সাঁওতাল বিদ্রোহ

সমাজ ও জীবন

সম্পাদনা

কমল চৌধুরী

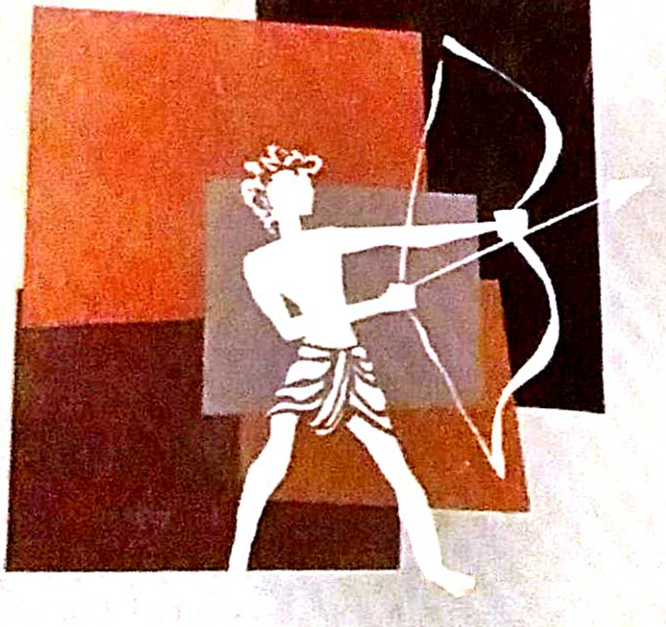

SANTAL BIDROHO : SAMAJ O JIBAN
A Bengali Book on SANTAL MUTINY and
also the Society and Lives of the SANTAL
Compiled & Edited by Kamal Choudhuri
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing @hotmail com
Rs. 400·00

ISBN : 978-81-295-1176-8

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১১, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮

৪০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

টাইপ সেটিং : নেপালচন্দ্র পান, সোনালী প্রেস
২এ ভোলানাথ পাল লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার প্রিয় লেখক
শ্রীঅনিল ঘড়াইকে

TAPAN TUDU
9733577309
tapantudu2013@gmail.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—কলকাতা
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র—কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রীকুমার রাণা
অধ্যাপক স্বপন বসু
শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ

১৫ পৃষ্ঠা ব্যতীত ভিতরের সব ছবি রামদাস টুডু রস্কের খেরওয়াল বংশ ধরম পুথি থেকে নেওয়া

প্রকাশকের নিবেদন

আগেই প্রকাশিত হয়েছে "সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর" এবং "নীল বিদ্রোহ ও সমকালীন বঙ্গ সমাজ" এবং "বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গ সমাজ"। এবার প্রকাশিত হল "সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ সমাজ ও জীবন"। অর্থাৎ ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৬০ সাল এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত বাঙালি জীবনের জটিল ঘটনাবর্তের বিশ্লেষণ ধরা পড়েছে এই তিনখানি গ্রন্থে। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের ঘটনাবলী বিবৃত হবে স্বতন্ত্র গ্রন্থে। এযাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি পাঠক সমাদৃত। বর্তমান গ্রন্থখানিও সমাদৃত হবে, আশা করি।

জানুয়ারি ২০১১

প্রকাশক

পরবর্তী গ্রন্থ
<u>সাঁওতাল সমাজ</u>
সংস্কার থেকে সমৃদ্ধি

TAPAN TUDU
9733577309
tapantudu2013@gmail.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ... ১১

সমাজ ও জীবন

সাঁওতাল পরগণা—অতীত ও বর্তমান—*শশিভূষণ রায়* ... ১৯
The Santal Parganas-*Calcutta Review-December 1860* ... ৬২
সাঁওতাল পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—*নবীনচন্দ্র ঘোষ* ... ৮৩
সাঁওতাল জাতি—*কালীপদ ঘোষ* ... ১০০
সাঁওতাল জাতি—*প্রফুল্লকুমার ঘোষ* ... ১০৬
সাঁওতালজাতির বিবরণ—*রামব্রহ্ম স্যানাল* ... ১০৭
সাঁওতালগণের বিবরণ—*প্রভাসচন্দ্র রায়* ... ১০৯
সাঁওতালগণের জীবন—*বিভূতিভূষণ গুপ্ত* ... ১১৫
সাঁওতালপল্লী ও সাঁওতাল চরিত্র—*নবীনচন্দ্র ঘোষ* ... ১২০
সাঁওতালদের গ্রামে—*প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়* ... ১২২
সাঁওতাল পুরাণ—*বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়* ... ১২৬
সাঁওতালি গান—*সরসীলাল সরকার* ... ১৪৭
সাঁওতালি গান—*সন্তোষচন্দ্র মজুমদার* ... ১৫১
সাঁওতালদের পূজাপদ্ধতি—*রণেন্দ্রবিজয় দাস* ... ১৬২
সাঁওতালদের বিবাহ ও গীত—*দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়* ... ১৬৫
সাঁওতালি রূপকথা—*কমল চৌধুরী* ... ১৭০
সাঁওতালি ভাষা—*প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়* ... ১৮৩
সাঁওতালি ভাষা—*কালীপদ ঘোষ* ... ২৬২
সাঁওতালি ভাষা—*মোহম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী* ... ২৬৫
সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও
প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব—*সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত* ... ২৬৭
বাংলা-সাঁওতালি শব্দের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ—*পরিমল হেমব্রম* ... ২৭১
বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষা ... ২৭৮

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া—*কৃষ্ণদাশ রায় (রাই)কুলকুড়ি* ... ২৮৭
সাঁওতাল বিদ্রোহ—*গৌরীহর মিত্র* ... ২৯৪

TAPAN TUDU
9733577309
tapantudu2013@gmail.com

সাঁওতাল বিদ্রোহ—*নীলরত্ন মুখোপাধ্যায়* ... ৩২৮
সাঁওতাল বিদ্রোহ—*মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল* ... ৩৩৫
সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কানু—*স্বপন বসু* ... ৩৫২
Santal Rebellion-Calcutta Review ... ৩৬১
সংবাদপত্র সাময়িকপত্রে প্রতিবেদন— ৩৯৫-৪৬০
সংবাদ প্রভাকর, সমাচার সুধাবর্ষণ, Friend of India, Bengal Hurkaru, Hindoo Patriot
নির্ঘণ্ট ৪৬১-৪৬৪

TAPAN TUDU
9733577309
tapantudu2013@gmail.com

ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সিপাহি যুদ্ধ এবং নীলবিদ্রোহ যতখানি মর্যাদার সঙ্গে বিশ্লেষিত, সাঁওতাল বিদ্রোহ ততখানি মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত হয়নি। তখন বাংলা প্রেসিডেন্সির অঙ্গ ছিল সাঁওতাল পরগণা। আজ বহির্বাংলার অন্তর্গত স্বতন্ত্ররাজ্য। আর্য-পূর্ব ভারতের অধিবাসী সাঁওতাল জাতি সুদীর্ঘকালের অবহেলা, নির্যাতনে এক মর্মান্তিক দুর্বিষহ জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। নির্মম পৃথিবী ওদের কোথাও সুখেশান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। এক কঠোর সংগ্রামের অধ্যায়। আর্যসংস্কৃতি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা আদি বাসভূমি ত্যাগ করে, জঙ্গল অধ্যুষিত বিপদসঙ্কুল স্থানে নতুন বাসস্থান গড়ে তোলে বারবার। কঠোর পরিশ্রমে অনাবাদী জমিকে চাষের উপযোগী করে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করেছিল। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতিকে কখনও তারা পরিত্যাগ করেনি। স্বতন্ত্র স্বাভাবিক জীবন যাপনে তারা অভ্যস্ত থেকেছে।

কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির প্রভুত্ব বিস্তারের পর তারা শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে পড়ে। আর্য প্রভুত্ব বিস্তারের পর সাঁওতালরা আদি বাসস্থান ত্যাগ করে যায় ঠিকই, কিন্তু জীবনকে হারিয়ে ফেলেনি তারা। বেঁচে থাকার জন্য তীব্র লড়াই তাদের করতে হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।। মুসলমান আমল পর্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি পেতে পেতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত জটিল হয়েছে, সাঁওতাল জীবনধারাও নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সে এক বীভৎস দিনযাপন। মানুষের মর্যাদা হারিয়ে জঙ্গলবাসী সাঁওতালরা পড়েছিল চরম দুর্গতির অধ্যায়ে। ইংরেজ শাসকদের চরম অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশীয় মহাজন আর অসাধু ব্যবসায়ীদের সংযোগ। কঠোর পরিশ্রমে তারা যে ফসল ফলাবার জমি তৈরি করেছিল, যে সামান্য ফসল ফলাত তাও তাদের ঘরে উঠতো কম। আসবাবপত্র, গয়নাগাটি—নিজস্ব তাদের কিছুই থাকতো না। লোভী মানবতাহীন মহাজনরা তাদের পরিণত করেছিল ক্রীতদাসে।

কিন্তু এমন অবস্থা দীর্ঘদিন থাকেনি। ক্রীতদাসের জীবন থেকে অনাহারের জগৎ থেকে, উদ্ধারের বাসনা তাদের মধ্যে তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা সাঁওতাল সমাজের প্রতিটি মানুষ, ইংরেজশাসক, ইংরেজ নীলকর, দেশীয় মহাজন, অসাধুব্যবসায়ী, দারোগা, পুলিশ, সুবিধাভোগী বাঙালি সম্প্রদায়—সকলের বিরুদ্ধে ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সংগঠিত সাঁওতাল সমাজ হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। ক্রীতদাসত্ব থেকে তারা মুক্তি চায়। বাঁচতে চায় মানুষের মতো।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বারবার বঞ্চিত হয়েই তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। ইংরেজ শাসক জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ পায় ১৮৫৫-৫৬ সালে। তার আগে ও পরে সাঁওতালরা কয়েকবার হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। যে বছরগুলিতে এই সব বিদ্রোহ ঘটে :

১৮১১ খ্রিঃ	১৮২০ খ্রিঃ
১৮৩১ খ্রি	১৮৫৫-৫৬ খ্রিঃ
১৮৭১ খ্রিঃ	১৮৭৪-৭৫ খ্রিঃ

১৮৮০-৮১ খ্রিঃ

এই সময়কালের অন্যান্য বিদ্রোহ হল-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ফরিদপুরে দুদুমিয়ার বিদ্রোহ, ২৪-পরগণায় তিতুমিরের বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ায় রায়ত বিদ্রোহ—ঐসবই ছিল কৃষক বিদ্রোহ। অর্থাৎ কৃষক সমাজই প্রথম বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। আরও বিদ্রোহ সমকালের জনজাগরণের চিত্রতুলে ধীরে, বা ইংরেজ শাসক, জমিদার ও মহাজনের নির্যাতনের মুখোশ খুলে দেয়।

ভারতের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী সাঁওতালদের সুনাম ছিল নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ হিসাবে। সাদাসিধে সরল জীবন তাদের—নিজস্ব কৃষ্টিকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। ইংরেজ আসবার পর থেকে এদের সনাতন জীবন ধারায় দেখা দেয় চরম বিপর্যয়। ইংরেজদের শোষণ এবং দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের চক্রান্তে তাদের নাভিশ্বাস ওঠে। ওরা কেবল চেয়েছিল বসবাস আর চাষবাসের জন্য ফসলি জমি। ওদের ছিল সোনার ফসল। কিন্তু এখন তাদের অভাব অনাহার নিত্যসঙ্গী। সেই নিরীহ মানুষের কেন বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেছিল? নিজেদের কৃষ্টির মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে হাজার হাজার ইংরেজ সরকারের খেপা সৈন্যদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল?

ডবলু. ডবলু. হান্টার" অ্যানালস অফ রুবাল বেঙ্গল"—গ্রন্থে সাঁওতাল জীবনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"অধিকাংশ সাঁওতালেরই এমন কি সামান্য ঋণ শোধ করবার মতো জমি বা ফসল থাকে না। যদি কোন সাঁওতালের পিতা মারা যায়, পিতার মৃতদেহ দাহ করবার জন্য তাকে জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে কয়েকটি টাকা ঋণ করতেই হবে। কিন্তু টাকা কয়টির জামিন স্বরূপ বাঁধা রাখবার মতো তার কোন জমিও নেই, বা ফসলও নেই। তাই সে জমিদার বা মহাজনের কাছে লিখে দিতে বাধ্য হয় যে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে এবং তার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার জমিদার বা মহাজনের দাস হয়ে থাকবে। এই কথা লিখে দেবার পরিদিনই সেই সাঁওতাল পরিবারকে জমিদার বা মহাজনের গোলামি করতে যেতে হয়। এজীবনে তার সেই ঋণ শোধ হবার কোন উপায় থাকে না। কারণ, যে টাকা ঋণ বাবদ নেওয়া হয়, প্রতিদিনই তার সুদ বেড়ে যায়, আর সুদে-আসলে বেড়ে মোট ঋণ পর্বত প্রমাণ হয়ে ওঠে। কোন ক্রীতদাস পুরো সময় অর্থাৎ দিনরাত জমিদার বা মহাজনের কাজ করতে অস্বীকার করলে, পুলিশ বা সরকারি কর্মচারীরা এসে ওই সাঁওতালকে জেলের ভয় দেখিয়ে ঠান্ডা করে। সাঁওতালটি কখনও জঙ্গলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, অবিলম্বে পুলিশ এসে হাজির হয়, তারপর সাঁওতালটি জেলে যায়। জেল থেকে ফেরার পর আবার আরম্ভ হয় মহাজনের দাসত্ব।"

বিদ্রোহী ভারত—সুপ্রকাশ রায়

সাঁওতাল জাতি নিরীহ হলেও কঠোর পরিশ্রমী। জঙ্গল হাসিল করে দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে চাষবাস ও বসতি গড়ে সোনা ফলিয়েছে। কিন্তু সবই চলে গেছে জমিদার ও মহাজনের কবলে। এইভাবে তারা বারবার স্থানান্তরিত হতে হতে ছোটনাগপুর অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। রাজমহল পাহাড়তলিতে দোমন-ই-কো তাদের সবথেকে বড় বসতি গড়ে ওঠে। আঠারো বা উনিশ শতকের প্রথম দিকের কথা। এই সময়কালের মধ্যে দামন-ই-কো এলাকায় কটক, মালভূম, ছোটনাগপুর, হাজারিবাগ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম থেকে সাঁওতালরা এসে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ৪২৭টি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে। যার সংখ্যা

১৮৫১ সালে হয় ১৫০০। লোকসংখ্যা ৮৩ হাজার। এখানে চাষাবাদ করতে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছিল। জানা যায়, পঁচিশ বছরে তারা পাঁচ লাখ বিঘা জমি হাসিল করে এবং তাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ। সমস্ত অঞ্চলই তারা সোনার ফসলে ভরে তোলে। কিন্তু একদিন জানলো এসব জমি তাদের নয়। জমিদার আর মহাজনদের দখলে চলে গেছে। এখানে প্রথম পর্বে সাঁওতালরা নিশ্চিন্ত নির্ভয় থাকলেও, বাঙালি ভোজপুরি ও ভাটিয়া ব্যাপারী ও মহাজনরা তাদের শান্ত ও নিরাপদ জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সাঁওতালরা পণ্য লেনদেনের মাধ্যমে জীবনযাপন করত। কিন্তু ব্যাপারীরা এখানে কারবার শুরুর পর তারা মুনাফার পাহাড় জমিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে ছিল তাদের সুদের কারবার। তাদের কাছ থেকে ধার নিয়ে সাঁওতালরা জমি হাসিল ও চাষাবাদ করত। কিন্তু তারপর দেখত সেইসব জমি চলে গেছে ব্যাপারীদের হাতে।

সাঁওতাল জীবন ঐ অঞ্চলে ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল। খোয়াকির স্বল্প ধান একসময় ফুরিয়ে যেত। সেই সঙ্গে ছিল নানারকম ক্রিয়া কর্ম। ধান কর্জ নিত। আর ব্যাপারীরা তাদের ফসলের ওপর দখল রাখত। যা কোন দিনই শোধ হত না। জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েও তারা রেহাই পেত না। এদিকে মহাজনরা আদালতের সাহায্যে তাদের গরু বাছুর মোষ, ভাতের হাঁড়ি-থালা থেকে মেয়েদের হাতের বালাটাও কেড়ে নিত। ঐ অঞ্চলে যে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিল, বখরা থেকে সেও বাদ পড়ত না। সারা ভারত জুড়ে তখন ইংরেজের করাল গ্রাস বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলা আর বিহার জুড়ে সেই লড়াই তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, সাঁওতালদের কানে এসে পৌঁছে গেছে সেই বিদ্রোহের ডাক। কোন সাঁওতালই তার থেকে দূরে সরে থাকতে পারে নি।

শয়তান ইংরেজ শাসক। তাদের তাবেদার জমিদার মহাজন, পুলিশ, পাইক-পেয়াদা আর জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের তাড়াবার জন্যে সাঁওতালরা জোটবদ্ধ হতে থাকল। তাদের নেতা সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ। নিজেদের স্বাধীন রাজ্য তারা চায়। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন। ভগবানডিহিতে ১০ হাজার সাঁওতাল সমবেত হল। আর তারা অত্যাচার ও দাসত্ব মানবে না। এ সংবাদ পুলিশের কানে পৌঁছাল। তারাও এসে হাজির। কিন্তু দারোগাসহ মারা পড়ল ৯ জন পুলিশ। সুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ। তারপর শুরু হল পুলিশ আর ইংরেজ সৈন্যের একের পর অভিযান। বিদ্রোহীরা চুপ করে ছিল না। পালিয়েও যায় নি। পাকুড়ের রাজবাড়ি ও অম্বর পরগণার জমিদার বিদ্রোহীদের শিকার হল। বিদ্রোহীরা দখল করে ফেলল বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চল। সেখানে ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নীলকর সাহেব আর জমিদার মহাজনরা পালিয়ে আশ্রয় নিল ইংরেজ শাসকের। বিদ্রোহীদের কামান বন্দুক ছিল না। তবুও তাদের হাতে বারবার পরাস্ত হয়েছে অধিক শক্তিধর ইংরেজ বাহিনী। অবশেষে এক বিরাট সেনাবাহিনী এগিয়ে আসে সাঁওতাল পরগণার দিকে। সমস্ত সাঁওতাল পরগণা তারা চষে ফেলে। নির্বিচারে হত্যাকরে সাঁওতালদের। সেদিন জমিদার মহাজনরা এসে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ শাসকের হিতৈষী হিসাবে। মুর্শিদাবাদের নবাব যে পঞ্চাশটি হাতি পাঠিয়েছিল, তাদের পাগল করে ছেড়ে দেওয়া হয় সাঁওতাল বসতি এলাকায়। শত শত মানুষ তাদের পায়ের নিচে চাপা পড়ে মারা গেল। অনেক নীলকুঠি আর ইংরেজ ঘাঁটির কোন চিহ্ন ছিল না। সিধুকে ইংরেজরা হত্যা করলেও, কানু ও অন্যান্য নেতারা

আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। ১৮৫৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলল বিদ্রোহীদের আক্রমণ। তারপর ধীরে ধীরে স্তিমিত হতে থাকে। ১৮৮০-৮২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ ১৮৫৫-৫৬ সালের মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। ইংরেজ সেনানায়ক টমাস গর্ডন বিরাট বাহিনী ও কামান নিয়ে সেদিন সাঁওতাল বসতিকে শ্মশানে পরিণত করেছিল।

বর্তমান গ্রন্থ কেবল বিদ্রোহের ইতিহাস নয়। সাঁওতাল জনজীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি—জীবনের নানাদিকে আলোকপাত হয়েছে। সাঁওতাল সমাজের কাছাকাছি যারা থেকেছেন, দীর্ঘদিন বসবাস করেছেন—তাদের লেখায় সাঁওতাল সমাজ ও জীবনের কথা ফুটে উঠেছে। আজ সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। একদা অশিক্ষা ও সংস্কার ওদের জীবনের সংগে আমূল জড়িয়ে ছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটেছে। শিক্ষিত সাঁওতালরা নানা পেশার সঙ্গে আজ যুক্ত। নারীজীবন আর প্রাচীন আবরণে আবৃত নয়। সমাজের বৃহৎ অঙ্গন জুড়ে তাদের বিচরণ।

"সাঁওতাল পরগণা—অতীত ও বর্তমান" বইটি শশিভূষণ রায় লেখেন ১৩৩৩ সালে। সাঁওতালদের বসতি এবং সমাজ ও জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য গ্রহণযোগ্য না হলেও ইতিহাসের অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। সাঁওতাল ভাষা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কম নয়। তারা বাংলা হরফে নিজেদের ভাষা লিখলেও, তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও তৈরি হয়েছে। সাঁওতাল ভাষা সম্পর্কে একখানি বই লেখেন প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২৮ সালে। সাঁওতাল ভাষা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী বাংলা ভাষাভাষী বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। অধুনা দুষ্প্রাপ্য বইটি এখানে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। সাঁওতাল ভাষা জনজীবন সম্পর্কে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য রচনা আছে এই সংগ্রহে। শ্রীপরিমল হেমব্রম লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধটি একটি সাধারণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনা করে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। সাঁওতাল-বাংলা-সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক লেখাটি পড়লে উপকৃত হবেন। শ্রীহেমব্রমের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

অকপটে স্বীকার করা উচিত, কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে। সহৃদয় পাঠক, গ্রন্থের ত্রুটি বিষয়ে উল্লেখ করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত হবে।

কমল চৌধুরী

২৩৩ বিবেকানন্দ সরণি (কলুপুকুর)
বারাসাত উত্তর ২৪ পরগণা
পিন৭০০০১২৪
দুরভাষ (মঃ) ৯৩৩৯৫০৫৫৮৩
৯৮৭৪২৩৪১১০

SNT-2018-441
VIDYASAGAR UNIVERSITY
Dept. of Santali
RECEIVED
MIDNAPORE, PIN-721102

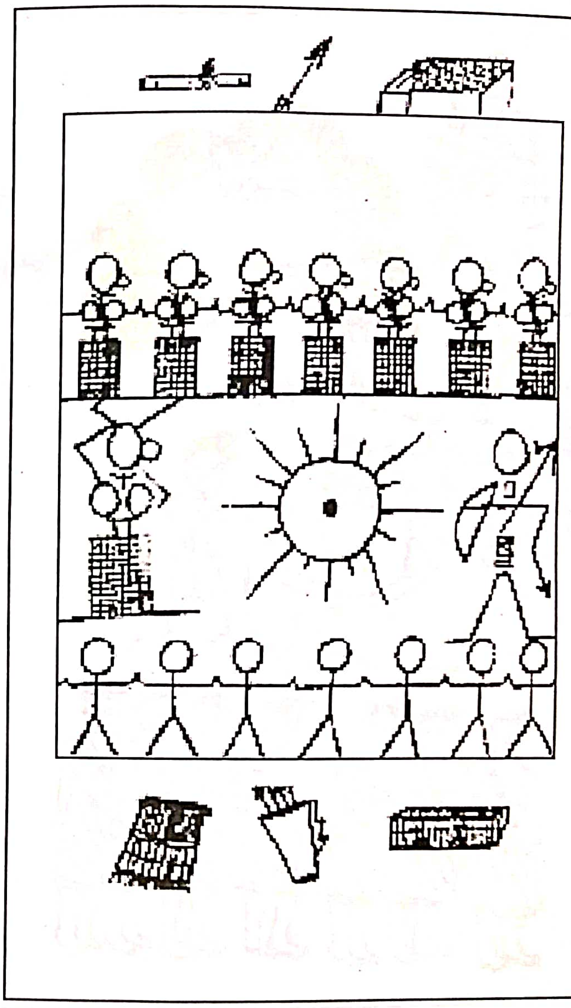

সাঁওতালি অলংকরণ—সাঁওতাল পরগণার বারমাস্যা—কুমার রাণা

নিবেদন

দেশের এই দুর্দিনে দেশভক্ত হওয়া ভীষণ বিড়ম্বনা। দেশ ভক্তগণের সংখ্যা সেই জন্য অতি অল্প। পাকুড়নিবাসী বৃজলাল ডোকানিয়া বর্তমান সময়েও দেশভক্তির এক বিমল আদর্শ এবং এই পুস্তিকা তাহারই নামে প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থকার বাস্তবিকই আনন্দিত। বিশেষতঃ এই পুস্তিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য এই জেলার অধিবাসীবৃন্দের জ্ঞাতার্থে এই জেলার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা। বৃজলাল ডোকানিয়ার উদার সহানুভূতিতে গ্রন্থকার বিনা আয়াসে এই পুস্তিকা সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সমর্থ। যদি ইহা পাঠ করিয়া পাঠক এই জেলার বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভে সমর্থ হন ; তাহা হইলেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইবে। যে দুরূহ বিষয়ের আলোচনা এই পুস্তিকায় করা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নহে ; অতএব পাঠকের নিকট তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়।

ইতি
বিনীত
শ্রীশশিভূষণ রায়
দেবঘর
১০ ভাদ্র, ১৩৩৩ সাল

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাস

বর্তমানে যে জেলা সাঁওতাল পরগণা নামে অভিহিত তাহার পূর্ব নাম ছিল "জঙ্গল তরাই" এবং পরিমাণও অনেক অধিক ছিল। রাজমহলের সন্নিকটস্থ পর্বতমালা "জঙ্গল তরাই" এর মুখ্য অঙ্গ স্বরূপ ছিল এবং উক্ত পর্বতমালা ও তৎপার্শ্বস্থ অরণ্যময় প্রদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে পাহাড়িয়া নামক এক বন্য জাতির বাস। উক্ত রাজমহল পাঠান ও মোগল রাজত্বকালে রাজশক্তির কেন্দ্রস্থানীয় হইয়াছিল। কিন্তু পাহাড়িয়াদিগের উপর কোন রাজশক্তিই বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। প্রকৃতির পার্বত্য সৌন্দর্যের মধ্যে বন-জীবন অতিবাহিত করাই পাহাড়িয়াগণের নিকট অতি আনন্দের বিষয় ছিল এবং বন্য-জীবীদির মাংস ও ফলমূলাদির সাহায্যে তাহারা অতি সুখে কালাতিপাত করিত। অতি অল্পেই যাহারা সন্তুষ্ট, তাহারা অনেক অভাব উপলব্ধিই করিতে পারে না; এবং সেই জন্য কৃষিজাত সামগ্রীর অভাব বোধ না করায় পাহাড়িয়াগণ কৃষি বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। বিনা হল-কর্ষণে যে সব ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহারই মধ্যে দুই একটি ফসল ইহারা উৎপাদন করিত এবং তদ্দ্বারাই জীবন যাপন করিত। উক্ত ভাবে কালাতিপাত করার বিশেষ কারণ এই যে, পাহাড়িয়াগণ শারীরিক পরিশ্রম করিতে বড়ই বিমুখ। আলস্যে সময় অতিবাহিত করাতেই তাহাদের যেন বিশেষ আনন্দ এবং সেই জন্য তাহারা বর্তমানেও ভোগে বড়ই আসক্ত। বন্য জন্তুর শিকারে ইহাদের আনন্দ। জীব হিংসায় যে পাপ হয় তাহা ইহারা জানে না ; সুতরাং ইহাদের প্রকৃতি নিষ্ঠুর। এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির জন্য ইহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইলেই ইহারা পর্বত সন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের নিরীহ কৃষকদলকে উৎপীড়িত করিতে ও তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে বিন্দুমাত্র শঙ্কা বোধ করিত না। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে ইহাদের অত্যাচার অতি ভীষণ আকার ধারণ করে ও পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত অত্যাচার চলিতে থাকে। এই অত্যাচারী জাতিকে দমন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব ৮০০ শত সৈন্য নিয়া এক সৈনিকদল সৃষ্টি করেন এবং তাহাদিগকে পাহাড়িয়া দমন কার্যে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় হইতেই প্রকৃতভাবে এই জেলায় ইংরাজদের শাসন আরম্ভ হয়।

পাহাড়িয়া ভিন্ন অন্যান্য অনেক জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এই জেলায় বসবাস করিয়া আসিতেছে। পাঠান রাজত্বকাল হইতেই রাজমহল প্রসিদ্ধি লাভ করায় উক্ত সব্‌ডিভিশনে এখনও অনেক মুসলমানের বাস এবং হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান "বৈদ্যনাথ ধাম" এই জেলার অন্তর্গত বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেবঘর, দুমকা প্রভৃতি সবডিভিসনে উচ্চ ও নীচবর্ণের বহু হিন্দু এই জেলায় বাস করিয়া আসিতেছে। "ভবিষ্য-পুরাণে" এই জেলার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং উক্ত পুরাণ হইতে জানা যায় যে, পূর্বে এই জেলার মাত্র এক চতুর্থাংশে চাষ আবাদ হইত ও তদতিরিক্ত প্রদেশ অরণ্যময় ছিল। প্রসিদ্ধ অজয়-নদের উল্লেখও উক্ত পুরাণে পাওয়া যায়। মহান হিন্দু-ধর্মের বিমল জ্যোতির

প্রকাশ এই জেলার অনেকাংশেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ প্রায় প্রত্যেক সব্‌ডিভিসনেই হিন্দুত্বের অক্ষয় স্তম্ভস্বরূপ প্রতীক উপাসনার নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। দেবঘরের অতি সন্নিকটে শঙ্করপ্রিয় হরিতকী বন বা "হরলাজুড়ি" ও সাধুজন সেবিত "তপোবন"। দেবঘর হইতে প্রায় ষোল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মপুরাণোল্লিখিত অনূঢ়েশ্বরী-দেবীর পবিত্র মন্দির বিরাজমান। অনূঢ়েশ্বরী নামের অপভ্রংশ বুঢ়েশ্বরী-নামে উক্ত তীর্থ এখনও পরিচিত এবং উক্ত দেবীর সেবাইত জনৈক হিন্দু ঘাটোয়াল। নামের অপভ্রংশ হওয়ার কারণ নির্দেশ করা অতি সহজ; যেহেতু উক্ত দেবী আজীবন অবিবাহিতা অবস্থায় ছিলেন এবং বার্ধক্যে ও অবিবাহিতা থাকায় "বৃদ্ধা" শব্দের স্থানীয় প্রতিশব্দ "বুঢ়া" শব্দের সহিত "ঈশ্বরী" শব্দের সংযোগে "বুঢ়েশ্বরী" নামকরণ হইয়াছে। বুঢ়েশ্বরী নামানুসারেই সেবাইত ঘাটোয়ালের গ্রামের নাম বুঢ়ই হইয়াছে। দুমকা সব্‌ডিভিসনে "বাসুকিনাথ" শিবের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ; গোড্ডা সবডিভিসনে "সিংহেশ্বরনাথ" শিবলিঙ্গ এবং রাজমহলে "গর্জেশ্বরনাথ" অতিশয় বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য উক্ত কয়েকটি তীর্থস্থানের অতিরিক্ত আরও কয়েকটি তীর্থস্থান আছে। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হইতে এই জেলার এইমাত্র ইতিহাস পাওয়া যায়।

এই জেলার বিশেষ ইতিহাস মুসলমান লেখকগণের নিকট হইতে পাওয়া যায়। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ রাজমহলের সন্নিকটস্থ "তেলিয়াগড়ি" নামক দুর্গে সৈন্য স্থাপন করিয়া হুমায়ুন বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাদশাহের সৈন্য শের সাহকে পরাজিত করিয়া দুর্গ দখল করিয়া লয়। মুসলমান রাজত্বকালে বঙ্গবিজয়ের জন্য যে সকল যুদ্ধ হইত, তাহাতে প্রথমে রাজমহলের পাশ দিয়াই আক্রমণ করা হইত এবং আক্রমণকারিগণ এই পথে বাংলা দেশে প্রবেশ করিত। সুতরাং বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে রাজমহল তোরণ স্বরূপ ছিল। গঙ্গা নদীর তটে অবস্থিত থাকায় রাজমহল বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং এই রাজমহল যখন শাহ-সুজার সময় বাংলার রাজধানী ছিল তখন সর্বপ্রথম ইংরাজ বণিকগণ নবাব শাহ সুজার নিকট হইতে এক "ফরমান" দ্বারা বঙ্গে অবাধে বাণিজ্য করার আদেশ এই রাজমহল নগরীতেই প্রাপ্ত হন। গৌড়ের পার্শ্বদেশ হইতে গঙ্গার স্রোত দূরে ঘুরিয়া যাওয়ায় গৌড় হইতে বাংলার রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা মানসিংহ রাজমহলের পূর্ব নাম "আগমহল" পরিবর্তিত করিয়া "রাজমহল" নামকরণ করেন। মানসিংহের সময়ে রাজমহল এক অতি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল ও সেই সময়ে অনেক অট্টালিকা ও প্রাসাদে ইহা সুশোভিত ছিল। কথিত আছে যে, রাজমহলের নিকটস্থ পর্বতে বাদশাহের জন্য বরফ প্রস্তুত হইত।

শেরশাহ সর্বপ্রথম রাজমহলে রাজধানী স্থাপনের চেষ্টা ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে, করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা মানসিংহ রাজমহলকে রাজধানীতে পরিণত করেন। পূর্বোক্ত "তেলিয়াগড়ি" দুর্গেই সৈন্য সমাবেশ করিয়া সাজাহান তাহার পিতা জাহাঙ্গীরের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীর বাদশাহের সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ ঢাকা হইতে রাজমহল আসিয়া বিদ্রোহী সাজাহানকে আক্রমণ করেন ; কিন্তু সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হওয়ায় সাজাহান কিছু দিনের জন্য বাংলার অধিপতি হইয়াছিলেন। প্রয়াগের নিকটে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সাজাহান পরাজিত হওয়ায় তিনি ঢাকায় পলায়ন করেন এবং সেইজন্য রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়া যায়। সাজাহানের

দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপিত করেন এবং রাজা মানসিংহ যে সকল দুর্গ ও প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার উৎকর্ষ সাধন করেন। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় রাজমহলের অনেকাংশ ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং কিছুদিন পরে গঙ্গার স্রোতের গতি পরিবর্তিত হইয়া রাজমহলের অনেক গৃহাদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এই জন্য বর্তমানে রাজমহলে মোগল রাজধানীর অতীত গৌরবের বিশেষ চিহ্নাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি হওয়ার পরেও ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজমহলে রাজধানী ছিল।

১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুজা তদীয় ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দিল্লি অভিমুখে যুদ্ধযাত্রায় পথিমধ্যে আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে ফিরিয়া আসেন এবং মুঙ্গেরে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা ও তদীয় পুত্র কুমার মহম্মদ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় শাহ সুজা রাজমহলে প্রত্যাগমন করেন। রাজমহলের নিকটস্থ তেলিয়াগড়ি ও সঁকরীকলিতে সৈন্য সমাবেশ করিয়া শাহ সুজা মীরজুমলার গতিরোধের প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিন্তু বর্ষার সমাগম হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হয় এবং রাজমহলে মীরজুমলা সৈন্য স্থাপনা করিয়া যুদ্ধানুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শাহ সুজার সৈন্যদল মধ্যে মধ্যে মীরজুমলার সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া বড়ই বিব্রত করিতে আরম্ভ করে। বিশেষতঃ কুমার মহম্মদ শাহ সুজার পুত্রীর প্রেমের আকর্ষণে মীরজুমলার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভাবী প্রণয়িণীর পিতার সহিত যোগদান করেন এবং জন্মদাতা পিতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মীরজুমলা উপায়ান্তর না দেখিয়া বর্ষাকালেই শাহ সুজাকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হন এবং ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুজাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন।

শাহ সুজার পতনের পর মীরজুমলা বাংলার শাসক নিযুক্ত হন এবং তাহার আদেশে ইংরাজ বণিকগণের মাল বোঝাই জাহাজ সকল রাজমহলের নিকটেই আটক করা হয়। ইংরাজগণ ক্ষমা প্রার্থনা করায় ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলে ব্যবসার এক কেন্দ্র স্থাপন করার আদেশ প্রাপ্ত হন। রাজমহলে বাদশাহের যে "টাকশাল" ছিল ইংরাজগণ সেই "টাকশালে" রৌপ্যাদি পাঠাইয়া তাহা মুদ্রায় পরিণত করাইয়া লইতেন। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে জনৈক সর্দার সুবা সিং বিদ্রোহী হইয়া উড়িষ্যার সর্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হয়; তখন তাহারা উভয়ে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং সুবা সিংহের সৈন্যগণ রাজমহল দখল করিয়া ইংরাজগণের সমস্ত সম্পত্তি যাহা রাজমহলে ছিল তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম খাঁর সৈন্য কর্তৃক রাজমহলের পুনরুদ্ধার হওয়ায় ইংরাজগণ তাহাদের সম্পত্তি পুনরায় পাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজমহলস্থ ইংরাজ বণিকগণ পুনরায় ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। কারণ, সেই সময় সম্রাট আওরঙ্গজেবের যে আদেশ ভারতে ইংরাজ-বণিকদলকে বন্দি করার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল, তদনুসারে রাজমহলস্থ ইংরাজ বণিকগণও সম্পত্তি সহ ধৃত হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন পর্যন্ত বন্দি ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে শাহ আলমের পুত্র অজিমুস সাহ পিতার সাহায্যার্থে রাজমহল হইতে দিল্লি যাত্রা করেন এবং রাজমহলে নিজ পুত্র ফরুকসিয়ারকে ও অন্দরের মহিলাগণকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংরাজ বণিকগণ ১৫০০ পনের হাজার টাকা ও দুইটি বৃহৎ দর্পণ, নবাব ও দেওয়ান সাহেবকে

উপঢৌকন স্বরূপ রাজমহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের পুনর্বার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কারণ, আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ফরুকসিয়ার ও তাহার কোষাধ্যক্ষ ইংরেজ দূতকে উত্তর দিয়াছিলেন যে, দেড় লক্ষ টাকা না দিলে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হইবে না। এই উত্তরে ইংরাজগণ অসন্তুষ্ট হইয়া হুগলি নদী দিয়া মোগলদের যে সব জাহাজ যাতায়াত করিত তাহা আটক করিবার চেষ্টা করে। ফলে ইংরাজদিগের রাজমহলস্থ এজেন্ট "কথর্প" সাহেব নবাবের আদেশে বন্দি হন। ইহার পরেও ইংরাজগণ প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ৪৫০০ হাজার টাকা নবাবকে দেওয়ার পর পুনর্বার বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে নবাব ফারুকসিয়রের মনস্তুষ্টির জন্য ইংরাজ বণিকগণ তাহাদের প্রতিনিধিকে নবাব দরবারে রাজমহলে প্রেরণ করিয়াছিল। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সম্রাট্ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ অরাজক হইয়া উঠে। "ইজ্জদ্দৌলা" নামক জনৈক সেনাপতি রাজমহলে অধীশ্বর হইবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু তিনি ফারুক্সিয়ারকে মুর্শিদাবাদ যাইবার পথে "তেলিয়াগাড়ির" পার্শ্ব দিয়া যাওয়ার সময় কোনও প্রকার বাধা দিবার সাহস করেন নাই।

১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে মারাঠাগণ রাজমহল অধিকার করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁকে মুর্শিদাবাদ ও গঙ্গার অপর পার্শ্বস্থ প্রদেশসমূহ ছাড়া আর কিছুই অধিকারে রাখিতে দেয় নাই। সেই সময় কিছুদিন রাজমহল ও এই জেলার অনেকাংশ মারাঠাদিগের অধীনস্থ ছিল। এমন কি কতিপয় মারাঠা এই জেলায় বাস করিতে আরম্ভ করে; যাহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও এই জেলায় রাঠোর নামে পরিচিত কতিপয় রাজপুতের বাস আছে। এই জেলায় থাকিয়া মারাঠাগণ বাংলা দেশ লুটপাট করিত, যাহা এখনও বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা নামে আবাল-বৃদ্ধ-সকলের নিকট পরিচিত। পলাশির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব সিরাজোদ্দৌলা গঙ্গা-নদী দিয়া পলায়নের সময় এই রাজমহলে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হন ও নাক কান কাটা এক ফকির, (যাহার অঙ্গচ্ছেদ নবাবের আদেশেই হইয়াছিল নবাবকে চিনিতে পারে এবং ফকিরের নিকট হইতে রাজমহলস্থ, ফৌজদার মীরজাফর আলি খাঁ সংবাদ পাইয়া নবাবকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। মুর্শিদাবাদে মীরন কর্তৃক নবাব সিরাজোদৌদ্দলাকে হত্যা করা হয়। মীরন চম্পারন জেলায় বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহার মৃতদেহ নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ লইয়া যাওয়া হইতেছিল; কিন্তু মৃতদেহ অতিশয় দুর্গন্ধময় হওয়ায় তাহা রাজমহলেই কবরস্থ করা হইয়াছিল। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের দক্ষিণে ছয়মাইল দূরে উধুয়ানালা (বর্তমানে উধুয়া গ্রাম) নামক স্থানে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হইয়াছিলেন এবং এই স্থানেই মুসলমান অধিকারের গৌরব রবি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই এই জেলা ইংরাজদিগের অধীনস্থ হয় ; কিন্তু ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই জেলায় ইংরাজ শাসন প্রণালী প্রকৃতভাবে প্রচলিত হয় নাই।

১৭৬৩ হইতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলার কোনও শাসনকর্তা ছিল না বলিলেই হয়। তখনও পাহাড়িয়াগণ পার্বত্য স্থান-সমূহে স্বাধীনভাবে বাস করিতেছিল। অম্বর পরগণায় প্রতাপশালী এক হিন্দু জমিদার ছিলেন এবং রাজমহল ও পাকুড়ে বহু হিন্দু ও মুসলমানের বাস ছিল। গোড্ডার মনিহারী পরগণায় প্রতাপশালী খেতৌর সর্দারগণের

রাজত্ব ছিল ; যাহাদের পূর্বপুরুষ রূপকর্ণ সিং বঙ্গবিজয়ে রাজা মানসিংহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। দেবঘর দুমকা ও জামতাড়া সবডিভিসনে অনেক হিন্দু জমিদার ও ঘাটোয়ালগণের অধিকার ছিল। ইহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লছমীপুরের ঘাটোয়াল এবং সুলতানাবাদের জমিদার। ইহারা উভয়েই হিন্দু ছিলেন এবং ইহাদের বংশধরগণ এখনও বর্তমান রহিয়াছে। ১৭৭০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ এই সময়েই হইয়াছিল এবং অন্নাভাবে পাহাড়িয়াগণ পর্বতমালার নিম্নপ্রদেশের নিরীহ গ্রামবাসিদিগের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত ছিল। উক্ত লুণ্ঠন-কার্যে কতিপয় ঘটোয়াল ও জমিদার পাহাড়িয়াদিগকে সহায়তা করিতেছিল এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর অংশও গ্রহণ করিত। যে সময়ে এই জেলার এইরূপ অরাজক অবস্থা, সেই সময় হইতে ইংরাজগণ এই জেলার শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উক্ত সময়ে সমগ্র ভারতে এক প্রকার অরাজকতা বিদ্যমান ছিল।

এই জেলার বর্তমান নাম সাঁওতাল পরগণা ; কিন্তু সাঁওতালগণ এই জেলার আদিম অধিবাসী নহে। হিন্দু মুসলমান ছাড়া একমাত্র উল্লেখযোগ্য বন্য-জাতি পাহাড়িয়াগণই এই জেলায় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব হইতে বাস করিয়া আসিতেছে। সাঁওতালগণ এই জেলায় ১৭৯০ হইতে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সর্বপ্রথম আসিতে আরম্ভ করে এবং তাহার পর হইতে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া বর্তমানে প্রায় ছয় লক্ষের উপর হইয়াছে। যাহা হউক ইংরাজ সরকার এই জেলার নাম সাঁওতাল পরগণা দিয়াছে এবং সেই নামেই ইহা এখন পরিচিত। সাঁওতালগণের বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
শাসন পদ্ধতির ইতিহাস

সাঁওতাল পরগণার বর্তমান শাসন-পদ্ধতি কিভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রচলিত শাসন পদ্ধতির উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত কোন বিশেষ পদ্ধতি এই জেলায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ নং কানুন দ্বারা এই জেলার বর্তমান নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল এবং এই জেলাকে উক্ত সময়ে প্রচলিত বাংলার ও ভারতের সর্বপ্রকার সাধারণ আইন-সমূহের অধিকার হইতে পৃথক করা হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন সরকারি উকিল সাহেব ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহা হইতে উক্ত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭নং কানুনের উদ্দেশ্যের এইরূপ অর্থ করা হয় যে, ভারতে তৎকালে বা তৎপরে প্রচলিত সমস্ত আইনের অধিকার হইতে এই জেলাকে পৃথক করা হয় নাই। সুতরাং অন্যান্য সাধারণ আইন অনুসারে এই জেলাতেও জমির হস্তান্তর প্রথা জারি হইয়া যায়। যাহার ফলেই নাকি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালগণ পুনর্বার বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিন নম্বর রেগুলেশন্ জারি করিয়া এই জেলাকে সম্পূর্ণভাবে ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে পৃথক করা হয় ও এই জেলার জন্য পৃথক আইন জারি করার অধিকার বড়লাট সাহেবকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে যে ভারত-শাসন-সংস্কার নামক আইন জারি করিয়া সকল প্রদেশকে আইন করার কিছু অধিকার কাউন্সিল দ্বারা দেওয়া হইয়াছে, সেই আইনের ৫২ ও ৭১ ধারায় এই জেলার জন্য আইন করিবার পূর্ণ অধিকার বড়লাট সাহেবকেই দেওয়া হইয়াছে। অতএব এই জেলার শাসন পদ্ধতির ইতিহাস আলোচনার বিষয় ১৭৭২ হইতে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ ও তৎপরবর্তী কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব ভাগের নাম "সৈনিক শাসনের যুগ" এবং পরবর্তী ভাগের নাম "শাসকের যুগ" দেওয়া হইয়াছে। উক্ত নামকরণ হইতেই বোঝা যায় যে, সৈনিক শাসন যুগের শাসকেরা প্রায়ই সৈনিক পুরুষ ছিলেন এবং তাহারা এক প্রকার সামরিক-শাসন পদ্ধতির অনুসরণে এই জেলার শাসনকার্য চালাইতেন। কোন আইনের বিশেষভাবে বশবর্তী না হইয়া যাহা ন্যায্য এবং সুবিধাজনক মনে করিতেন, সেই ভাবেই এই জেলায় প্রথম প্রথম শাসন করিতেন। "শাসক-যুগে" অবশ্য কয়েকটি আইন মানিয়া শাসকদিগকে চলিতে হইত বটে, কিন্তু প্রত্যেক বিচারণীয় বিষয়েই আইন প্রভৃতির অর্থ ইত্যাদি সম্বন্ধে মীমাংসা করার সময় তাহাদের নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধির (Discretionary Powers) সাহায্য গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল; এবং বর্তমানেও শাসকদিগের প্রায় সেইরূপ অধিকার রহিয়াছে। এমন কি, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত-শাসন-সংস্কার-আইনে অন্যান্য জেলার প্রজাদিগকে যে সকল সামান্য অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও এই জেলার প্রজাগণকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। সুতরাং "শাসিতের যুগ" নামক যে নবযুগের অতিক্ষীণ ঊষালোক ভারতের প্রায় সর্বত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই চিরবাঞ্ছিত ঊষালোকের সমাগম এখনও এই হতভাগ্য জেলায় হয় নাই। জানি না, এই অতি দরিদ্র জেলার অধিবাসীবৃন্দকে আরও কত

দিন অতি দীনহীনভাবে সেই ঊষার প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতে হইবে। অতএব পূর্বোক্ত দুইটি যুগের আলোচনা ক্রমান্বয়ে করা যাইতেছে।

সৈনিক শাসক যুগ

এই যুগের প্রথমেই পাহাড়িয়াদিগকে দমন করার উদ্দেশ্যে ৮০০ শত সৈনিকের একদল ওয়ারেন হেস্টিংস বড়লাট সাহেব রাজমহলে প্রেরণ করেন। উক্ত সৈনিকদলের সেনাপতি ব্রুক সাহেবকে বর্তমান জেলার উত্তরভাগেস্থিত এবং ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের দক্ষিণস্থ জঙ্গল তরাই নামক প্রদেশের সৈনিক শাসক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিদ্রোহী জমিদারগণকে ও পাহাড়িয়াদিগকে দমন করিয়া এই প্রদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার ভার তাহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। তিনি মাত্র দুই বৎসর শাসকরূপে এখানে ছিলেন; কিন্তু উক্ত অল্প সময়ের মধ্যেই উধুয়া এবং বারকোপ এলাকায় প্রায় ২৮৩টি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে জেমস ব্রাউন তাহার স্থানে শাসক নিযুক্ত হন এবং তিনি অম্বর ও সুলতানাবাদের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে বশীভূত করেন। পাহাড়িয়াদিগকে বশীভূত এবং শান্তিপ্রিয় করিবার জন্য তিনি এক নূতন শাসন-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া যান এবং তাহার পরবর্তী শাসক ক্লীবল্যান্ড সাহেব উক্ত প্রণালীকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিবার পর উক্ত প্রণালী অনুযায়ী শাসন কার্য চালাইয়া যখন কিয়ৎ পরিমাণ সফল হইয়াছিলেন, তখন তিনি গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবকে উক্ত শাসন প্রণালী মঞ্জুর করার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। পাহাড়িয়াগণের সহিত বিশেষভাবে মিলিত হইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র জঠর-জ্বালাতেই পাহাড়িয়াগণ লুণ্ঠন করিয়া থাকে এবং সরকারের উদ্যোগে ও সাহায্যে যদি তাহাদের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে লিপ্ত হইবে এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকে পরিণত হইবে। তিনি পাহাড়িয়াগণের শাসনভার পাহাড়িয়াদিগের উপরই ন্যস্ত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং তাহারা যে ভাবে স্বাধীন জীবন যাপন করিত তাহা যাহাতে প্রায় পুর্ণভাবে রক্ষিত হয় তাহারও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাহাদের মধ্যে যাহারা মাননীয় তাহাদিগকে মাঝি বাহাল করা ও মাঝিকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি প্রদান করা, প্রত্যেক মাঝির অধীনে পঞ্চাশ জন পাহাড়িয়া সিপাহি মাসিক দুই টাকা বৃত্তিতে নিযুক্ত করা এবং উক্ত মাঝি ও সিপাহিদিগকে সরকারের তরফ হইতে পোষাক দেওয়ার প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে বাৎসরিক সরকারকে ২৯০০ হাজার টাকা খরচ করিতে হইত; সুতরাং হেস্টিংস সাহেবের তাহা মনোমত প্রস্তাব হয় নাই। তিনি মাঝিদিগের উপর পাহাড়িয়া সর্দার ও নায়েব সর্দার নিযুক্ত করার মন্তব্য জারি করেন, এবং সর্দারদিগকে মাসিক দশ টাকা বৃত্তিতে ও নায়েব সর্দারদিগকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিতে নিযুক্ত করার আদেশ দেন। মাঝিদিগকে কোনরূপ বৃত্তি দেওয়া তিনি মঞ্জুর করেন নাই। এই ব্যবস্থা পর্বতের উপরভাগের পাহাড়িয়াগণ স্বীকার করে; কিন্তু দক্ষিণ ভাগের পাহাড়িয়াগণ আপত্তি করে যে, অম্বর ও সুলতানাবাদ পরগণাদ্বয় "জঙ্গল তরাই"-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া যতক্ষণ তাহাদের সম্বন্ধেও উক্তরূপ ব্যবস্থা না করা হয়, ততক্ষণ তাহারা উক্ত ব্যবস্থা মানিয়া লইতে পারে না; কারণ সেরূপ করিলে উক্ত পরগণাদ্বয়ের পাহাড়িয়াগণ তাহাদের

উপর অত্যাচার করিতে পারে। সুতরাং ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে উক্ত পরগণাদ্বয় ও "জঙ্গল-তরাই" এর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার পর উক্ত প্রণালী পাহাড়িয়াগণ স্বীকার করিয়া লয়। ক্লীভল্যান্ড সাহেবের উক্ত প্রণালী একটু বিশদভাবে লিখিত হওয়া উচিত।

ক্লীভল্যান্ড সাহেব ১৩০০ শত পাহাড়িয়ার এক সিপাহিদল গঠন করেন ও পরে তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রকৃতভাবেই এক সৈনিক দলে পরিণত করেন। এই দলের সাহায্যে পাহাড়িয়াদিগকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে সরকার গ্রহণ না করায় পাহাড়িয়াদিগকে এক শান্তিপ্রিয় কৃষক শ্রেণিতে পরিণত করা হয় নাই। তাহার প্রস্তাব ছিল যে,—পর্বত সমূহের নিম্নভাগে হাট বসাইয়া তাহাদিগের অরণ্যজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে কৃষি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, এবং তাহাদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রচার করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সভ্য করা ; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার পাহাড়িয়াদিগের উন্নতি কল্পে উদাসীন থাকিয়া অর্থ সাহায্য না করায়, পাহাড়িয়াগণ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্ত-শিষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু আজ তাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই ; শিক্ষা নাই ; নীতি নাই!!! আছে শুধু কোন প্রকারে বন্যজাত-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া এবং সামান্য ফসল উৎপাদন করিয়া অতিকষ্টে উদর পূর্তি করা; আর পশুবৎ জীবন অতিবাহিত করা!!! ক্লীভল্যান্ড সাহেব পাহাড়িয়াদিগকে এতবেশি ভালবাসিতেন ও তাহাদের উন্নতির জন্য এরূপ সরলভাবে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেন যে, পাহাড়িয়াগণ তাহাকে যে কেবল অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত তাহা নহে ; বরং তাহারা তাহার "চিলিমিলি সাহেব" বলিয়া এক অতি আদরের নাম রাখিয়াছিল এবং এই নাম পাহাড়িয়াগণের এত পরিচিত ছিল যে, তাহাদের বংশধরেরা এখনও এই নাম ভুলিয়া যায় নাই। ক্লীভল্যান্ড সাহেবের উক্ত শাসন প্রণালী অনুসারে সর্দারগণের বৃত্তির জন্য সরকারের এখনও ১৩০০০ হাজার টাকা বৎসরে খরচ হইতেছে। ম্যাকফারসন সাহেবের মতে এই বৃত্তি পাহাড়িয়াদিগকে এখনও দেওয়া অপব্যয় মাত্র ; কারণ, আর যে পাহাড়িয়াগণ বিদ্রোহী হইয়া দস্যুবৃত্তি করিবে বা দেশকে অরাজক করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। সরকার যদি উক্ত অপব্যয়, বন্ধ না করিয়া এবং সম্ভবপর হইলে আরও কিছু ব্যয় করিয়া পাহাড়িয়াদিগকে কৃষি ও সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন ; তাহা হইলে আজ তাহাদিগকে আমরা অনেক উন্নত অবস্থায় দেখিতে পাইতাম। কেন যে সরকার এরূপ করে নাই বা এখনও করিবার জন্য প্রস্তুত নহে ; তাহার কারণ ভারতের শাসন-নীতির সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ক্লীভ্ল্যান্ড সাহেব পাহাড়িয়াগণের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে তাহাদের সর্দারগণের এক একটি কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন এবং উক্ত কমিটিকে সর্বপ্রকার বিচার্য বিষয়ে মীমাংসা করিবার প্রায় পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত বিচারসভায় ম্যাজিস্ট্রেট পরিদর্শক রূপে উপস্থিত থাকিতেন ; এবং বিচার-সভার মীমাংসায় কোন অপরাধীর চতুর্দশ বা তাহার কম বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইলে তিনি তাহার অনুমোদন বা কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার অধিকারী ছিলেন। চতুর্দশ বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ হইলে, পাহাড়িয়া-সর্দার সভার আদেশের বিপক্ষে "নিজামত" আদালত বা বাংলার সর্বোচ্চ ফৌজদারি আদালতে আপিল করিবার অধিকার অপরাধীর ছিল। পাহাড়িয়া সর্দার সভাকে

এই সমান অধিকার ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের এক নম্বর রেগুলেশন দ্বারা ক্লীভ্ল্যান্ড সাহেবের প্রস্তাব মতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত রেগুলেশন ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের এক নম্বর রেগুলেশন দ্বারা রহিত করিয়া পাহাড়িয়াদিগের অপরাধ বিচার করিবার অধিকার সাধারণ আদালত সমূহকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত রেগুলেশনও পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ক্লীভল্যান্ড সাহেব ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন এবং তাহার পর ফম্বেল সাহেবের নাম সৈনিক শাসকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ফম্বেল সাহেব ক্লীভল্যান্ডের নীতির অনুসরণ করিয়াই পাহাড়িয়াগণের শাসন-কার্য চালাইয়াছিলেন ; এবং তাহারই চেষ্টায় পূর্বোক্ত ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দের এক নম্বর রেগুলেশন জারি করানো হইয়াছিল। তাহার পরবর্তী শাসকগণ উপযুক্ত না হওয়ায় এবং তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারিগণ পাহাড়িয়াদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় সরকারের নিকট শাসকগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছিল। উক্ত অভিযোগ সমূহের সত্যতা নিরূপণের জন্য ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট "সাদারল্যান্ড" সাহেব অনুসন্ধান লইবার জন্য প্রেরিত হন এবং তাহার ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে সরকার ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করিয়া আদেশ প্রচার করেন যে—"পাহাড়িয়াগণ যে পর্বতমালা ও পার্বতীয় অরণ্য প্রদেশে বাস করে তাহা ভবিষ্যতে সরকার-বাহাদুরের খাস জমিদারিরূপে পরিগণিত ও শাসিত হইবে এবং সেইজন্য শীঘ্রই উক্ত প্রদেশের সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া যাইবে।" এই আদেশ অনুসারে "জন পেটি" সাহেব ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে এই জেলায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। এবং জরিপ করার পর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে "দামিনিকো" বা সরকারি খাসমহলের সীমা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতে "দামিনিকো" সরকারি খাস জমিদারি হইয়া রহিয়াছে। অবশ্য উক্ত চিহ্নিত সীমার মধ্যে কতিপয় জমিদারের জমিদারির অংশও অন্তর্ভূক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল বলিয়া, গত সেটেলমেন্টের সময় মোকাদ্দমা করিয়া মনিহারী পরগণার নেহাল সিং প্রভৃতি সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মাসিক এক শত টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত "দামিনিকো" মহালের সর্বপ্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, "পন্টেট' সাহেব, নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

একদিকে যখন এইভাবে পাহাড়িয়া-দমন-কার্য চলিতেছিল, তখন অপরদিকে বিদ্রোহী জমিদার ও ঘাটোয়ালগণের সহিত চিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়। তদনুসারে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ নম্বর রেগুলেশন্ জারি করিয়া বীরভূম নবাবের অধীনস্থ ঘাটোয়ালগণের সহিত তাহাদিগের ঘাটোয়ালী সমূহ চিরস্থায়ী রূপে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত ঘাটোয়ালদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হইবে জমিদারগণের সহিত উক্তরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধারণ আইন দ্বারা করা হইয়াছিল।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে "দামিনিকো" পরগণার সৃষ্টি হওয়ার প্রায় বিশ বৎসর পরে সাঁওতালগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়াছিল। উক্ত বিদ্রোহের ফলেই সাঁওতাল পরগণার এই বর্তমান শাসন-পদ্ধতি ; এবং সেইজন্যই সাঁওতালগণ এই জেলায় অতি পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। সাঁওতালগণ "দামিনিকো" মহালে সর্বপ্রথম ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রথম দেখা দিয়াছিল। ইহারাও পাহাড়িয়াগণের মত এক বন্য-জাতি; কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক

পার্থক্য আছে। সাঁওতালগণ অলস নহে, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষের উপযোগী করিবার ক্র্যর্যে ইহারা বড়ই নিপুণ ;এবং ইহারা শান্তিতে কায়িক শ্রমলব্ধ অন্নে কালতিপাত করাতেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। পাহাড়িয়াদিগের ভাষা হইতে ইহাদের ভাষা পৃথক। ধর্ম পৃথক এবং সামাজিক আচার ব্যবস্থার প্রভৃতি ও পৃথক। ইহারা সর্ব প্রথমে "দামিনিকো" মহালে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং পরে ধীরে ধীরে এই জেলার অপরাপর অনেক অংশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জঙ্গল সাফ করিয়া ইহারা গৃহাদি নির্মাণ করে এবং অতি অল্প ভোগের বস্তু পাইলেই মহাসুখে পুত্র কলত্রাদি লইয়া জীবন-যাপন করিতে থাকে। দলে দলে সাঁওতালগণ বন্য-জন্তুর শিকারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং শিকারে ইহাদের তৎপরতা ও নিপুণতা অনেক প্রসিদ্ধ শিকারির পক্ষেও শ্লাঘার বিষয়। ইহারা সরল ও সত্যনিষ্ঠ ছিল ;কিন্তু এখন অধঃপতিত হইয়াছে এবং প্রায় নয় হাজার সাঁওতাল খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করিয়া একটু বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। বিলাসী হওয়ায় ইহাদের দুঃখের মাত্রাও বাড়িয়া গিয়াছে। স্বদেশ প্রেমের অভাব ইহাদের মধ্যে নাই এবং কায়িক শ্রমে পরিষ্কৃত অরণ্যময় প্রদেশে ফসল উৎপন্ন করিয়া কুটুম্ববর্গের সহিত একত্র বাস করিতে পাইলে ইহাদের বিশেষ আনন্দ হয়, এবং অত্যাচার অসহ্য না হইলে ইহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করে না, বর্তমানে বিশেষ অন্নকষ্ট হওয়ায়, ইহারা অনেকেই বাধ্য হইয়া কুলীরূপে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে।

সাঁওতালগণের মধ্যে একতা আছে; কিন্তু শিক্ষিত নহে বলিয়া একতা বর্তমান থাকিলেও ইহাদের দ্বারা কোন মহান কার্য সম্পাদিত হইতেছে না। স্বভাবতঃ ইহারা নিরীহ হইলেও ভীরু বা কাপুরুষ নহে ;প্রয়োজন হইলে অত্যাচারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেও ইহারা পশ্চাৎপদ নহে। এই জন্য ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে যখন ইহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা অত্যধিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সাঁওতালেরা বিদ্রোহী হইয়া এই জেলাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল। এমন কি, ইহাদিগকে দমন করা প্রতাপশালী সরকার বাহাদুরের পক্ষেও সময় সাপেক্ষ হইয়াছিল।

উক্ত বিদ্রোহের কারণ অনেকেই নানারূপ বলিয়া থাকেন। সরকার বলেন যে—"দামিনিকো" মহালে যে সকল সাঁওতাল বাস করিতেছিল তাহাদের উপর একজন মাত্র ইংরাজ অফিসার ছিলেন এবং তাহারও ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয়বিধ বিচারের অধিকার ছিল না ; অধিকান্তু তাহার অধীনস্থ আমলা ও পিয়নবর্গ সাঁওতালদিগকে পীড়ন করিত। বাঙালি মহাজনবর্গের অত্যাচারও বড় বেশি ছিল ; কিন্তু যে সকল সাঁওতাল জমিদারি এলাকা সমূহে বাস করিতেছিল, জমিদারগণ তাহাদিগকে মহাজনের অত্যাচার হইতে বিশেষভাবে রক্ষা করিতেন। অবশ্য পরবর্তী জমিদারগণের সময়ে সাঁওতালদের প্রতি জমিদারদিগের অধিক সহানুভূতি ছিল না ; এবং মহাজনগণ অর্থের বলে সাঁওতালদিগকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমনকি, জমিদারগণ অর্থের লোভে তাহাদের জমি অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছিলেন। এই সকল অত্যাচার অসহ্য হওয়ায়, সাঁওতালগণ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহের আরও দুইটি মুখ্য কারণ ছিল। প্রথমটি এই যে—তাহাদিগের নিকট হইতে জমির খাজনা আদায় করা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু খাজনা দিতে তাহারা পূর্বে অভ্যস্ত ছিল না। বৎসরান্তে সর্দারগণকে তাহারা উৎপন্ন ফসলের কিয়দংশ উপঢৌকন দিয়া আসিতেছিল। জমিদারি এলাকা সমূহে

ও "দামিনিকো" মহালে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া তাহারা যে সকল জমি তৈয়ার করিয়াছিল ও করিতেছিল তাহার উপর সরকার এবং জমিদারগণ উভয়েই খাজনা ধার্য করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের ধারণা ছিল যে, জঙ্গল যখন তাহারা স্বীয় পরিশ্রমে পরিষ্কার করিয়াছে, তখন খাজনা দিবে কি জন্য? বিদ্রোহের দ্বিতীয় কারণটিই প্রকৃত পক্ষে প্রধান কারণ এবং তাহা এই যে বন্যবিহারী এক স্বাধীন সম্প্রদায় বলিয়া তাহাদিগকে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে হয় নাই। যে অরণ্যময় স্থানসমূহ তাহারা পরিষ্কৃত করিত, ভাবিত যে উক্ত স্থান সমূহের তাহারাই একমাত্র অধীশ্বর। এই স্বাধীনতার পথে যখনই তাহারা দেখিল যে, জমিদারগণ ও সরকার উভয়েই তাহাদের পক্ষে কন্টক-তুল্য তখনই তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

বিদ্রোহের প্রারম্ভে সাঁওতালগণ প্রথমে কতিপয় মহাজনের গৃহাদি লুণ্ঠন করে। এই লুণ্ঠনকারিদিগকে সরকার-বাহাদুর দন্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে দুই দল সাঁওতাল পুনরায় ডাকাতি করে এবং বিচারের পর দন্ডিত না করিয়াই সরকার তাহাদিগকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া দেন। সরকারের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সাঁওতালগণ মহাজনের অত্যধিক সুদের হারে উৎপীড়িত হইয়াই উক্তভাবে লুণ্ঠন ও ডাকাতি প্রভৃতি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে তাহারা যখন পূর্ণভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তখন সরকারের উক্ত বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়া যায়। এই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ—সিধু, কানু, চাঁদু ও ভৈরব ছিল। তাহাদের নিবাস ছিল, বর্তমান "বার হৈৎ"এর নিকটবর্তী গ্রাম—বাঘনাডিহিতে। তাহারা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে, সাঁওতালগণের দেবতা "ঠাকুর" এক শ্বেতবর্ণের মনুষ্যের আকৃতিতে তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া এক কিতাবে তাহার আদেশ লিখিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। ঠাকুরের আদেশ যে, সাঁওতালগণের রাজত্বস্থাপন করিতে হইবে। এবং ঠাকুরের কৃপায় শত্রুগণ সাঁওতালদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। উক্ত আদেশ প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছিল কিনা, অবশ্য তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন তারিখে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল বাঘনাডিহিতে সমবেত হইয়াছিল। সেই স্থলে তাহাদিগকে ঠাকুরের উক্তরূপ আদেশ সম্বন্ধে জ্ঞাত করান হইয়াছিল; এবং বাঘনাডিহি হইতেই বিদ্রোহী হইয়া তাহারা যুদ্ধ যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। বোরিও বাজারের তদানীন্তন দারোগা সাঁওতালগণের একত্রিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাঘনাডিহিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতে সাঁওতালগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত দারোগাকে হত্যা করার পর যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ করে। পন্টেট্ সাহেব ও ভাগলপুরের কলেক্টর সাহেব সেই সময় রাজমহলে ছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা শাহ সুজার নির্মিত প্রাসাদে যাহা অধুনা 'সঙ্গী দালান' নামে পরিচিত, তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; এবং বিদ্রোহীদিগের সহিত আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সরকার বাহাদুরের সৈন্য অধিক না থাকায়, বিদ্রোহ প্রথম অবস্থায় রাজমহলে দমন করা হয় নাই। ফলে সাঁওতালগণ রাজমহল হইতে বর্তমান সাঁইথিয়া পর্যন্ত প্রদেশের এক প্রকার অধীশ্বর হইয়া পড়িয়াছিল। ১১ জুলাই বহরমপুর হইতে চারিশত পদাতিক সৈন্য আনাইয়া তাহাদের গতিরোধ করার কার্যারম্ভ হয়। সাঁওতালগণ অম্বর রাজবাটি আক্রমণ করে ; কিন্তু আক্রমণে বিশেষ লাভ হয় নাই। পরে তাহারা মহেশপুরের রাজবাটি অধিকার করিবার বিশেষ চেষ্টা করে। কারণ উক্ত রাজবাটি

অধিকার করিয়া তাহাদের "সুবার" প্রাসাদে পরিণত করার বলবতী ইচ্ছা তাহাদের ছিল। কিন্তু সরকারের পদাতিক সৈন্যদল সাঁওতালদিগকে মহেশপুরে বিশেষভাবে পরাভূত করিয়াছিল। মহেশপুরের আক্রমণে সিধু, কানু ও ভৈরব আহত হইয়াছিল। এবং প্রায় দুইশত সাঁওতাল নিহত ও আহত হইয়াছিল। সাঁওতালগণ পরাভূত হইয়া পলায়ন করে; এবং কয়েকদিন পরে উক্ত সৈন্যদল বারহেৎ পুনরায় অধিকার করে ও ভাগলপুর হইতে আনীত সৈন্যদলের হস্তে সিধু ধৃত হয়।

জুলাই মাসের শেষভাগে সরকার অধিক সৈন্য একত্রিত করিয়া জর্জ লয়েড সাহেবের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ষাকাল উপনীত হওয়ায় সৈন্য পরিচালনার একটু অসুবিধা হয় এবং সরকার সেই সময় ঘোষণা করিয়া দেন যে, দশ দিনের মধ্যে যে সকল বিদ্রোহী বশ্যতা স্বীকার করিবে, তাহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে। কিন্তু সাঁওতালগণ, সরকারের এই উদারতার অর্থ দুর্বলতা বলিয়া মনে করিয়াছিল; এবং নব-উদ্যমে পুনর্বার দেবঘর হইতে জামতাড়া পর্যন্ত স্থানসমূহে লুণ্ঠন করিতে ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। উপায়ান্তর না থাকায় সরকারকে বাধ্য হইয়া এই জেলার বিদ্রোহ দমনার্থে "সামরিক আইন" জারি করিয়া আদেশ প্রচার করিতে হয় যে, অস্ত্র হস্তে থাকিলেই প্রত্যেক লোককে ধৃত করা হইবে এবং উপযুক্ত বিবেচনা করা হইলে মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করা হইবে। এই জেলার মধ্যভাগ দিয়া সৈন্য চালনা করা হইতে লাগিল ;এবং সৈন্যদলের নিকটস্থ হইলেই সাঁওতালগণ জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত ও সুযোগ পাইলেই আবার অত্যাচার করা আরম্ভ করিত। কিন্তু যখন সাঁওতালগণ সৈন্যদলের সম্মুখে পড়িয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইত, তখন তাহারা আর পশ্চাৎপদ হইত না। যতক্ষণ তাহাদের জাতীয় রণডঙ্কা বাজিতে থাকিত, ততক্ষণ সাঁওতালগণ প্রকৃত বীরের মত শত্রুর সম্মুখীন হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পরান্মুখ হইত না। ডঙ্কার শব্দ স্থগিত না হইলে তাহারা অন্যত্র গমন করিত না এবং ডঙ্কার গৌরব রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। হায়! আজ যদি জাতীয় পতাকার গৌরব-রক্ষার্থে অসভ্য সাঁওতালগণের আদর্শ, শিক্ষিত ভারতবাসিগণ অনুকরণ করিতে সাহসী হইত এবং দেশের মুক্তির জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতেও যত্নবান হইত, তাহা হইলে ভারতের বর্তমান অসহনীয় ক্লেশের অনেক লাঘব হইত। পাহাড়িয়াগণ সাঁওতালদিগের পশ্চাৎভাগে থাকিত, এবং কোন গ্রাম সাঁওতালগণের দ্বারা অধিকৃত হইলে, তাহারা তাহা লুণ্ঠন করিয়া ধন সম্পত্তি হস্তগত করিত। মহাজনকে পাইলে সাঁওতালগণ তাহার অঙ্গ ছিন্ন করিত; এক একটা অঙ্গচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক এক কিস্তি সুদের টাকা ওসুল হইল বলিয়া হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিত। সরকারি সৈন্যদল সেপ্টেম্বর মাস হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের শেষে সাঁওতালগণকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ;এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারিতে "সামরিক আইন"-এর প্রয়োগ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বহুস্থানব্যাপী যে বিদ্রোহ সিপাহিগণ করিয়াছিল, তাহার ফলে এই জেলাতেও উক্ত খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন তারিখে দেবঘরের নিকটস্থ রোহিনী গ্রামে যে সিপাহি দল ছিল, তাহার মধ্যে তিনজন সিপাহি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উক্ত দলের কাপ্তেন, জনৈক সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু ধৃত হওয়ায় তাহাদের ফাঁসি হইয়াছিল। ৯ অক্টোবর দেবঘরস্থ একদল সিপাহি বিদ্রোহী হইয়া প্রথমতঃ দেবঘর-

বাজার লুণ্ঠন করিয়াছিল;এবং তাহার পর রোহিনী অভিমুখে যাত্রা করিবার সময় সেনাপতি কুপার সাহেব ও রোলান্ড সাহেবকে হত্যা করিয়াছিল। উক্ত ঘটনার পর বিদ্রোহী সিপাহিদল এই জেলা হইতে অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিল।

উক্ত বিদ্রোহাদির পর এই জেলায় উল্লেখযোগ্য কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা হয় নাই। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালদিগের মধ্যে পুনরায় বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃতভাবে বিদ্রোহী হয় নাই। যাহা হউক, সরকার বাহাদুর পূর্বোক্ত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অজুহাতে উক্ত খ্রিস্টাব্দের ৩৭ নম্বর কানুন জারি করেন ;এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের উত্তেজনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশন জারি করিয়া দিয়াছিলেন, সেই শাসন প্রদ্ধতির ফলে বর্তমানেও এই জেলার ভারতের অন্যান্য জেলার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হইবে।

শাসকের যুগ

বিগত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই জেলায় "শাসকের যুগ" বর্তমান রহিয়াছে। এই যুগের সর্বপ্রথমেই ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ নং ও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ নং আইনদ্বয় দ্বারা অপরাপর স্থান হইতে এই জেলার পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরও যখন শাসকবর্গ দেখিলেন যে, অন্য স্থানের প্রচলিত সাধারণ আইনসমূহের প্রভাব হইতে এই জেলাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা হয় নাই, তখন ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিন নম্বর রেগুলেশন জারি করা হইল! এই রেগুলেশনের প্রভাব বর্তমান ও এখানে সম্পূর্ণভাবে বিরাজমান। উক্ত আইনদ্বয় ও তিন নম্বর রেগুলেশনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পরবর্তী সময়ে করা হইয়াছে; কিন্তু শাসন বিষয়ে প্রজাদিগকে কোনও অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। আইন জারি করা সরকারের অধিকারে ; এবং আইনসংগত কার্য করা হইতেছে কিনা, ইহার পরিদর্শনের ভারও সরকার নিজ অধীনে রাখিয়াছেন, সেটেলমেন্ট প্রদত্ত জমিদার ও প্রজার যে সকল অধিকার আছে, তাহার অভিভাবক সমগ্র জেলার অন্য ডেপুটি কমিশনার সাহেব, সবডিভিসনের জন্য সব্‌ডিভিসনাল অফিসার ;এবং গ্রামের জন্য গ্রামবাসীর কোন সভা বা জমিদার অভিভাবক নহেন। যেখানে অভিভাবক গ্রামের মোস্তাজীর বা প্রধান। উক্ত মোস্তাজীর বা প্রধানের নিযুক্তি ও পদত্যাগ স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার সাহেবের অধীন। সুতরাং আপাততঃ যে সকল অধিকার জমিদার বা প্রজার এই জেলায় আছে, তাহার প্রকৃত অধিকারী সরকারি কর্মচারিগণ ;এমনকি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের যে অধিকার অন্যত্র পূর্ণভাবে প্রজাগণকে দেওয়া হইয়াছে, সেই অধিকারও এই জেলায় ডিস্ট্রিক্টবোর্ড স্থাপিত না হওয়ায় প্রজাদিগকে এখনও দেওয়া হয় নাই। এই শাসক যুগে যে সকল আইন প্রচলিত করা হইয়াছে, তাহাদের সারাংশ ও আলোচনা পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করা হইয়াছে। সেই জন্য এস্থলে আভাস মাত্র দেওয়া হইল।

তৃতীয় অধ্যায়
আইন ও শাসন

এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় নীরস আইনসমূহ। উক্ত নীরস আইনসমূহ সাধারণের বোধগম্য করানো বড়ই কঠিন ; কাজেই ভাষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা অধিক করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত আইন সমূহ যে জেলায় প্রচলিত, তাহার সীমা নির্দেশ কিরূপে করা হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কাপ্তেন ব্রুক্‌ ও তৎপরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রাউন সাহেব সৈনিক শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত শাসকদ্বয়ের সময়ে "জঙ্গলতরাই" পরগণার যে পরিমাণ ছিল, তাহা ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের কানুনী আদেশ অনুসারে যে মানচিত্র রেনেল সাহেব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় উক্ত মানচিত্র অনুসারে জঙ্গল তরাই পরগণা সেই সময়ে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় পরেশনাথ পাহাড় পর্যন্ত। পশ্চিমে বর্তমান ডোমচাঁ পর্যন্ত এবং উত্তরে কিউল স্টেশনের আরও কিছু দূর আগে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঢাকাই প্রভৃতি মুঙ্গের জেলাসহ গ্রাম-সকল তখন এই জেলার অধীনস্থ ছিল। বর্তমানে এই জেলার যে সীমা নিরূপিত হইয়াছে এবং ইহার অন্তর্গত যে সকল স্থান আছে তাহার সমস্তই উক্ত মানচিত্রে ছিল। কেবল বর্তমান জামতাড়া সবডিভিসন উক্ত মানচিত্র অনুসারে জঙ্গলতরাই পরগণার অধীনস্থ ছিল না। মানচিত্রে এই জেলার সীমা এই রূপ দেখা যায় বটে; কিন্তু কার্যস্থলে অন্যরূপ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ক্লীভল্যান্ড সাহেব এখানকার সৈনিক-শাসক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে অম্বর ও সুলতানাবাদ পরগণাদ্বয় পাহাড়িয়াগণের উপরোধে জঙ্গলতরাই পরগণার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত প্রমাণ আছে। অথচ রেনেল্‌ সাহেবের মানচিত্রের উক্ত পরগণাদ্বয় যে এই জঙ্গল তরাইয়ের অন্তর্গত ছিল, তাহা দেখা যায়। পুনর্বার ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে "ফস্টেল" সাহেব ও উক্তভাবে পূর্ব মানচিত্রের অন্তর্গত "বেলপত্তা ও নুনী" পরগণাদ্বয়কে জঙ্গলতরাই পরগণার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জঙ্গলতরাই পরগণার পরিমাণ কম বা অধিক ছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই মাত্র জানা যায় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের পার্শ্বস্থ যে সকল পর্বতমালা বহুদূর পর্যন্ত এই জেলায় বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই পার্বত্য প্রদেশসমূহ ও তৎপার্শ্বস্থিত অরণ্যময় স্থানসমূহ জরিপ করিয়া অপরাপর জমিদারি হইতে পৃথক করা হইয়াছিল এবং তাহা "দামিনিকো" বা সরকারি খাসমহল নামে অভিহিত করিয়া সরকারের জমিদারিতে পরিণত করা হইয়াছিল। অবশ্য উক্ত "দামিনিকো" মহাল পূর্বোক্ত জঙ্গলতরাই পরগণার অন্তর্গত ; এবং রেনেল, সাহেবের মানচিত্র অনুসারে ও তাহা জঙ্গলতরাইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭নং আইনের সহিত বর্তমান এই জেলার সীমা নির্দেশ করিয়া একটি তালিকা (সিডিউল) প্রকাশিত করা হয়। এবং পুনরায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ নম্বর আইনের সহিত প্রকাশিত সীমা নির্দেশ সম্বন্ধীয় তালিকায় পূর্বোক্ত তালিকার সামান্য পরিবর্তন করিয়া চিরস্থায়ীভাবে এই জেলার সীমা আইন অনুযায়ী স্থিরীকৃত করা হইয়াছে। অতএব ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলার সীমা পরিবর্তিত হইতে থাকায়, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে

যে, যতদিন সেটেলমেন্ট হইয়া এই জেলার সীমা প্রকৃত পক্ষে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং উক্ত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭নং আইন দ্বারা ভারতবর্ষ কোন অংশকে ভারতের প্রচলিত আইনসমূহের অধিকার হইতে পৃথক করা হইয়াছে সে বিষয়ে কেহই নিঃসন্দেহে কোন নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করিতে পারে না।

যাহা হউক উক্ত ভাবে যে জেলার সৃষ্টি করা হইল, তাহার বর্তমান নাম সাঁওতাল পরগণা; এবং সাঁওতাল পরগণা জেলাকে সেই সময়ে বাংলা দেশে যে সব আইন প্রচলিত ছিল তাহার, অধিকারের বাহিরে করিয়া লওয়া হইল, এরূপ করিবার কারণ দেখান হইল যে, বাংলা দেশের সেই সময়ের আইন সকল এই জেলার অধিক সংখ্যক যে সব সাঁওতাল অধিবাসী আছে তাহাদের পক্ষে উপযোগী নহে, অর্থাৎ সাঁওতালগণের জন্য অতি সহজ ও অল্প কয়েকটি আইন থাকাই যুক্তিযুক্ত! কারণ, সাঁওতালেরা কঠিন আইন বুঝিতে পারিবে না, এবং তাহারা আইনের কিছু বুঝিতে না পারিলে এই জেলার সুশাসন হইতে পারে না। উক্ত কারণ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন দেশেরই সাধারণ লোক সেই দেশের প্রচলিত আইনসমূহের অর্থ বুঝিতে পারে না। স্মৃতিসমূহে হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তির বিভাগ-সম্বন্ধে যে কয়েকটি নিয়ম আছে; তাহা কয়জন হিন্দু বুঝিতে পারে? এবং কোরাণের আরবি ভাষায় লিখিত উক্তভাবের কয়টি নিয়ম কয়জন মুসলমান বুঝিতে পারে? কিন্তু তথাপি মনু বা মহম্মদ সহজ নিয়ম করিবার প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মনু বা মহম্মদ আজ জীবিত থাকিলে হয়ত সাঁওতাল পরগণার বর্তমান সহজ আইনগুলি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন!

সাঁওতাল পরগণা গেজেটিয়ার নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে যে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানে ইহা জানা যায় যে, সাঁওতালগণের বিদ্রোহী হইবার বাস্তবিকই কতকগুলি বিশিষ্ট কারণ ছিল; কিন্তু এই অনুসন্ধান লওয়ার পূর্বেই ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭নং আইন জারি করা হইয়াছিল। এমন কি, উক্ত আইন জারি হওয়ার সময় এই জেলায় "সামরিক আইন" বলবৎ ছিল এবং উক্ত "সামরিক আইন" ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারী রহিত করা হইয়াছিল। কারণ নির্দিষ্ট হওয়ার পূর্বেই যখন উক্ত কারণ সমূহের বলেই বর্তমান শাসন পদ্ধতির সৃষ্টি করা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝিতে পারেন যে, এই জেলার শাসন পদ্ধতির প্রচলন করিবার পূর্বে ইহার ফলাফল ও প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে কোনও বিশেষ চিন্তা বা আলোচনা করা হইয়াছিল কিনা।

আইন

যে কয়টি বিশেষ আইন ও রেগুলেশন্‌ এই জেলায় এখনও প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এবং সাধারণের প্রয়োজনীয় ঃ

১। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯নং ঘাটোয়ালী রেগুলেশন।
২। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭নং রেগুলেশন।
৩। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ নং আইন।
৪। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৫নং ঘাটোয়ালী আইন।
৫। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩নং সেটেলমেন্ট রেগুলেশন।

৬। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২নং মালগুজারি রেগুলেশন।
৭। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৫নং সুবিচার সম্বন্ধীয় রেগুলেশন।
৮। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩নং সুবিচার সম্বন্ধীয় সংশোধিত রেগুলেশন।
৯। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২নং সেটেলমেন্ট রেগুলেশন।
১০। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩নং মালগুজারি রেগুলেশন।
১১। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং সেটেলমেন্ট রেগুলেশন।
১২। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পুলিশ রেগুলেশন।
১৩। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৭নং মালগুজারি রেগুলেশন।

উক্ত আইন ও রেগুলেশন সমূহ বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করা যাইতেছে ঃ

(ক) ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে এই জেলার ঘাটোয়ালী সমূহ চিরস্থায়ী ভাবে বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ২৯ নং রেগুলেশন জারি হইয়াছিল এবং ঘাটোয়ালদিগকে ঘাটোয়ালী সম্পত্তির উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ৫নং আইন জারি করা হইয়াছিল।

(খ) অন্যান্য স্থানের প্রচলিত আইনসমূহের অধিকার হইতে এই জেলাকে পৃথক রাখার উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩৭নং আইন জারি হইয়াছিল এবং এই জেলার সীমা চিরস্থায়ী রূপে নির্দিষ্ট করার জন্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১০নং আইন জারি হইয়াছিল। উক্ত ৩৭নং আইন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৫নং রেগুলেশন দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা হইয়াছিল এবং এই রেগুলেশন ও ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন্ দ্বারা সামান্য পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

(গ) এই জেলায় সেটেলমেন্ট হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন বিধায় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন্ জারি হইয়াছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২নং রেগুলেশন্ জারি করিয়া সেটেলমেন্টের খরচ মালিক ও প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হস্তান্তর প্রথা বে-আইনী প্রমাণ করিয়া, উক্ত প্রথা একেবারে এই জেলায় বন্ধ করিবার জন্য ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশ্ন্ দ্বারা ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের ২৭ ধারাকে পরিবর্তিত করা হইয়াছে।

(ঘ) সেটেলমেন্ট অফিসার সমূহকে এবং জেলায় জমির খাজনা ধার্য করিয়া দিবার অধিকার দিবার জন্য সর্বপ্রথম ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২নং রেগুলেশন জারি করা হইয়াছিল এবং উক্ত রেগুলেশন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ৩নং রেগুলেশন্ দ্বারা পরিবর্তিত করা হইয়াছিল। প্রধান বা মোস্তাজীরগণের বাকি খাজনার পরিমাণ সাজাতে অনেক বেশি না হইতে পারে, তাহার জন্য গত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস ৭নং রেগুলেশন্ জারি হইয়াছে।

(ঙ) ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ৪নং রেগুলেশন্ এই জেলার কিয়দংশে সরকারি পুলিশ নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনবশে জারি করা হইয়াছে।

অতঃপর উক্ত আইন ও রেগুলেশন সমূহের সারাংশ সর্ব-সাধারণের জ্ঞাতার্থে ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে এবং স্থান বিশেষে কিঞ্চিৎ সমালোচনাও করা হইবে।

ক. ঘাটোয়ালী সম্পত্তি

এই জেলায় ঘাটোয়ালগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে আছেন, এবং পাহাড়িয়া বিদ্রোহ দমন করার পরই উক্ত ঘাটোয়ালগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯নং রেগুলেশন জারি করা হয়। ইহার দ্বারা তৎকালীন যে সকল ঘাটোয়াল পূর্বে বীরভূম নবাবের অধীনস্থ ছিলেন ও বীরভূম নবাবের সম্পত্তি সরকারের অধিকারে আসিবার পর তাহাদিগের সহিত ঘাটোয়ালীসমূহ বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল করিবার সর্তে বন্দোবস্ত করা হয় ; এবং উক্ত সম্পত্তি সমূহের রাজস্ব ও চিরদিনের জন্য নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। যতদিন উক্ত ঘাটোয়ালগণ বা তাহাদের বংশধরগণ নিয়মিত রূপে রাজস্ব দাখিল করিয়া ভোগ দখল করিতে থাকিবেন, ততদিন রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে না, অথবা বন্দোবস্তের সর্তাদি ভঙ্গ না করিলে সম্পত্তি হইতে বে-দখল করা হইবে না। নিয়মিতভাবে রাজস্ব দাখিল করা না হইলে, বড়লাট সাহেবকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে তিনি যে ঘাটোয়ালীর রাজস্ব বাকি পড়িবে তাহা, নিলামে বিক্রীত হইবার আদেশ দিতে পারিবেন। অথবা তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলে উক্ত ঘাটোয়ালী অপর যে কোনও ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। বন্দোবস্ত করার সময় রাজস্ব বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়া বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারিবে এবং নির্ধারিত রাজস্ব বা বন্দোবস্তের সময়ে বর্ধিত ও হ্রাসকৃত রাজস্ব পাইবার অধিকারী বীরভূমের নবাব এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ হইবেন। উক্ত রাজস্ব অধুনা দুমকার ডেপুটি কমিশনারের আদেশানুসারে দুমকার কোষাগারে জমা দিতে হয়।

উক্ত ঘাটোয়ালী সম্পত্তিসমূহ দান বা বিক্রয়াদি করা যাইতে পারে না এবং উত্তরাধিকারিগণের মধ্যেও বিভক্ত হয় না। বংশে যে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়, পিতার মৃত্যুর পর সেই ঘাটোয়ালীর মালিক হয়, এবং অপরাপর পুত্রগণের "খোরপোষ" বা ভরণপোষণার্থ স্থাবর সম্পত্তি পাইবার অধিকার আছে। কিন্তু ঘাটোয়ালদের সম্মতি না থাকিলে ঘাটোয়ালের ভ্রাতৃবর্গের খোরপোষ পাইবারও অধিকার নাই। অবশ্য হিন্দু আইনমতে ভরণপোষণের দাবি করিতে পারে। এই ঘাটোয়ালী সমূহ জায়গির স্বরূপ এবং ঘাটোয়ালগণ কর্মচারীর তুল্য। সুতরাং ঘাটোয়ালীর উত্তরাধিকার সূত্র উক্ত প্রণালীতে নির্ণীত হইয়া আসিতেছে এবং এই প্রণালী চিরন্তন প্রথার উপরই নির্ভর করে। ঘাটোয়ালগণের সম্পত্তিতে মাত্র জায়গির স্বত্ব থাকায় ঘাটোয়ালীর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সেইজন্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের পাঁচ নম্বর আইন দ্বারা ঘাটোয়ালগণকে অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, জীবদ্দশার অতিরিক্ত সময়ের জন্যও ঘাটোয়ালগণ ঘাটোয়ালীর কোন অংশ পাট্টা করিয়া খনির জন্য জঙ্গল সাফ করাইবার জন্য, বসত-বাটি নির্মাণ জন্য, শিল্পশালার জন্য, ও খাল বা তড়াগ প্রভৃতি খননের জন্য অপর কোন উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত পাট্টা ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব মঞ্জুর না করিলে তাহা স্থায়ী ও বলবৎ হইবে না।

বীরভূম নবাবের অধীনস্থ থাকার সময় ঘাটোয়ালগণের ঘাটোয়ালী সম্পত্তিতে যে সকল স্বত্ব, উপস্বত্ব ও অধিকার প্রভৃতি ছিল, তাহার কোনটি উক্ত রেগুলেশন দুইটির দ্বারা নষ্ট বা খর্ব করা হয় নাই। 'ঘাট' বা ঘাঁটি রক্ষার ভার ঘাটোয়ালগণের ছিল বলিয়া এই

শ্রেণির ভূস্বামীবর্গের নাম ঘাটোয়াল হইয়াছে। পূর্বে বীরভূমের নবাবকে সৈন্য সাহায্য করা ইহাদের কর্তব্য ছিল ; এমন কি ইংরাজ শাসনকালেও উক্ত কর্তব্য পালনের জন্য ইহাদিগের বিনা-পাশে অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি রাখিবার অধিকার প্রায় জমিদারগণের সমান ছিল ; কিন্তু এই জেলায় বিশেষ রকমের শাসন প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায় তাহাদের অনেক স্বত্বের হানি হইয়াছে। পূর্বে পতিত প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিবার অধিকার ইহাদের ছিল, কিন্তু অধুনা সেই অধিকার প্রধান বা মোস্তাজীর প্রভৃতিকে দেওয়া হইয়াছে এবং বন্দোবস্ত সম্বন্ধে শেষ-নিষ্পত্তি করার অধিকার সবডিভিসনাল অফিসারকে দেওয়া হইয়াছে। গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষাকল্পে বন্দোবস্তের অধিকার প্রধান বা মোস্তাজিরগণকে দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের বহাল করা অবৈতনিক ভৃত্যমাত্র। উক্ত অধিকার প্রজাদিগের প্রতিনিধি বা প্রজাদিগের পঞ্চায়েতকে দিলে, প্রজারা উক্ত অধিকার পাইয়াছে বলা যাইতে পারিত ; কিন্তু বর্তমান উক্ত অধিকার হইতে প্রজাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, অথচ ঘাটোয়ালদিগের পূর্ব-অধিকার নষ্ট করা হইয়াছে। বিশেষতঃ জঙ্গল-মহালে প্রজাদিগকে সেটেল্‌মেন্টের সত্ত্বলিপিতে যে অধিকার প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধেও উক্তভাবেই কার্য করা হইয়াছে। প্রজাদিগকে জ্বালানি ও গৃহাদি নির্মাণ জন্য কাষ্ঠ লইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং ঘাটোয়ালগণ অনুমতি না দিলে, কাষ্ঠ কাটিবার অনুমতি প্রজাগণ সব্‌ডিভিসনাল্-অফিসারের নিকট হইতে লইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত জঙ্গল-মহালের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার ভার কাহার উপর দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্বত্বলিপিতে লিখিত নাই। ঘাটোয়ালগণ জানেন যে, তাহারা অনুমতি না দিলেও প্রজাগণ সব্‌ডিভিসনাল্ অফিসারের অনুমতি লইয়া কাষ্ঠ এবং ৯ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত শালের রোলা প্রভৃতি লইতে পারিবে; এবং তাহারা চেষ্টা করিলেও কোন শাল-বৃক্ষ ১৮ ইঞ্চির অধিক বেড়ের হইতে পারিবে না। কারণ, ১৮ ইঞ্চির বেশি বেড়ের হইলে, প্রজাদের আর অধিকার থাকিবে না বলিয়া, প্রজাগণ তাহার পূর্বেই রোলা কাটিবার চেষ্টায় থাকে। এইরূপ করার ফলে ঘাটোয়ালগণও উক্তরূপ জঙ্গল রক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকায়, এবং প্রজাগণের উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার না থাকায়, এই জেলার জমিদারি বা ঘাটোয়ালীসমূহে আর জঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; এবং বর্তমানে কেবল যে কাষ্ঠ দুর্মূল্য হইয়াছে তাহা নহে ; এমন কি, অনেক স্থানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে এই জেলার ঘাটোয়াল ও জমিদারগণের অধিকার খর্ব করা হইয়াছে; এবং প্রজাদিগকে দায়িত্ব-বিহীন উক্ত অধিকার প্রদত্ত হওয়ায় বর্তমানে আর জঙ্গল নাই যে, প্রজাগণ তাহাদের অধিকার অনুসারে কাষ্ঠ কাটিতে পারে। ঘাটোয়ালগণের স্বত্ব, উপস্বত্ব ও কর্তব্যাদি-বিষয়ে ভালভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তাহাদের জমিদারির খাজনায় মাত্র অধিকার আছে; কিন্তু জমিতে অধিকার নাই। খাজনাপ্রাপ্তির অধিকার-সম্বন্ধে তাহারা জমিদার ; কিন্তু জমির বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে তাহারা মোস্তাজীর বা প্রধান, এবং আইন অনুসারে সম্পত্তি বংশানুক্রমে ভোগ-দখলের তাহাদের অধিকার চিরস্থায়ী ; কিন্তু সর্বদাই স্বল্প-কারণেই সরকারের বিরাগভাজন হইয়া সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে অস্থির। এবম্বিধ সঙ্কটাপন্ন ভূস্বামিবর্গের একমাত্র উপমাস্থল রাজা "ত্রিশঙ্কু"। তিনি তপস্যার বলে স্বর্গ-পথে অগ্রসর হওয়ার পরও অদৃষ্টের দোষে অর্ধ-পথেই রহিয়া গিয়াছিলেন।

খ. বিচার-বিভাগ

১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁইত্রিশ নম্বর আইন দ্বারা এই জেলার সীমা নির্দেশ করিয়া ইহাকে তৎকালে প্রচলিত সাধারণ আইনসমূহের অধিকারের বাহিরে রাখা হইয়াছে ; এবং ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশন্ দ্বারা স্পষ্টভাবে আইন করা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে যদি কোনও আইনে এই জেলার নাম উল্লিখিত করা না থাকে; তবে সে আইন এখানে বলবৎ হইবে না। এই আইন দ্বারা এই জেলার শাসনভার জনৈক ডেপুটি কমিশনারকে দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার সাহায্যার্থে কয়েকজন সহায়ক-কমিশনার প্রত্যেক সব্‌ডিভিসনে বহাল করা হইয়াছে। উক্ত অফিসারগণকে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় প্রকার মোকদ্দমা বিচার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তাহাদের হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল বিচার করিবার অধিকার ভাগলপুরের কমিশনার-সাহেবকে ও সকলের উপরে প্রাদেশীয় লাট-সাহেবকে দেওয়া হইয়াছে। এই আইন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের পাঁচ নম্বর রেগুলেশন্ দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করা হইয়াছে। উক্ত দুইটা আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, বর্তমানে এই জেলার শাসনাধিকারসমূহের সারাংশ নিম্নে লিখিত হইতেছে ; এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন্ দ্বারা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের জাস্টিস-রেগুলেশন যে ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার সারাংশও সম্মিলিত করা হইয়াছে।

ফৌজদারি-বিচার

ফৌজদারি-বিচার করিবার জন্য সাবডেপুটি ও ডেপুটি-কলেক্টর এবং সব্‌ডিভিসনাল-অফিসারের অধিকার আছে। উক্ত অফিসারগণের উপরে ফৌজদারি-আপিল বিচার করিয়া নিম্ন-আদালতে প্রদত্ত শাস্তি কমাইবার বা দণ্ড রহিত করিবার অধিকার ডেপুটি-কমিশনার-সাহেবের আছে। বিশেষতঃ তাহার এক বিশেষ অধিকার আছে যে, তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলে নিম্ন-আদালত-সমূহের দণ্ডের হুকুম বৃদ্ধি করিতেও পারেন। সাধারণ ফৌজদারি-মোকদ্দমা-সম্বন্ধে ভাগলপুরের কমিশনার-সাহেবের হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে; এবং তাহার বিচারের উপরে আর আপিল করা চলে না। অবশ্য যে সকল ফৌজদারি মোকদ্দমায় আসামীকে দায়রায় বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়, সেই সকল মোকদ্দমায় প্রাদেশীয় হাইকোর্ট পর্যন্ত আপিল করিবার অধিকার আসামীর আছে। জাস্টিস্-রেগুলেশনের অনুসারে যদি কোন ইউরোপীয় ইংরাজ ফৌজদারির আসামী হন, তাহা হইলে তাহারও প্রাদেশীয়-হাইকোর্ট পর্যন্ত আপিল করার অধিকার আছে। যদি কোন ভারতীয় প্রজা কোন ফৌজদারি-মোকদ্দমায় উক্ত ইউরোপীয় ইংরাজ মহাশয়ের সহিত একই অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তবে সেই হতভাগ্যেরও প্রাদেশীয়-হাইকোর্ট পর্যন্ত আপিল করিবার অধিকার আছে। অবশ্য উক্ত অধিকার-প্রাপ্তি যে সৎসংসর্গেরই ফলস্বরূপ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এরূপ বিশেষ অধিকার ইউরোপীয় ইংরাজ আসামীকে দেওয়া যে পক্ষপাতিত্ব-দোষ রহিত নহে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এইস্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, ফৌজদারি-মোকদ্দমার বিচার-পদ্ধতি অন্যান্য জেলায় যেরূপ আছে, তাহা এই জেলাতেও প্রচলিত করা হইয়াছে।

দেওয়ানি-বিচার

এক হাজার টাকা বা তাহার কম টাকার দাবিতে যে সকল দেওয়ানি-মামলা হয়, তাহাতে বিচার করিবার অধিকার নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে; এবং এইরূপ দেওয়ানি-বিচারের অধিকার যে সকল হাকিমকে দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা "সাঁওতাল-অফিসর" বলিয়া অভিহিত ও তাহাদের আদালতসমূহকে "সাঁওতালি-আদালত" বলা হইয়া থাকে।

দেওয়ানি-মামলায় সবডেপুটি-কলেক্টরের দুই শত টাকার দাবি পর্যন্ত, ডেপুটি-কলেক্টরের পাঁচ শত টাকার দাবি পর্যন্ত এবং তদূর্ধে সবডিভিসনাল-অফিসারের এক হাজার টাকার দাবি পর্যন্ত মামলার বিচার করিবার অধিকার আছে। সব্‌ডেপুটি ও ডেপুটি-কলেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে সব্‌ডিভিসনাল্-অফিসারের নিকট আপিল করা চলে ;এবং সব্‌ডিভিসনাল্-অফিসারের হুকুমের বিরুদ্ধে ডেপুটি-কমিশনারের নিকট আপিল করা চলে। উক্ত সমস্ত আদালতের উপরে আপিল বিচারের জন্য কমিশনারসাহেবের হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে। কমিশনার ও ডেপুটিকমিশনার উভয়েরই সাঁওতালি-আদালতসমূহের বিচারের পুনর্বিচার করিবার অধিকার আছে ; এবং এইরূপ পুনর্বিচার যে সকল মামলায় না হইবে, তাহাতে পঞ্চাশ টাকার কম দাবির আপিলে সব্‌ডিভিসনাল-অফিসারের যে বিচার হইবে, তাহাতে আর আপিল করা চলিবে না। সেইরূপ একশত টাকার কম দাবির আপিলে ডেপুটি-কমিশনারের উপরে আর আপিল চলিবে না। অবশ্য স্থাবর-সম্পত্তির মালিকত্ব বা অন্য কোন স্বত্ব লইয়া মামলা থাকিলে উক্ত পঞ্চাশ টাকার কম দাবিতেও সব্‌ডিভিসনল অফিসারের বিরুদ্ধে আপিল করা চলিবে ; এবং একশত টাকার কম দাবিতে ডেপুটি-কমিশনারের উপরেও আপিল করা চলিবে। সব্‌ডেপুটি ও ডেপুটি-কমিশনারের বিরুদ্ধে সব্‌ডিভিসনাল-অফিসারের নিকট, সব্‌ডিভিসনাল্-অফিসারের বিরুদ্ধে ডেপুটি-কমিশনারের নিকট, এবং ডেপুটি-কমিশনারের বিরুদ্ধে কমিশনারের নিকট আপিল করা চলিবে। নিম্নস্থ যে কোন আদালতে দেওয়ানি-বিচার, যাহার বিরুদ্ধে আপিল করা চলে না, অথবা আপিল কোন কারণে করা হয় নাই, সেই বিচার সম্বন্ধে নথী তলব করিয়া পুনর্বিচারে নিম্ন-আদালতের হুকুম রদ করিবার অথবা বহাল রাখিবার অধিকার ডেপুটি-কিমশনার ও কমিশনার উভয়েরই আছে। নিম্ন-আদালতে কোন মামলার বিচার শেষ হওয়ার পূর্বে, উক্ত মামলা সঙ্গত কারণে অন্য আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করার বা নিজে বিচার করিবার অধিকার ডেপুটি কমিশনার ও কমিশনার উভয়েরই রহিয়াছে। বিশেষতঃ কোন মামলায় বিলাতে আপিল হওয়ার পূর্বে, উক্ত মামলায় নিজের দেওয়া হুকুম, সম্বন্ধে পুনরায় নিজেই বিচার করিয়া অথবা "রিভিউ" করিয়া নিজের পূর্ব হুকুম রাখিবার বা বদলাইবার অধিকার কমিশনার-সাহেবের আছে। (প্রত্যেক দেওয়ানি মামলা যাহার সম্বন্ধে কমিশনার-সাহেবকে হাইকোর্টের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিলাত পর্যন্ত আপিল করা চলে)। নিম্নস্থ কোন সাঁওতালি-অফিসারের "রিভিউ" অর্থাৎ নিজের বিচার করা মামলায় পুনরায় ছানি-বিচার করিবার অধিকার নাই ; তবে সব্‌ডেপুটি ও ডেপুটি-কলেক্টরগণ এবং সবডিভিসনার অফিসার ডেপুটি-কমিশনারের হুকুম লইয়া, তথা ডেপুটি-কমিশনার ভাগলপুরের কমিশনার-সাহেবের হুকুম লইয়া, "রিভিউ বা ছানি" করিতে পারেন। উক্ত দেওয়ানি-আপিল সম্বন্ধে

মনে রাখা উচিত যে কোনও মামলায় দুইবার আপিল করা চলিবে না;অর্থাৎ প্রথম আপিলে নিম্ন-আদালতের হুকুম বহাল থাকিলে, পুনরায় দ্বিতীয় আপিল করা চলিবে না। তবে পুনর্বিচারের জন্য হাইকোর্টে অর্থাৎ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করা চলিবে। উক্ত হাজার টাকার কম দাবির দেওয়ানি-মামলার জন্য এই জেলায় ভারতে প্রচলিত দেওয়ানি-বিচার-পদ্ধতি-বিষয়ক-আইন বলবৎ নাই। উহার স্থানে মাত্র ৬৩টি সাধারণ নিয়ম প্রচলিত করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত নিয়ম কয়েকটি এত অল্পসংখ্যক যে, সব মামলায় উক্ত নিয়ম হইতে সাহায্য পাওয়া যায় না। অবশ্য এক হাজার টাকার অধিক দাবির দেওয়ানি-মামলায় দেওয়ানি-বিচার-পদ্ধতি-বিষয়ক-আইন এই জেলাতেও বলবৎ আছে ; এবং সেই অনুসারেই বিচার হইয়া থাকে। এক হাজারের অধিক দাবীর দেওয়ানি-মামলাসমূহের জন্য সব্‌-ডিভিসনাল-অফিসারকে সব্ জজের ক্ষমতা এবং ডেপুটি-কমিশনারকে ডিস্ট্রিক্ট-জজের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এতদতিরিক্ত আরও কয়েকটি অন্যত্র প্রচলিত আইন অনুসারে বিচার করার সম্বন্ধে, উক্ত দুই অফিসারের যথাক্রমে সব্‌জজ ও ডিস্ট্রিক্ট-জজের অধিকার আছে। এক হাজার টাকার অধিক দাবির দেওয়ানি-মামলায় দেওয়ানি-বিচার-পদ্ধতি-বিষয়ক-আইন এখানেও প্রচলিত থাকায় সর্বসাধারণের কোনও প্রকার বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু উক্ত ৬৩টি নিয়ম, যাহা সাঁওতালি-আদালত-সমূহের জন্য প্রচলিত করা হইয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। উক্ত নিয়ম কয়েকটির সারাংশ অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে—

হাজারের কম দাবি দেওয়ানি-মামলায় পর্দানসীন স্ত্রীলোকের, শারীরিক বা মানসিক কারণে আদালতে উপস্থিত হইতে অসমর্থ ব্যক্তির, অন্য জেলার অধিবাসীর, স্বয়ং মামলার বিষয় অবগত নহে এমন ব্যক্তির, অথবা সরকারি আইন অনুসারে আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হয় না এমন মাননীয় ব্যক্তির, দেওয়ানি-মামলায় নিজে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা আদালতের হুকুম লইয়া নিজ প্রতিনিধি বা এজেণ্ট দ্বারা মামলা করিতে পারেন। কিন্তু আদালত আদেশ করিলে তাহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে। মামলার আরজি মৌখিক অথবা লিখিত দুই প্রকারেই করা যাইতে পারে। মৌখিক-আরজি হাকিমের সম্মুখে করিতে হইবে এবং উপযুক্ত কোর্ট-ফী দিতে হইবে। লিখিত-আরজি নিজ বাটির কাহারও দ্বারা লিখাইয়া লইতে পারা যায় ; অথবা দরখাস্ত-লেখক, উকিল বা মোক্তার প্রভৃতির দ্বারা লিখাইয়া লইতে হয়। আরজিতে বাদী ও প্রতিবাদীর নাম, পিতার নাম, বাসস্থান এবং পেশার উল্লেখ করিতে হইবে এবং দাবির সম্বন্ধে অল্প কথায় সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিতে হইবে। দাবির পরিমাণ নির্ণয় করিতে প্রত্যেক একরের বা সাড়ে সাত হাতের কাঠার প্রায় এক বিঘা আওল-ধান-জমির ৭৫ টাকা, দোয়েম-ধনীর ৬০ টাকা, সেম-ধনীর ৪৫ টাকা, আওল "বারী", পুষ্করিণী বা বাঁধের ৪৫ টাকা, দোয়েম বারী ৩০ টাকা ও পতিত ১৫ টাকার দরে মূল্য হিসাব করিয়া দাবির পরিমাণ স্থির করিতে হইবে; এবং তদনুসারে কোর্ট-ফী দিতে হইবে। প্রতিবাদীর উপর শমন বাদী নিজে জারি করিতে পারে; অথবা তলবানা দিলে আদালতের তরফ হইতে শমন জারি করান হইতে পারে। বাদী ও প্রতিবাদী মামলা বিচারাধীন অবস্থায় যে কোন সময়ে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করিয়া দরখাস্ত দিলে, মিটমাটের সর্তানুসারেই ডিক্রি দেওয়া হইবে। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে দুইজন সালিশ মানিলে ও আদালতের তরফ হইতে একজন সালিশ এইরূপ তিন জন সালিশ হইলে, মামলায় সালিশী বিচার হইবে। সালিশগণ মতভেদ না করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে

নিষ্পত্তি করিয়া যে রোয়দাদ্ বা রিপোর্ট দিবেন তাহাই আদালতকে মানিয়া লইতে হইবে। অবশ্য যদি জুয়াচুরী প্রমাণ হয়, তবে আদালত সালিশগণের বিচারকে মানিতে বাধ্য নহে এবং এরূপ অবস্থায়, হয় সালিশগণের বিচার মঞ্জুরীর জন্য উপর আদালতের নিকট মামলা প্রেরিত হইবে, অথবা আদালত অধিক-সংখ্যক সালিশের যে মত, সেই মত গ্রাহ্য করিতে পারিবে। বাকি খাজনার ডিক্রিতে প্রথমে অস্থাবর-সম্পত্তি ক্রোক্ করা হইবে ; পরে জমি উচ্ছেদ করা যাইবে। কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে প্রথমে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিতে পারে। দেওয়ানি দাবির ডিক্রিতে এই জেলার নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ক্রোক্ করা যাইবে না ; যথা—পরিধানের বস্ত্রাদি, বিছানা প্রভৃতি এবং রন্ধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনাদি, মিস্ত্রি প্রভৃতির কারখানার যন্ত্রাদি, চাষের যন্ত্রাদি, বীজের শস্য, দুই জোড়া পর্যন্ত চাষের বলদ বা মহিষ এবং সংবৎসরের খাদ্যোপযোগী শস্য প্রভৃতি, কৃষকের মাটির গৃহাদি, মাছ ধরার জাল বা ক্ষুদ্র নৌকা, গাড়োয়ানগণের এক জোড়া বলদ বা মহিষ, মজুর এবং চাকরের বেতনের টাকা, বৃত্তির টাকা, পেন্‌সন্ ইত্যাদি, কাটা হইবার ও আছড়ান হইবার আগের জমির ফসল, হিসাবের কিতাবসমূহ, ক্রোক্ করা যাইতে পারে না। কিন্তু বাকি খাজনার ডিক্রিতে ফসল ক্রোক্ করা যাইতে পারে। বাকি খাজনার টাকা মালিক লইতে রাজী না হইলে অথবা আপত্তি করিলে, প্রজা খাজনার টাকা আদালতে জমা দিতে পারিবে, এবং জমা দিবার জন্য দরখাস্ত লিখাইতে লেখককে দুই আনা মাত্র ফী দিতে হইবে। বেশি ফী চাহিলে আদালতকে জানাইয়া দেওয়া দরকার। দেওয়ানি-আরজি আদালতের লেখকের দ্বারা লিখাইতে হইলে, নিম্নলিখিত হারে ফী দিতে হইবে। পঞ্চাশের কম টাকার দাবি স্বত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মামলায় আরজি লিখাইবার ফী এক টাকা, পঞ্চাশের উর্ধে এক শত টাকার দাবিতে দুই টাকা ; এবং তাহার উর্ধে প্রত্যেক এক শত টাকার বা তাহার কম দাবির জন্য আট আনা করিয়া ফী দিতে হইবে। বাকি খাজনার জন্য কুড়ি টাকার দাবি পর্যন্ত আট আনা, তদূর্ধে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বার আনা, পঞ্চাশ হইতে এক শত টাকা পর্যন্ত এক টাকা এবং এক শতের অধিক দাবিতে প্রত্যেক শত বা তাহার আংশিক দাবির জন্য ফী আট আনা করিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য দরখাস্তের জন্য ফী এক টাকা। কিন্তু ডিক্রি-জারি, নকল প্রভৃতির দরখাস্ত চারি আনা ও দুই আনার অধিক ফী দিতে হইবে না। দাবির ডিক্রি হওয়ার পর যদি দাবির টাকা ২৫ টাকার কম হয়, তবে আদালত টাকা দাখিল করিবার জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। উক্ত নির্দিষ্ট দিনে টাকা না দিলে বাদীর প্রার্থনা অনুসারে, আদালত বাদীকে ক্রোক্ জারি করিবার আদেশ দিবেন। ডিক্রি ওয়াশীল করিবার জন্য এক বৎসরের মধ্যে ডিক্রি জারি করিতে হইবে ; যদি তিনবার ডিক্রি জারি হওয়ার পরও দাবির টাকা ওয়াশীল না হয়, তবে ডিক্রি রদ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাদী যদি আদালতে প্রমাণ করাইতে পারে যে, দেনদার জুয়াচুরি করিয়া সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখিতেছে, তাহা হইলে ডিক্রি রদ হইবে না। যদি ডিক্রি হওয়ার পর এক বৎসর অতীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেনদারকে কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ করার পর ক্রোক্ করিবার আদেশ দেওয়া যাইবে। সাধারণতঃ সব ডিক্রি তিন বৎসর পর তামাদী হইয়া যায় ; কিন্তু যদি বাদী ও প্রতিবাদী ডিক্রির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে কিস্তি করিয়া টাকা ওয়াশীল করিবার মীমাংসা করতঃ উভয়ে মিলিয়া দরখাস্ত দ্বারা কিস্তি মঞ্জুরী প্রার্থনা করে, তবে ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক দাবিতে ডিক্রি ছয় বৎসর পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। যদি কিস্তি খিলাফ হয়,

তবে কিস্তি খিলাফীর পর তিন বৎসর পর্যন্ত ডিক্রি কায়েম থাকিবে। অন্যান্য অংশ সর্বসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না।

গ. সেটেলমেণ্ট

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশন্ জারি হওয়ায় প্রাদেশিক লাট-সাহেবকে নিম্নলিখিত অধিকার দেওয়া হইয়াছে ঃ

১। অন্যত্র প্রচলিত যে কোন আইনকে নোটিশ দিয়া এই জেলায় প্রচলিত করা বা তাহার প্রচলন পুনরায় বন্ধ করা।

২। এই আইনের সহিত যে সকল প্রচলিত আইনের তপ্‌শিল দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে কোনটির প্রচলন বন্ধ করা।

৩। নোটিশ দিয়া এই জেলার সমস্ত বা কোন অংশ জরিপ করান ; এবং জরিপ চলিতে থাকার সময় জমির সত্ত্বাদি, জমিদার, প্রধান প্রভৃতির অধিকার ও কর্তব্যাদি এবং জমির খাজনা-সম্বন্ধে, যে সকল মামলা হইবে, সে সকল মামলা বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়া সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারদিগকে বাহাল করা।

৪। সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারদিগের চূড়ান্ত বিচারের পরেও নথী তলব করিয়া যে কোন মামলার বিচার করা ; এবং স্বত্ত্বলিপিতে লিপিবদ্ধ সত্ত্বাদিসমূহ পরিবর্তন করা।

৫। সেটেল্‌মেণ্ট জারি হওয়ার পর জমির স্বত্ত্বাদি, জমিদার, প্রধান প্রভৃতির স্বত্ত্বাদি-সম্বন্ধীয় সমস্ত মামলার বিচার সাধারণতঃ এই জেলার আদালতসমূহে না হইয়া সেটেল্‌মেণ্ট-আদালতে হইয়া থাকে ; কিন্তু লাট-সাহেব ইচ্ছা করিলে সাঁওতালি-আদালতসমূহকে উক্ত বিচারের অধিকার দিতে পারেন।

উপরোক্ত অধিকার ব্যতীত এই জেলার জন্য সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে লাট-সাহেবের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই আপিল বিচার করিবার অধিকার আছে। আপিল বা মেমোরিয়াল করিতে হইলে লাট-সাহেবের নিকট ডাকযোগে আবেদন-পত্র পাঠাইতে হয় ; এবং লাটসাহেব সঙ্গত বিবেচনা করিলে পুনর্বিচার করিয়া ফলাফল ডাকযোগে আবেদনকারীকে জানাইয়া দিয়া থাকেন। পূর্বোক্ত অধিকার, তথা ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের দুই নম্বর রেগুলেশনে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে এই জেলার জরিপ হওয়ার জন্য লাটসাহেব কয়েকবার আদেশ জারি করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে ম্যাক্‌ফারসন-সাহেব সেটেলমেণ্ট করিয়া গিয়াছেন ও বর্তমানে সেটেল্‌মেণ্ট চলিতেছে।

এই তিন নম্বর রেগুলেশন্ দ্বারা এই জেলার জন্য এইরূপ হুকুমও জারি করা হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে ভারতে যে সকল আইন প্রচলিত হইবে, তাহাতে যদি এই জেলার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত না থাকে, তাহা হইলে উক্ত আইন এখানে বলবৎ হইবে না।

এই রেগুলেশন্ অনুসারে সেটেল্‌মেণ্ট আরম্ভ হওয়ার পর জমি, জমা, জমিদার, প্রধান প্রভৃতির স্বত্ত্বাদি-সম্বন্ধে দেওয়ানি-মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকিলেও তাহা সেটেলমেণ্ট-আদালতেই বিচারার্থ প্রেরিত হইবে ও তথায় বিনা "কোর্ট-ফিতে" বিচার হইবে। যদি উভয় পক্ষ প্রার্থনা করে এবং আদালতের মঞ্জুরী হয় ; তবে যে কোন মামলা সেটেল্‌মেণ্ট-আদালতে না হইয়া সাধারণ দেওয়ানি-আদালতে হইবে। কিন্তু এরূপ বিচারের জন্য উপযুক্ত কোর্ট-ফি দিতে হইবে। সাঁওতালি-আদালতে লাট-সাহেবের আদেশ অনুসারে

সেটেল্‌মেন্টের সময় যে সকল উক্তরূপ দেওয়ানি-মামলা হইবে, তাহাতে "কোর্টফি" দিতে হইবে না। সেটেল্‌মেন্টের সময় সেটেল্‌মেন্ট অফিসারগণ প্রত্যেক মৌজা জরিপ করিয়া তাহার চৌহদ্দী স্থির করিয়া দিতে পারিবেন এবং মৌজায় কত পতিত থাকিবে তাহাও স্থির করিয়া দিবেন। "দামিনিকো" এলাকায় প্রথম সেটেল্‌মেন্টে খাজনা ধার্য করিবার সময় সেটেল্‌মেন্ট-অফিসারগণ "নজর পয়মাস" অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে সমস্ত মৌজার খাজনা ধার্য করিয়া প্রত্যেক প্রজার খাজনা নির্ধারণ করিবার ভার গ্রাম্যসম্প্রদায়ের উপর দিতেন, এবং জমিদারি-এলাকায় "রৈয়তওয়ারী" জরিপ করিয়া প্রত্যেক প্রজার জমির ও খাজনার পরিমাণ স্থির করিয়া দিতেন। এই খাজনা ধার্য করিবার অধিকার ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২নং রেগুলেশন্ দ্বারা দেওয়া হইয়াছে। সেটেল্‌মেন্ট অফিসারগণকে উক্ত তিন নম্বর রেগুলেশন্ দ্বারা প্রত্যেক মৌজার স্বত্বলিপি প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। স্বত্বলিপিতে প্রত্যেক মৌজার মালিক, প্রজা, প্রধান প্রভৃতির জমি, পতিত, ডাঁড়, বাঁধ, খাল পুষ্করিণী, জঙ্গল প্রভৃতিকে যে সকল স্বত্ব, উপসত্বাদি আছে তাহা সমস্তই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। জমিতে দান, বিক্রয়, হস্তান্তর প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রথা থাকে তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। উক্ত স্বত্ব, উপস্বত্বাদি ও প্রথাসমূহ সম্বন্ধে গ্রামবাসীর নিকট মৌখিক বা লিখিত মত লইয়া অফিসারগণ স্বত্বাদি লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং যদি কোন গ্রামের অধিবাসিগণ মৌখিক বা লিখিত মত না দেয়, তাহা হইলে অফিসারগণ নিজেই অনুসন্ধান করিয়া স্বত্বাদি স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। উক্তরূপে প্রস্তুত স্বত্বলিপি ছাপাইয়া, যে গ্রামের যে স্বত্বলিপি, তাহা সেই গ্রামের প্রকাশ্য-স্থানে স্থাপিত করিয়া বা অন্য কোন উপযুক্ত উপায়ে ঘোষণা করিয়া, জানাইয়া দিতে হইবে যে, স্বত্বলিপিতে মালিক, প্রধান, প্রজা-প্রভৃতির স্বত্ব, উপস্বত্বাদি সম্বন্ধে কি কি বিষয় লিখিত হইয়াছে। উক্ত ভাবে ঘোষণা হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে মালিক ও প্রজাগণের আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে। আপত্তি-সমূহের বিচার করিয়া অফিসারগণ প্রয়োজন মত স্বত্বলিপি সংশোধন করিবেন ; এবং প্রথম ঘোষণার এক বৎসর পরে সংশোধিত স্বত্বলিপি প্রকাশিত হইবে। এরূপভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রজাগণের আর স্বত্বলিপি-সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি করা চলিবে না। স্বত্বলিপি অনুসারে প্রজাদিগকে কার্য করিতে হইবে। অন্যথা করিলে এই রেগুলেশনের ২৮ ধারা মতে, পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। স্বত্বলিপির পরিবর্তন করাইতে হইলে, পরবর্তী সেটেল্‌মেন্টে আপত্তি করিতে হইবে। (বর্তমানে যে সেটেল্‌মেন্ট চলিতেছে, তাহাতে প্রজাগণের যদি গত সেটেলমেন্টের স্বত্বলিপি সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে স্বত্বলিপিতে আপত্তি করিয়া পরিবর্তন করাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য। অবশ্য এরূপ আপত্তি অফিসারগণ গ্রাহ্য না করিলে, প্রজাগণের লাট-সাহেবের নিকট পর্যন্ত আন্দোলন করা উচিত। যাহারা প্রজাগণের প্রতিনিধি হইয়া কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছেন, তাহাদের মারফতে কাউন্সিলেও আন্দোলন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এই সম্বন্ধে এই জেলার প্রজাবর্গের মনে রাখা দরকার যে, সর্বপ্রথম সেটেল্‌মেন্টের সময় অম্বর-পরগণা বা বর্তমান পাকুড়ের প্রজাগণ তাহাদের স্বত্বাদি সেলেট্‌মেন্ট দ্বারা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় সেটেলমেন্টে যোগদান না করিয়া সেটেলমেন্ট "বয়কট' করিয়াছিল। আজ তাহার ফলস্বরূপ দেখি যে, তাহাদের মধ্যে জমির হস্তান্তর প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। হস্তান্তর-প্রথা বর্তমানে অম্বর, সুলতানাবাদ,

কাঁকজোলা ও মামুদাবাদ-পরগণায় প্রচলিত আছে। দেবঘর সব্-ডিভিসনের প্রজাগণের মধ্যে "মূলরাইতগণ" স্বত্বলিপিতে আপত্তি করিয়া মামলা করায়, তাহাদেরও সম্পত্তিতে দান, বিক্রয় প্রভৃতি করিবার অধিকার আছে। কেবল যে সকল নিরীহ প্রজা মূর্খতাবশতঃ আপত্তি করে নাই; তাহাদের স্বত্বলিপি আপত্তিজনক হইলেও পরিবর্তিত হয় নাই। স্বত্বলিপি তৈয়ার করিবার সময় প্রজাগণের মতামত, সর্বপ্রথম সেটেল্‌মেন্টে লওয়া হইয়াছিল কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। বর্তমান সেটেলমেন্টেও মতামত লইয়া হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রজাগণের আপত্তি করা একান্ত প্রয়োজন।)—উক্ত উদ্ধৃত অংশ লেখকের অভিমত।

প্রকাশিত স্বত্বলিপি-সম্বন্ধে মালিক, জমিদার বা অপরাপর ভূস্বামীবর্গ তিন বৎসরের মধ্যে মামলা করিতে পারিবেন। মামলা কেবল জমিদারের বা মালিকের স্বত্ব-সম্বন্ধে হইতে পারিবে এবং যে কোন সাধারণ সব্‌জজের আদালতে উপযুক্ত "কোর্ট-ফি" দিলে মামলা চলিতে পারিবে। দেওয়ানি-বিচার-পদ্ধতি-বিষয়ক-আইনের ১১ ধারা অনুসারে তামাদী ঘটিয়া থাকিলে মামলা চলিবে না। মালিকগণও স্বত্বলিপি বিরুদ্ধাচরণ করিলে এই রেগুলেশনের ২৮ ধারামতে দণ্ডিত হইবেন।

এই রেগুলেশনের বিশেষ লাভ এই যে, কোনও প্রকার চুক্তি থাকিলেও কর্জ টাকার বা দেনার সুদ শতকরা দুই টাকা মাসিক হারের অধিক ডিক্রি হইবে না ; এবং মধ্যবর্তী হিসাব-নিকাশের সময়ে সুদের সুদ ধরা যাইতে পারিবে না। কর্জ টাকা বা দেনা এক বৎসরের অধিক দিনের না হইলে আসল টাকার সুদ, এক চতুর্থাংশের অধিক ডিক্রি হইবে না ; এবং যত দিনেরই কর্জ হউক না কেন, আসল টাকার অধিক সুদের ডিকরী দেওয়া হইবে না।

২৭ ধারার সারাংশ ও ফলাফল

উক্ত রেগুলেশনে সর্বপ্রকার হস্তান্তর রহিত করা হয় নাই ; কিন্তু ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত রেগুলেশন্ সংশোধিত হওয়ায়, সাতাইশ ধারার এই অর্থ দাঁড়াইয়াছে যে—দান, বিক্রয় এবং কোন প্রকার চুক্তিতে জমি অপরকে দিলে তাহা বে-আইনী হস্তান্তর হইবে। ডেপুটি-কমিশনার-সাহেব জানিতে পারিলেই, হস্তান্তরকারী ও যাহার নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে, উভয়কেই হস্তান্তরিত জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। অবশ্য ডেপুটি-কমিশনার হস্তান্তরকারীর বা তাহার উত্তরাধিকারীর সহিত উক্ত উচ্ছেদী-জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও পারিবেন অথবা গ্রামের অপর কোন প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু যে স্থলে হস্তান্তর-গ্রহণকারীর হস্তান্তরিত জমিতে বার বৎসরের অধিক দখল থাকিবে, সে স্থলে সে জমি হইতে উচ্ছেদ হইবে না। উচ্ছেদের পূর্বে ডেপুটি-কমিশনার হস্তান্তর-গৃহীতাকে উচ্ছেদ না হইবার কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিবেন। কমিশনারের মঞ্জুর না হইলে উচ্ছেদ কায়েম হইবে না। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, স্বত্বলিপিতে যে মৌজায় যে ভাবে ও যত দূর হস্তান্তরের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই মৌজায় সেই ভাবে হস্তান্তর করিবার অধিকার আছে, অন্যত্র হস্তান্তরের অধিকার নাই। উক্ত ধারার অর্থ সাধারণত এই প্রকার :—যদি কোন স্থলে স্বত্বলিপির স্বত্বের বিরুদ্ধে হস্তান্তর করা হয়, তবে উক্ত হস্তান্তর এই তিন নম্বর রেগুলেশনের অন্যান্য ধারামতে রেজেস্ট্রি করা যাইতে পারে না,

অথবা কোন ফৌজদারি, দেওয়ানি বা রাজস্ব-সম্বন্ধীয়-মামলার প্রমাণস্বরূপ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

উক্ত ধারা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে যে সকল স্থলে জমিদারি ও ঘাটোয়ালী ছিল এবং আবাদী-জমি বেশি ছিল, সেই সকল স্থানের হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে হস্তান্তর প্রথা প্রচলিত ছিল। দেবঘর প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান-স্থানে এখনও ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি, পূর্বে যে হিন্দুদের মধ্যে হস্তান্তর প্রথা ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বর্তমান। মুসলমানগণের সম্বন্ধেও এই প্রকার প্রমাণ আছে। হস্তান্তরকে বে-আইনী সাব্যস্ত করিবার পর অনেক দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর-জমিকে "রায়তী" জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। এরূপ করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব-প্রচলিত প্রথা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এখনও যে সকল লাখরাজ-জমি আছে তাহা হস্তান্তর হয়। হিন্দুগণ যে সব ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর করিয়াছিল, তাহার খাজনা ধর্মের খাতিরে অবশ্যই ধার্য করে নাই; কিন্তু সেটেল্‌মেন্টে উক্ত জমি "রায়তী" হওয়ায় তাহার খাজনাও ধার্য হইয়াছে। পাহাড়িয়াগণ চাষ আবাদ অধিক করিত না; কাজেই তাহাদের মধ্যে হস্তান্তর-প্রথা ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। সাঁওতালগণ অন্যত্র হইতে আসিয়া জঙ্গল সাফ করিয়া এই জেলায় বাস করিতেছে; কাজেই তাহাদের প্রথম অবস্থায় জমি ছিল না সুতরাং হস্তান্তর প্রথা থাকাও অসম্ভব ছিল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে এখানে অবাধে হস্তান্তর চলিতেছিল ও তাহা আদালতও স্বীকার করিত, তাহার প্রমাণ সরকারি-রেকর্ড হইতেই পাওয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের অজুহাতে এই হস্তান্তর-প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু "উড" সাহেবের সেটেলমেন্ট হওয়ার পরও যে হস্তান্তর-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ সরকারি-রিপোর্ট হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু সরকার বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই জেলায় হস্তান্তর প্রথা প্রচলিত থাকিলে ধূর্ত মহাজনগণ সাঁওতাল, পাহাড়িয়া এবং অন্যান্য মূর্খ প্রজাগণের জমি আত্মসাৎ করিয়া লইবে, এই জন্য সরকার ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮৬নং চিঠির দ্বারা আদেশ প্রচার করেন যে,—এই জেলায় জমির হস্তান্তর বন্ধ করা হইল এবং কোন আদালত যেন হস্তান্তর কার্যকে স্বীকার না করে। জমি বিক্রয় বা মর্টগেজ দেওয়া রহিত করা হইল এবং প্রধানের নিজ জোত বিক্রয় করিবার অধিকার রহিল না। কেবল খাজনা বাকি পড়িলে তদানীন্তন ডেপুটি-কমিশনার "কাস্টার্স" সাহেবের প্রস্তাবানুসারে, প্রধানকে বাকি খাজনায় নিজ জোত হইতে উচ্ছেদ করার নিয়ম, সরকার জারি করিলেন। বাকি খাজনায় প্রজার জমিও উচ্ছেদ করার নিয়ম প্রচলিত করা হইল।—অবশ্য বাকি খাজনায় জমি উচ্ছেদের এই নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে; কিছুদিন পূর্বে জোতের অংশ উচ্ছেদ হইত, বর্তমানে সমস্ত জোতই উচ্ছেদ হয়।

উক্ত ৮৬ নং চিঠির দ্বারা "কোর্ফা" প্রজা বহাল করাও বন্ধ করা হইয়াছে। তবে যদি কোন "কোর্ফা" প্রজা হস্তান্তরিত জমির উপর বসত-বাটি প্রভৃতি তৈয়ার করে, এবং বার বৎসরের উর্ধকাল দখলীকার থাকে, তবে তাহাকে জমি হইতে উচ্ছেদ না করিয়া জমাবন্দি প্রজার শ্রেণিভুক্ত করিতে হইবে। *উক্ত চিঠিতে ভাওলী এবং কৃষাণী যে "বে-আইনী হস্তান্তর" তাহার উল্লেখ নাই।* কিন্তু উক্ত সংশোধিত সাতাইশ ধারার যেরূপ অর্থ সরকারের

তরফ হইতে করা হইতেছে তাহাতে "ভাওলী" এবং "কৃষাণী" উভয়কেই হস্তান্তর প্রমাণিত করা হইতেছে। বর্তমান সেটেলমেন্টে "হাণ্ডুয়া" তালুকের কয়েকজন প্রজাকে কৃষাণী দেওয়ার জন্য জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছিল এবং ভাগলপুরের কমিশনার-সাহেবের নিকট আপিল করায়, কমিশনার-সাহেবও কৃষাণীকে হস্তান্তর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বর্তমান সেটেলমেন্টের যে সকল তস্‌দিগের নিয়ম (attestation rules) ১৯২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে জারি হইয়াছিল, তাহাতে বার বৎসরের কম সময়ের জন্যও ভাওলী বা কৃষাণী দিলে প্রজাকে উচ্ছেদ করা যাইবে, এই প্রকার নিয়ম করা হইয়াছিল। উক্তরূপ নিয়ম অনুসারে হাণ্ডুয়া-তালুকে কৃষাণী উচ্ছেদ ক্রমশঃ জারি হইতেছিল। ভাওলীর জন্যও উচ্ছেদ জারি করা আরম্ভ হইয়াছিল। অবশ্য গত সেটেল্‌মেন্টে ম্যাক্‌ফারসন্‌-সাহেব যে সকল তস্‌দিগের নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ আদেশ ছিল না। যাহা হউক, উক্তভাবে উচ্ছেদ জারি হইতে দেখিয়া, প্রজাগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়, এবং দুমকা ও পাকুড়ে রায়ত-সভা কায়েম করিয়া লাট-সাহেবের নিকট আবেদন করা হয়। এই জেলার কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুক্ত রামেশ্বরলাল মাড়োয়ারী স্থানীয় জেলা কংগ্রেস-কমিটির বিশেষ সাহায্যে অনেক পরিশ্রম করিয়া একটি মেমোরিয়াল, যাহাতে তের হাজার প্রজার দরখাস্ত ছিল, তাহা লাট-সাহেবকে দিয়াছিলেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে যখন লাট-সাহেব দুমকা আসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে বুঝাইবারও চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। উক্ত মেমোরিয়াল এখানকার কয়েকটি আইনের পরিবর্তনের প্রার্থনাও করা হইয়াছিল। এমন কি, রাজমহলের সাঁওতালগণের তরফ হইতে বর্তমান আইন পরিবর্তন করিবার প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য উক্তরূপ দরখাস্ত করিবার পরও ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যখন কাউন্সিলে বাজেটের উপর অর্থাৎ সরকারি-আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল; তখন বর্তমান সেটেল্‌মেন্টের খরচ হইতে একশত টাকা কমাইবার প্রস্তাব এই জন্য করা হইয়াছিল যে, এই জেলার বর্তমান সেটেল্‌মেন্টে প্রজাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। বিশেষতঃ বার বৎসরের কম সময়ের জন্য ভাওলী ও কৃষাণীতে যে প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইতেছে, তাহা আইন-সঙ্গত নহে এবং ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক। উক্ত ভাবে আন্দোলন হওয়ায়, বর্তমানে তস্‌দিগের নিয়ম সংশোধিত হইয়াছে এবং সরকার নিয়ম জারি করিয়াছেন যে, উচ্ছেদ করার যে অধিকার আছে, তাহা যে সকল গ্রামে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতিই অধিক বাস করে সেই সকল গ্রামের জন্যই দেওয়া হইল। যে সকল গ্রামে "দিকু" প্রজাগণের অধিক বাস, তথায় পূর্ব সেটেল্‌মেন্টে ভাওলী-সম্বন্ধে যে নিয়ম ছিল, সেই অনুসারেই বর্তমান সেটেল্‌মেন্টেও কার্য হইবে অর্থাৎ বার বৎসরের কম সময়ের জন্য ভাওলীতে পূর্ব সেটেলমেন্টের জমাবন্দি রায়তদিগকে উচ্ছেদ করা হইবে না। কিন্তু কৃষাণী প্রথাকে এখনও বে-আইনী বলিয়া আদেশ প্রচার করা হইয়াছে; তবে ইহাও বার বৎসরের উর্ধকালের না হইলে প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইবে না। কিন্তু গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সরকারের তরফ হইতে যে প্রকার চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, এই জেলায় যে স্বয়ং হাল ধরিয়া চাষ করিবে, তাহারই জমি থাকিবে, অন্য কাহারও জমি থাকিবে না। প্রজাগণের সময় থাকিতেই সতর্ক হওয়া উচিত; এবং বর্তমান সেটেল্‌মেন্টের মধ্যেই ঘোর আন্দোলন করা এবং কাউন্সিলের সাহায্যে যাহাতে এই জেলার আইন পরিবর্তন হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

ঘ. রাজস্ব-বিষয়ক আইন

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে দুই নম্বর রেগুলেশন্ দ্বারা সেটেলমেন্ট অফিসারদিগকে জমির খাজনা ধার্য করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। লাট-সাহেবকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে, অথবা এই জেলার জমিদার বা প্রজাগণের প্রার্থনা অনুসারে, মধ্যে মধ্যে সেটেল্‌মেন্ট হইবার আদেশ জারি করিবেন। উক্ত সেটেলমেন্টের খরচও জমিদার এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিবার আদেশ দিয়া খরচ ওয়াশীল করাইতে পারিবেন। এই রেগুলেশন্ জারি হওয়ার পর হইতে সেটেলমেন্ট দ্বারা যে খাজনা ধার্য করা হইবে, তাহা আর পনের বৎসরের মধ্যে কম বা বেশি করা চলিবে না। কিন্তু পনের বৎসর পরে যে মৌজায় সেটেল্‌মেন্ট হইয়াছে, সেই সকল মৌজার জমিদার বা অপর কোন মালিক, মাঝি অথবা প্রধান কিংবা অর্ধেকের বেশি প্রজা যদ্যপি ধার্য খাজনায় অসন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে ধার্য খাজনার পরিমাণ পরিবর্তনের জন্য, সঙ্গত কারণ দর্শাইয়া ডেপুটি-কমিশনারের নিকট দরখাস্ত দিতে পারিবে। ডেপুটি-কমিশনার যদ্যপি প্রদর্শিত কারণসমূহ সঙ্গত বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারিবেন ; যদ্যপি সঙ্গত বিবেচনা করেন, তবে কমিশনার সাহেবের আদেশ লইবার পর, উক্ত মৌজার খাজনা-সম্বন্ধে বিচার করিয়া, যে নিয়মে সেটেল্‌মেন্ট-অফিসারগণ খাজনা নির্ধারিত করিয়া থাকেন, সেই নিয়মে খাজনা ধার্য করিয়া জমাবন্দি প্রস্তুত করাইবেন ; উক্ত জমাবন্দি কমিশনার-সাহেবের মঞ্জুরী হওয়ার পর প্রকাশিত করা হইবে। প্রকাশিত হওয়ার পর উক্ত মৌজায় যে কোন প্রজার বা মালিক প্রভৃতির-সমূহের জমা বন্দিতে আপত্তি করিবার অধিকার থাকিবে। আপত্তি-সমূহের বিচার-নিষ্পত্তির অনুসারে জমাবন্দি পুনর্বার সংশোধিত করা হইবে ; সংশোধিত জমাবন্দি কমিশনার-সাহেব মঞ্জুর করিবার পর, প্রথম প্রকাশিত হওয়ার এক বৎসর পরে শেষবার প্রকাশিত হইলে আর আপত্তি করা চলিবে না। তখন তাহা আইন অনুসারে সেই মৌজার জমাবন্দি বলিয়া গণ্য হইবে ও ধার্য খাজনা পনের বৎসর বা পুনরায় সেটেল্‌মেন্ট হওয়া পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। খাস-মৌজা-সকলে নূতন জলাশয় খনন দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে জমির উন্নতি-বিধান করাইবার পর, মালিক খাজনা বৃদ্ধি জন্য ডেপুটি-কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কিন্তু যদ্যপি মোস্তাজিরী বা প্রধানী মৌজায় জমির উন্নতি-বিধান জন্য, উক্ত প্রকার কার্য করিবার পূর্বে-মালিক ডেপুটি-কমিশনারের অনুমতি না লইয়া থাকেন, তবে সেই সকল মৌজাতে খাজনা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না। যে সকল স্থানে সেটেল্‌মেন্ট হয় নাই, সেই সকল স্থানের খাজনা পরিবর্তনের জন্য দরখাস্ত, যে কোন সময়ে যে কোন সংখ্যক, এমন কি অর্ধেকের কম, প্রজাগণও করিতে পারিবে। ডেপুটি-কমিশনারের এ স্থলে খাজনার পরিবর্তন করিবার পূর্ণ অধিকার আছে এবং এ বিষয়ে সংশোধন জন্য কমিশনার বা লাট-সাহেবের অনুমতি তাহাকে লইতে হইবে না। ডেপুটি-কমিশনার উক্ত মৌজার জমাবন্দি প্রস্তুত এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করিয়া, জমাবন্দি পূর্বে প্রকাশিত হওয়ার এক মাস পরে প্রকাশিত করিয়া জারি করিতে পারিবেন। বন্দোবস্তী মৌজার খাজনা পরিবর্তন বিষয়ে ডেপুটি-কমিশনারের, কমিশনার বা লাটসাহেবের অনুমতি লইয়া, জমাবন্দি সংশোধন ও প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। কিন্তু বে-বন্দোবস্তী-মহালের জন্য তিনিই সর্বেসবা। পতিত বা নূতন খণ্ডিত জমির খাজনা, প্রথম সাত বৎসরের জন্য উক্ত শ্রেণির জমির ধার্য খাজনার অর্ধেকের বেশি হইতে পারে না, এবং ফৌতী ফেরারী জমির খাজনা বৃদ্ধি করিয়া বন্দোবস্ত হইতে পারিবে না। এই সকল জমির খাজনা সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিলে ডেপুটি-কমিশনার-সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে আপত্তির বিচার হইতে পারিবে। কোন প্রজার কোন জমিতে দখলী-স্বত্ব থাকুক্ বা নাই থাকুক্, তাহাকে তাহার সাময়িক দখলীভূত জমি হইতে বিনা ডেপুটি-কমিশনারের হুকুমে উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। জমিদার বা অন্য কোন মালিক ডেপুটি-কমিশনারের হুকুম লইয়া, প্রজার জমি বা জমির অংশ অথবা গ্রামস্থ কোন জমি সেই জমির উন্নতির জন্য, বসৌড়িমহালের জন্য, অথবা কোন ধার্মিক, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বা সর্বসাধারণের হিতকর-কার্যের জন্য, খাস দখলে আনিতে পারিবেন; অর্থাৎ "এ্যাকোয়ার" করাইতে পারিবেন। অবশ্য এই জন্য ডেপুটি-কমিশনারের আদেশ অনুসারে ধার্য ক্ষতিপূরণের টাকা প্রজাকে দিতে হইবে। এই রেগুলেশনে ডেপুটি-কমিশনার, কমিশনার বা সেটেল্‌মেন্ট-অফিসারকে যে সকল অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধেই লাট-সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিয়া, উক্ত অফিসারগণের মীমাংসার পরিবর্তন বা সংশোধন করাইয়া লইবার অধিকার প্রজাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। স্বত্বলিপি শেষবার প্রকাশিত হইয়া জারি হইবার পর, অথবা স্বত্বলিপির সংশোধন সেটেলমেন্ট-অফিসার-সাহেবের আদেশানুসারে হওয়ার পর, পুনরায় সেটেল্‌মেন্ট অথবা অন্যান্য কারণে পরিবর্তিত জমাবন্দি জারি না হওয়া পর্যন্ত, লাট-সাহেবের বিনা মঞ্জুরীতে স্বত্বলিপিতে কোনরূপ পরিবর্তন হইতে পারিবে না। লাটসাহেব প্রকাশিত স্বত্ব-লিপিতে যদ্যপি কোনও প্রকার ভুল আছে বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত লিপি পরিবর্তন করিবার জন্য বিশেষ আদেশ জারি করিতেও পারিবেন। ইহার অর্থ এই যে—লাট-সাহেবের অনুমতি লইয়া স্বত্ব-লিপিতে বা জমাবন্দিতে যে কোন সময়ে পরিবর্তন করাইতে পারা যাইবে। এই সারাংশের সহিত ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশনের ভাবার্থও লিখিত আছে। এই জেলায় বাকি-খাজনার নালিশ তিন বৎসরের মধ্যে পূর্বে করা হইত ; কারণ তখন তিন বৎসরের পর তামাদি ঘটিত। কিন্তু ১৯২৫ সালে সাত নম্বর রেগুলেশন ডিসেম্বর মাসে জারি করা হইয়াছে ; এবং প্রধান বা মোস্তাজীরের বাকি-খাজনার নালিশ প্রত্যেক বৎসর করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ আদেশ জারি করিবার কারণ কি তাহা সাধারণে জানে না ; কারণ কোন রেগুলেশন্ জারি করিবার পূর্বে তাহাদের কোন মতামত লওয়া হয় না। তবে আশঙ্কা হয় যে, বাকি-খাজনা এক হাজারের অধিক হইয়া নালিশ হইলে হয়ত বাকি-খাজনার মামলাতেও কোন বিষয়ে হাইকোর্টে আপিল হইতে পারে ; এবং এরূপ হইলে হাকিমদের তকলিফ বাড়িয়া যাইতে পারে, সেই জন্যই এরূপ আইন করা হইয়াছে। যাহা হউক, বর্তমান এই রেগুলেশনে প্রধান বা মোস্তাজীরের মামলা খরচ যথেষ্টই হইবে এবং প্রথমে বাকি-খাজনার খরচ যত দিতে হইত, এখন তাহার প্রায় তিন গুণ খরচ দিতে হইবে। প্রথম নিয়মানুসারে দাবি টাকার "কোর্ট-ফি" ছাড়া, তিন বৎসরের খাজনার জন্য একটি মামলার খরচই দিতে হইত এবং এক মামলার জন্যই হয়রান হইতে হইত, কিন্তু এখন তিনবার হয়রানী হইবে ও তিন গুণ খরচ দিতে হইবে।

উক্ত খাজনা ধার্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, খাজনার হার নির্ণয় করিবার সময় সেটেল্‌মেন্ট-অফিসারগণকে বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে, প্রজার কৃষি-

সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান বা নিপুণতা আছে, এবং তাহার বংশগত ও জন্মগত কৃষি-সম্বন্ধীয় অভ্যাস ও প্রবৃত্তিই বা কিরূপ। এই সকল বিচার করিয়া এই জেলার খাজনা ধার্য করিতে গিয়া জাতিগত-পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং দামিনিকোতে দিকুদের অপেক্ষা সাঁওতাল-পাহাড়িয়াগণের খাজনার হার অনেক কম করা হইয়াছে। আপাততঃ দয়ার কার্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহা ন্যায়ানুমোদিত নহে।

ঙ. পুলিশ

এই জেলার সর্বত্র পুলিশ নাই। সমগ্র দেবঘর সবডিভিসন, দামিনিকো-পরগণা বাদে রাজমহল, পাকুড় ও গোড্ডা সব্‌ডিভিসন এবং দুমকা সহরে পুলিশ আছে। অন্যত্র পুলিশ নাই। এই সকল স্থানে জনতার নিকট হইতে পুলিশের কার্য লওয়া হইয়া থাকে। "দামিনিকো" মহালে এক একটি বাংলোর অধীনস্থ এলাকার উপরে এক একটি পরগণাইত আছে এবং তাহার অধীনে দেশ-মাঝি ও চাকলাদার আছে। পরগণাইত ছাড়া দামিনিকোতে পাহাড়িয়া-সর্দারগণ, নায়েব ও মাঝি-সকল আছে, তাহারাই পুলিশের কার্য করে। জামতাড়া সব্‌ডিভিসনে এবং সহর ও দামিনিকো ছাড়া দুমকা-সব্‌ডিভিসনে ঘাটোয়াল, সর্দার ও চৌকিদারগণের মারফতে পুলিশের কার্য হইয়া থাকে। "দামিনিকোতে" যে সকল পরগণাইত আছে, তাহাদিগকে বহাল করা ও বরখাস্ত করিবার অধিকার ডেপুটি-কমিশনার-সাহেবের আছে। পরগণাইতদিগকে কবুলিয়ত লিখিয়া কর্তব্যপালনের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়; তবে তাহারা বাহালী পরোয়ানা পাইয়া থাকে। তাহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য এই—নিজে মদ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিবে না এবং এলাকাস্থ লোকদিগকে মাদক-দ্রব্যের বেশি ব্যবহার করিতে দিবে না। "অবশ্য এই কর্তব্য তাহারা পালন করে কি না, সে বিষয়ে তাগিদ রাখিলে আবগারি-বিভাগের লোকসান হইবারই সম্ভাবনা; কাজেই তাগিদ রাখা হয় কিনা তাহা জানা যায় না।" কোন অফিসার গেলে হাজির হওয়া ও হুকুম তামিল করা, তাহার জন্য লড়িকা ও যানের সরবরাহ করাও তাহাদের কর্তব্য। এমন কি, কোন ইউরোপীয়-মহোদয় ভ্রমণচ্ছলে দামিনিকোতে পদার্পণ করিলে তাহাকে সব বিষয়ে সাহায্য করা পরগণাইতদের কর্তব্য; অবশ্য এইজন্য পরগণাইত পুরস্কার লইতে পারিবে। পুলিশের সাধারণ কাজ,—শমন প্রভৃতি জারি করা, সরকারি জঙ্গলমহাল ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা, খাজনা আদায়ে সাহায্য করা প্রভৃতি তাহাদের কর্তব্য। পরগণাইত প্রজাদের নিকট হইতে নগদ এক টাকা, আট আনার ও ভুট্টা দুই আনার মোট এক টাকা দশ আনা বাৎসরিক লইতে পারিবে। তাহার অধীনস্থ দেশ-মাঝি নগদ। আট আনা, ঘি চারি আনার ১ ভুট্টা দুই আনার মোট চৌদ্দ আনা এবং চাক্‌লাদার নগদ। চারি আনা, ঘি দুই আনার ও ভুট্টা দুই আনার মোট আট আনা প্রতি বৎসর প্রজাদের নিকট হইতে লইতে পারিবে। অবশ্য উক্ত প্রাপ্য প্রত্যেক মৌজায়, যাহার মোট খাজনা পঞ্চাশ টাকার অধিক, এবং পঞ্চাশের কম খাজনার প্রতি মৌজা হইতে মোট দেড় টাকা প্রতি বৎসর পরগণাইত, দেশ-মাঝি ও চাক্‌লাদার লইতে পারিবে। দশ টাকার কম খাজনার মৌজা হইতে কিছুই আদায় করিতে পারিবে না।

বর্তমানেও অনেক পাহাড়িয়া-সর্দার ক্লীভল্যাণ্ড-সাহেবের সময়ে ধার্য বৃত্তি পাইয়া থাকে, এবং ইহাদের পেশা উত্তরাধিকারসূত্রে বংশধরেরা পাইয়া থাকে। বিশেষ দোষ না

করিলে সর্দারের চাকুরি যায় না, অথবা বৃত্তি বন্ধ করা হয় না। পরগণাইত ও পাহাড়িয়া-সর্দারগণ পুলিশের কার্য করিয়া থাকে; তাহাদের ক্ষমতা প্রায় একজন দারোগার সমান। পাহাড়িয়া-সর্দারগণ হইতে দুমকা ও জামতাড়ায় যে সকল সর্দার আছে তাহারা পৃথক; কিন্তু তাহাদিগকেও পুলিশের কার্য সম্বন্ধে এক একজন দারোগার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঘাটোয়ালগণেরও পুলিশ কার্য সম্বন্ধে, বিশেষতঃ জামতাড়া সব্‌ডিভিসনের ঘাটোয়ালদের জনৈক দারোগার অধিকার আছে।

উক্ত স্থানসমূহ ছাড়া অন্যান্য স্থানে সরকারি পুলিশ আছে। এই জেলায় কোন স্থানে পুলিশ আছে, আবার কোনও স্থানে পুলিশ নাই। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্য কি এবং কারণ কি তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য সরকারের তরফ হইতে এই সম্বন্ধে যে অনেক অসাধারণ যুক্তির অবতারণা করা অতি সহজ, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। বর্তমানে যেখানে পুলিশ নাই, সেখানে পাহাড়িয়া ও সাঁওতালগণেরই বাস বেশি; এবং যেখানে দিকুদের বাস অধিক, সেখানে সরকারি পুলিশ আছে। যদি জনতাকে পুলিশের অধিকার দেওয়াই এরূপ করিবার উদ্দেশ্য, তবে উন্নত দিকুদিগকে উক্ত অধিকার না দিয়া, সাঁওতাল-পাহাড়িয়াদিগকে এই অধিকার দেওয়ার অর্থ বোধগম্য হয় না। যদি এক সময়ে লুণ্ঠনে পটু পাহাড়িয়া ও বিদ্রোহী সাঁওতালগণের মনস্তুষ্টির জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে দিকুদের শান্তিপ্রিয়তা ও রাজভক্তির প্রতিদানে তাহাদিগকে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কারণ কি তাহা বোধাতীত। আমার মনে হয়, ক্লীভল্যাণ্ড সাহেবের পাহাড়িয়া-শাসন-প্রণালীর অনুসরণেই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিংবা "দুষ্ট" দিকুদের মধ্যেই বেশি দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনায়, সরকারের এরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

উক্ত আইনসমূহ ছাড়া যে সকল সাধারণ আইন এই জেলায় প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-সম্বন্ধীয় আইনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজনীয়। উক্ত আইন অনুসারে দেবঘর, মধুপুর, দুমকা ও সাহেবগঞ্জে মিউনিসপ্যালিটি আছে এবং তাহাদের কার্য সম্বন্ধে সরকারি রিপোর্টেও প্রশংসা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই জেলায় ডিস্ট্রিক্টবোর্ড স্থাপিত হয় নাই। অন্যান্য জেলায় গ্রামবাসিগণ নির্বাচন করিয়া তাহাদের প্রতিনিধিগণকে জেলাবোর্ডে পাঠাইয়া থাকে, কারণ তাহাদের সে অধিকার আছে। উক্ত প্রতিনিধি-সভা গ্রাম্য-রাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির ব্যবস্থা করে ও রোড্-সেস্ প্রভৃতিতে যে টাকা আদায় হয়, সেই অর্থে উক্ত উন্নতির কার্য সম্পন্ন করাইয়া থাকে। উক্তরূপে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার এই জেলার কয়েকটি শহরের লোকদিগকে দেওয়া হইয়াছে; অথচ এই জেলার প্রকৃত অধিবাসী গ্রামের লোকদিগকে তাহা দেওয়া হয় নাই। শহরগুলিতে যে বিদেশ হইতে আগত অনেক মহাজনের বাস তাহা সকলেই জানেন। এই ধূর্ত মহাজনদিগের কবল হইতে নিরীহ গ্রামবাসী প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য, সরকার-বাহাদুর এই জেলার জন্য এক নূতন শাসন-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন; অথচ যে অধিকার সহরবাসী ধূর্ত মহাজন ও "সাঁওতালদের ঘৃণার্হ দিকু" নাগরিকগণকে দেওয়া হইয়াছে, সেই অধিকার হইতে কেন যে গ্রামবাসী এখনও বঞ্চিত, তাহার মীমাংসা করা অতীব কঠিন। বিশেষতঃ যখন দেখি যে, এই জেলার ডেপুটি-কমিশনার, যাহার উপর ডিস্ট্রিক্ট-জজ ও ডিস্ট্রিক্ট-কলেক্টরের দ্বিবিধ কর্তব্যের ভার এবং তদুপরি সেটেল্‌মেন্টের অভিভাবকত্বের

গুরুভার অর্পিত থাকা সত্ত্বেও তাহাকেই এই জেলার জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানের কর্তব্যের ভার দেওয়া হইয়াছে, তখন বাস্তবিকই ইহা কল্পনা করাও কঠিন হয় যে, কিরূপে একক ডেপুটি কমিশনারে-সাহেব এতগুলি গুরুভার বহনে সমর্থ এবং কিরূপেই বা তাহার দ্বারা এতগুলি কর্তব্য একত্রে সুচারুরূপ পালিত হইতেছে? গত বৎসরের ডিস্ট্রিক্টবোর্ড কমিটির রিপোর্টের আলোচনা হইতে ইহার অর্থ কিছু উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এই কমিটির মোট খরচ গত (১৯২৪-২৫) সালে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকারও অধিক এবং প্রতি বৎসর প্রায় এইরূপ খরচই হইয়া থাকে। রোড সেস্ প্রভৃতি হইতে এই কমিটির আয় মাত্র দুই লক্ষ টাকাও বৎসরে নহে। সরকারের নিকট হইতে বিশেষ অর্থের সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে বলিয়াই এই কমিটির কার্য এখনও চলিতেছে। সরকারের নিকট হইতে উক্ত সালে শিক্ষার জন্য ১,৬৮,২২৬ টাকা সাহায্য আসিয়াছিল এবং খরচ ১,৭৩,৪৬৬ টাকা হইয়াছিল; অর্থাৎ শিক্ষার জন্য এই কমিটি নিজ তহবিল হইতে মাত্র প্রায় ৫২৪০ টাকা খরচ করিয়াছে। আবার এই পাঁচ হাজার টাকা শিক্ষা-বিভাগের খরচের মধ্যে প্রায় সাড়ে চারি হাজার টাকা দামিনিকো-মহালের জন্য খরচ হয়। রাস্তা-ঘাট প্রভৃতির জন্য এই কমিটির প্রায় ২,১০,০০০ টাকা খরচ হয় এবং ইহার মধ্যে প্রায় ১,৩১,০০০ টাকা সরকার দিয়াছিলেন। প্রায় প্রতি বৎসর এই ভাবেই আয় ব্যয় হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, এই কমিটির নিজ আয় বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা এবং অফিস ইত্যাদির খরচ প্রায় ৪৬০০০ টাকা। বাকি যে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা এই কমিটির আয়, তাহা হইতে যে ১২৮৮½ মাইল রাস্তা আছে, তাহাই যদি ভালভাবে মেরামত করা হয়, তাহা হইলে প্রতি মাইলে কমপক্ষে ২৫০ টাকা খরচ করিলে বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা রাস্তা মেরামতের জন্যই খরচ করিতে হয়। অথচ কমিটির আয় মাত্র দেড়লক্ষ টাকা; কাজেই সরকার টাকা না দিলে, এই জেলার রাস্তাগুলি যাতায়াতের উপযোগী থাকিতে পারে না। অবশ্য সরকার কোন জেলাতেই এইভাবে বাৎসরিক খরচের জন্য টাকা দেন না বা সরকারি নিয়মও এরূপ নহে, সুতরাং সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করিলেই এই জেলাকমিটিকে রোড সেস্ প্রভৃতি প্রায় পাঁচ গুণ বাড়াইতে হইবে, অথবা কমিটিকে দেওলিয়া হইতে হইবে। রোড সেস্ পাঁচ গুণ বাড়িয়া গেলে এই জেলার দরিদ্র প্রজার দুঃখে যে পাষাণও গলিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কমিটি যখন এই ভাবেই আয়-ব্যয় করিয়া আসিতেছে, তখন কমিটির স্বায়ত্বশাসনের দায়িত্বজ্ঞান কতটুকু তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ, বর্তমানেও এই কমিটি আব্দার করিয়া সরকারের নিকট হইতে যে টাকা পাইতেছে, তাহাতে কেবলই বড় বড় নূতন রাস্তা তৈয়ার করান হইতেছে। সম্প্রতি একটি রাস্তা প্রায় একশত মাইল দীর্ঘ দুমকা হইতে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত তৈয়ার করান হইতেছে। এই রাস্তা সরকারি খাসমহলের ভিতর দিয়া হইতেছে এবং হুজুরদের মটরযোগে খাসমহাল দর্শনের অবশ্য সুবিধা হইবে, সাধারণের এই রাস্তায় কোন লাভই হইবে না। রাস্তার মেরামতে প্রতিবৎসর কি খরচ হইবে তাহার চিন্তা কমিটির আদৌ নাই। কমিটি যখন এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান বিহীন, তখন সরকারের উচিত, এই কমিটির আব্দার পূরণ না করিয়া কমিটিকে লোপ করিয়া দেওয়া; অবশ্য সরকার এরূপ করিতেও বোধ হয় নারাজ। কাজেই মনে হয়, দুমকা হইতে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত যে সুবৃহৎ রাস্তা হইতেছে, তাহার সহিত এই জেলার শাসন-পদ্ধতির কোন সম্বন্ধ আছে এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা সহসা কোন ডেপুটি-কমিশনার উপলব্ধি

করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং যত অর্থই ব্যয় হউক না কেন, রাস্তাটি করিতেই হইবে এবং সরকারের পোষ্য-অফিসারদের আব্দার রক্ষার জন্য সরকার অর্থ সাহায্য করিবেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যে শিক্ষা-বিভাগে আঠার লক্ষ লোকের জন্য এই কমিটি নিজ তহবিল হইতে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বাৎসরিক খরচ করে। স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার-প্রাপ্ত কোন কমিটি যদি শিক্ষা বিভাগে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া বাকি সমস্ত টাকার জন্য সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে সেই কমিটি সাধারণের নিকট হইতে কতটুকু সহানুভূতি পাইতে পারে, তাহা এই কমিটির অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও যে এই জেলার অধিকাংশ লোকই অনভিজ্ঞ তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এই জেলার দামিনিকো অর্থাৎ সরকারি-জমিদারি-মহালে রোড্ সেস নাই, সেখানে প্রজাদিগকেই রাস্তা মেরামত করিয়া দিতে হয়। এইরূপ মেরামত করিবার মজুরী যে রোড সেসের দেয় টাকা হইতে কম নহে তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য জমিদারিতে রোড্ সেস জারি করা হইয়াছে, কিন্তু খাসমহালে রোড্ সেস ধার্য করা হয় নাই। অবশ্য ইহার কারণ সাঁওতাল-পাহাড়িয়াগণের প্রতি অনুকম্পা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে সিংভূম-জেলার খাসমহালে "হো" "মুণ্ডারী" প্রভৃতির উপর রোড্ সেস্ ধার্য করিবার কোনও অর্থ থাকে না। আমার মনে হয়, যেহেতু এই কমিটির আয়-ব্যয়-সম্বন্ধে কোনও সামঞ্জস্য নাই, সেইজন্যই এখানকার খাসমহালের রাস্তাগুলির মেরামতের ভার নিরীহ প্রজাদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। সরকার অনুগ্রহ করিয়া যদ্যপি সিংভূমের কোল্হান্ প্রভৃতি খাসমহালে যেরূপ রোড্ সেস্ ধার্য করা হইয়াছে, সেইরূপ এই জেলার খাসমহলের করিয়া দেন, তাহা হইলে রাস্তা মেরামতের যে গুরুভার প্রজাদের উপর আছে, তাহা হইতে প্রজাগণ নিষ্কৃতিলাভ করে। উপযুক্ত আলোচনা হইতে পাঠক বুঝিবেন যে, এই জেলার রোড্-কমিটির প্রয়োজনীয়তা কি?

উপসংহার

এই স্থলে এই জেলার বর্তমান শাসন-পদ্ধতির ফলাফল বিচার করিবার পূর্বে বর্তমান-অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

বর্তমান লোকসংখ্যা মোট ১৭,৯৮,৬৩৯ জন; কিন্তু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ১৮,৮২,৭৮১ জন ছিল। দশ বৎসরের মধ্যে লোক সংখ্যা ৮৪,১৪২ জন কমিয়াছে। বর্তমানে দামিনিকোতে ৩,৭২,৬৮৭ জনের বাস এবং ইহাতে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া প্রভৃতি শতকরা ৮০ জন এবং বাকি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান। দামিনিকোর বাহিরে এই জেলায় ১৪,২৫,৯৪২ জন লোক আছে এবং তাহার মধ্যে শতকরা মাত্র ৪০ জন সাঁওতাল প্রভৃতি, বাকি দিকু। দেবঘর-সব্‌ডিভিসনে সাঁওতাল প্রভৃতি শতকরা ১৬½ জন, জামতাড়ায় প্রায় ৪১ জন, দুমকায় ৫২ জন, রাজমহলে ১০ জন, গোড্ডায় ২২½ জন এবং পাকুড়ে ৫৩ জন আছে, বাকি দিকু অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান্ ও খ্রিস্টান্। উক্ত হিসাবে দামিনিকো পরগণাকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। দুমকায় দামিনিকোতে শতকরা সাড়ে-আটাত্তর জন, গোড্ডায় ঊনয়াশি জন, রাজমহলে সাড়ে-পঁচাত্তর জন, ও পাকুড়ে সাড়ে-অষ্টয়াশি জন সাঁওতাল প্রভৃতির বাস। দেবঘর ও জামতাড়া-সব্‌ডিভিসনে "দামিনিকো" নাই। এই জেলায় সাঁওতাল প্রভৃতি শতকরা সাড়ে-একচল্লিশ জন, রাঁচিতে প্রায় ঊনচল্লিশ জন, এবং সিংভূমে প্রায় সাড়ে

তেতাল্লিশ জন আছে। কিন্তু যদি দামিনিকো বাদ দেওয়া যায় ;তবে শতকরা চৌত্রিশ জনের অধিক সাঁওতাল প্রভৃতি এই জেলায় নাই, বাকি হিন্দু মুসলমান্ ও খ্রিস্টান্ আছে। উক্ত তুলনা হইতে দেখা যায় যে, রাঁচি প্রভৃতি জেলা হইতে এখানে সাঁওতাল প্রভৃতি অনেক কম ; অথচ এখানকার আইন হইতে, বিশেষতঃ জমি-সম্বন্ধীয় আইন হইতে, উক্ত জেলাসমূহের আইন অনেক উন্নত।

এই জেলার হিন্দুর সংখ্যা মোট ৮,২৩,০৭৪ জন, মুসলমান মোট ১,৮০,৩৯৬ জন, খ্রিস্টান্ মোট ১১০০১ জন, সাঁওতাল প্রভৃতি মোট ৭,৮৩,৬৩১ জন এবং অন্যান্য জাতি ৫৩৩জন। এখানে হিন্দি-ভাষায় অর্থাৎ খোট্টায় ৭,৮৮,৩১০ জন কথা বলে, বাংলা ভাষায় ২,৪১,৪৫৫ জন কথা বলে, সাঁওতালী-ভাষায় ৬,৭০,৮৯৫ জন কথা বলে এবং মল্‌টো-ভাষায় অর্থাৎ পাহাড়িয়া-ভাষায় ৬০,৯২০ জন কথা বলে। ভারতীয় প্রায় সকল ভাষাতেই কথা বলে এমন অনেক লোক এখানে আছে। মাড়োয়ারী-ভাষায় এই জেলার ১৪৮০ জন কথা বলে এবং ইহারাই এই জেলায় পুঞ্জীকৃত ধনের অধিস্বামী ; অথচ এ দেশের অর্ধাশনক্লিষ্ট অধিবাসিগণের দুঃখে কাহারও সহানুভূতি নাই।

শিক্ষা-সম্বন্ধে এই জেলা অনেক পশ্চাৎপদ ; কারণ শতকরা মোটে প্রায় তিনজন শিক্ষিত। সমগ্র ভারতে শিক্ষিত শতকরা প্রায় এগার জনেরও বেশি ;তবে বিহারের অন্যান্য কয়েকটি জেলারও প্রায় এই অবস্থা। পূর্ণিয়া জেলায় শিক্ষিত শতকরা তিনজনের সামান্য বেশি, রাঁচিতে প্রায় সাড়ে-তিনজন, পলামুতে পৌণে-তিনজন, সিংভূমে প্রায় চারিজন এবং হাজারিবাগে শতকরা তিনজন মাত্র শিক্ষিত। অতএব শিক্ষার তুলনাতেও এই জেলার আইন উন্নত ও পরিবর্তিত হওয়া উচিত।

এই জেলার পরিমাণ-ফল ৫৪৬২ বর্গ-মাইল ;এখানে বড় সহর ৫টি ও ১০,১৫৬ টি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামসমূহে মোট ৩,৩১,৪৬৪টি বসত-বাটি আছে এবং গ্রামে মোট ১৭,৫৬,৫০১ জনের বাস। গ্রামবাসীরা প্রধানতঃ চাষের উপরই নির্ভর করে ; কিন্তু তাহাতেও আবার অনেক লোকের জমি আদৌ নাই। তাহারা চাষী-মজুর বা অন্যান্য পেশার লোক। প্রায় সতের লক্ষ লোক এই জেলায় সম্পূর্ণভাবে চাষের উপরই নির্ভর করে। অথচ এই জেলায় গত সেটেল্‌মেণ্টের হিসাবে ধানী-জমির পরিমাণ, ৬,৩১,৮৮৭ একর ও "বারী" জমির পরিমাণ ৬,৩৩,৪২১ একর ছিল। অতএব মোট আবাদী-জমির পরিমাণ ১২,৬৫,৩০৪ একর। এক একর জমি সাড়ে-সাত হাতের কাঠার প্রায় এক বিঘার সমান। বর্তমানে যে সেটেল্‌মেণ্ট চলিতেছে, তাহাতে আবাদী-জমির পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি হইবার আশা আছে। উক্ত হিসাবে প্রত্যেক লোকের গড়ে ধানী-জমি দেড়-সিকি একরের কিছু কম এবং "বারী" জমি দেড়-সিকি একরের কিঞ্চিৎ বেশি ; অর্থাৎ মোট পৌণে-এক একর আবাদী-জমি গড়ে প্রত্যেক লোকের এই জেলায় আছে ; সুতরাং দেশী হিসাবে গড়ে সাতকাঠা ধানী-জমি ও আট-কাঠা বারী-জমি আছে। উক্ত পনের কাঠায় যে ফসল হয়, তাহার পরিমাণ ম্যাক্‌ফার্‌সন্-সাহেবের প্রদত্ত হিসাবমতে ধরিলেও প্রত্যেক লোকগড়ে ধানী-জমি হইতে সাড়ে-সাত মণের অধিক ধান পায় না, এবং সামান্য ফসল বারীজমি হইতে পাইয়া থাকে। এই আয় হইতে চাষের খরচ বাদ যায়, খাজনা দিতে হয়, মহাজনের সুদ যোগাইতে হয়, লজ্জা-নিবারণের বস্ত্রাদি খরিদ করিতে হয় এবং উদ্বৃত্ত যাহা থাকে, তাহাতেই একজনকে সারা বৎসরের অন্নের সংস্থান করিতে হয়। অবশ্য উক্ত ফসলের

হিসাব—যে বৎসর ষোল-আনা ফসল হয়, সেই বৎসরের হিসাব। কাজেই অনাবৃষ্টি ও অল্প-বৃষ্টির বৎসরে প্রত্যেক লোক কত ফসল পায় তাহা অনায়াসেই অনুমেয়। পাঠক! কল্পনার সাহায্যে উক্ত হিসাব-দৃষ্টে এই জেলার অধিবাসিবৃন্দের দৈন্যতার চিত্র অঙ্কণ করিতে পারিবে কি? যদি পার এবং ভগবানের কৃপায় অনশনের তীব্র উত্তাপে কিংবা স্বার্থের তুষানলে তোমার হৃদয়ের সমবেদনার উৎস যদি শুষ্ক বা রুদ্ধ না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের দুঃখ-মোচনের জন্য পাগল না হইয়া থাকিতে পারিবে কি?

কৃষি ব্যতীত আরও দুই একটি পেশা এই জেলায় আছে; তাহার মধ্যে তাঁতি মোট ১৮,৮৩১ জন আছে ; কিন্তু বিদেশী ও মিলের কাপড়ের প্রচলন হওয়ায়, তাঁতিদের আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং তাহারা মজুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লাহা বা লাক্ষার চাষ এই জেলায় ৩২১৪৪ জনে করে ; কিন্তু এ বৎসর লাহার দম কম হওয়ায় ইহারা হাহাকার করিতেছে। বাংলায় যেমন পাটের দরের জন্য বিদেশীয়দের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, এই জেলায় লাহার চাষীদেরও সেই অবস্থা। ভূমিহীন চাষী-মজুর এই জেলায় মোট ২০,১৩৭ জন আছে। কৃষাণী-প্রথা প্রচলিত থাকায় ইহাদের অন্ন-সংস্থানের উপায় ছিল ; কিন্তু কৃষাণী হস্তান্তর বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, ইহাদের অবস্থা শোচনীয় হইবে এবং হয় ইহাদিগকে দিন-মজুরী করিতে হইবে, বা অধিক অর্থ-প্রাপ্তির আশায় কুলী হইয়া অন্যত্র যাইতে হইবে। কৃষাণী-প্রথা রহিত হইলে অল্প জমির মালিক অনেক-চাষীরও মজুর বা কুলী হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। যে মহাজনগণের অত্যাচারের কারণ উল্লেখ করিয়া সরকার-বাহাদুর এই জেলায় জমি-সম্বন্ধীয়-আইনে এত অধিক কড়াকড়ি করিতেছেন, তাহাদের সংখ্যা মাত্র ১১১৫ জন ; অর্থাৎ জন-সংখ্যার হিসাবে গড়ে ১৬১০ জন লোকের জন্য এই জেলায় মাত্র একজন মহাজন আছে। এই সকল মহাজনের মধ্যে অনেকেই চাল, ধান, প্রভৃতির দাদন দিয়া থাকে—নগদ টাকার কারবার অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া এই মহাজনগণের মধ্যেও কিছু লোক আছে, যাহারা অন্যের নিকট হইতে কর্জ করিয়াও মহাজনী করিয়া থাকে। অথচ সরকার একজন অত্যাচারীর দোহাই দিয়া, ষোলশত লোকের উন্নতির পথে বাধা দিতে কুণ্ঠিত নহেন। একজন মহাজন ষোলশত লোকের জমি ঠকাইয়া বা খরিদ করিয়া কোন প্রকারেই লইতে পারে না, বা একজন লোকের ধূর্ততায় ষোলশত লোক প্রবঞ্চিত হইতেই পারে না। তথাপি বর্তমান পদ্ধতিই প্রচলিত থাকিবে ; যেহেতু সরকারের মতে মহাজনগণের ধূর্ততার প্রশ্রয় দেওয়া ভয়ঙ্কর অনিষ্টজনক।

এই জেলায় মোট ৪,৮৬,৫৩৫টি ষাঁড়, বলদ ও চাষের মহিষ আছে। গাভী ও দুগ্ধ-প্রদানকারী মহিষ এখানে মোট মাত্র ৬৩,২৬২টি আছে ; গো-বৎস ও মহিষ-শাবকের সংখ্যা মোট ২,২৭,২১৯টি। গোধন (মহিষ সহিত) সর্বমোট এই জেলায় ১১,৬৩,২৬৫ সংখ্যক। এই গণনা ২০।২৫ বৎসর পূর্বের ; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ বর্তমানে সে সংখ্যার বিশেষ হ্রাস হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত হিসাব অনুসারে শতকরা পঁচিশটি বৃদ্ধ ও অসমর্থ গো-মহিষাদির সংখ্যা কমাইলে চাষের উপযোগী গরু ও মহিষ এই জেলায় ৩,৬৪,৪০১টির কমই থাকে। অথচ আবাদী-জমির পরিমাণ ২,৬৫,৩০৪ একর এই জেলায় থাকায় গড়ে প্রত্যেক জোড়া গো বা মহিষের উপর প্রায় সাড়ে-সাত একর জমি আবাদ করিবার ভার আছে। ইহার সহিত যদি এই জেলার গো-মহিষাদির শারীরিক অবস্থার কথা চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে এই জেলার

চাষের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বিশেষতঃ আঠার লক্ষ লোকের জন্য যেখানে মাত্র ৬৩,২৬২ টি দুগ্ধপ্রদান-কারী গো-মহিষাদি আছে সেখানে কত লোক যে বৎসরান্তেও দুগ্ধের আস্বাদ-গ্রহণে বঞ্চিত থাকে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

এই জেলার ধন, জন ও সম্পত্তির বিবরণ অতি সংক্ষেপে উপরে লিখিত হইল, এবং ইহার দ্বারাই এই জেলার অন্নাভাব যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহার আভাসও পাওয়া গেল। এক্ষণে প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির ফলাফলের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেই সর্বপ্রথমে লোকসংখ্যার যে ভয়ানক হ্রাস হইতেছে, তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হয়। তারপর দেখা যায় যে, অন্নাভাবে কুলী হইয়া অনেক লোক এই জেলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় কুলীর সংখ্যা ৩৯,৮৯৫ ছিল, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৫৯,০০৪ হইয়াছিল এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের গণনায় ৮৪,১৩৮ জন কুলী গণনা করা হইয়াছে। কাজেই কুলীর সংখ্যা উত্তরোত্তর ভীষণভাবে বৃদ্ধি হইতেছে। কুলীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া, মাননীয় ম্যাক্‌ফার্‌সন-সাহেব বলেন যে, সাঁওতালগণ এক স্থানে বহুদিন বাস করিতে চাহে না, মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্তন করাই তাহাদের স্বভাব"। কিন্তু যে সকল সাঁওতালকে পেটের দায়ে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চা-বাগানে এবং কয়লার খনিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের যোগাড় করিতে হইতেছে, এবং যাহারা এইরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অস্বাস্থ্যকর-স্থানে বাস করিবার জন্য অকালে মৃত্যুর কবলে পতিত হইতে বাধ্য হইতেছে, তাহারা ম্যাক্‌ফার্‌সন্-সাহেবের উক্ত উক্তির বিষয় শুনিলে কিরূপ মর্মাহত হইবে, তাহা কল্পনা করিলেও বিশেষ কষ্ট হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের গণনার রিপোর্টে কুলীর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্য কারণ দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট-লেখক-অফিসারের মতে অন্নাভাবই ইহার কারণ। যদি কারণ ইহাই হয়, তবে এই জেলার জমি-সম্বন্ধীয়-আইন, যাহার জন্য এই জেলায় অন্নাভাব হয়, তাহা যে কিরূপ ভীষণ অনর্থের মূল, তাহা অতি অল্প-বুদ্ধি লোকেরাও অনুমান করিতে সমর্থ। কুলীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও কুলী ভর্তি করিবার জন্য সরকারের পরিদর্শনাধীনে যে বহুসংখ্যক কুলী "ডিপো" এই জেলায় আছে তাহার বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে বাস্তবিকই এই প্রশ্ন মনে হয় যে, হয়ত কুলীর সংখ্যা-বৃদ্ধি এবং এই জেলার শাসন-পদ্ধতি সহিত যেন কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ, সাঁওতাল-বিধবাগণকে যখন তাহাদের মৃত-স্বামীর জমি হইতে বে-দখল করিয়া, উক্ত জমি অন্য পুরুষের সহিত বন্দোবস্ত করিবার নিয়ম আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বাস্তবিকই আশঙ্কা হয় যে, কুলীর সংখ্যা ও শাসন-পদ্ধতি এই দুইটির মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান শাসন-পদ্ধতির উপযোগিতা ও উপকারিতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমান শাসন-পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট। এই পদ্ধতির প্রথম উদ্দেশ্য "শাসক ও শাসিতের" মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা এবং সেই জন্যই মামলায় উকিল মোক্তারগণকে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া হয় না। এই জেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক উকিল মোক্তারকে ব্যবসা করিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, অধিক উকিল মোক্তার এবং অযথা অনেক আইন না থাকায়, মামলা বিচারের সময় আইনের কূট-তর্কে বৃথা সময় নষ্ট হয় না এবং নিরীহ

প্রজাদের বৃথা অর্থ ব্যয়ও হয় না। বিশেষতঃ বিচারকের সহিত বাদী, প্রতিবাদী ও আসামী প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এবং বিচারক প্রজার সহিত সুপরিচিত হইয়া যাওয়ায়, ন্যায়-বিচারের বড়ই সুবিধা হয়। তৃতীয়তঃ, এখানে নিয়মিত পুলিশ না থাকায় প্রজাগণ স্বয়ং পুলিশের কার্য করিতে করিতে নিজ নিজ ধন-সম্পত্তি রক্ষার বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া যায়। "উদ্দেশ্য কয়টি অতি মহান্ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু আদালতে গিয়া যখন দেখি যে, উকিল মোক্তার অনেকেই আছেন এবং অনেক মামলায় আইনের অতি সূক্ষ্ম বাক্-বিতণ্ডাও চলিতেছে। অধিকন্তু মামলা ব্যয়ের বাহুল্যে অনেক প্রজা নিরন্ন হইতেছে, তখন বুঝি নি যে—প্রথম উদ্দেশ্যটির পূর্তি কি ভাবে হইতেছে। আবার যখন দেখি যে—কোন মামলায় হাকিমের অনুগ্রহে উকিল মোক্তার খুব বাহবা করিতেছেন এবং কোন মামলায় হাকিম হয়ত প্রজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য অন্তরায়-স্বরূপ উকিল মোক্তারকে—মামলায় নিকটেও আসিতে দেন না, তখন বুদ্ধিভ্রম হইবার উপক্রম হয় এবং এই শাসন পদ্ধতির উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া এক প্রকার আত্মহারা হইতে হয়। এই জেলার জনসংখ্যা আঠার লক্ষ এবং বিচারকগণের সংখ্যা ২০। ২৫ এর অধিক হইবে না; আবার বিচারকগণকে অন্য জেলাতেও বদলি করা হয়; তখন বুঝি না—অতি অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত কয়েকটিমাত্র বিচারক কোন্ অসাধারণ শক্তি-বলে আঠার লক্ষ লোকের সহিত সুপরিচিত হইয়া সেটেল্‌মেন্ট-প্রদত্ত গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের অধিকারসমূহের অভিভাবকত্ব, তথা দেওয়ানি ও ফৌজদারি-বিচারাদি ত্রিবিধ কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইতেছেন? নিয়মিত পুলিশ কোথাও আছে এবং কোথাও নাই। কেন নাই, কে বলিবে? এ সকল যে অন্নাভাবক্লিষ্ট প্রজাদের মস্তিষ্কে ধারণা করাও অসম্ভব! বর্তমান শাসন-পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে এবং কালের প্রভাবে অনেক আইন, যাহা অন্যত্র প্রচলিত ছিল, তাহাও এখানে জারি করা হইয়াছে। সেই সকল আইনের কূটতর্কও হইতেছে, এবং সেই তর্ক শুনিয়া বিচারক বিচারও করিতেছেন। ফলে নিরীহ প্রজা উক্তরূপ আইন-চর্চার অভিনয়ের জন্য খরচের ভারে নিরন্ন হইতেছে; কিন্তু তাহার অদৃষ্টে বিচারকের সহিত পরিচিত হইয়া স্বকীয় দুঃখের কাহিনী বিচারকের শ্রীচরণে নিবেদন করিবার সুযোগ সকল মামলায় উপস্থিত হইতেছে না অথবা উকিল মোক্তারগণের উপর মামলার সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিয়া নিজে নিশ্চিন্তও হইতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থাতেও অন্যান্য স্থানে উকিল মোক্তারদিগের জন্য যে আইন জারি আছে, তাহা এই জেলায় জারি হইতেছে না। দেওয়ানি-বিচার-সম্বন্ধে হাজার টাকার উপর দাবির এক নিয়মে বিচার হয়, আবার হাজারের কম হইলে বিচার-পদ্ধতি অন্য নিয়মের অধীন। হাজারের কম দাবির জন্য ৬৩টি মাত্র নিয়ম আছে, এবং ইহা দ্বারাই বিচারের পদ্ধতি চালিত হইতেছে। ফলে কোন বিষয়ের জন্য বিচার-পদ্ধতি নির্দিষ্ট আইন আছে এবং কোন বিষয়ের জন্য আইন নাই। কাজেই দেখা যায় যে, এই জেলায় আইন আছে, কিন্তু যতগুলি প্রয়োজন, ততগুলি নাই। ইহার অভাব যে উকিল, মোক্তার বা প্রজাগণই বুঝিতেছে তাহা নহে—বিচারকগণও এই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন কারণে বা প্রয়োজন না হওয়ায় প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। আইনের এই অনিশ্চিত অবস্থায়, ন্যায়-বিচার এবং সকল মামলায় নিয়মিত বিচার যে হইতে পারে না, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই বেশ জানে। অথচ সরকার তথাপি বর্তমান আইন পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী।

বর্তমান শাসন-পদ্ধতির আর একটি বিশেষ গৌরবের স্থল আছে, তাহা এই জেলার "ভিলেজ্-কমিউনিটি" বা গ্রাম্যসম্প্রদায়। গ্রাম্য-বিষয়-সম্বন্ধে উক্ত সম্প্রদায় স্বায়ত্ত-শাসনের এক প্রধান অঙ্গস্বরূপ এবং এই গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের ভিত্তি এই জেলার প্রচলিত প্রথাসমূহ। এই জেলায় যে বর্তমানে ৮৯,৬৮৮ জন খাঁটি পাহাড়িয়া আছে, তাহাদের পূর্ব-পুরুষ চাষ করিতেই জানিত না; কাজেই বর্তমানে গ্রাম্য-সম্পত্তির ও জমির স্বত্ত্ব-উপস্বত্ত্বাদির অধিকারযুক্ত যে গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পাহাড়িয়াগণের মধ্যে আদৌ ছিল না। এমন কি, এই জেলায় যে খাঁটি সাঁওতাল ৬,৬৮,৮৪১ জন আছে, তাহাদের মধ্যে এক প্রকার গ্রাম্য-পঞ্চায়েত ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত গ্রাম্য সম্প্রদায় হইতে তাহা অনেক পৃথক ছিল। কারণ সাঁওতালদের গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের অধিকার সম্পূর্ণ ছিল এবং মাঝিখানে বিচারাদি হইত। তাহাদের "মোরে হোড়' বা পাঁচজন লইয়া পঞ্চায়েত হইত। এমন কি, সময়ে সময়ে গ্রামস্থ সকলকেই বিচারের অধিকার দেওয়া হইত; কিন্তু এক্ষণে গ্রাম্য-সম্প্রদায় অর্থে গ্রাম-সভা নহে এবং উক্ত সম্প্রদায়ের অধিকার-সমূহের রক্ষার ভারও গ্রাম্য-সভার উপরি অর্পিত নহে। কাজেই সাঁওতালদিগের প্রথার উপর নির্ভর করিয়াও বর্তমান গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নাই। বিশেষতঃ, বর্তমান গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের গ্রাম্য-সম্পত্তিতে যে সাম্প্রদায়িক অধিকার আছে, তাহা এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমানগণেরও প্রথা নহে। ইসলাম ও আর্য-সভ্যতা ব্যক্তিগত অধিকারের অনুকূল—সাম্প্রদায়িক-অধিকারের অনুকূল নহে বরং প্রতিকূল। এই গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক-অধিকার, জগতে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক-অধিকার-স্থাপনের চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব হইতে করা হইতেছে। অথচ প্রচলিত প্রথার দোহাই দিয়া এই বর্তমান গ্রাম্য-সম্প্রদায়সমূহ প্রত্যেক গ্রামেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অধিকন্তু পাহাড়িয়া ও সাঁওতালদিগের মধ্যে জাতিগত ও ধর্মগত বিবিধ প্রভেদ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে একই প্রকার সাম্প্রদায়িক-অধিকার-বিশিষ্ট গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি উভয়ের জন্যই করা হইয়াছে। অত্যাশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত প্রকার গ্রাম্য-সম্প্রদায়সমূহ হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্যও করা হইয়াছে। পুনরায় যখন দেখি যে, গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের অধিকার সমূহের রক্ষার ভার প্রধান বা মোস্তাজীরগণের উপর অর্পিত এবং উক্ত প্রধান বা মোস্তাজীর গ্রামবাসীর সম্পত্তি ক্রমে স্বয়ং সরকার-বাহাদুরের অফিসার দ্বারা বাহাল ও বরখাস্ত হয়, তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাঁওতাল-পরগণার গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের অর্থ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি? উক্ত ভাবে গঠিত গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে মালিকগণের অধিকার খর্ব করা হইয়াছে এবং উক্ত অধিকারসমূহ গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের অধীনস্থ না করিয়া, প্রকৃতপক্ষে সরকারের জনৈক সেবকের অধীনস্থ করা হইয়াছে। অতএব উক্ত গ্রাম্য-সম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, তাহা পাঠক! একটু চিন্তা করিয়া স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টা কর এবং ইহা স্বায়ত্ত-শাসনের সহিত কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখ।

উক্তরূপ শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন করাইবার জন্য আন্দোলন বহু বৎসর যাবৎ চলিয়া আসিতেছে এবং এই বিষয়ে লাটসাহেবের শেষ জবাব এই যে, এই জেলার শাসন-পদ্ধতি অতি সুপ্রতিষ্ঠিত; কাজেই ইহার পরিবর্তন হইতে পারে না। কিন্তু যখন দেখি যে, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেও প্রয়োজনবশে প্রচলিত খাজনা-আদায়-সম্বন্ধীয় নিয়মের পরিবর্তন করিবার জন্য, সাত নম্বর রেগুলেশন উক্ত মাসেই জারি করা হইয়াছে, তখন

আশা হয় যে, হয়ত প্রয়োজন হইলে সরকার-বাহাদুরকে এই জেলার শাসন-পদ্ধতিতে আরও অনেক পরিবর্তন করিতে হইবে। তবে সম্প্রতি বাকি-খাজনায় সমস্ত জোত উচ্ছেদের যে নিয়মটি প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখি যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পরেও অনেক আইনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; এবং বর্তমান সেটেল্‌মেণ্টে যখন দুইবার নিয়ম পরিবর্তিত হইতে দেখি, তখন মনে হয় যে, এই জেলার শাসন-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব ও অনেক পরিবর্তন-সাপেক্ষ। বিশেষতঃ, এই পরিবর্তনশীল-জগতে স্বয়ং স্রষ্টার সৃষ্টিতেই যখন পরিবর্তন ও উৎকর্ষ-সাধনের পূর্ণ প্রয়াস দেখিতে পাই, তখন এই জেলার "সুপ্রতিষ্ঠিত" শাসন-পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যাইতে পারে না; এরূপ বলা একটা বিরাট অত্যুক্তিমাত্র।

শাসন-পদ্ধতি এবং দেশের উন্নতি উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; কিন্তু বর্তমান শাসন-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা স্বত্ত্বেও এই জেলায় অতি দীন-দরিদ্র বহু প্রজাগণের বাস। তাহাদের অন্নাভাব এত ভয়ঙ্কর যে, তাহারা মনুষ্যের অখাদ্য "মহুয়া" উদরস্থ করিয়া বৎসরের কয়েক মাসই অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়; নতুবা অন্নাভাবে প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অভাবের তাড়নায় ইহারা প্রায় নগ্ন-অবস্থায় থাকে এবং শীতের প্রকোপ হইতে শরীর রক্ষার্থে রাশীকৃত "কোদো" নামক ঘাসের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শীতকালের দীর্ঘ রাত্রিগুলি যাপন করিয়া থাকে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, এই জেলার দুঃখিনী মাতা খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে ক্রন্দনশীল ক্ষুৎপীড়িত শিশুর মুখে অশ্বত্থ-বৃক্ষের ফলগুলি তুলিয়া ধরিতে দ্বিধা বোধ করে নাই এবং খাদ্য-প্রাপ্তির সুখে যখন দেখিয়াছি যে শিশুর ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি— এই জেলার দীনতার সীমা কোথায়? এত দরিদ্র হইলেও এই জেলা প্রাচীনকাল হইতে দেবাদিদেব শঙ্করের কৃপায় আর্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছে, এবং ইহার অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজমহল-নগরীতে এখনও তাহার অতীত মহান গৌরবের বহু চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। তথাপি কেন যে এই জেলা শাসকদিগের মতে এখনও অনেক অনুন্নত, তাহা অতি আক্ষেপের বিষয়! বিগত ষোড়শ-শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চরণরেণু-স্পর্শে দেবঘর পবিত্র হইয়াছিল এবং সেই সময়ে এই জেলার অধিবাসিবৃন্দ সুখী ছিল বলিয়া তাহার কোমল-হৃদয়ে বোধ হয় বিশেষ আঘাত লাগে নাই। কিন্তু গত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর মহাত্মা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী এই দেবঘরে যখন শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং তাহার শ্রীচরণে এই জেলার দুঃখের কাহিনি নিবেদন করা হইয়াছিল, তখন মর্মাহত হইয়া মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন ঃ "ত্যাগ কর ও কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত হও—তবেই এই জেলার শাসন-পদ্ধতি পরিবর্তিত করাইতে পারিবে"। উক্ত মহাপুরুষের এই মহতীবাণীর অনুসরণ করিয়া এই জেলার অধিবাসিগণ অগ্রসর হইবে কি?

THE SANTHAL PERGUNNAHS

In the begining on the year 1855 he Santhal Pergunnahs were non-existent and the Santhals to the world unknown. The tract of country now so called was then divided between the districts of Bhaugulpore, Berhanpore and Beerbhoom. The Damun-i koh, a Government khas mehal, more thickly populated with Santhals than any other part of the Pergunnahs, was under the fiscal and general management of Mr. Pontet subordinate to the Commissioner of Bhaugulpore, and in criminal matters in the jurisdiction of the Magistrate of Bhaugulpore. Thannahs were attached to Bhaugulpore, to Berhampore and to Beerbhoom.

Under the old system of management there was in all this extent of country, only one resident Magistrate at Deoghur, a station at the extreme North West boundary of the then Beerbhoom District and the great mass of the people had to go to Bhaugulpore, Beerbhoom or Aurungabad (a Sub-Division of Berhampore) for justice. It is true that Mr. Pontet during his cold weather tour through the Damun-i-koh did something to redress petty grievances between Santhal and Santhal, settling disputes about land, division of property, & c., but he was powerless to redress the wrongs of the Santhals against more powerful oppression and so they were left to the Bhaugulpore Courts for what they could get.

The distance the people had to go to Court, though an inconvenience, was not the material objection to their attending. But what was a semi-savage Santhal to do when he reached the Court ? He found a Magistrate surrounded by an almost impregnable barrier of Amlah, and Court scrupulously guarded from gratuitous entry by a horde of Peons and Burkundazes; and a set of Mooktears, representing the only medium through which he could hope for a hearing, who wish to sell him at any stage of his case if it proved worth their while; or who would decline to act for him altogether if he had not the wherewithal to pay his way– a way paved every inch with what to the poorer class is gold.

While the Santhal saw justice in the shape of Magistrate so far off and so terribly difficult of aecess, he found justice nearer home in the shape of the Darogahs and Thannah police, the authorized agents of the distant Magistrate, but found it only to find it his bane, and to learn that his first object was to avoid not seek it.

What wonder then that the Santhal, cut off from the fountain head of redress and avoiding as a pestilence the muddy polluted sources from it which reached him, should fall an easy victim to the cunning and oppression of the Bengalee Mahajun. He saw his crops, his cattle, even

himself and family appropriated for a debt which ten times paid remained an incubus upon him still. He found his simple memorandum kept in knots upon a piece of string no match against the Mahajun's arithmetic supported by pen, ink and paper, and if he comprehended the gross injustice of the case he gained but little in an argument which was concluded by the Mahajun's peons summarily carrying off whatever they could lay their hands on, or by as effectual a process performed through the more legal but perhaps equally unjust agency of a Moousiff's decree.

The Santhal is patient enough, and to a regretful extent phlegmatic, but the worm will turn at last. For years he bore the oppression that robbed him of the produce of his labor, that took him and his family captives for debt and worked them in slavery, that respected not the honor of his wife and daughters, and then he rose against the tyranny and became a rebel. It is said that the Santhals gave notice to the Commissioner and Magistrate of Bhaugulpore that unless their grievances were redressed they would rise ; but be that as it may it came like a thunder-clap upon those who heard of it, that in the centre of Bengal there was rebellion; and that a race of people almost unheard, and certainly unthought of, were in arms, murdering and running riot thorough the land.

Kanoo and Seedoo, two brothers with two other less notorious brothers, became the leaders of this insurrection. They professed to act upon divine inspiration and were dubbed soobahs. They appointed their Naibs, Darogahs and other officers and proclaimed themselves masters of the country. So little was known of them, so well had they combined ans so unanimous was the feeling among them, that the rebellion broke out and spread over the whole of the country, now known as the Santhal Pergunnahs, and beyond into Monghyr and other parts of Bhaugulpore and Beerbhoom, before one note of preparation had reached the ears of any one not in the secret.

Their first act was to kill Darogah of a Thannah near Rajmahal, and with the Darogah fell his Burkundazes. If report speaks truly the Darogh merited his end and the Santhals only took what to them was a legitimate revenge for dishonor brought upon their women and oppression done to men and women alike. After the Darogah fell mahajuns, who closed by their deaths long standing accounts that had left the Santhal life only, and then mad with long suppressed passions and the thirst of the blood they had tasted the Santhals sought out and killed every one connected, as they thought, with their oppressors.

The first report that reached the Europeans in the neighbourhood was that large bands of Santhals were marching about the country,

killing and plundering, that they performed pooja in their villages, putting up a trophy consisting of sheep skin, a bhursa (a battle axe) a drum– bow and arrow and fife and then leaving the villages to take care of themselves went forth on their invasion; that a Darogah had been murdered and all villages not Santhal plundered. This report was at first too vague and improbable to be relied on, but before those who listened to it dubiously had satisfied themselves whether a Santhal was a particular caste of Hindoo or some sort of animal, there came corroboration in the shape of flying villagers, carrying with them all that they could move, pushing in frantic haste towards the Ganges to put the river between themselves and the rebels, ere long up to the station of Rajmahal and everywhere above the line of Railway from Rampore Haut to Colgong there came the ominous beating of the digdiggi or Santhal drum.

The Magistrate of Bhagulpore and Mr. Pontet proceeded at once to Rajmahal where, taking up their quarters at the house of the District Engineer, they waited the arrival of troops. Rajmahal was threatened with an attack and rewards offered by the Santhals for the head of Mr. Pontet, who had heretofore been styled by them their Raja, and other heads of less importance. The District Engineer with a few other Railway Engineers who fell back upon Rajmahal when their own houses had been burnt and plundered held the Sungidelan, which with the Ganges on one side and two large swivel guns commanding the front, defied the rebels until troops arrived, and the rewards for the heads of Mr. Pontet and others were never disburesd.

On intimation reaching Bhaugulpore of the outbreak a detachment of the Hill Rangers was sent to Colgong. The commanding officer however could not march without the civil authority being in attendance– and consequently a party of 9 or 10 Railway officers went out to meet the Santhals taking with them a large number of Burkundauzes and peons. The Santhals gave fight; the Burkundazes whose tight girt loins and lofty threats had promised gallant conduct ran away; and serimmage took place, in which 3 of the Europeans were wounded and 2 of their horses killed on one side while the rebels lost 8 or 9 killed and wounded, and from which the Europeans escaped with their lives, only because the Santhals did not sufficiently speedily recover the check to follow them.

Two days after this the Hill Rangers came to the scen of this scrimmage, but only to be beaten off the field with the loss of a Serjeant Major and 10 or 12 sepoys and a European volunteer who accompanied them. Immediately after this the detachment returned to Bhaugulpore

leaving the rebels masters of the position. For a short time the Santhans continued in unchecked possession of the country from Colgong to Pulsa on the Ganges side and nearly to Beerbhoom and Raneegunge to the West. The first check they received was from Berhampore whence, some Companies of the 7th N.I. under Mr. Toogood, the Magistrate, made a forced march on elephants, and reaching Mohespore, near Pulsa unexpectedly came upon the rebels in a tank and inficted a severe loss on them, taking nearly all their plunder.

Troops then poured in from all sides and the rebels Hed in every direction never to rally again. Brigadier Loyd, who commanded, on one occasion hemmed the rebels in and could have inflicted the most disastrous loss upon them; but whether influenced by merciful orders from Government or inspired by the same influence that prompted him in the more recent emergency at Dinapore, he certainly allowed the opportunity to pass and the rebels essaped by driblets–to be hunted like dogs and starve or die of disease until reduced to half their original number to subjection.

A terrible vengeance attended the Santhal for his-rebellion–his house was burnt, his store of grain burnt in his house or lundered, the crops on his land destroyed or lost for want of attention to them, his flocks and herds scattered, seized, sold and lundered, and himself become an attennuated, half starved, miserable wretch, with only half family left to him.

At this moment a Santhal beggar is unknown, but after the rebellion hundreds in every direetion sought charity where it was to be found, and it is only now they are recovering the shock received from conflict with a Government of whose power and resources they never dreamt.

But with all this it is questionable whether the Santhal has not benefited by the course he took. He fought for justice, and although the cost at the time was terrible and unthought of he has got it. The difficulties of seeking justice are swept away, he finds a Court where Amlahs only exist, as Amlahs should, to be machines obeying the will of the authority they serve, a Court free of costs, presided over by a Hakim who is accessible at all hours; and where every man pleads his own case and stands equal before his adversary whatever their relative position may be. The police who erstwhile-persecuted him are swept away, and in his village the Santhal is represented by his own race instead of some grasping harpy whose sympathies are with the Santhal's foe and profit rather than with justice.

On the country becoming quiet after the rebellion the Santhal Pergunuahs became a separate disrict,–extra regulation. Divided into 5 Divisions each under an Assistant Commissioner with a Sub-Assitant,

the whole was made subordinate to a Deputy Commissioner, who in his turn was subordinate to the Commissioner of the Bhaugulpore Division as Commissioner of the Santhal Pergunnahs. This arrangement still exists.

The Assistant Commissioners have generally full powers of a Magistrate and in civil matters try suits up to, 1,000 Rs. in value. The Deputy Commissioner has the some powers but hears apeals from the orders of the Assistants, and the Commissioner has the same power in civil suits, but in criminal cases his powers extend to transportation for life. All capital sentences are referred to the Lieutenant-Governor and the Sudder. During the time of the late Lieutenant Governor capital sentence was passed by him without reference, but the present Lieutenant Governor, alter a little sparring with the Sudder on the subject, maintained his point that the executive was not paramount in judicial maters and that the subject of life and death was one for the consideration of the highest Criminal Court of the country and so the Sudder determines all sentences of death.

It may appear singular that the Commissioner of the Santhal Pergunnahs with powers in criminal matters so little restricted, should not have higher powers in civil matters. It cannot be that the liberty of a fellow creature for life is valued at less than any sum of money, even above a thousand Rupees, and yet so it would appear, and the anomaly is still more striking when it is remembered that the Commissioner has been a Judge, and was probably promoted for his merit. That the limitation to suits of 1,000 Rs. exists as an evil in the system of the Santhal `Pergunnahs that should be done away with is a question without doubt. Its existence causes confusion in jurisdiction between two systems as wide as under as the poles, and leads, or indeed opens a road, to discovery and evasion of justice. It may be that an Assistant Commissioner has not sufficient experience to decide civil cases with all the acumen of an experienced Judge,but there is a speedy and inexpensive appeal to a Commissioner who may be assumed to be a tolerable judge, and the result of such appeals will shew that of the orders passed in cases in which the evidence is taken direct by the hakim in is own language, on a judgment formed by him to the best of his ability and consientiously, withou any interference from the pen or tongue of a Sherishtadar or Amlah, such a proportion are upheld as would commpare very creditably with the appeal returns of the Judges, Sudder Ameens and Moonsiffs of the Regulation Provinces. Another point to be considered is whether if the officers of the Santhal Pergunnahs are not allowed to try suits beyond 1,000 Rs. they should have the power of trying those below. The value of a case does not

make it more difficult of decision. A case for 50 Rs. may possible exhibit as much intricacy, and call for as much judgment, as one for Rs. 50,000, and above all it is to be rememberd that a suit of Rs. 100 may be of as much vital importance to Ram Ghose a poor Gwala as one of lakhs would be to Ramkishto Roy the proprietor of an estate as large as an English county. Why then should the wealthy litigant cescape to a Court where his money cannot fail to aid him and where the poorer man cannot effectually follow, instead of being made subject to the jurisdiction of a Court which is held to be good enough for his lowlier brethren.

On the establishment of this system the Moonsiffs' Courts were at once abolished, but the Thannah Police maintaned. But Mr. Yule, the present Commissioner, whose heart has been in the perfection of the system, knowing the police to be the obstacle to the attainment of justice and a thorough understanding between the hakim and the people direct, knowing them, as all do who have any experience on the subject, to be a body whose object it is to keep the authorities and the people equally in the dark, whose retainment would nullify all the good effects to be attained from a purified Court, met the dificutly as Alexander settled the Gordian kont and cut them with a stroke– not of his sword but his pen. In May 1858 the Thannah Police were abolished. The village chowkedars only being retained, the Darogahs, Mohurrirs, Jemadars, Pharidars and Burkundazes were discharged and the people were left to be their own guardians. It was a bold step to take in an age when the Thannah police is looked upon as an institution of the country and part and parcel of it; when every body, admitting it to be a curse, thinks it a necessary one, and can devise no means for improving or doing without it for it ; for it was one well matured it was one in which Mr. Yule had the fullest support of his subordinates and it was one was one which success has guaranteed to have been prudent and far-seeing beyond the anticipation of the most sanguine well-wishers.

It may be said that if desirable in the Santhal Pergunnahs the abolitin of the police must be equally to be desired elsewhere, and we think that few who know the police and have the opportunity of judging how successful the no-police system proves, would argue that a more extended trial of it is not advisable. It may be said that a police so severely punished for their opression by the Santhals and so closely watched by European officers, in the ratio of I officer to 3 Thannahs, might lave been expected to keep in bounds; but one instance of many will suffice to show how little the warning of a Santhal's revenge and the close supervision of an active European

officer tended to check the rapacity and peccancy of the police, and this instance we have from one well aequainted with the facts.

A Santhal under trial for complicity in the rebellion escaped from jail, and a reward of Rs. 100 was offered for his capture. An Engineer of the E.I. Railway who arrested several of the active members, and murderers concerned in the rebellion, procured information of the fugitive's place of hiding and arrested him. A police Jemadar thirsting for the reward was also hot in pursuit, but being on the wrong scent went to the fugitive's village to arrest him at the very time that he was safely in keeping in the Engineer's camp. The family of the Santhal unhappily were unaware that the capture had ben made, and when the question came as to his place of concealment they met it with evasion or silence. It would not be seem the pages of this *Review* to say *what* the Jemadar did to the unhappy women he found in that familly; but let the reader imagine every torture that the ingenuity of a demon could suggest– every insult to woman that lust could prompt– let him picture to himself bleeding, fainting women led off to incarceration, and further, torture and insult in the Pharee—and he will have before him a correct although a faint representation of the guilty scene of which that Jemadar proved the excellence of the system of which he was a worthy though humble representative, The end of this drama is pleasanter in its character. The Engineer on his own authority and contrary to law, sent down his Burkundazes to the police station and released the captives, (one of whom however was *never found*) provided them with funds, and sent them with their witnesses and a letter describing the occurrence to the Assistant Commissioner of the Division, and the Jemadar was sortly afterwards sentenced by the Commissioner to 14 years imprisonment with labor in irons.

Surely a police the members of which are such as this Jemadar are better swept away from the land; and who will venture to say that this Jemadar checked fortuitously in his career was the solitary spot on the sun's disc, the very rare exception to the rule ? Does not experience tend contrariwise to prove that oppression in a greater or lesser degree is the rule ?

That the abolition of the police is a boon to the people cannot be denied, that it makes the duties of the Magistrate more satis-factory to himself, every officer who has tried it can say, and that without the Police the duties they were paid to perform are better performed by an unpaid community we will try to shew.

First then as to the repression of erime; has crime increased in those districts where the non-police system has been introuced since the

abolition of the police or not ? We have no general statistics to shew this result as far as concerns the whole of the Santhal Pergunnahs, but we have (thanks to the eourtesy of friends who are in a position to give them) statistics of portions of the Santhal Pergunnass, and we may fairly infer that what is ture for large tract of the country is not very incorrect for all.

The statistics we have then shew that during the years 1856, 57 and 58, during which time the Police existed, taking an average of 4 murders and 43 dacoities, there were only 3 murders and 18 dacoities in 1859, when the Police had been abolished, and that the year just passed of 1860 exhibits a further decrease in both; they also shew that a similar decrease has appeared in thefts with violence, wounding, and extensive thefts and burglaries.

So far then, as well as figures can guideus it is proved that the people are capable of self-protection. We will next consider whether crime is better reported now than during the time of the Police.

On looking up our statistics again we find that in 1856 and 1857 to an average of $41\frac{1}{2}$ dacoities the average of burglaries was 90, of thefts 131, and of other offences 94, or in other words, and taking rougher figures, there were 2 burglaries, 3 thefts, and two other offences to every dacoity. Now does this ratio seem probable, and viewing it in another light is it possible that among a people toelrably well governed, and with anything approaching to redress, there should be 6 felonies to 2 cases of personal injury ? In looking at the crimes reported in 1859 we find a very different result, the burglaries being as 15 to 1, the thefts as 21 to l, and other offences 54 to 1. The felonies being 3 to 4 cases of personal injury.

We have not included the year 1858 in this comparison, because the police were only abolished in May of that year, and the system of no-police in its transition was not so perfected as subsequent experience has made it.

From this comparison we must then draw the inference that the hakim is now made acquainted with much that was heretofore suppressed, and it is reasonable that this should be so. For under the present system while suppression of the report of crime is punished every inducement is held out to the heads of villages and Chowkedars to make a speedy report of every occurrence. The Chowkedar who comes to Court for this purpose is not detained, the occurence is noted down by the hakim as it is described, and in trifling cases the prosecutors and heads of villages are left to take the necessary steps to bring the offender to justice. In cases brought to trial the prosecutor with his withneses, defendants and everything required come up a

complete case, and on their arrival are heard and dismissed without annoyance, detention or the most trifling expense.

In serious cases immediately on the occurrence being reported the hakim goes to the spot and makes the necessary local enquiry, but the enquiry is judiciously carried out, the villagers are not harassed to supply the hakim or a horde of myrmidons, no pressure is made to extort a false representation of facts, and the people, even if the case does not end is detection of the criminals, have not sustained an additional loss by a fruitless enquiry.

Contrast this with the conduct of a Darogah. On hearing of any occurrence, accompanied by a troop of Burkundazes and Mussaibs, Darogahjee lolling in his palkee is conveyed to the village where the occurrence happened, there, domiciled in the best house to be found, the great man rests his wearied limbs and hears with suffieient non-chalance the particulars of the case which he, a worthy scion of the Bow Street detective, has come to investigate. Then the wants of this imperial Nemesis must be attended to and, the capacity and delicacy of his capacious maw being considered, his exhausted system must be refreshed before he enters upon the business before him. His myrmidons meantime permeate the village, and the few inhabitants who have remained to face the invasive force give up their substance to feed the shadows of justice.

After some time the meal has been discussed and its contingent chillum has assisted digestion– and then the case is heard in earnest. It is true that no clue exists to the offenders, they having perhaps got off unseen leaving no sign behind, and the property stolen is in all probability of such a nature as to defy recognition, but what of this? There are several Bourees, Dhuns and other low caste budmashes in the neighbourhood and will not they do to make a satisfactory chellaun to the Magistrate ? What was easier in times happily passed away than to get a confessing prisoner ? Dhuns no more than Brahmins can stand a pressure of 50 pounds on the square inch when that square inch consists of the epidermis of the Dhun's chest, and the pressure falls upon his heart and crushes life out of his miserable low caste frame– and under some such pressure probably a confessing prisoner is procured—some property is found where the prisoner is led to point it out—and *voila* a good case.

But not here ends the infliction on the villagers, there are fees to pay at every stage of the enquiry, fees to avoid the search of this man's house, fees to prevent the arrest of that man's wife, fees to buy immunity from every kind of oppression, which are heavier and easier of realization in proportion to the respectability of the victims.

What wonder then that the villagers only reported to the Police such cases as must leak out and became known, and of a consequence that dacoities and murders were reported while burglaries and minor offences were not. But another reason tends to reconcile this discrepancy between dacoites and thefts, and this is that every Darogah naturally considers his characeter for vigilance at stake in the result of the cases he investigates. To report the occurrenee of 50 thefts and only bring five to trial would in his opinion be to exhibit his own worthlessness, and infallibly prevent his rising to the 1st grade or mar the accomplishment of some dear dream of his heart (if a Darogha has such an organ). And cohesquently the report of occurrences has to be ruled by the number of cases which by hook or crook he can concoct for the Magistrate.

It appears then that under the Police system there are two obstructions to the Magistrate's having crime fully reported, the greater that arising from the dread of the people reporting to the police in the first instance—the other that which occurs from the police reporting select cases only. But in the no-police system the latter of these has been, as coetaneous with the police, abolished with them– and the former has been, as we have shewn, removed by conciliatory and patient practice.

The only other question that remains is whether the necessary local enquiry in petty cases, the chellaun of prisoners and parties required, the production of unelaimed property and other duties of the police, are performed as well by the people as by the Darogah and his assistants, and this question may be briefly replied to by the assertion that they are better performed. The heads of villages conduct the search of houses for stolen property and the arrest of defendants with intelligence and moderation : they despatch parties required and chellaun unclaimed property with regularity and promptitude, and they conduct the duties of a Darogah generally with more effect and infinitely more integrity than was the case under the old *regime*. In one department the improvement is very marked—this is the production in Court of any well to do man who is wanted against his will. The difficulties thrown in the way of the arrest of such a man by a Darogah are legion. As long as the desiree has the funds, he can purchase returns to the Magistrate's Perwaunahs in which the Darogah laments his inability to catch the desiree who has gone to Benares, to Cabul, to Jericho, or any where else out of the Darogh's Thannah, and is consequently not to be found in spite of all the energetic exertions made for his capture by the Magistrate's slave and servant to command.

Of course there are a few exceptions to the rule, and among the

heads of the community there are rascals just as among Darogahs there are honest men—but the exceptions are rare. The offenders are not sufficiently practised to err in safety and the hakim is too much master, of the country in which his jurisdiction exists for wilful breach of the law or failure of the trust imposed to go unpunished.

As an instance in point of the service rendered by the people being superior to that of the paid police we may mention the capture and utter extinction of a gang of Paharea dacoits who had for nearly four years infested the country lying between the Tecoor and Phooljooree Hills in the South Western portion of Santhal Pergunnahs, These dacoits numbered some 30 to 40 Pahareas, men and women; they lived in the neighbourhood of Phooljooree and when pushed took refuse in that hill and its neighbour the Mahra hill, where pursuit was next to impossible. They had an almost equally inaccessible fastness in the Tecoor Hill and played between one and the other to the utter confusion of the police. These dacoits committed between 1855 and 1858 about 80 dacoities and gang robberies, two or three attended with arson and five or six murders, and during the existence of the police only stray members of the gang were caught. But in July 1858 after the police had been abolished two months the people captured the leader and several of the gangs, and drove the rest out of that part of the country so completely that have never revived.

So far the system conferred a double benefit on the people– it made Amla subordinate to the will of hakim and it swept the police away altogether. But Mr.Yule whose conception, it is only fair to say, the system is, and to whom its success is mainly attributable, went yet further in the course of amelioration of the condition of those under his rule.

A great step towards bettering the condition and raising the social standard of the lower orders was gained when Kumeoti was abolished formally. It is a subject of regret, and has been made matter for discussion in the House of Parliament, that in the Regulations there should exist no sifficient check on the traffic in and keeping of slaves. The latest act that has reference to the subject is Act V. of 1843, and this is purely a negative one—it provides no penelty for the sale, or hire, or other connection with slaves and slavery but it gives the slave the privileges of a free man in Courts of justice—It rules that an injury done to him shall be treated in the same manner as though it had been done to a free man–and it ignores the right of the master in his slave in any of its Courts.

But in the Santhal Pergunnahs the Kumeoti system was actively discountenaced. The bonds by which they were bound were held

invalid and every one filed in Court was cancelled and declared null and void. In a short time Kumeoti died out and free labour with fair wages was substituted.

It may be as well to go more fully into the Kumeoti question to prove how just and righteous was the step that put a stop to it. A Kumea was a man in needy circumstances who bound himself and family down by a bond to serve until he paid the sum due upon this instrument. Perhaps a poor man had occasion for a few rupees to marry his daughter, he went to the mahajun and asked for the loan, the mahajun gave the money 10 to 15 rupees, but like Shylock insisted upon flesh in his bond, and the needy borrower with the wonted apathy of his race, sold himself and family for the few pieces of silver that would be gone beyond redemption in a few days. From that time he was a slave, neither he nor his family knew what liberty was—they could not cultivate or improve their condition by their own industry for that industry was pledged to another who claimed it whenever it was necessary to him and could have been of service to them, and this labor was taken as interest for the money due upon the bond. It is true that the Kumea was fed when he worked—but who was to feed him when he did not, and whence was to come the principal due to his owner, the payment of which only could release him from his bondage.

As a matter of course the Kumea, not having cultivation or any certain means of livelihood, supported himself by theft when not in the actual employ of his owner, and theft was not sufficiently, profitable to a man who stole for food–the actual necessarries of life for his family and himself—to admit of his saving the sum that was required to clear him.

If the yoke galled him so severely that he rebelled the master was master still, he had the bond the principal of which was yet unsatisfied, and on this he sued in Court and obtained a decree. The execution of this decree soon brought the slave to kneel again and plead that the yoke might be out upon his neck once more, for as he had no property, the only option left him was between imprisonment in his master's service or imprisonment in the Civil Jail, and with all the terrors of the latter which the master's subtle tongue could instil in his mind, the Kumea naturally chose the former.

But when it became known that the bonds on which the Kumeas were held were pieces of waste paper, to file which was only to cause their destruction, the Kumeas asserted their right to liberty; and working on the Railroad and, with more liberal wages for their old employers, with their time at their own command, to give to their own

patch of land and other affairs, instead of being claimable at all seasons by a hard task master whose purpose it was to keep the Kumea a slave for ever, in the course of time they rose to a feeling of independence and self-reliance which their improved circumstances will retain them in against all the masters in the world.

The last great and substantial benefit the active care of Mr. Yule could confer upon the people was the introduction of his Civil procedure rules and abolition of imprisonment for debt.

The Civil procedure rules are so admirable for the comprehensiveness embodied in so little space that, without commenting upon them generally, it will perhaps not be out of place to give some idea of what they are as a whole reserving special remarks for one or two points.

The Rules are 33 in number, they occupy a little more than 7 pages of foolscap in print.

Rule 1 — is, that all claims shall be preferred *viva voce*, the whole recored and every order passed in the case being written by the Hakim in English, a claim being only made by proxy when the Plaintiff is a *purda nusheen* woman, a native of rank or any one of respectability not resident in the Santhal Pergunnahs.

Rule 2 — provides penalties for false suits and evidence.

Rule 3 — directs that all documents shall be produced when a claim is brought.

Rules 4, 5 and 6 — shew the mode of procedure with the suit.

Rule 7 — how the decision is to be written in English and explained to both parties, copies being claimable by either.

Rule 8 — costs shall be paid by the party by whose act or omission they were incurred.

Rule 9 — arbitration.

Rule 10 — service of summons on Defendant.

Rule 11 — on production of witnesses.

Rule 12 — comprehensively disposes of the subject of subsistence allowance payable by parties to their witnesses and the course to be adopted if either party fail to pay.

Rule 13 — Give the rate at which peadas are to be paid i.e. $\frac{1}{2}$ anna per coss and 3 annas for an extra day allowed for serving process—One or more extra days allowed if Defendants and witnesses reside in different villages, and only 3 annas allowed if the process is served within 3 coss of the Hakim's Cutcherry, the peadas not being allowed to bsting in any parties.

Rule 14 — prescribes the penalty for non-service of notice by a Plaintiff.

Rule 15 — directs that security shall not be demanded from Defendant during progress of suit, but the Hakim may, if he sees reason, direct the village authorities to prevent a Defendant making away with his property until the suit against him is decided.

Rules 16, 17 and 18 — clearly and definitely lay down the rules on the subject of distraint and rule 19 the punishment for distraint without cause (*Vejai kooshi*) or forcible or other illegal removal of distrained crops.

Rule 20 — relates to execution of decrees for less than Rs. 50 of which rule and those concerning execution that follow, more hereafter.

Rule 21 — directs how claims by a third party to attached property are to be disposed of and the penalty to be avoided for a false claim.

Rule 22 to 27 — are on the subject of execution of Decrees.

Rule 28 — "imprisonment for debt is altogether abolished."

Rule 29 — relates to transfer of property and what punishment is to be awarded for fraudulent transfer.

Rule 30 — to an insolvent debtor's release for Sauthals.

Rule 31 and 32 — lay down the course to be adopted in sales held in execution and the time and manner of paying the proceeds to decree-holders.

Rule 33 — directs that the officers of the Santhal Pergunnahs shall be guided by the spirit of these rules in all contingencies not actually provided. for.

The last rule however is almost superfluous, so comprehensive is the code; so much to the point is disposed of in a few graphic words and so intelligible is the whole, that there is almost nothing left to be supplied by parity of reasoning.

Of these rules probably No. 28, which is given word for word, was the most effectual foregood. The Mahajun now having taken most of his debtor's property cannot take his liberty also. The family of the prisoner are not driven to beg, borrow or steal, probably the last, the wherewithal to release their captive relative; and system of imprisonment, strongly resembling the *lettre de cachet* of the Capet rule by which the wealthy native broke the spirit of the poor man who opposed him, is gone for ever.

There was a great outcry among the Mahajuns when this rule became law, and the Civil Jail being pulled down, the prisnoers were

released. It was said that all credit must cease, that no one was to be trusted when the Civil Jail could not be held *in terrorem* on him, and that, considering this and the lenient rules prescribed for sale of property in execution of decrees, it would be useless seeking to recover through the Courts, But experience has shewn the fallacy of this; credit still exists, and if with more discrimination so much the better, the Mahajun's money and grain do not lie idle, and the Courts where redress was said to be inaccessible are filled with suitors on the civil side.

So also was it said that Mooktears not being allowed to institute and plead in suits would be felt as a hardship and keep back many respectable (?) men from Court. But the respectable portion of the community has adapted itself to circumstances, unless it is to be announced that when everybody comes to Court there is no respectability, and the increasing shew of work of the civil file proves that justice is not despaired of even by those whose advantages are most curtailed by the existing procedure.

We have no exact figures to illustrate what we have stated, but taking approximate ones, which may be considered not very far wrong, the Civil file of the years 1857, 1858, and 1859 have shewn 800, 1000 and 2400 cases respectively, and no stronger argument could be adduced to prove that the system equally protects the creditor and debtor.

The rules with regard to execution of decrees also afford great relief to the poor man. Decrees are not allowed to be held for years, their amount accumulating by interest; terrible instruments of scourge to the debtor. Decrees for less than Rs. 50 for money, delivery to goods, performance of contract or transfer of personal property, unless some settlement approved of by the Hakim be made, shall be executed at once; if no property be found it shall be struck off the file, the decree-holder being allowed to take out execution at any other time within 6 years, provided that if there is a return of noproperty to three successive orders of attachment the decree shall be become void. All such decrees become *ipso facto* paid after 6 years.

If the decree-holder shews reason why a decree of this nature should not be executed as prescribed he may execute it any time within six years, it being provided however that interest does not accrue during such time. Execution of other decrees must be taken out within a year unless sufficient reason be shewn for neglecting to do so, and if execution is not so taken out suit does not accrue in other respects the same rules apply to these decrees as to those above mentioned. Thus there is relief for the debtor in every way. The decree against him is speedily disposed of. The amount of that decree does not increase

by interest till it overwhelms him, there is a moderate limit to its duration, and if he be in such impoverished circumstances that three fruitless attempts at attachment are made, he is released altogether.

That the debtor by making away with his property by transfer or otherwise shall ensure three fruitless attachments and so defraud the creditor, is provided against by the rules prescribing penalties for such offences, and the creditor has full protection and assistance in realizing his decree when there is property to realize it from. But the property attachable in execution of decree is so limited that the debtor shall not be sent forth naked upon the world, creditless and bereft, of hope. Kutcha houses, agricultural implements, plough cattle to the extent of three pairs, the grain required for seed, and for the consumption of the family till next crop, and the necessary metal cooking and water-pots of cultivators; the tools or instruments of the artisan, the fisherman's boats and nets, the carter's cart and bullocks, in fine those properties by which the debtor earns his livelihood, all are declared not liable to attachment except in realization of penalties prescribed in these rules.

By this rule the roof is preserved above the head of the debtor and he is not cast forth shelterless, the provision for his family till next crop is spared that he may not be driven by hunger and the pleadings of his children's starving cries to crime, and his means of livelihood are saved to him that he may recover his position and not be thrown out of his natural employment to become a useless criminal burden on society.

The whole system of administration smacks more of that fraternity of character which the Government is supposed to assume than any other. The Hakim is of, as well as over, the people, he descends from the bench to the level of the people before him and, without loss of dignity to himself, reasons to them argues with them, and learns more of them than any officer in a Regulation province can hope to do. By these means he gets a knowledge of things as they really exist and by his influence succeeds in arranging differences, soothing recalcitrant factions, softening obdurate creditors and bringing evasive debtors to book in a manner that as a judicial officer simply he could not hope to do.

The absence of all interference on the part of amlah effectually adds to the influence of the Hakim. Sitting in a room apart the amlahs are only employed in writing perwannahs, processes &c., from recorded English instructions translated to them by an English writer. There is no room for writing even a perwannah to the order to some suitor, for its nature has been placed on record in English, and the

power of the amlah to miswrite and misread evidence, to alter the record or interfere with the case in any way, is gone.

There is a direct hearing, a speedy termination to the suit, and an equally expeditious appeal. And of 100 civil suits decided 50 at least are decided by the lower and appellate Courts, and, if decreed, execution is completed by the time that such suits in a Regulation Court would have been half completed in the Court of first instance; and this at so trivial cost that, let the case go how it may, neither party is a sufferer. There are no costs for stamps, and although peadas are mentioned in the Civil procedure their employment is only exceptional, the parties themsleves in almost every instance serving their own processes, and thus the expense of a suit is limited to the diet of witnesses, and the average amount of a suit is limited to the diet of witness, and the average amount of costs may be about 12 annas or a rupee. So much for legitimate expenses, and we have shewn that fees to amlah and other costs of the kind not taxable do not exist.

Of course it has been argued that such a system answers very well for a simple people like the Santhals, although with other races it would prove a total failure, but it must be rememberd that of the population of the Santhal Pergunnahs probably one-third only are Santhals, and that the remaining two thirds of every class and creed, number among them some of the most difficult and litigious characters that the Courts could have to deal with and this average of one third Santhals applies to the whole district of the Santhal Pergunnahs. Let it be seen whether in that portion of it where the average is reduced to one-sixth of less the success of the system is greater or less.

As far as the Santhals are concerned, as long as protection from oppression is afforded them, they trouble the Courts very little; crime among them, now that witch murder has been successfully suppressed, is little known, and as long as the landlord and Mahajun take their dues only the Santhals pay up so regularly that application to the civil Courts is seldom necessary. The Courts are consequently mainly occupied in business concerning other classes.

Having disposed of the history of the Santhal Pergunnahs and given some idea of its administration, we may proceed to say something of the people from whom the district derives its name.

The Santhals have always been known for their simplicity, and until the rebellion had the character of great patience and kindness of heart. That they are simple, truth telling, patient and kind of heart still apllies to them in spite of their conduct is the "hool." They are also honest and ingenuous, but they are reserved and phlegmatic to a degree. "Leave me alone and I will leave you" would appear to be the Santhal's

axiom to people not of his own race, and so it comes about that, living mixed up together, the Santhal is an enigma to the rest of the population who in their turn are objects of distrust and contempt to the Santhal.

The religion of the Santhal is peculiar to himself. He believes in the existence of an all prevailing deity called "Chandaboonga," but his devotions to this deity are few and far between, consisting in the sacrifice of a goat once in 3 or 5 years as the case may be, and strange to say always on Sunday. This sacrifice is not attended with any great ceremony, the Santhal standing on one leg holds the goat under his arm and calls on Chandaboonga to whom he turns his eyes heavenward, and having done so kills the goat and eats it. The great poojahs attended with tamasha and feastings are those of the 4 wood gods, the Dryads of the Santhal's mythology. These 4 are called. Jaihiria," "Monikoh, "Marungbooroo" and "Gosaieera." They are four stones buried in a clump of trees called the "jairthan" and no Santhal village can be settled till the "jairthan". is established. The feeling of the Santhal appears to be that these 4 deities are familiar spirits like the Lares and Penates of the Roman, and very convenient for poojah which affords an excuse for revelry and eating and drinking.

There is one other familiar deity whose name is Majeeharam. This, in the shape of a stone, lies buried in a small open shed about 6 feet square in some central part of the village, and there assemble the punchaiyuts to have what the Santhals call a "booj." This shed is known to others than Santhals as the Boodathan, and Manjeeharam is irreverently called Booda Manjee, which being rendered means Old Santhal, a Manjee and Santhal being synonmous.

The Santhal reserved as he is to outsiders, likes a large gathering of his own people as well as anything. In the months of April and May when nature is parched and dried up, the trees leafless, and the grass and under growth burnt, the great Shikar parties of the Santhals assemble for their "Seudra." 2,000 to 4,000 Santhals collect with hunting dogs, drums, bows and arrows and sticks and encircle a large tract of jungle, then beating in a circle, the circumference of which rapidly decreases, they drive in the game to a central point, and when the birds and amimals find out their position and attempt escape, sticks arrows and dogs are let loose at them until all have run the gauntlet and escaped or been killed. Tigers are generally allowed to make a dignified retreat unmolested; sometimes a similar license is given to leopards and bears, but wild pig, deer, hares, pea fowly jungle fowl, partridge, foxes, civet cats and vermin generally are mobbed, and if possible killed. It must not be supposed that the Santhal kills the fox or civet cat from mere wantoning for he does it to eat, all being flesh

that comes to his lot nor must it be thought that he lets the tiger, leopard and bear go because he does not consider them edible, on the contrary he eats them all, and esteems the flesh of the tiger as a great delicacy because it is crisp and has more body in it than more legitimate meat. For which reason perhaps his most solemn oath is taken while touching a tiger skin.

The Santhal dances cause of collection of a large number of people, men and women both joining in the nautch, which is as peculiar to the people as anything else about them. The principal dance requires a large *corps de ballet*; a hundred to two hundred women hand by hand form a ring, about half that number of men make an inner circle and, playing their drums and fifer to a wild and gloomily exciting monotonous air, go round one way while the outer circle of fair ones goes the other. The men simply step to time without much action, but the women drum their heels and toes in a slow time double shuffle, bend their bodies forward to a half-kneeling position, as though paying homage to the men, and so bending and raising their bodies to time, always double shuffling they by an imperceptible progressive movement sideways go round and round as long as the music lasts. The strictness with which time is kept and the originality of the dances make it worth seeing, but as it lasts rather longer than two ordinary ballets the non-performing spectator (not being a Santhal) wearies of it. The other dances of the Santhals are similar in character. Peacock's feathers enter largely into the paraphernalia required for some, and drums the diggiggis of the Santhal, are paramount in all.

The marriages of the Santhals are contracted in a sensible manner, a man and woman like each other and having no doubts about their income admitting of the step they marry, very much in the same fashion as obtains among civilised nations. But in the matter of divorce they long anticipated the divorce and matrimonial court presided over by Sir Cresswell Cresswell, for man and wife having found out that they were not suited to each other a punchaiyut, after a little booj; releases them from the fetters in which, the roses having faded and fallen to pieces, only the thorns remain.

On a Santhal dying the body is burnt and a small portion of the ashes is taken, when convenient to his relatives, to the Damooda the Santhal's sacred river known by him as the Nai, into which it is thrown.

With a people so truthful and free of all caste prejudice as the Santhals with a religion so primitive and little invested with the mythical network that holds the Hindoo captive, it is palpable that a Mission throughly supported an encouraged would rapidly effect the conversaion of thousands. It is true that the Bhaugulpore Mission has gone the right way to work and done much towards this good cause, but that Mission has only local support and is not recognized by Government or at any rate is not greatly encouraged, and the labours of two or three worthy men in such a Herculean task must make it a work of a weary, weary time. The last report of this Mission shews that there are eleven schools in the Damun-i-kooh or its neighbourhood, attended by above 300 boys. As yet the instruction of these boys chiefly tends to prepare their minds for the reception of the great truths they have yet to learn. The more advanced read the gospels and all learn Bible passages the Ten Commandments and Christian Hymns in Hindi. There can be no doubt that many of these 300 will be converted and if the funds of the Mission were larger and the members for the performance of its work more numerous the 13 schools might be increased tenfold and the number of those led into the proper path might be told by thousands instead of hundreds.

The Santhals thoroughly appreciate the education given to their chindren and would not exhibit any opposition to their conversion, In one instance a Pergunnait (or headman of several villagers) asked one of the Missionaries to procure an order from the Assistant Commissioner that all father *who nelected to send their boys to the school should be fined.*

...one observation in this Mission report that we cannot endorse, the writer says "that the Santhals in the Damoon through better administration are placed in such favorable circumstances that, for some time to come, it will be difficult to make them understand that they are badly off without schools, and miserable without the gospel, and consequently that schools and Mission work will prove more successful "elsewhere." But it seems to us that the better the government and the more improved the condition of the people government, the better inclined will the people be to adopt the religion of their governors.

Besides the Santhals the only other people in the Santhal Pergunnah calling for special notice are the Pahareas. These people are divided into two tribes, the Pahareas who live in the Rajmahal range of hills, and the Naiga Pahareas who live in the plains west of Rajmahal.

Of these the former live by what crops of Indian corn and grain they can rear on the table land and slopes of the hills, and for all other necessaries they barter the hill bamboos, grass and timber which grow in ruxsuriant profussion in every driection. In religion they are supposed to be Hindoos, in character they are peculiar for nothing unless it be lying and drunkeness. The Bhaugnlpore Hill Rangers is principally composed of this people, and besides the pensions received by some as retired veterans of this distinguised corps, many receive

pensions settled by Cleveland many years ago, for the safe keeping of the ghats in the hills and ensurance of safety from raid and plunder in the plains–a species of black mail in short paid to these hill men to keep them quiet in their hills.

The Naiga Poojhar's are very much like their hill brethren in religion, perhaps they have rather less if it and make up the deficiency by increased clepitomanic drunkenness and dirtiness. They have and not the advantage of right of forest in a long range of well wooded hills and consequently are worse off and more readily driven to brigandage to supply their wants.

Both tribes of Pahareas are low indeed in the social scale as many of the lower orders of Hindoos in Santhals Pergunnahs. The Coles, Mussohurs and others among the Hindoos, are far beneath the Santhal in intelligence and position, and for all of these people who are free from caste prejudices and ignorant of religion a Mission might do much.

The Santhals and Pahareas being deducted about one-half of the people of the Santhal Pergunnahs are accounted for, the remaining half are principally Hindoos of every degree from the Brahmin downwards—the few Mussulmans living here and there complete the tale.

At present the officers of the Santhal Pergunnahs are short- handed, and additional assistants are required. Two or three divisions have no sub-assistants and all the officers are overworked. From 8 to 10 hours a day, and sometimes more, is too much for most men when the *pen* has to be employed as well as the brain *all* the time; and what with the records in cases, decisions, books of occurrences and registers of various kinds that the Hakim has to keep in his own writing less than 8 or 10 hours a day would not accomplish the work in some divisions.

If the revenue of the Santhal Pergunnahs is such as not to afford an expensive establishment and yield a profit, surely loss of good administration should not be consequence of its provery, and if a comparison of expense be made between any regulation district and an equal extent of the Santhal Pergunnahs, even allowing twice as many officers as now exist in the latter, the economy will remain with the Santhal Pergunahs. The comparison of expense of the Beerbhom District and the Deoghur Division of the Santhal Pergunnahs would show that the latter does not cost more than 1-7th of the former, and for a tract of country half as large again and for the most part equally populated.

Calcutta Review–December 1860

নবীনচন্দ্র ঘোষ
সাঁওতাল পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাঁওতাল পরগণা প্রকৃতির রম্যভূমি। বঙ্গদেশের এই অংশে পর্বত, বন ও স্রোতস্বতীর শোভা অনির্বচনীয়। সাঁওতাল পরগণার সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা অর্ধেকেরও অল্প, এক তৃতীয়াংশের কিছু অধিক। অনেকে মনে করেন, সাঁওতালরা অসভ্য, দুরন্ত, কুৎসিত, কদাচারী। কিন্তু বস্তুতঃ ইহারা যেমন পরিষ্কৃত, তেমনি অমায়িক ও আমোদপ্রিয়। ইহাদের বাসগৃহাদি অতিশয় পরিপাটি, আচারব্যবহার নিম্নশ্রেণির হিন্দুদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে ইহাদের পূর্বপুরুষেরা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত হাজারিবাগ ও মানভূমের পার্বত্য প্রদেশে বাস করিত। আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, ভূমির সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে এইখানে আসিয়া বাস করে। তখন এই স্থান ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর লীলাভূমি ও অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। সাঁওতালগণ বলিষ্ঠ ও শিকারকুশল, সুতরাং সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ক্রমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে স্থানীয় ভাষায় দিকু কহে। কালক্রমে দিকুর সংখ্যা বাড়িয়া গেলেও, সাঁওতালেরা আদিম অধিবাসী ও নিতান্ত নিরীহ বলিয়া, ইহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে স্থানটির নাম দেওয়া হইয়াছে,—সাঁওতাল পরগণা। যাহাতে দরিদ্র সাঁওতালের প্রতি উৎপীড়ন না হয়, এই উদ্দেশ্যে এখানকার শাসনপ্রণালীও অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট বিধানের অধিক করা হয় নাই ; এ নিমিত্ত ইহাকে 'বেবন্দোবস্তী মহল' কহে। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল এই স্থানটিই প্রাকৃতিক দৃশ্যে, অধিবাসীর বিশেষত্বে ও শাসনপ্রণালীর বৈচিত্র্যে সকল প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। স্থানটির পরিমাণ ৫৪৮৮ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য

সাঁওতাল পরগণার উত্তরদিকে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া ; পূর্বসীমা মালদহ, মুরশিদাবাদ ও বীরভূম। দক্ষিণে বর্ধমান ও মানভূম ; এবং পশ্চিমসীমা হাজারিবাগ ও ভাগলপুর। ভূমি সাধারণতঃ তিন প্রকার। পূর্ব দিকে সাহেবগঞ্জ হইতে নয়া দুমকার দক্ষিণ-পশ্চিম-পার্শ্বস্থ নৌবিল নদী পর্যন্ত প্রায় এক শত মাইল ব্যাপিয়া অবিচ্ছিন্ন পাহাড়ে জমি। সেখান হইতে পশ্চিম দিকে তরঙ্গায়িত, বন্ধুর ও উচ্চ ভূমিভাগ সমস্ত দেওঘর, পব্বীয়া ও গোড্‌ডার কিয়দংশে ২৫০০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া মধ্যভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে ভালরূপ শস্য জন্মে না। অপরাংশ সমতল, জলাশয়ের সন্নিহিত ও পলিমিশ্রিত ; সুতরাং এখানে প্রচুরপরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। পরগণাটি ক্ষুদ্র হইলেও সমস্ত ভারতবর্ষে এরূপ সুন্দর স্থান অতি বিরল। এই জেলার মধ্যে এক স্থান হইতে দূরবর্তী অন্য স্থানে যাইতে হইলে যে সকল নয়নানন্দকর, পরম রমণীয় বিচিত্র শোভা সকল নেত্রগোচর হয়, তাহা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কোথাও ধান্য, গোধূম, কলাই প্রভৃতি শস্যের ভূমি শ্যামবর্ণে শোভা পাইতেছে, কোথাও শ্বেত-কৃষ্ণ প্রস্তরের সন্নিহিত উচ্চ ভূমিভাগে কুর্তি প্রভৃতি রবিশস্য জন্মিয়াছে। সমতলভূমি হইতে চলিতে আরম্ভ করিলে কখনও ৮। ১০ হাত উচ্চ

পাহাড়ে জমি আরোহণ করিয়া পরক্ষণেই আবার ১৪।১৫ হস্ত নিম্নে নদীগর্ভে নামিয়া আসিবার পুর পুনশ্চ উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে হয়। কোন স্থানে সুগন্ধিনির্যাসপূর্ণ শালবৃক্ষের শ্রেণি মনোহর উন্নত মস্তকে সৈন্যব্যূহের ন্যায় বহুপরিসর মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও বিস্তৃত পলাশবন লোহিতবর্ণ পুষ্প ও লাক্ষা প্রদান করিতেছে; কোথাও নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণে নয়ন ও মন আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। অসংখ্য নদী শীত ও গ্রীষ্মকালে সুপ্ত ও বৃহদাকার অজগর সর্পের ন্যায় বালুকাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে; পরে বর্ষার জলপান করিয়া গভীরগর্জনসহকারে দ্রুতবক্রগতিতে উভয়তীরস্থ বহু দূর পর্যন্ত স্থান গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। পূর্ব দিকে রাজমহলের পাহাড় ১৩৬৬ বর্গমাইল পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত আছে। ইহার মরী ও সেন্দগর্স নামক দুই শিখর ২০০০ ফিট উচ্চ। দক্ষিণ দিকে মহুয়াশাড়ী শিলা ১৫০০ ফিট উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিউর, ফুলজুড়ি, সোণাতরী ও মালঞ্চ প্রভৃতি দশটি উচ্চ শিলায় ত্রিকোণমিতি জরিপের এক একটি স্টেশন আছে। ছোট ছোট পাহাড়ের ইয়ত্তা নাই। গঙ্গা উত্তর সীমার কিয়দংশ ও পূর্বসীমার অধিকাংশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। নদীর মধ্যে গুমানী, মরাল, বাঁশলয়, ব্রাহ্মণী, ময়ূর বা ময়ূরাক্ষী, নৌবিল, অজয় ও বরাকরের নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালে প্রায় সকল নদীই শুকাইয়া যায়; বর্ষাকালে সমস্ত পরিপূর্ণ ও তাহাদের স্রোত অতিশয় প্রবল হয়; এ জন্য বৎসরের কোন সময়েই নৌকা চালাইবার সুবিধা নাই।

কুশিদিয়া গ্রামের নিকট বাঁশলয় নদীতে ১২ ফুট উচ্চ একটি ও সিংহপুরের নিকট ব্রাহ্মণী নদীতে ১০ ফুট উচ্চ আর একটি ঝরণা আছে। মহারাজপুর স্টেশনের অনতিদূরে "মতি ঝরণা" নামে যে জলপ্রপাত আছে, উহার জল সংবৎসর সমভাবে পড়িয়া থাকে। দামিনীকোহ পাহাড়ে শিরগাড়ি নামে এক গুহা আছে, উহা ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট গভীর। অত্রত্য শিবমন্দির দেখিবার জন্য চৈত্রমাসে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। এখানে প্রস্রবণেরও অভাব নাই। রাজমহলের অন্তর্গত দামিনীকো শিলায় রক্ষী নামক স্থানে একটি প্রস্রবণ আছে। দুমকার অন্তর্গত ভুড়ভুড়ি ও সিদ্ধ নদীতে এবং গোড্ডার ছয় মাইল দক্ষিণে নওডিহা বা ভাতেণ্ডা নামক স্থানে এক একটি উৎস আছে। শেষোক্ত উৎসের নাম নির্ঝর।

পাথুরে কয়লা ও লৌহ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। ১৮৫০ সালে শের-উইল সাহেব দেওঘর মহকুমায় তাম্র ও রৌপ্যের খনি হইতে কিয়দংশ মিশ্র-ধাতু বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন; উহার মধ্যে প্রায় ৭ সের ওজনের খনিতে ১৫৪ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য পাওয়া গিয়াছিল।

এই দেশ জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও মূল্যবান বাহাদুরী কাঠের একটিও অরণ্য নাই। দামিনীকোহ হইতে জ্বালানি কাঠ কাটিবার স্বত্ব ইজারা দিয়া গবর্মেন্টের বার্ষিক ৩০০ টাকা মাত্র আয় হইয়া থাকে। অন্যান্য জমিদারেরা কুড়ালী প্রতি কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকে। জঙ্গলে অধিকাংশই শাল, অন্যান্য বৃক্ষ যৎসামান্য। পলাশ, কুল ও অশ্বত্থ গাছে লাক্ষা জন্মে; শাল নির্যাসে ধুনা হয়; মোম, মধু, সাবুই ঘাস, রবর, দড়ি-নির্মাণের উপযোগী কুঞ্জু ও জম্বায় লতা জঙ্গলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, চিতা, হরিণ, বন্যশূকর ও নানাবিধ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে বন্যহস্তী ও গণ্ডারও ছিল; এখন তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

শাসনপ্রণালী

এখানকার শাসনপ্রণালী অন্যান্য প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র। ফৌজদারি মকদ্দমা ভাগলপুর ও বীরভূমের সেশন আদালতের অধীন। এইরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহলের রাজস্ব ভাগলপুর ও বীরভূমের কোষাগারে প্রেরিত হইয়া থাকে। আর যে সকল দেওয়ানি মকদ্দমার তায়দাদ ১০০০ টাকার উপর, তাহাদেরও উক্ত জেলাদ্বয়ের আদালতে বিচার হইয়া থাকে। এখানকার সর্বোচ্চ গবর্মেন্ট কর্মচারী ডেপুটি কমিশনর দুমকায় থাকেন; ইনি ভাগলপুরের কমিশনরের অধীন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য স্বতন্ত্র আদালত নাই; বিচারকর্তাদের উভয়বিধ মকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার আছে। বন্দোবস্তী প্রদেশে প্রচলিত আইনানুসারেই অধিকাংশ মকদ্দমা মীমাংসিত হয়। মতভেদ হইলে, পূর্ববর্তী বিচারকগণের শাসনপ্রণালী ও সার্কুলার অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। জেলার ভূস্বামী গবর্ণমেন্ট ও জমিদার। জমিদারির অধিকাংশ প্রধানী জমি, অবশিষ্ট জমিদারের খাস, ঘাটওয়ালী, মোকরবী ও মান প্রভৃতি। প্রধানী জমিতে প্রায় প্রতি গ্রামে এক এক জন গবর্মেন্টের মনোনীত লোক আছে; তাহাকে প্রধান কহে। এই পদ পুরুষানুক্রমে চলিতেছে, জমিদারের ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। এই প্রধান প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া জমিদারের তহশিলদারকে দিয়া থাকে, এ জন্য জমিদার ও প্রজা প্রত্যেকের নিকট হইতে আদায়ের টাকা প্রতি ১ আনা হিসাবে পাইয়া থাকে। স্থানবিশেষে গবর্মেন্ট-প্রদত্ত নিষ্কর জোতও পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত জমিদারের কর্মচারীও দৃষ্ট হয়।

তহশিলদার বা গোমস্তা বা নায়েব

প্রধানের নিকট হইতে খাজনা আদায়, জমির বন্দোবস্ত, কৃষি ও জমিদারিরা উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহাদের কর্তব্য কর্ম।

পাটওয়ারী

জমিদারের খাসমহল ব্যতীত প্রায় সকল জমিদারিতেই ইহারা নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে জমাবন্দি, জমাওয়াশিলবাকি, তেরিজ বা খতিয়ান, খসড়া ও প্রজাগণকে রসিদ লিখিয়া দিতে হয়। ইহারা কোথাও মাসিক বৃত্তি, কোথাও টাকায় ১ পয়সা হইতে ১ আনা বা বার্ষিক ফসল পাইয়া থাকে। এই শেষোক্ত আদায়ের নাম হক্ পাটওয়ারী।

গোড়াইত

ইহারা প্রায়ই দৌত্যকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কোন প্রজাকে ডাকিতে হইলে, কিংবা কোন উচ্চ গবর্মেন্ট বা প্রাইভেট কর্মচারী গ্রামে আসিলে, তাহার আহারাদির বা অন্য যে কোন প্রকার সাহায্যবিধানে ইহারা নিযুক্ত হয়। কোনও কোনও স্থানে ইহাদের গোড়াইতি জায়গির আছে। কোথাও প্রধান বার্ষিক ১ বা ২ বেতন দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ফসলের সময় প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে করস্বরূপ ইহারা কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চৌকিদার, মুকদ্দম, ডিহিদার প্রভৃতি অনেকে ছোট ছোট কর্মচারী আছে।

সাঁওতাল গ্রামে যে সকল কর্মচারী আছে, তাহাদের নাম :

পরগণাই

ইহারা গবর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত। প্রধান বা মাঝিদিগের নিকট হইতে ইহারা যাহা আদায় করে, তাহার উপর শতকরা ২ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে। ইহাদের অনেক পরিমাণে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের ক্ষমতা আছে। ইহাদের অধীন দেশমাঝি ও চাকলাদারেরা দূতের কাজ করিয়া থাকে।

মাঝি

সাঁওতাল গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে মাঝি কহে। ইহারা গবর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হয়, এবং কার্য বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। ইহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যাহা আদায় করে, তাহার উপর শতকরা ৮ টাকা হিসাবে কমিশন পাইয়া থাকে। ইহারা গ্রাম্য পুলিশের কর্তা। দেওঘরে পুলিশ কর্মচারীর সুবন্দোবস্ত আছে বলিয়া ইহাদিগকে পুলিশের কর্ম করিতে হয় না। ইহারা মান অর্থাৎ নিষ্কর জমি পাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য লোকেরা মিলিয়া যোগমাঝি ও লিয়ারি নিযুক্ত করে। উহারও কিছু কিছু মান জমি পাইয়া থাকে। যোগমাঝিরা বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সংস্কার নির্বাহ করিয়া থাকে।

পঞ্চাইত

সাঁওতাল মৌজার পঞ্চায়েত বলিলে এক প্রকার সভা বুঝায়। উপরে যে সকল সাঁওতাল কর্মচারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই পঞ্চায়েত সভার সদস্য। যেখানে এই সভার অধিবেশন হয়, তাহাকে মাঝিথান (স্থান) কহে, এবং তথায় সামান্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিবাদের মীমাংসা হয়। যে সকল বিবাদ কিছু উচ্চ দরের, তাহা পাঁচজন মাঝি লইয়া যে সভা গঠিত হয়, তাহাতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পরগণাইত ইহাদের সভাপতিরূপে বৃত হয়। বিষয়টি ইহা অপেক্ষা বেশি জটিল হইলে সরকারি বিচারালয়ে প্রেরিত হয়। পঞ্চায়েত সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা ও অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকে। এই প্রকার স্বায়ত্ব-শাসন দ্বারা সাঁওতালদিগের মধ্যে একতা প্রভূতপরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন পাটওয়ারী, জেঠ, রাইয়ত, মাহাতো প্রভৃতি আরও অনেক গ্রাম্য কর্মচারী আছে।

পাহাড়িয়া গ্রামে প্রধান ব্যক্তির নাম সর্দার। ইহার ক্রিয়াকলাপ সাঁওতাল মাঝির মত। ইহাকে মাঝিও বলিয়া থাকে। তাহার অধীনে নায়েব ও অন্যান্য ছোট ছোট কর্মচারী আছে।

লোকসংখ্যা

সাঁওতাল পরগণার লোকসংখ্যা বর্তমান সময়ে প্রায় ১৩ লক্ষ। ১৮৭২ সালের আদমসুমারি দৃষ্টে জানা যায় যে, এখানে ২৩০৫০৪ গৃহে ১২৫৯২৮৭ জন লোকের বাস। ১৩৬৬ বর্গমাইল পরিমিত দামন পাহাড়ে কিঞ্চিদধিক ১লক্ষ ১৭ হাজার লোকের বাস। ইহা গবর্মেন্টের খাসমহল। ভাগলপুরের জমিদারদিগের অত্যাচার ও জমির অপহরণ নিবারণের নিমিত্ত ৩০০ মাইল দীর্ঘ সীমানার উপর মধ্যে মধ্যে পাকা স্তম্ভ ও তন্মধ্যবর্তী স্থানসমূহে

তালবৃক্ষশ্রেণি গবর্মেন্ট কর্তৃক রোপিত হইয়াছে । এখানে অধিকাংশই পাহাড়িয়া। অল্পবুদ্ধি সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদিগের জাতীয় প্রথা অনুসারে যে প্রকারে লোকগণনা হইয়াছিল, তাহা বড় কৌতুকজনক! গবর্মেন্ট মাঝি ও সরদারগণকে চারি বর্ণের রঙ্গিন সূত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য যথাক্রমে কাল ও লাল রঙের, বালকদের সাদা ও বালিকাদের জন্য পীতবর্ণের সূত্র নির্দিষ্ট ছিল। মাঝি ও সরদারেরা লোকগণনার সময় স্ত্রী, পুরুষ ও বয়স বিবেচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সূত্রে সংখ্যানুসারে এক একটি গ্রন্থি দিত! পরে গণনা শেষ হইলে এক এক রঙের সূত্রের গ্রন্থি গণনা করিয়া কত পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা ইত্যাদি নির্ণীত হইয়াছিল। গোড়্ডার সন্নিহিত দামন শিলার কয়েক গ্রামে আর এক প্রকারের গণনা চলিয়াছিল। সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের গণনার ভার আপন আপন মাঝি ও সরদারদিগের উপর ন্যস্ত ছিল; হিসাব রাখিবার নিমিত্ত তিন তিন জন সহকারী থাকিত। এক জন পুরুষের, এক জন স্ত্রীলোকের ও অপর ব্যক্তি বালক বালিকাদের হিসাব রাখিত। ইহারা ফলের বীচি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গণনাকার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে ২২৯ জন লোকের বসতি। গোড়্ডা পরগণার সর্বাপেক্ষা অধিক ও জামতারা পুলিশ থানার অন্তর্গত স্থানসমূহে সর্বাপেক্ষা অল্পলোকের বাস। সমস্ত জেলাটিতে খাঁটি আদিম জাতির সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার। পার্বত্য প্রদেশে প্রধানতঃ সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া, বন্ধুর ও তরঙ্গায়িত অংশে অর্ধ আদিম জাতি ও নদীধৌত সমতল প্রদেশে প্রায়ই আর্যসন্তান অধিবাসী।

জাতি, আচার ব্যবহার ও ধর্ম

এখানে এত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ (Caste) বা সম্প্রদায়ের (Sect or race) বাস, যে বঙ্গদেশে এত অধিক কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি একেবারে নিষিদ্ধ। এমন কি, এক শ্রেণির মধ্যেও আত্মীয় বা বিশেষ ঘনিষ্ঠ না হইলে কেহ কাহারও অন্ন আহার করিতে চায় না। বঙ্গদেশে এক জাতির (caste) লোক অন্য সমজাতীয় লোকের অন্নভোজন বড় দোষাবহ মনে করে না। অনেক সময় ভালবাসার, অনুরোধে, বা অন্য কোন কারণে, এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের ভাতও খাইয়া থাকে ; তাহাতে জাতিচ্যুত বা বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হয় না। কিন্তু এ প্রদেশের রীতিনীতি বড়ই কঠোর, পদ্ধতিরেখার তিলমাত্র বিচলিত হইলে আর উদ্ধার নাই। ইহারা শাস্ত্রানুসারে অনেক কার্য করিতে পারে না, অথচ আপনাদিগকে পরম ধার্মিক বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। পূর্বে বাঙালিদিগকে ইহারা বড়ই সম্মানের চক্ষে দেখিত, আজকাল অহিন্দু বলিয়া প্রায়ই ঘৃণা করে। ঘৃণা করিবার কারণও আছে। বেহার প্রদেশে যে সকল বাঙালি কার্যোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশ আচারভ্রষ্ট, প্রাচীন আর্যধর্মে আস্থাশূন্য ও পাশ্চাত্যমতাবলম্বী।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে যে সকল বর্ণ (caste) আছে, তাহার কতক কতক বঙ্গদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্ট হিন্দুস্থানের নিজস্ব। কিন্তু সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। তবে, যে সকল আদিম জাতির জন্য এ প্রদেশের নামকরণ ও আইন প্রভৃতি ভিন্ন রকমের হইয়াছে, তাহাদের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হওয়াছে। নিম্নে কয়েকটি আদিম জাতির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে,—

ভড় (রাজভড়)

কিংবদন্তী ও প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয়, ইহারা এক সময় অযোধ্যা ও কাশী প্রদেশের অধিবাসী ছিল। বর্তমান সময়ে ইহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অনেকে রাখালের কার্য করিয়া থাকে।

ধাঙ্গড়

ইহারা ছোটনাগপুর হইতে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে পার্বত্য প্রদেশে বাস করে বলিয়া ইহিদের উক্ত নাম দেওয়া হইয়াছে; কারণ দাং বা ধাং অর্থে পাহাড়। ইহাদের অধিকাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। বোধ হয়, ধান (ধান্য) শব্দ হইতে ধাঙ্গড় (ধান্ গড়) নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে।

কাঞ্জর

ইহাদের নির্দিষ্ট ব্যবসায় নাই, সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেকে ঘাসের রজ্জু ও খস্‌খসের পর্দা প্রস্তুত করে। এক শ্রেণির লোক চৌর্য-বৃত্তি করিয়া থাকে।

খাড়ওয়াড়

অধিকাংশ মৎসজীবী।

কোল

মুণ্ড, হোস, ভূমিজ ও উরেয়ন জাতির সাধারণ নাম।

নৈয়া

দক্ষিণ পাহাড়িয়াদের পঞ্চম ও সর্বনিম্ন শ্রেণি। ইহারা বহুপূর্বে জাতীয় পুরোহিতগিরি করিত। কথিত আছে, ইহারা এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের পুরোহিত ছিল।

নট

ইহারা প্রায়ই কবীরপন্থী মুসলমান। সির্কা নামক বহনযোগ্য আচ্ছাদন বা কুটীর লইয়া এক এক স্থানে রাত্রিবাস করে। ইহারা সাধারণতঃ বাজিকর, খোদ্‌নেত বান্দরমারা, গোহি (গিরগিটিখাদক), সাপুড়িয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। নাচ, তামাসা, বন্যজন্তু দর্শান ও চুরি প্রভৃতি ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা যে ভাষায় কথাবার্তা কহে, তদ্ব্যতীত আপনাদের মধ্যে অন্যের দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবৃত্তি করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে।

পাহাড়িয়া জাতি

পাহাড়িয়া জাতির সম্বন্ধে যেরূপ কিংবদন্তী আছে, তাহা হইতে বিশেষ কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। উরাওনদিগের জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, তাহারা এই জাতির এক শাখামাত্র; ইহারা পশ্চিমঘাট হইতে আসিয়া রোটাস পর্বতে অনেক কাল অবস্থিতি করিয়াছিল, পরে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত ও দুই অংশে বিভক্ত হয়। এক ভাগ রাজমহল পর্বতে ও দ্বিতীয় ভাগ ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে বাস করিতে আরম্ভ করে। ইহারা বলে, মনুষ্য জাতি সর্বপ্রথমে পর্বতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত তাহারা পাহাড় পর্বতে থাকিতে ভালবাসে। উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের যে কিংবদন্তী আছে, তাহা লেপ্টেনান্ট শ সাহেবের বিবরণী হইতে গৃহীত হইতেছে—

লোকসৃষ্টির জন্য স্বর্গ হইতে সাত ভাই মর্তে প্রেরিত হয়। সর্বজ্যেষ্ঠ পীড়িত হইলে, অবশিষ্ট ভ্রাতারা একটি ভোজের আয়োজন করিল, এবং আপনাদের মধ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল যে, যাহার যেরূপ খাদ্যে অভিরুচি জন্মে, সে তাহাই খাইবে ও আপনার ঈপ্সিত স্থানে গিয়া বাস করিবে। একজন ছাগমাংস আহার করিয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, এবং তাহার সন্তান সন্ততি হিন্দুনামে পরিচিত হইল। অপর এক জন শূকরমাংস ব্যতীত আর সকল মাংসই ভোজন করিয়াছিল, তাহার সন্তানেরা মুসলমান হইল। তৃতীয় কি করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই; কিন্তু সে খারওয়ার জাতির আদিপুরুষ। চতুর্থ বরাহমাংসে তৃপ্তিলাভ করিয়া উত্তরপ্রদেশে কিরাতজাতির সৃষ্টি করিল। পঞ্চম ভ্রাতা কদির (? কোল) জাতির পূর্বপুরুষ। ষষ্ঠ সর্বজীবের মাংস ভক্ষণ করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল; পরে কি হইল, অনেক কাল জানা যায় নাই; অবশেষে ইংরাজদিগকে দেখিয়া ইহারা একেবারেই স্থিরসিদ্ধান্ত করিল যে, তাহারাই এই সর্বভূক্ ভ্রাতার বংশধর। পীড়িত সপ্তম ভ্রাতার নাম মালেয়ার; সে এক পুরাতন পাত্রে সর্বপ্রকারের মাংস ভক্ষণ করার অপরাধে জাতিচ্যুত ও পাহাড়ে থাকিতে বাধ্য হইল। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় না দেখিয়া সসন্তান দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল।

শাসন

মাননীয় ক্লীবলাণ্ড সাহেব হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে ইহারা আপনাদের প্রাচীন শাসনপ্রণালী অনুসারে চলিত। ইহাদের দণ্ডবিধানপদ্ধতি অতি নিষ্ঠুর ছিল। কোন ব্যক্তি অন্যগ্রামবাসী ভিন্ন মাঝির (সর্দারের) অধীনস্থ কোন অনিষ্টকারীর প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিলে, সে স্বসম্প্রদায়ের সর্দারের নিকট অভিযোগ করিত। দলপতি আপনার দলবল সহ অপরাধী গ্রাম লুণ্ঠন ও তাহাকে বন্দি করিয়া স্বগ্রামে আনিয়া লুণ্ঠিতদ্রব্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইত। যে পর্যন্ত বন্দির আত্মীয়েরা খরচ সহ টাকা ও অপহৃত দ্রব্যাদির ক্ষতিপূরণ না করিত, তাবৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিত না।

ধর্মনীতি

লেপ্টেনান্ট শ-এর মতে পাহাড়িয়ারা পুনর্জন্ম ও পরকাল মানে। "সদা সদ্ব্যবহার করিবে, কাহাকেও গালি দিবে না। চুরি, প্রহার ও হত্যা করা পাপ। স্ত্রীপুরুষ সকলেই দুবেলা ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। পরমেশ্বর সমস্ত দেখিতে পান, সুতরাং পাপের শাস্তি সকলকেই পাইতে হইবে। আত্মহত্যা মহা পাপ।" ইত্যাদি উচ্চ ধর্মকথা শিক্ষিত পাহাড়িয়াদিগের মুখে শুনা যায়। ইহারা ঈশ্বরকে 'বিদো' বলে; দেবতাদের সাধারণ উপাধি গোঁসাই, দেবতাদের নাম—

রকসী (রক্ষী) ঃ গ্রামে মহামারী বা বাঘের দৌরাত্ম্য হইলে, ইহারা কোন বড় বৃক্ষের তলায় একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত করিয়া, তাহা রক্‌সী-(রক্ষী)-দেবজ্ঞানে পুরোহিতের দ্বারা পূজা করিয়া থাকে।

চাল বা চালনদ ঃ গ্রামে কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে, ইহাদের পবিত্র মুক্‌মুম গাছের তলায় একটা পাথর রাখিয়া পূজা করে। ইহার মন্দিরে প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে "চিতারীণ" উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে একটি গাভী বলি দিতে হয়।

পৌ গোঁসাই ঃ ইনি পাথর দেবতা। যাত্রার সময় বিল্বমূলে বেদীনির্মাণ করিয়া মোরগ বলি দিয়া ইহার পূজা হইয়া থাকে।

দ্বারা গোঁসাই ঃ গ্রামাধিপতি দেবতা। গৃহস্বামী ঘরের সম্মুখে মুকুমুম বৃক্ষের শাখা রোপণ করিয়া তাহার নিচে একটি ডিম রাখে এবং শূকর বলি-দান করিয়া সেই মাংস বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজন করায়। পরে ডিম ভাঙিয়া ফেলে ও শাখাটি গৃহে রাখিয়া দেয়।

কুল গোঁসাই ঃ ধান্যবপনের সময় ছাগ, শূকর, বা পক্ষী বলিদান দিয়া ইহার পূজা সম্পন্ন হয়।

ঔংগা ঃ শিকারের দেবতা। ইহাদের শিকার-আইন অতিশয় কঠোর। শিকারি কুকুর হত্যা করিলে ১২৲ টাকা জরিমানা হইয়া থাকে। বিড়াল হত্যা করিলে প্রত্যেক গ্রাম্য বালককে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কিছু কিছু লবণ দিতে হয়। হতজীবের কোন নির্দিষ্ট অংশ স্ত্রীলোকদিগকে খাইতে দিতে হয়, না দিলে দেবতা রুষ্ট হন। শিকারের কিয়দংশ মাঝির প্রাপ্য। শিকার অদৃশ্য হইলে যাহারা খুঁজিয়া বাহির করে, তাহারা সেই পশু হত হইলে অর্ধেক পাইয়া থাকে।

গুমু গোঁসাই ঃ কুল গোঁসাইর সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে।

চামদা গোঁসাই ঃ ইনি সর্বপ্রধান দেবতা। ইহার পূজায় এতাদৃশ ব্যয় হয় যে, কেবল ধনীরাই এই দেবতার পূজা করিতে সমর্থ। পূজক, পুরোহিত বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট নৈবেদ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা যাহা বলিবে, তাহাই করিতে হইবে। প্রায়ই দ্বাদশ বরাহ, দ্বাদশ ছাগ, চাউল,তৈল ও লাল সীস দিতে হয়। তিনটি বাঁশ পুতিয়া তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিন বর্ণে চিত্রিত অনেক নৌকা সংলগ্ন করিয়া দেয়। নৌকার পার্শ্বদেশ কাল ও লাল রঙে চিত্রিত, ও মধ্যভাগে কাঠের স্বাভাবিক বর্ণ রাখা হয়। একটি বাঁশে ৯০, অন্যটিতে ৬০ ও তৃতীয় বাঁশে ২০ টি নৌকা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি সুন্দর পদার্থে বাঁশগুলি আরও সুশোভিত করে। পরে এক সঙ্গে সমস্তগুলিকে চামদা গোঁসাই জ্ঞানে পূজকের গৃহের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া পশু পক্ষী বলিদান দেয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে নৃত্যগীতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করে ; তিন তিন জন লোক পালাক্রমে চামদা গোঁসাইর সেই অপূর্ব মূর্তি ধরিয়া থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে ধন-পুত্রলাভকামনায় আবার বলিদান হয়। রক্তরঞ্জিত মুকুমুম শাখা চিহ্নস্বরূপ বেদীর উপর রাখিয়া দেয় ও বাঁশগুলি পূজকের গৃহাভ্যন্তরে চালের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। পূর্বে মালেয়ারদিগের পুরোহিতকে নৈয়া (নায়ক) বা লৈয়া বলিত। বর্তমান পুরোহিতদিগকে দইমনস ও তাহার পত্নীকে ক্ষিয়েন্দ্রী কহে। ইহাদিগকে চুল দাড়ি রাখিতে হয়, এবং একের শক্তির অতিরিক্ত কোন অদ্ভুত কৌশল দেখাইতে হয়। সর্দার সন্তুষ্ট হইয়া লাল সুতায় কড়ি বাঁধিয়া তাহার গলায় ও মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া দিলে, তাহার উৎসবে অধ্যক্ষতা করিবার অধিকার জন্মে। তাহাকে উৎসর্গীকৃত পশুর শোণিত পান করিতে হয়।

পাহাড়িয়ারা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত

মালেয়ার মাল ও কুমার। ইহারা সকল প্রাণীর মাংস খায়, মৃতজন্তুও বাদ যায় না। পাহাড়িয়ারা সূর্যকে বিদো গোঁসাই-(পরমেশ্বর)-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহারা বিদেশী লোকের সহিত মিশিতে ভালোবাসে না, এ জন্য দুর্গম বৃক্ষসমাচ্ছন্ন স্থলে বাস করে। প্রত্যেক বাটিতে মাচান অর্থাৎ শস্যের গোলা থাকে। ইহাদের গৃহে মৃত্তিকার প্রাচীর নাই ;

কেবল বাঁশ ও খড় দিয়া ঘর প্রস্তুত করে। ইহারা উৎসবে প্রচুর পরিমাণে পাঁচওয়াই নামক মদ্য পান করে। নৃত্যের সময় এক ব্যক্তি মদের পাত্র লইয়া নর্তনশীল প্রত্যেকের মুখে একটু একটু ঢালিয়া দেয়, তাহারাও তালভঙ্গ না করিয়া নাচিতে নাচিতে পান করে।

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ দেখিতে সুন্দর। স্ত্রীলোকেরা কটীদেশের নিম্নভাগে ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান, এবং শরীরের উপরিভাগে লাল রঙের চাদর ওড়নার ন্যায় ব্যবহার করে। কাণে কর্ণভূষা ও গলায় প্রচুরপরিমাণে বিবিধ বর্ণের পুঁতির মালা পরিধান্ করায় দেখিতে অতি সুশ্রী বোধ হয়। কিন্তু পুরুষেরা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কটীদেশে জড়াইয়া ও রুক্ষকেশ মস্তকের উপর খোঁপা বাঁধিয়া রাখায়, নিতান্ত অসভ্য বলিয়া বোধ হয়। ইহারা প্রায় সকলেই পাহাড়ে বাস করে।

বিবাহ

ইহাদের বিবাহে ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় কতকটা কোর্টশিপ চলিয়া থাকে। যুবক যুবতী একত্র কাজ করে, এক সঙ্গে হাটে যায়, একত্র আহার ও এক শয্যায় শয়ন করে। সম্মতিগ্রহণের সীমাতিরিক্ত অপরাধ করিলে তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হয়, পরে নিজ ব্যয়ে পশুর রক্তপাত করিয়া পাপ ধৌত করিলে সমাজের পুনর্গৃহীত হয়। বিবাহের দিন বর সবান্ধবে কন্যাকর্তার বাটিতে উপস্থিত হইয়া মাদুর বা খাটিয়ার উপর উপবেশন করে। আহারান্তে কন্যাকর্তা বালিকার হাত বরের হাতে দিয়া তাহাকে কন্যার প্রতি চিরকাল সদয় থাকিতে অনুরোধ করে। বর দক্ষিণ হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বালিকার ললাটে সিন্দুর দেয়, এবং সেই অঙ্গুলি দ্বারা বালিকার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবারা স্বামীর ভ্রাতৃগণকে বিবাহ করিতে পারে. কিন্তু কোন ভ্রাতাই একাধিক ভ্রাতৃবধূর পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সৎকার

পাহাড়িয়ারা মৃত ব্যক্তিকে গোর দেয়। পুরোহিত মরিলে তাহাকে জঙ্গলে লইয়া গিয়া বৃক্ষপত্র ও শাখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, পুরোহিতের প্রেতাত্মা গ্রামে থাকিলে অনেক দৌরাত্ম্য করে। কেহ সংক্রামকরোগে মরিলে তাহাকেও দূরে ফেলিয়া দেয়। দলপতি মরিলে তাহার কবরের উপর গৃহনির্মাণ করিয়া পাঁচ দিন ভোজ দিতে হয়। বৎসরান্তে পুনর্বার লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া ভূরি ভোজন করাইতে হয়। এই দ্বিতীয় ভোজ না হইলে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে না, এবং ইতোমধ্যে সেই পরিবারের কাহারও পত্নীবিয়োগ হইলে সে ব্যক্তি দ্বিতীয় দার-গ্রহণ করিতে পায় না। মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্ধসম্পত্তির অধিকারী, অবশিষ্ট অর্ধ অন্যান্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে সমভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহারা প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা কহে না ; আপনাদের সামান্য জমি চাষ করে, ও বাগানে কলা, শাক সব্জি প্রভৃতির উৎপাদন করিয়া থাকে।

ধনী মাল পাহাড়িয়াদের পুরোহিত হিন্দু। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। দরিদ্রেরা কন্যাকে অনেক সময় ২০ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিতা রাখিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহে কন্যার সম্মতি গ্রহণ করে না। কন্যাকর্তা বরের নিকটে সামান্য পণ গ্রহণ করে। বিধবারা

কোন পুরুষের উপপত্নীরূপে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই লোক চিরকাল উপপত্নীর ভরণপোষণ করিতে বাধ্য। কুমারীর সন্তান জন্মিলে জন্মদাতাকে উহার পাণিগ্রহণ করিতে হয়। কুলটারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হয়, কিন্তু তাহারা অন্যের উপপত্নীরূপে থাকিতে পারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব বিষয়ের অধিকারী, অন্য পুত্রেরা কিছু কিছু ভূমি পাইয়া থাকে; পিতার অস্থাবর সম্পত্তি পুত্রেরা সমান অংশ পাইয়া থাকে। বিধবারা যতদিন বিবাহিতা বা অন্যের সঙ্গিনী না হয়, তত দিন পুত্রের দ্বারা প্রতিপালিতা হয়।

সাঁওতাল জাতি

সাঁওতালদিগের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, ইহারা বহুকাল পূর্বে হাজারিবাগ ও বীরভূমে আসিয়া আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; সেখান হইতে ক্রমশঃ সাঁওতাল পরগণায় আসিয়াছে। ইহারা পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থান দামোদর ও কাঁসাই নদের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ পবিত্র বলিয়া মনে করে। ইহারা এক স্থানে থাকিতে ভালোবাসে না। বাসস্থান আরামজনক হইলেও সামান্য কারণে ইহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষসমাকীর্ণ জঙ্গলে বা অনুর্বর স্থানে থাকিয়া বাঁশি, মাদোল ও তীর-ধনুক লইয়া সুখে কাল কাটায়, এবং যেখানে থাকে, আংশিকভাবে তথাকার ভাষা ও রীতিনীতির অবলম্বন করে। ইহাদের গৃহে মৃত্তিকার প্রাচীর ও সুন্দর বারান্দা আছে; তাহা লাল, সাদা ও কাল রঙে চিত্রিত; দেখিতে অতি সুন্দর। গৃহ যেমন সুন্দর, রাস্তাঘাটও তেমনি পরিস্কৃত করিয়া বাস করে, তথায় হিন্দুরা আসিয়া জমিদারকে বেশি খাজনা স্বীকার করিয়া বাস করিতে থাকে, সুতরাং সাঁওতালেরা অনন্যোপায় হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করে, তাহাদিগকে "ঝুটীয়া" সাঁওতাল ও যাহারা পৈত্রিক স্থানে বাস করে, তাহাদিগকে "বেদিয়া" সাঁওতাল কহে। ইহারা খুব কাল, কিছু খর্ব ও স্থূল; মুখ প্রায় গোল, চেহারা অনেকটা কাফ্রিদের মত।

প্রত্যেক গ্রামে এক জন করিয়া (১) যোগ মাঝি আছে। বালকবালিকাদের বিবাহ ও ধর্মনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহাদের প্রধান কর্তব্য। (২) পরামাণিক জমির চাষ ও বন্টনের কর্তা। প্রত্যেককে ভালমন্দ দুই প্রকারের জমি বিভাগ করিয়া দেয়, ও অতিথিসৎকারের জন্য প্রত্যেকের নিকট কিছু কিছু চাঁদা আদায় করিয়া থাকে। ইহাদের কার্য পুরুষানুক্রমিক। (৩) গ্রাম্য পুরোহিতের নাম নৈয়া (নায়ক) বা লয়া। ইহারা বৃত্তিস্বরূপ কিছু জমি পাইয়া থাকে, তাহার উপস্বত্ব দ্বারা সকলকে বৎসরের দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়। চৈত্র মাসে শালের ফল (সরহাই) ও মহুয়ার ফুল ফুটিলে যে সরহুল উৎসব বা বহাপূজা হয়, তাহাতে প্রথম ভোজ, ও আশ্বিনমাসে ফসলের ভাবী মঙ্গলের জন্য মুয়মুরি উৎসবে দ্বিতীয় ভোজ দিতে হয়। পৌষ মাসে সরাই বা সরহাই পর্বে যোগমাঝি সকলকে আহারের নিমন্ত্রণ করে। গৃহপালিত পশুগণকে তৈল ও সিন্দুর মাখাইয়া হাঁড়িয়া নামক মদ্যপান করিতে দেয়। বন্-বনি ও হবি-অবি পরব যথাক্রমে শস্যবপন হইলে ও শস্য পাকিলে হইয়া থাকে। বন্ধুয়া উৎসব সর্বপেক্ষা বিখ্যাত। ২৭ পৌষ হইতে ৩০ শে পৌষ পর্যন্ত তিনদিন স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলে মিলিয়া অবিশ্রান্ত পান, ভোজন, নৃত্য গীতে অহোরাত্র যাপন করে; এই সময় যুবকযুবতীরা আপনাদের বিবাহের মনোমত পাত্রী পাত্র খুঁজিয়া লয়। প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে, কোথাও প্রত্যেক চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষে, গৃহস্বামী পরিবারের মঙ্গলকামনায় জহরথানে অর্থাৎ পূজার জন্য নির্দিষ্ট মুক্ত স্থানে সূর্যদেব সিংবঙ্গার সম্মুখে

প্রাতঃকালে ছাগবলি দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা আরও অনেক দেবতা, এমনকি, পূর্বপুরুষদিগেরও উপাসনা করিয়া থাকে। অনেক সাঁওতাল দুর্গাপূজা ও হোলির সময় হিন্দুদের সহিত যোগদান করিয়া মহোৎসব করিয়া থাকে।

সাঁওতাল পরবে যে ব্যক্তি পূজা ও বলিদানাদি সম্পন্ন করে, তাহাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হয়। ঢাকের বাদ্যে ধ্যানভঙ্গ হইলে দুলিতে থাকে, —যেন কোন দেবতা আসিয়া তাহার উত্তর দিতে থাকে। ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠন ও এমন ছট্‌ফট করিতে থাকে যে, প্রায়ই তাহার দেহ রক্তাক্ত হয়। এ জন্য রক্ত রাখিবার পাত্র পর্যন্ত সম্মুখে সজ্জিত থাকে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে সিংবঙ্গা (সূর্যদেবতা) সর্বপ্রধান দেবতা ঃ নিন্দা চান্দো বঙ্গা- (চন্দ্রদেবতা)-ও একজন প্রধান দেবতা। সৃষ্টি ও পালনকর্তা জাহির এরা (জাহিরমানের দেবতা) মনিকা, মারাং বুক (পর্বত) মরোকো টুরেকো (পঞ্চদেবতা ও এক দেবী একসঙ্গে), মাঝি হারাম, গোঁসাই এর প্রভৃতি অপদেবতারা রোগ বা দুর্ভিক্ষের সময় পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্বাঞ্চলে ব্যাঘ্রেরও উপাসনা হইয়া থাকে। কোনো সাঁওতালকে বাঘে লইয়া গেলে সেই পরিবারের কর্তা বাঘভূত বা বনসিং দেবতার পূজা করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র-চর্মে উপবেশন করিয়া শপথ করা সর্বপ্রধান শপথ।

পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে সাঁওতালদিগের মধ্যে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত। সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবী জলনিমগ্ন ছিল। সর্বত্র জল আর ভিন্ন কিছুই ছিল না। সিংবঙ্গা (সূর্য) ও চান্দো বঙ্গা (চন্দ্র) ঈশ্বরদ্বয় প্রথমে এক হংস-মিথুনের সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্রামের স্থান না দেখিয়া দেবতা-দ্বয়ের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, এবং জলমগ্ন পৃথিবীকে উঠাইয়া তাহাদের আবাসস্থান করিয়া দিলেন। ভূমণ্ডলের আকৃতি কূর্মাকার ও তদুপরি ঘাস ও শাক সবজিতে পরিবৃত ছিল। হংসী দুইটি ডিম্ব প্রসব করিলে একটির মধ্য হইতে "পিল্ চু হারাম" নামক একটি পুত্র ও অপরটির মধ্য হইতে "পিলচু বুধী" নামে এক কন্যা বাহির হইল। ইহারা পরস্পর ভাই ভগ্নী। কিন্তু শয়তান মারাং বুরু (পর্বত দেবতা) 'হাড়ী' বা 'হাঁড়ীয়া' নামক মদ্যপান ও 'রানু' নামক লতা আহার করাইয়া তাহাদের সে সম্পর্ক ভুলাইয়া দিলে, তাহাদের সাত পুত্র ও আট কন্যা জন্মিল। এই সপ্ত পুত্র সপ্ত কন্যার পরিগ্রহণ করিল। ক্রমে তাহারা নানা দূরদেশে গেল, এবং তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইল। অষ্টম কন্যা বরাবর অবিবাহিতা থাকিয়া "মেদি মাই" নামে পূজিতা হইতে লাগিল।

রীতিনীতি

সন্তান জন্মিবার পর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম দিবসে এক প্রকার ফেন প্রস্তুত করিয়া সিংবঙ্গা বা মারাংবুরুকে তদ্দ্বারা স্নান করাইয়া পুনরায় তাহা আহারের নিমিত্ত রাখিয়া দেয়। প্রসূতির স্নান ও শিশু সহ পরিবারস্থ সকলেই ক্ষৌর-কর্ম ও স্নান সমাপ্ত হইলে, সকলে মিলিয়া তাহা আহার করিয়া শুদ্ধ হয়। ইহাকে নর্ত উৎসব কহে। পিতামহের নামানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখা হয়, অন্যান্য বালকেরা অপরাপর আত্মীয়ের নাম প্রাপ্ত হয়। শিশুসন্তান জন্মিবার পর এক বৎসরের মধ্যে তাহার কর্ণবেধ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বালক বালিকাদের বসিবার পৃথক স্থান নাই। বালিকারাও অবাধে হাটে যায়, উৎসব ও গ্রাম্যনৃত্যে যোগদান করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যুবক যুবতীর এক সঙ্গে ভ্রমণ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

নৃত্য

যোগ মাঝির বাটির সম্মুখে খানিকটা অনাবৃত স্থান থাকে। তথায় সাঁওতাল যুবকেরা সান্ধ্য আহারের পর নৃত্যের জন্য সমবেত হয়। তাহাদের মাদোল ধ্বনি ও বংশীরব শুনিতে পাইলে যুবতীরা কেশদাম বিন্যস্ত করিয়া ও তাহাতে ফুল গুঁজিয়া নৃত্যসভায় উপস্থিত হয়। মদিরামত্ত যুবকেরা বৃক্ষপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ বা পুষ্পস্তবক কেশে বাধিয়া মাদোল ও বংশী বাজাইয়া উল্লম্ফন ভূমিলুণ্ঠন প্রভৃতি বিবিধপ্রকার নৃত্য করিতে থাকে, এবং যুবতীরা পাশাপাশি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া চক্রাকারে যুবকগণকে বেষ্টন করিয়া, পদ ও শরীর ঈষৎ দোলাইয়া, করতাল বাজাইতে বাজাইতে নৃত্যের সহিত মৃদু মধুর সংগীত করিতে থাকে।

বিবাহ

ধনী সাঁওতালেরা সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব সন্তানগণের বিবাহ দেয় ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে বালক বালিকারা যৌবনে পদার্পণ করিয়া আপনারাই মনোমত পাত্র পাত্রী খুঁজিয়া লয়। পিতা মাতা পাত্র বা পাত্রী খুঁজিয়া বিবাহ দিলে ইহারা গৌরবজনক মনে করে। বর অবস্থাপন্ন হইলে পাত্রীর পিতাকে পণস্বরূপ ১৬৲ টাকা নগদ ও স্ত্রীলোকদের জন্য এগার হইতে বার হাত দীর্ঘ লাল পেড়ে সাদা রঙের শাড়ি দিয়া থাকে। শ্যালকের জন্যও পাঁচ হইতে সাত হাত পরিমিত মার্কিনের ধুতি ও কনের জন্য হরিদ্রারঞ্জিত সাড়ে নয় হাত মার্কিনের শাড়ি দিতে হয়। কনের শাড়ির বহর বয়সানুসারে কমবেশি হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে নয় হাত হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু, বরকে কিছু গহনাও দিতে হয়। তাহার মধ্যে একটি রৌপ্যনির্মিত হওয়া আবশ্যক। নিতান্ত গরিব হইলে চারি আনা মূল্যের একটি রৌপ্য অঙ্গুরীয়ক দিলেও চলিতে পারে। দরিদ্র সাঁওতালকে ৩৲ বা ৫৲ বা ৭৲ বা ৯৲ টাকা নগদ, তিন খানি শাড়ি, শ্যালকের জন্য একখানি ধুতি ও শ্বাশুড়ির নিমিত্ত একখানি শাড়ি দিতে হয়।

দেনা পাওনা স্থির হইলে বিবাহের দিন নির্দিষ্ট হয়, এবং সেই দিন হইতে যত দিন অবশিষ্ট থাকে, দুই গাছি রজ্জুতে সেই কয়টি গ্রন্থি দিয়া এক একগাছি পাত্র পাত্রীর নিকট রাখিয়া দেয়। তাহারা প্রত্যহ সকালে একটি গিরা খুলিয়া বিবাহের দিন ঠিক করিয়া লয়। গরিবের বরযাত্রী ৩/৪টি ও অবস্থাপন্ন লোকের অনেক বেশি হইয়া থাকে। নির্ধারিত দিনে বর বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া বিবিধ বাদ্যের সহিত কনের বাটিতে যাত্রা করে। গন্তব্য গ্রামের সন্নিহিত হইলে যোগমাঝি ও স্ত্রীলোকেরা পা ধুইবার জল লইয়া উপস্থিত হয়। পরে বর ব্যতীত অন্যান্য যাত্রীরা কন্যাকর্তার বাটিতে গিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য করিতে থাকে। রাত্রিশেষে বর কোন সঙ্গীর কোলে উঠিয়া কোনের বাটিতে আইসে। পাত্রীকেও সেই সময় ভ্রাতা কি ভগ্নীপতি ঝুড়িতে তুলিয়া লইয়া আইসে। বর পূর্বাস্য ও কনে পশ্চিমমুখী হইয়া আসনে উপবেশন করে। দুইটি জলপূর্ণ পাত্রে আম্রপল্লব রাখিয়া একটি বর কনের সম্মুখে রাখিলে, বর আম্রপল্লব দ্বারা কনের সর্বাঙ্গে জল ছিটাইয়া দেয়, পরে কনেও সেইরূপ বরের গাত্রে জলসেচন করে। ইহার পরে অবশ্য কর্তব্য সিন্দুরদান। বর কনের ললাটে ও শিরোদেশে পাঁচবার প্রচুরপরিমাণে সিন্দুর মাখাইয়া দেয়, এবং সভাস্থ সকলে আনন্দধ্বনি করিতে থাকে। বর কনে সমস্ত দিন উপবাসের পর এই সময়ে এক সঙ্গে আহার করে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের আহার এই প্রথম।

পাত্রীকে বাটি লইয়া যাইবার সময় অবস্থানুসারে চতুর্দোলে, পাল্কীতে বা পদব্রজে লইয়া

যায়। ইহাদের বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তবে যোগমাঝি কর্মের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকে। সিন্দুরদান ও একত্রভোজন, এই দুইটিই বিবাহের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সাঁওতাল পুরুষ কোনও সাঁওতাল-কুমারীর ললাটে সিন্দুর দিলে তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য। অন্য জাতীয় কেহ ওরূপ করিলে, হয় তাহাকে বিবাহ করিবে, না হয় আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবে। বরকন্যার একত্রভোজনের অর্থ এই যে, কন্যা আর পিতার পরিবারভুক্ত রহিল না, বরের পরিবারভুক্ত হইল। রমণীরা ঘোমটা দেয় না। সাঁওতালেরা এক সময় তিনটি ভার্যা রাখিতে পারে, কিন্তু পূর্বপত্নীর সন্তান না হইলে ভার্যার সংখ্যা ইচ্ছানুসারে বাড়াইতে পারে। ধনীরা অনেক সময় নিয়মভঙ্গ করিয়া ৬/৭ টি স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। পত্নীকে ডাইনি বা ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ হইলে, গৃহের বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সাঁওতাল স্ত্রীর পক্ষে ভাসুরের ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শিকার

সাঁওতালরা অনেক সময় আলস্যে দিন কাটাইলেও পরিষ্কার ঋতুতে বড়ই আমোদে কাল কাটায়। চাষ, বংশীবাদন, বালিকাদের সহিত নৃত্য ও মৃগয়ায় সর্বদা লিপ্ত থাকে। শিকারের সময় ইহারা দলে দলে তীর, ধনুক, টাঙ্গি ও কুকুর সঙ্গে লইয়া জঙ্গল ঘিরিয়া হরিণ, শূকর ও পক্ষী শিকার করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে অরণ্যের আবরণ শুষ্ক ও বিচ্ছিন্ন হয়, সুতরাং গ্রীষ্ম ঋতুই মৃগয়ার প্রশস্ত সময়। বাঘ ও ভালুক প্রায়ই এরূপভাবে শিকার করে না। যে ব্যক্তি লক্ষ্যের প্রতি সর্বপ্রথমে আঘাত করে, সেই জন্তুকে অপর কেহ বধ করিলেও, উহা তাহারই প্রাপ্য। ইহারা প্রায় সর্বজীবের মাংস খায়। অনেকে কুকুর, শৃগাল, চিল ও বিষাক্ত সর্প খাইতে চাহে না। মুরগী, শূকর, গরু ও নির্বিষ সর্প প্রভৃতি সমস্তই ইহাদের খাদ্য। অশ্বত্থ ও বটের পাতা, কচু গাছ ও নানা প্রকারের শাক রন্ধন করিয়া ভোজন করে। এমনকি, মৃত জীবের মাংসও ইহাদের পরিত্যজ্য নহে। কিন্তু অন্যজাতীয় লোকের প্রস্তুত অন্ন কিছুতেই আহার করে না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সাঁওতাল মরিলে শবদেহ দগ্ধ করে। দাহ করিবার পদ্ধতি অনেকটা হিন্দুর মত। মুখাগ্নি, দামোদর নদে অস্থিনিক্ষেপ, শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় ভূতের দৃষ্টিনিবারণের নিমিত্ত খই ও তুলার বীচি চতুর্দিকে ছড়ান প্রভৃতি হিন্দুর রীতি ইহারা অবলম্বন করিয়া থাকে। সাঁওতালরা পরকাল মানে না, সুতরাং অস্থি দামোদরে নিক্ষেপ ভক্তি ও ভালবাসার পরিচায়কমাত্র। এক বৎসরের অল্পবয়স্ক শিশু মরিলে তাহাকে সমাহিত করে। কোন সাঁওতাল বিসূচিকা বা বসন্তে মরিলে যত দিন সেই সংক্রামক রোগ গ্রামে প্রবল থাকে, তত দিন তাহাকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখে, পরে দেশে রোগের শান্তি হইলে, শবদেহ তুলিয়া দগ্ধ করা হয়।

কোনও সাঁওতালের মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে সম-ভাগে বিভক্ত হয়। কন্যা পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী নহে, কিন্তু কন্যা প্রায়ই একটি গাভী পায়। পিতার জীবিতাবস্থায় কোন পুত্র পৃথক হইলে পিতার মৃত্যুর পরে পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার থাকে না; অন্যান্য পুত্রেরা পিতৃ-সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়। অন্য কেহ না থাকিলে পৃথগন্ন পুত্রই বিষয় পাইয়া থাকে। প্রথম উত্তরাধিকারী না থাকিলে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয় না থাকিলে তৃতীয়, ইত্যাদিক্রমে দায়াধিকার চলিয়া থাকে।

মৃত ব্যক্তির পুরুষ জ্ঞাতি থাকিলে দৌহিত্র সম্পত্তির অধিকারী হয় না। সাঁওতালদিগের মধ্যে উইল করিবার প্রথা নাই।

ইহারা দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা—

(১) হান্দসা, (২) কিস্কু (৩) মর্মু (৪) হোমরাও (৫) টুডু (৬) সরেম বা সারণ (৭) মারান্তি (৮) বস্কি (৯) বেসেরা (১০) চোরেন (১১) পাওরিয়া বা মর্লি (১২) সাঁওয়ালে বা করওয়ার। ইহাদের নামের শেষে উল্লিখিত কোন একটি পদবী (বা উপাধি) যোজিত হয়। কিন্তু সাধারণত ; নামের শেষে "মাঝি" উপাধিই অধিক প্রচলিত। প্রথমোক্ত সাত শ্রেণি বংশমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদিগের সগোত্র বিবাহের ন্যায় ইহাদের এক শ্রেণির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

সাহিত্য ১৩০৭ আষাঢ় ও শ্রাবণ

দেশের অবস্থা

সাঁওতাল পরগণা অতি গরিবের দেশ। প্রকৃতি দেবী ইহাকে বিচিত্র ভূষণে সজিত করিলেও ইহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। এখানকার জলবায়ু উৎকৃষ্ট হইলেও শীতাতপ দুইই প্রবল। অধিবাসীদের অধিকাংশই নির্ধন ; যাহারা সঙ্গতিপন্ন, তাহারাও দরিদ্রের ন্যায় দিনযাপন করে। ইহারা অপ্রচুর খাদ্য খাইয়া সামান্য কুটীরে বাস করে, মলিন ও গ্রন্থিযুক্ত পরিধেয় বস্ত্রে কোন মতে দেহ ও লজ্জা রক্ষা করে। লেখাপড়া অতি অল্প লোকেই জানে ; ন্যায় অন্যায় ও হিতাহিতের বোধ প্রকৃতি যাহা দিয়াছেন, তাহা ভিন্ন বড় বেশি নাই। সমদ্ধিশালী নগরী, বিবিধবৃক্ষসমাকীর্ণ ধনধান্যভরা জনপদ, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ভদ্রলোক ও তাহাদের আচার ব্যবহার এখানকার অতি অল্প লোকেই দেখিয়াছে ; সুতরাং ইহারা যেমন অনভিজ্ঞ ও অপরিণতবুদ্ধি, তেমনই ভীরু। তবে, যদি "সন্তোষ"কে "রত্ন" বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ধনী বলা যাইতে পারে ; কারণ, সুখ ও উন্নতির অভিজ্ঞতা না থাকায় ইহাদের অন্তরে উচ্চাভিলাষ প্রায়ই স্থান পায় না, সুতরাং সন্তুষ্টচিত্ত বলিয়া এক প্রকার সুখী বলা যাইতে পারে। ইহারা ২/৩ আনা পয়সা পাইলে সমস্ত দিন এক পয়সার মুড়ি খাইয়া হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন অনেক দরিদ্র আছে, যাহারা পরিত্যক্ত ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন দেখিতে পাইলে কুকুরের ন্যায় পরিতুষ্ট হইয়া যত্নের সহিত তাহা খুঁটিয়া খায়। মহাজনেরা প্রজাদিগকে বপনের জন্য ধান্য কর্জ দিয়া ফসলের সময় দেড় গুণ বা দ্বিগুণ শস্য গ্রহণ করে। যদি শস্য ভালরূপ না জন্মে, তবে বাকি ধান্য পর বৎসরে সুদ সহ আদায় করিয়া থাকে। এই প্রকারে বিদেশীয় ধনী মহাজনেরা টাকা বা ধান্য ধার দিয়া প্রজাগণকে চিরঋণজালে জড়িত করিয়া অবশেষে তাহাদের জমির উপস্বত্ব আপনারা ভোগ করিতে থাকে। অনেক প্রজা এইরূপে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। এবংবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া ১৫/২০ বৎসর পূর্বে গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে যে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা নির্বাপিত করিতে গবর্মেন্টকে অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহার পর হইতে ইহাদের স্বপক্ষে আইনের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান বর্ষের সেটেল্‌মেন্ট আইনানুসারে সাঁওতাল পরগণার কেহই আপনার জোত জমি হস্তান্তর করিতে পারিবে না। মহাজনেরা ঋণের দেনায় অধমর্ণের অস্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশ নিলাম করিয়া প্রাপ্য টাকা অদায় করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার জমি বিক্রয়ের অধিকার নাই। অধিবাসীরা নিঃস্ব বলিয়া মকর্দ্দমার খরচও এখানে অনেক অল্প ; কেন না, হাকিমদিগের অনুমতি না হইলে বড় বড় ব্যারিস্টারেরাও আদালতে প্রবেশ করিতে পান না ; এবং অনেক সময় উকিল মোক্তার ব্যতিরেকে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। দরখাস্ত লেখককে (petition writer) চারি আনা দিয়া নালিসের কারণ বুঝাইয়া দিলে, সে মুসাবিদা করিয়া একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিতে বাধ্য। অনেক সময় সাঁওতালদিগের মৌখিক দরখাস্তও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের চাষের জমির খাজনাও অনেক কম। কিন্তু তথাপি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। ইহারা নিতান্ত অলস, অপব্যয়ী ও মদিরা-সক্ত। নিজের পানভোজনের নিমিত্ত যতটুকু পরিশ্রম আবশ্যক, তাহার বেশি কিছুতেই করিতে চাহে না, এবং সঞ্চিত অর্থ না ফুরাইলে পুনরায় কর্মে প্রবৃত্ত হয় না।

সাঁওতাল পরগণায় জমিদারের প্রভুত্ব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রজাদিগের সহিত জমিদারের সম্বন্ধও অল্প। "প্রধান" খাজনা আদায় করিয়া না দিলে জমিদারের আদায়ের ক্ষমতা নাই ; জমিদারের খাসমহল না হইলে প্রজার নিকট হইতে তাহার কর আদায়ের অধিকার নাই। আবার প্রধানও গবর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত, সুতরাং আইনত চুক্তিভঙ্গ না করিলে মকদ্দমা করিয়া তাহাকে তাড়াইবারও যো নাই। গরিব প্রজার উপর অত্যাচার না হয়, এমন নহে ; কিন্তু নালিশ হইলে তাহাদের উপর বিচারকর্তাদিগের স্বাভাবিক দয়া ও বিশ্বাসবশত অনেক সম্ভ্রান্ত লোককেও লাঞ্ছিত হইতে হয়। মহুয়া গাছ এখানকার নিজস্ব। ইহার ফুল শুষ্ক করিয়া রাখিলে সংবৎসরেও নষ্ট হয় না। উহা সুমিষ্ট কিন্তু সুগন্ধ নহে ; গরিব লোকেরা ফল খাইয়া অনেক দিন কাটাইতে পারে ; অধিকন্তু উহা দ্বারা মদও প্রস্তত হয়। উহার ফল তরকারি-রূপে আহার করা যায়, এবং তাহা হইতে ঘৃতের ন্যায় এক প্রকার তৈল প্রস্তত হয়। এই বৃক্ষ বার্ষিক ১ আনা খাজনায় প্রজাদিগকে বিলি করিয়া দেওয়া হয় ; কোন স্থলে প্রজাদিগকে বিনা করেও দেওয়া হইয়া থাকে। এই মহোপকারী বৃক্ষ না মরিলে কাহারও কাটিবার অধিকার নাই ; কাটিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। জমিদারের শাল প্রভৃতির "রাখা জঙ্গল" (reserve forest) আছে। তাহা হইতেও তিনি ইচ্ছামত গাছ কাটিতে পারেন না। রাস্তা ঘাটও অনেক সময় তাহাকে মেরামত করিয়া দিতে হয়।

বাণিজ্য, রেলওয়ে, রাজপথ

এ দেশে বাণিজ্যস্থান অধিক নাই। লুপলাইনের ধারে সাহেবগঞ্জ ও রাজমহল, এই দুইটি প্রধান বন্দর। সাহেবগঞ্জ, রেলওয়ে লাইন ও প্রশস্ত নদীতীরে অবস্থিত হওয়ায়, এখানে জলপথ ও স্থলপথে নানা দেশ হইতে দ্রব্যাদির আমদানি ও রপ্তানি হইতেছে। পূর্বে ভাগলপুর, পীরপৈঁতি, কাহালগাঁ প্রভৃতি স্থানে যে সকল কারবার চলিত, এখন সে সকল সাহেবগঞ্জ একচোটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। নদী ও রেলের ধারে অবস্থিত বলিয়া বিদেশের সহিত ইহার বাণিজ্যের যত সম্পর্ক, সাঁওতাল পরগণার অন্যান্য প্রদেশের সহিত তত নয়। সাঁওতাল পরগণার পূর্ব দিক দিয়া লুপলাইন ও পশ্চিম দিক দিয়া কর্ডলাইন চলিয়া গিয়াছে। লুপলাইনের স্টেশনগুলির নাম—পাকুড়, বিজাপুর, বহাওয়া, তিনপাহাড়, রাজমহল, মহারাজপুর ও সাহেবগঞ্জ। কর্ডলাইনের স্টেশন যথা,—জামতারা, কর্মাটার, মধুপুর ও বৈদ্যনাথ। এই দুইটি প্রধান লাইন ব্যতীত মধুপুর হইতে হাজারিবাগের কহরবাড়ি পর্যন্ত আর একটি ক্ষুদ্র রেলওয়ে লাইন খোলা হইয়াছে। তাহার ধারে সাঁওতাল পরগণার জগদীশপুর নামে একটি স্টেশন আছে। সংপ্রতি ভাগলপুর হইতে চৌসী হইয়া দুমকা পর্যন্ত

একটি এবং চৌসী হইতে দেওঘর ও গোডা পর্যন্ত আর একটি লাইন খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। তাহা হইলে, এ জেলার প্রধান প্রধান নগর ও মহকুমাগুলি পরস্পর এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া যাইবে। কিন্তু এখন টাকায় যে দুই সের ঘৃত ও কুড়ি সের দুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহা তখন উপকথা বলিয়া বোধ হইবে। এই জেলায় পাঁচটি মহকুমা আছে ; তাহাদের নাম, নয়াদুমকা বা সদর, রাজমহল, দেওঘর, গোড়ডা এবং পাকুড়। এতভিন্ন কুমারাবাদ, নলহাটি, ননীহাট, সরাইয়াঘাট, রোহিণী, সারোয়া, কোরোন, কুণ্ডিত প্রভৃতি নগরের প্রত্যেকটিতে প্রায় দুই সহস্রের অধিক লোকের বাস।

এ জেলায় ভাগলপুর সুরি রোড নামক রাস্তাটি পাকা। অন্যান্যগুলির অধিকাংশই কাঁচা। বড় বড় কয়েকটি রাজপথের নাম ও পরিমাণ দেওয়া যাইতেছে ; যথা,—পীরপৈঁতি গোড়ডা রোড—৩১ মাইল। দেওঘর জর্মুতি রোড ২৬ মাইল। সাহেবগঞ্জ বারাহাট রোড —৩১ মাইল। মুরারী অমর পাড়া রোড—২০ মাইল। পাকুড় হিরাপুর রোড—১২ মাইল।

অজয়, জয়ন্তী, পাত্রো, কাজিয়া, হার্ণা প্রভৃতি নদীতে বন্যা আসিয়া থাকে। গত বৎসর শেষোক্ত নদীদ্বয়ের বহুদূরব্যাপী জলপ্লাবনে অনেক গৃহ, মানুষ ও পশু নষ্ট হইয়াছে। বন্যার সময় ডাক ও লোকের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়।

শিক্ষা

দুমকা, দেওঘর, পাকুড় ও জামতারায় এক একটি এন্ট্রেন্স স্কুল আছে। উক্ত স্থানচতুষ্টয়ের আদালতের ভাষা বাংলা হওয়ায় তত্রত্য স্কুলেও অনুবাদ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় হইয়া থাকে। দেওঘর ও দুমকার বিদ্যালয় দুটি সমধিক প্রসিদ্ধ। গতপূর্ব বৎসর দুমকা হইতে একটি ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়াছিল। ছোট ছোট স্কুল অনেক আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত তুলনায় এখানকার শিক্ষা অনেক নিম্ন সোপানে অবস্থিত। সাঁওতালেরা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া সরকারি কর্মে নিযুক্ত হইয়া পোষাক ও কথাবার্তায় হিন্দুদিগের অনুকরণ করিতেছে। অশিক্ষিত সাঁওতালরা স্থানীয় তন্তুবায় নির্মিত একহাত বহরের ক্ষুদ্র কাপড় পরিধান করে। কিন্তু এই জাতীয় অনেকে লেখাপড়া শিখিয়া পরিষ্কার বিলাতি কাপড় পরিধান করিতে ও মস্তকে টিকি রাখিতে শিখিয়াছে। অল্পকাল প্রায় সকলেই হিন্দুদিগের নামানুসারে পুত্র কন্যার নাম রাখিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ সকলেই বাংলা ও হিন্দী ভাষায় কথাবার্তা কহিতে পারে ; কিন্তু পাহাড়ের নিকটবর্তী যে সকল সাঁওতাল হিন্দুগণ হইতে অনেক দূরে বাস করে, তাহারা অনেক বিষয় সঙ্কেত ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কতিপয় মিশনারি গোড়ডার অন্তঃপাতী পাখ্‌রা নামক স্থানে প্রাইমারী স্কুলে স্থাপিত করিয়া, তৎসংলগ্ন ছাত্রনিবাসে কয়েকটি পাহাড়িয়া বালক রাখিয়া, লেখাপড়া ও ধর্মশিক্ষা দিতেছেন। তথাকার পাহাড়িয়া বালকদিকের প্রকৃতি ও ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। উহারা প্রতি রবিবার খ্রিস্টিয় উপাসনামন্দিরে যাইয়া অপরের দেখাদেখি বেঞ্চির উপর উপবেশন করে, সময়মত উঠিয়া দাঁড়ায়, কখনও বা জানু পাতিয়া হেঁটমুণ্ডে কি ভাবিতে থাকে। সমভূমিতে মনুষ্যের স্বহস্তরোপিত উদ্যান ও মনোহর নরনারীর বিচিত্র বেশভূষা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের পশুপ্রকৃতিতে যে কালক্রমে কোমলতার সঞ্চার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু গিরিবাসী পাহাড়িয়ারা এখনও পূর্ববৎ অজ্ঞান ও অসভ্য রহিয়াছে। শুনা যায়, বর্তমানবর্ষে গবর্মেন্টের কোন আমিন পাহাড়িয়াদিগের

জমি জরিপ করিতে গেলে, স্থানবিশেষের পাহাড়িয়ারা সমবেত হইয়া তাহাকে নিষেধ করিয়াও যখন দেখিল যে, সে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে, তখন তাহারা আমিনকে রজ্জু দ্বারা গাছের সহিত বন্ধন করিয়া নির্যাতন করিতে ত্রুটি করিল না। কোন কোন স্থলে আমিন অসভ্যদিগের তিরস্কারে ভীত হইয়া তাহাদের ইচ্ছামত স্বত্ব লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। আগামী ১৯০১ সালে দামিনীকোট পাহাড়ের জরিপ আরম্ভ হইবে। তখন অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

এখানকার লোক গরিব হইলেও ডাকাতি বা খুন না হইয়া থাকে, এমন নয়। অনেক সময় কুসংস্কারে বশবর্তী হইয়া ইহারা লোকদিগকে নির্দয় ভাবে হত্যা করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর পূর্বে নিম্বু মাঝি নামক এক সাঁওতাল কোন দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এক অতি বীভৎস প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিল। সে এক অপরিচিত লোককে প্রতারণাপূর্বক পাহাড়ের নিকটে আনিয়া আরও তিন জন সহচরের সাহায্যে উহাকে ভীষণরূপে বলিদান করিয়া, রোগমুক্ত হইবার আশায়, হতভাগ্যের শোণিতে স্নান করিল। সে প্রথমে লোকটির মুখের মধ্যে কাপড় পুরিয়া স্বর বন্ধ করিয়া হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিল, এবং নিজের ক্ষুর দিয়া উহার কেশের কিয়দংশ চাঁচিয়া লইল। অত্যাচারী দলের মধ্যে একজন পাহাড়িয়া ছিল ; সে ঘৃত, আতপ চাউল, ও সিঁদুরের দ্বারা এক প্রকার পূজা সম্পন্ন করিলে, অপর তিন জন সাঁওতাল হতভাগ্যের গলায় রজ্জু বাঁধিয়া একটা বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিল। মৃত্যুর সময় মুখ বন্ধ করা অবিধি জানিয়া নিম্বু তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। পরে অপর দুজন সাঁওতাল বেচারীর পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলে নিম্বু স্বীয় তরবারি দ্বারা উহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। বিচারে নিম্বুর ফাঁসি ও অপর দুই জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছিল। *সাহিত্য ১৩০৭ মাঘ*

কালীপদ ঘোষ

সাঁওতাল জাতি

আর্য ও অনার্য জাতির সমন্বয়েই ভারতের জাতীয়তার সৃষ্টি। সেই অনার্যজাতিরই একটা শাখা হচ্ছে এই সাঁওতাল জাতি। এদের বাসস্থান হচ্ছে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে। এই সব পার্বত্য প্রদেশের গভীর শালবনের মাঝেই এরা নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি রচনা করেছে। হস্তী, ব্যাঘ্র ভল্লুকের দন্ত উপেক্ষা করে এরা তাদের সঙ্গে এক জায়গায় বাস করছে। অসীম সাহসে এরা পাহাড়ের গভীর জঙ্গল চষে বেড়াচ্ছে। পাথরের বুক চিরে এরা নিজেদের আহার্য তৈরি করছে। আমরা এদের এখনও অসভ্য জংলী বলেই জানি, কারণ আমাদের মতো সভ্যতার আলোক এরা এখনও পায়নি।

এদের গ্রামগুলি ঘনশ্যাম শালবনের মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখায় যেন এক একখানি চমৎকার ছবি। গ্রামগুলি খুব ছোট ছোট, প্রায় বিশ-ত্রিশ ঘরের বেশি লোক কোন গ্রামে নেই। তার মাঝে ছোট ছোট কুটিরগুলি লাল, কাল, সাদা প্রভৃতি রঙে রাঙান। সেই কুটিরগুলি এত ছোট যে তাতে যে মানুষ বাস করতে পারে তা ধারণা হয় না। ঘরগুলি উঠানসুদ্ধ অতি পরিষ্কার, ঝরঝর,তরতর করচে। কোথাও আবর্জনার লেশমাত্র নেই। এদের প্রত্যেক পরবেই এরা ঘরদুয়ার মাটি দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে। আর খড় পুড়িয়ে কাল রং লাল সাদা মাটি দিয়ে লাল সাদ রং করে, তারা ঘরগুলিকে রাঙায়। জংলী হলেও এদের সৌন্দর্যজ্ঞান কম নয়।

এদের গায়ের রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, শরীরের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এরা সত্যবাদী, সরল, অকপট, কষ্টসহিষ্ণু। সারাদিনের পরিশ্রমে এরা যা পায় তাই দিয়েই সংসার যাত্রা নির্বাহ করে, পরের দ্রব্য অপহরণ করে এরা খাবার সংস্থান করতে চায় না। ভবিষ্যতের ভাবনা এদের কল্পনায় আসে না, কোন গতিকে দৈনিক আহার্য জুটলেই এরা আর কিছু চায় না। এদের অভাব অভিযোগও বিশেষ নেই, কারণ সভ্যতার স্পর্শ এরা এখনও পায়নি, তবে যাদের মধ্যে সভ্যতা ঢুকেছে। তারাই বিগড়ে গেছে।

এরা অসভ্যজাতি হলেও শান্তিপ্রিয়, কলহবিবাদের মধ্যে এরা বড় থাকতে চায় না। এরা শাসন মেনে চলে। গবর্ণমেন্টকে এদের জন্য কিছু কিছু পৃথক পৃথক আইন তৈরি করতে হয়েছে। ময়ূরভঞ্জের সাঁওতালরা দেখেছি রাজকর্মচারীদের খুব ভয় করে, কারণ পুলিশের অত্যাচার সেখানে বড় বেশি। সেখানকার প্রথা অনুসারে রাজার কাছে তাদের বেগার দিতে হয়, তাকে বলে 'বেঠিয়া'—সারাদিন না খেয়ে খাটবে। দিনান্তে যদি একটা পয়সা পেলে ত খুব খুশি। এ রকম নিরীহ হলেও কিন্তু রাগলে তাদের জ্ঞান থাকে না, তখন কাউকে হত্যা করতে তাদের মোটেই বাধে না।

এদের মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা নাই, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবল। ঠিক পাশ্চাত্য স্বাধীনতা না হলেও তার চেয়ে কিছু কমও নয়। এরা মেয়ে পুরুষ উভয়েই খাটে। আমার মনে হয় পুরুষদের চাইতে বেশি খাটতে পারে মেয়েরা। মেয়েরা দেখতে সুন্দর না হলেও সুশ্রী। গায়ের গাঢ়

কৃষ্ণ রংটা বাদ দিলে এরা যে কোন দেশের সুন্দরীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। এদের গড়ন অতি চমৎকার নিটোল, নধর, কটিদেশ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। বোধ হয় এত খাটে বলেই এত সুন্দর এদের গড়ন। মেয়েদের মধ্যে পাতলা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এদের পরিধানে মোটা ছোটো কাপড়, হাঁটুর নিচে নামে না, আর গায়ে ঢাকা দিবার জন্যে আর একখানা ছোট কাপড়, মাথায় এরা কাপড় দেয় না। এদের চুল বাঁধা—মাঝে সিঁথি কেটে চুলের গোছা পেছনে ঘুরিয়ে চুলের মধ্যে গুঁজে রাখে। এই জন্যেই বোধ হয় চুলগুলি একহাতের বেশি বড় হয় না। তা না হলেও চুলগুলি যেমনি ঘন তেমনি কৃষ্ণবর্ণ। ফুল এরা অত্যন্ত ভালবাসে, ফুল পেলেই খোঁপায় গুঁজে রাখে। ফুল অভাবে গাছের বাহারে পাতাই গুঁজে গুঁজে রাখে। ধানের শীর্ষের মত সবুজ পাতাগুলি খোঁপায় দুলিয়ে এরা যখন সারে সারে চলে তখন মনে হয় যেন হাস্যময়ী বনবালারা বেড়াতে চলেছে। এদের গহনার মধ্যে হাতে শাখা, খাড়ু, পায়ে নুপুরের মত নিরেট কাঁসার মল, আর গলায় পরার মালা। কানে তাদের ছেঁদা থাকে, কিন্তু তাতে শুধু কাঠ গুঁজে রাখে, কোন গয়না পরে না। আমাদের গয়না পরা যেমন এয়োতির লক্ষণ, এদেরও তাই, তবে সধবা অবস্থায় হাত ফাঁকা করতেও এদের কোন আপত্তি নেই,—এদের সিন্দুর পরাও ঠিক এই ধরনের। তবে বিধবারা শুধু হাতেই থাকে। এদের বর্ণ কৃষ্ণ, কিন্তু এই কৃষ্ণ আবরণের ভিতর অতি সুন্দর হৃদয় আছে। এরা স্নেহময়ী, অতিথিপরায়ণা, অতি সরলা। কোন পুরুষের কাছে যেতে এরা সঙ্কুচিত হয় না, তাদের সঙ্গে অবাধে কথা কইতে পারে। এদের মুখে হাসিটি লেগেই আছে। শত অভাব-অভিযোগের মধ্যেও এদের হাসি ম্লান হয় না। সারাদিন পরিশ্রম করে শান্ত গোধুলি বেলায় যখন এরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে মিহি সুরে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরে তখন এদের দেখলে মনে হয় না এরা অবসন্ন, হাসির উচ্ছ্বসিত বন্যায় যেন সমস্ত ক্লান্তি সমস্ত অবসাদ কোথায় ডুবিয়া দিয়েছে।

সাঁওতাল পুরুষরাও প্রায় সদানন্দময়। মনে হয় যেন দুঃখ এদের কিছু করতে পারে না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর এরা রাস্তায় বাঁশি কিম্বা একতারা বাজাতে বাজাতে ঘরে ফেরে। পুরুষদের পরিধানের মধ্যে শুধু এক কাপড়, অনেকে আবার কোপীন এঁটেই থাকে। এরা গলায় পলার মালা পরে, কেউ কেউ আবার হাতে সরু বালা পরে। আগে এরা মাথায় লম্বা লম্বা চুল রাখতো এখন অনেকে আমাদের মত ছআনা দশআনা চুল কাঁটতে শিখেছে। জুতা, ছাতা, জামা এদের মধ্যে চলতে শুরু হয়েছে। পূর্বে এদের কাপড় ছিল ; নিজেদের হাতে বোনা মোটা কাপড়, এখন অনেক মিহি বিলাতি কাপড় পর্যন্ত পরতে সুরু করেছে।

এদের ঘরের আসবারের মধ্যে দু একটা কাঁসার বাটি আর মাটির হাঁড়ি। শোবার বিছানার মধ্যে শাল কাঠের রলার তৈরি আর বাবুই দড়ির বোনা খাটিয়া আর পাতার চাটাই কি কাঁথা। বালিস এরা ব্যবহার করতে জানে না।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে মহিষ গরু মুরগি ছাগল, ভেড়া, মহিষ আর গরু শুধু চাষ করবার জন্য । এরা গাই-বলদে চষে। গাই এর দুধ কখনও দোয় না—এদের ধারণা তা হলে বাছুর বাঁচবে না। মুরগি এদের খুব প্রিয় খাদ্য।

চাল থেকে এরা একরকম মদ তৈরি করে, তাকে এরা বলে 'হাঁড়িয়া'। এটা হচ্ছে সাধারণ মদ—আমাদের দেশের যেমন 'পাচুই' মদ। হাঁড়িয়া ছাড়া মহুয়া থেকে একরকম মদ হয়, তাকে এরা বলে 'পরুয়া'। এটা হচ্ছে চোয়ান মদ। পরুয়ার চেয়েও এক রকম ভাল মদ এরা করে, তাকে বলে 'রসি', আরও একরকম মদ এরা করে, তাকে বলে 'ফুলি', মদ এদের বড় প্রিয়। ভাতের চেয়েও এরা মদ বেশি ভালবাসে। যদি কারু কাছে এরা পয়সা চায় তবে বলবে না যে চাল কিনব, বলবে হাঁড়িয়া খাব। মেয়ে পুরুষ সমানভাবেই হাঁড়িয়া খায়, তাতে কোনো সময়ে বাধে না।

এদের নৃত্য, কলা কৌশলে পূর্ণ না হলেও মন্দ নয়। মেয়েরা একজনের পর আর একজন পেছনে কোমরের কাছে দুহাতে দুদিকে দুজনের হাত ধরে শ্রেণিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে নৃত্য করে। বাজনার মধ্যে মাদল আর একটা প্রকাণ্ড নাগাচ্ছি, তাকে এরা বলে 'ধমসা' সেই বাজনার সঙ্গে এরা তালে তালে পা তুলে তুলে নৃত্য করে, কি সুন্দর সে নৃত্য। সমুদ্র তরঙ্গের মত অলস লীলায় ধেয়ে আসে, আবার যেন তখনই বেলাপহত হয়ে ধীরে ধীরে সাগর গর্ভে নেমে যায়। এরা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত অশ্রান্তভাবে নৃত্য করতে পারে। এই নৃত্যের মধ্যেও যেন একটা বীরত্বের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়। নৃত্য করে শুধু মেয়েরা, আর বাজনা বাজায় পুরুষে। নৃত্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে গানও হয়। এদের গলা খুব মিহি। একেবারে বাঁশির সুরের সঙ্গে মিশে যায়। নৃত্যের সময় মেয়েরা মদ খায়, কারণ অশ্রান্তভাবে সারারাত নৃত্য তা নইলে সম্ভব নয়। এদের একটা গুণ এই যে, মদ খেয়ে এরা মারামারি খুব কমই করে।

ভাতই এদের প্রধান খাদ্য। আর ভাতের সঙ্গে তরকারি হচ্ছে তেঁতুল, নুন, লঙ্কা, শাকভাজা, বেগুনপোড়া, কিম্বা এমনি যা হয় একটা কিছু। তবে যাদের নেহাত ভাত জোটে না তারা জঙ্গলের খাম-আলুর মত একরকম আলু সিদ্ধ করে খায়। তাকে এরা বলে সাং। গাছে যে লাল পিঁপড়া হয় সেই ভাজা এদের বেশ মুখরোচক। বাদলে পোকার ডানা ছাড়িয়ে কাঁচাই এরা চিবিয়ে খায়, আর কখন বা ভেজে মুড়ির সঙ্গে খায়। বনের এক রকম পাতলা গোল গোল ফল এরা পুড়িয়ে খায়, সেগুলো খেতে ঠিক বিস্কুটের মত চমৎকার। কেঁদ, পিয়াল, ভেলাই ত এরা খুবই খায়।

এরা জমি চাষ করতে শিখেছে। আমাদেরই মত বীজ বুনে রোওয়া পুঁতে চাষ করে। এদের লাঙ্গল ছোট ছোট, ফলাখানিও এক ইঞ্চির বেশি চটাল হবে না। তাতেই যতদূর হয়, কিন্তু তাতেও ধান মন্দ হয় না। জমি ছেঁচবার জন্য আমাদের মত 'দুলি' এদের নেই, এরা হাত দিয়ে কোন একটা কিছু করে ছেঁচে। ধান পাকলে মেয়ে পুরুষে গিয়ে ধান কেটে আনে। খড়ের পালুই দিতে এরা জানে না। গোল করে থাক দিয়ে রাখে। ধান ঝাড়ে আমাদেরই মত, কিন্তু মরাই বাঁধতে জানে না। পুড়োর মধ্যে রেখে ঘরে তুলে রাখে।

অস্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে তীর-ধনুকই প্রধান। পূর্বে এরা অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাজ ছিল, এখন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সব ভুলে যেতে বসেছে। লোহা থেকে চার পাঁচ রকমের তির এরা তৈরি করত। এখনও কুড়ুল, টাঙ্গি প্রভৃতি এরা বেশ ভাল রকম তৈরি করতে পারে। এদের এই সব অস্ত্র তৈরি করবার জন্য লোহা জার্মানি বা স্কটল্যাণ্ড থেকে আসত না, এরা নিজেরাই তৈরি করে নিত।

এদের লৌহ প্রস্তুত প্রণালী

নদীর ধারে একটা কাদার ভাটি তৈরি করত। সেটার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাঠের কয়লা দিয়ে পূর্ণ করত, তার উপর এক তৃতীয়াংশ লোহার পাথর (iron ore) দিত, এবং বাকিটা বালি দিয়ে পূর্ণ করত। তারপর নিচে আগুন দিয়ে হাপরের হাওয়া দিত। পাথর গলে গিয়ে বালি ক্রমশ যখন নিচে নেমে যেত, তখন বুঝতে পারত যে লোহা তৈরি হয়েছে সেই লোহা থেকে ইস্পাতও তৈরি করত। এবং সেই ইস্পাত আজকালকার বিদেশী লোহার চেয়ে কোন অংশে হীন ছিল না। এখন এরা সে সব ভুলে যেতে বসেছে।

পূর্বে আগুন জ্বালাতে এদের দেশলাই-এর আবশ্যক হত না। কাঠে কাঠে ঘসে, এরা আগুন জ্বালাত। এখনও অনেক স্থলে এরা তাই করে। মাটিতে এক টুকরো কাঠি রেখে আর একটুকরো কাঠ হাতে করে, তার উপর ঘোরায়। আর কাঠিটা গরম হয়ে আগুন হয়। সব কাঠে এটা সহজে হয় না। যে গুলোতে হয় তা এরা জানে।

এদের মাসের বা বারের কোন নাম নেই। এক এক মাসকে এরা 'চাঁদো' বলে, আর বছরকে বলে 'সেরমা'। এদের মাসে ৩০ দিন। এদের সংখ্যা গণনা কুড়ি পর্যন্ত। তার উপর নেই।

এক-মিট, দুই-বার, তিন-পে, চার-পুন, পাঁচ-মোরে, ছয়-তুরুই, সাত-এয়া, আট হ'রেল, নয়-আরে, দশ-গেল, কুড়ি-ঈশি। এর বেশি আর এদের নেই। কারণ এর বেশি গোনবার সৌভাগ্য এদের হয়নি। এগার হলে-এদের মাথায় হবে মিট্‌ গেল মিট্‌ ইত্যাদি।

এদের অসুখ খুব কম হয়। আর ডাক্তারি, ওষুধও খুব কম খায়—শক্ত ব্যারাম না হলে নয়। মাথা ধরলে সমস্ত কপালে এরা ভেলার টিপ দেয়। অন্য অসুখেও এদের ওষুধ গাছগাছড়া। আর সে ওষুধ দেয় সাঁওতাল বৈদ্য। এত পরিশ্রম করে বলেই বোধ হয় এদের মধ্যে অসুখ এত কম।

সামাজিক রীতি-নীতি

কোন ঘরে ছেলে হলে তাকে এরা বলে নোতা ঘর বা কামাম ঘর। ছেলে যখন হয় তখন এরা কিছু খায় না, নাপিত এসে কামিয়ে দিলে, নেয়ে এসে এরা খায়। আবার দশদিন পরে নাপিত এসে কামিয়ে দেয়। সেদিন এরা স্বজাতিদের নিমন্ত্রণ করে হাঁড়িয়া মুরগি খাইয়ে দেয়।

এদের বিবাহে কনের বাপকে বা ভাইকে পণ দিতে হয়। সে, পণ হচ্ছে দুটি গরু, একটা টাকা বা তারও বেশি, আর তিনটি কাপড়—একটি আয়ো লুগরী বা মা শাড়ি, একটা কনের বোনের জন্য আর একটা সিঁদুর লুগরী, বা সিঁদুর দানের শাড়ি কনের জন্যে। বরের বাপ কনের বাপের কাছে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কিনা সেই সব ঠিক করে। তারপর বিবাহের একটা দিন স্থির হয়। সেই দিন রাত্রে বর স্বজাতির সঙ্গে কনের ঘরে যায়।সেখানে হাঁড়িয়া ও মুরগি দিয়ে ভোজ ও নৃত্য হয়। পরের দিন বরের ভাই বা ভগ্নীপতি কনেকে কোলে করে ঘরে আনে ও সেখানে নৃত্য হয় ; হাঁড়িয়া ইত্যাদি খাওয়া হয় ও কনের মাথায় সিঁদুর দেওয়া হয়। তার দিন দুই তিন পরে বরকনে আবার কনের বাপের ঘরে ফিরে যায়। আবার সেখানে দুদিন থাকবার পর আবার কনেসুদ্ধ বরের ঘরে ফিরে আসে ও ঘরকন্না করে। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অবিবাহিত, কারণ এরা

সহজে কেউ পণ দিয়ে বিয়ে করতে সমর্থ হয় না। বিবাহের আগে পর্যন্ত এদের মেয়েদের কোন অবরোধ নেই। মেয়েরা যে কোন যুবকের সঙ্গে ইচ্ছা করলে হাঁড়িয়া খেতে পারে, নৃত্য করতে পারে, ইত্যাদি। তাতে বাপ মা কোন বাধা দেয় না বা এদের জাতিও যায় না, তবে অন্য জাতির সঙ্গে গেলেই জাতি যায়। জাতি গেলে আবার অতি সহজে জাতি ফিরেও পায়। স্বজাতিদের কিছু জরিমানা দিয়ে হাঁড়িয়া মুরগী খাইয়ে দিলেই জাতে ওঠা যায়।

ধারেও এদের বিবাহ হতে পারে। বিবাহ করে পণ পরে দিবার কথা থাকে, কিন্তু পরে না দিতে পারলে কনে বাপের ঘরে চলে যায়। আবার তার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়।

আর একরকম বিয়ে এদের মধ্যে আছে। সেটা হচ্ছে কোন যুবকের কোন যুবতীকে বিবাহ করবার ইচ্ছা হলে, কোন নৃত্যের সময় জোর করে তার মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেয়। তখন আর তাকে কেউ বিয়ে করতে পারে না। তারপর তার বাপ বা ভাই- এর সঙ্গে পণ ঠিক হয়ে বিয়ে হয়। বিয়ের সময় লোহার খাড়ু কনেকে দিতে হয়। এইটাই এদের বিবাহের লক্ষণ।

যে কোন সময়ে এদের বিয়ে ভঙ্গ হতে পারে। পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে দিতে পারে। যদি পুরুষ ছাড়তে চায় তবে তাকে কুড়ি টাকা দিতে হবে, আর যদি মেয়ে ছাড়তে চায় তবে তাকে পণের সমস্ত টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং কেউ কাউকে সহজে ছাড়তে পারে না।

মড়ার সম্বন্ধে ব্যবস্থা

মরে গেলে অধিকাংশ স্থলে এরা পুড়িয়েই দেয়, কদাচিৎ সমাধি দেয়। মড়া পুড়ে গেলে তার হাড় একটা মাটির ডিবায় করে নিয়ে আসে। তাকে এরা বলে 'চুকা'। সেই হাড় এরা দামোদরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। দামোদরকে এরা বলে গঙ্গা। সেই গঙ্গার ঘাটে একটা শালের ডাল্ডা পোঁতে আর তার কাছে একটা লোহার খাড়ু আর চারটি পয়সা পুতে দেয়। সাঁওতালদের বামুন সেইখানে পূজা করে সেগুলি তুলে নেয়। অস্থি দিয়ে ফিরে এলে ঘরের মেয়েরা তেল জল দিয়ে তার পা ধুইয়ে দেয়। মড়া নিয়ে গেলে ঘরের সবাই নেয়ে আসে। একমাস পরে এদের শ্রাদ্ধ হয়, তখন কুটুম্ব আসে, আর ভোজ হয়।

কারু ঘরে লোক মরলে এদের প্রত্যেকের ঘর থেকে একজন করে যায়।

এদের দেবতা বোঙ্গা!

সে পাহাড়ে থাকে। এরা তারি পূজা করে থাকে। বছরের মধ্যে এদের পাঁচটা পরব।

পৌষ মাসে মকর ঃ এটাই এদের বড় পরব। নূতন কাপড় কেনে আর হাঁড়িয়া ও মুরগি খেয়ে আমোদ করে।

ফাল্গুন মাসে শাল পূজা ঃ এই সময় শালের নূতন পাতা হয়। এরা জাহেরাকে পূজা করে আর হাঁড়িয়া ও মুরগি খেয়ে আমোদ করে।

ভাদ্র মাসে বিঁধা পরব ঃ যেখানে রাজা আসে সেই খানেই এই পরবটা হয়। একটা মহিষকে বেঁধে তির মারে। রাজা এসে আগে তির মারে। তারপর অপর সকলে তির মেরে তাকে মেরে ফেলে।

ভাদ্র মাসে গোম্‌হা পরব ঃ এই পরবে বোঙ্গার পূজা হয়।

আশ্বিন মাসে বাঁধ্‌না পরব ঃ এটা আমাদের দেশের গো পার্বণের মত। মুরগি, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু এরা পূজা করে।

অস্পৃশ্যতা এদের এক ভাত ছাড়া আর কিছুতে নেই। এরা মাথায় করে হাড়িসুদ্ধ ভাত যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যায়। যেখানেই ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সাঁওতাল ছাড়া অন্য জাতে ছুয়ে দিলেই সে ভাত তারা খায় না। তা হলেই তাদের জাতি যায়। অপর কোন জাতির ঘরে তারা ভাত খায় না, বা কারু এঁটো বাসন তারা মাজে না। পুরুষরা যদিও বামুন ঘরে ভাত খায়, কিন্তু মেয়েরা কোথাও খায় না। সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আমার মনে হয় এরা হিন্দুদের কাছ থেকে অনেক ধার করেছে, কারণ উপরোক্ত অনেক ব্যাপারই আমাদের সঙ্গে মিলে যায়।

এদের সরলতা, এদের ঔদার্য, এদের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দেয়। যতদিন এদের অভাব অভিযোগ কম থাকবে, ততদিন এরা এমনি সরল, এমনি মহৎ থাকবে। ক্রমশঃ সভ্যতার সংস্পর্শে যতই আসবে ততই এদের অভাব বাড়বে, আর ততই হয়ত চুরি, জোচ্চোরি, ধাপ্পাবাজী এদের মধ্যে প্রবেশ করবে।

প্রবাসী ১৩৩০ শ্রাবণ

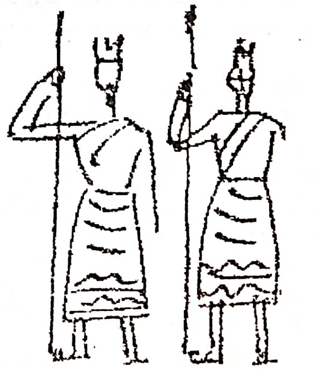

প্রফুল্লকুমার ঘোষ

সাঁওতাল জাতি

শ্রাবণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ "সাঁওতাল জাতি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার দু একটা জায়গায় দু একটা ভুল চোখে পড়ল। যেমন, সাঁওতালরা নাকি দামোদর নদীকে বলে গঙ্গা। সাঁওতালরা অবশ্য দামোদরকে হিন্দুদের গঙ্গার মত পবিত্র ও মুক্তিদায়িনী মনে করে, কিন্তু ওর নাম গঙ্গা নয়; তোপন নাই, হিন্দুর গঙ্গাজলেরই মত তাদের তোপন দাঃ অতি পবিত্র। সুদূর পল্লিগ্রাম থেকে সাঁওতালরা মৃত পিতামাতার অস্থি এনে "তোপন নাইরে" অর্পণ করে থাকে। পূর্বে তিনটি মাত্র ঘাট ছিল, এখন অনেক ঘাট হয়েছে। তোপন নাই পার হয়ে গেলে জাতি থাকে না বলে শাস্ত্রের আদেশ ছিল। কিন্তু কালক্রমে 'নাই' পার হয়ে নিয়ম ভঙ্গ করে অনেকে দূরদেশে যাতায়াত করে—তার ফলে সকলে সভা করে বহু তর্ক বিতর্কের পর নাকি স্থির করেছে যে এই নিয়মটি লঙ্ঘন করা যেতে পারে।

সাঁওতালদের গণনাতে কুড়ির বেশি নেই এমন নয়; কুড়ি পর্যন্ত গুণেই সাধারণত তারা কাজ চালায়—এবং বেশি হলে এক কুড়ি এক (বার গেল মিৎ) এক কুড়ি দুই (বার গেল বারে) অথবা মিৎ-ইষি মিৎ, মিৎ ইসি বার প্রভৃতি করে বলে। এমনি করে ত্রিশ = পেগেল; চল্লিশ = পোন্ গেল; একশ = শায়; দুইশ = বার শায়, হাজার = গেল শায়।

সাঁওতালদের সামাজিক রীতি নীতি, নৃত্য সঙ্গীত প্রভৃতি সম্বন্ধে আরো যথেষ্ট কথা বলা যায়। সাধারণ পাঠকের জন্য এর কোন আবশ্যকতা নেই মনে করেই হয়ত লোক আর অধিক লেখেন না। কিন্তু এই সদানন্দ হাস্য প্রফুল্ল জাতির সঙ্গীত সম্বন্ধে আরো দুএকটা কথা না বললে ওদের স্ফুর্তি-প্রিয়তার ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। প্রাণের আনন্দে এরা সর্বদাই এমন ভরপুর যে এদের প্রত্যেকটি দেহের ভঙ্গীকে যেন নাচের তাল বলে ভ্রম হয়, এদের হাসিকৌতুকে ভরা প্রত্যেকটি কথাকে গানের সুর বলে মনে হয়। নৃত্য সম্বন্ধে লেখকের কথিত সাগরের ঢেউয়ের মত এদের গানের বেশ একটা বাঁধা পর্দা আছে। বেশিক্ষণ শুনলে এই একই সুরকে যদিও খানিকটা একঘেয়ে বলে মনে হয়, কিন্তু গানের বিষয় বৈচিত্র্য বুঝলে সেটুকু বোধ হয় না। এদের অনেক রকমের গান আছে তার মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

বাপলা সেরিং	=	বিবাহের গান।
লাগড়ে সেরিং	=	সকল সময়ে গাহিবার গান।
বীর সেরিং	=	অশ্লীল গান।
তোতোাংৎ সেরিং	=	বীজভাষার গান।
রহয় সেরিং	=	ধান্যরোপনের বা বর্ষাকালের গান।
হ্যাড়-হ্যাৎ সেরিং	=	নিড়ানের গান।
কারাম সেরিং	=	আশ্বিন কার্তিক মাসের গান।
সহরায় সেরিং	=	কালীপূজার সময়ের গাান।
বাহা সেরিং	=	বসন্ত কালের গান।

প্রবাসী ১৩৩০ ভাদ্র

রামব্রহ্ম স্যান্যাল

সাঁওতাল জাতির বিবরণ

.........সাঁওতালের নাম তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ; ধাঙ্গড়, পাহাড়ি এবং কোলদিগের মতো ইহারাও ভারতের আদিম অধিবাসী। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে যে সকল জঙ্গল এবং পাহাড় আছে সাঁওতালরা সেই সকল জঙ্গল এবং পাহাড়ে বাস করে। এ সকল জঙ্গল এবং পাহাড় পালামৌ, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, মানভূম প্রভৃতি জেলা এবং মহকুমার অন্তর্গত। ইহা ভিন্ন বাংলা এবং বেহারের মধ্যে রাজমহল পাহাড়ের নিকটে যে সকল সমতল স্থান আছে তাহাতে এত সাঁওতালের বাস যে, ওই সকল স্থানের নাম 'সাঁওতাল পরগণা' হইয়াছে।

সাঁওতাল দেখিতে যদিও অনেক পরিমাণে ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের মতো। কিন্তু ওই সকল জাতি অপেক্ষা যে ইহারা বেশি বুদ্ধিমান এবং কর্মিষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায়ই কাহারও গোঁফ দাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমরা মনে করিও না যে, ইহারা গোঁফ দাড়ি কামাইয়া ফেলে, ইহাদের গোঁফ দাড়ি উঠেই না। সাঁওতালেরা খুব শিকারি, এবং কৃষিকার্যেও বেশ দক্ষ। আত্মনির্ভরের ভাব ইহাদিগের প্রকৃতিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, এবং আলস্য কাহাকে বলে একেবারেই জানে না। এই সকল কারণে সাঁওতালদিগের মধ্যে এমন পরিবার কিংবা ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা আহার অভাবে কষ্ট পাইতেছে। অবশ্য তাহাদিগের দোতলা বাড়ি নাই, ভালো ভালো কাপড়, ভালো ভালো জামা নাই, বিলাসের জিনিস কিছুই নাই, কিন্তু তাহাদিগের যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সমস্তই আছে। ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত যতই পড়িবে, তাহাদিকের বিষয় যত সমালোচনা করিবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, ওই সকল জাতির অনেকের অপেক্ষা সাঁওতালদিগের অবস্থা বেশি উন্নত। কৃষি বিষয়ে নিপুণতা, ধৈর্য, এবং শ্রমদক্ষতা তাহাদিগের এই উন্নতির কারণ। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগের জাতীয় প্রকৃতিরও পরিবর্তন হইতেছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সাঁওতালেরা অধিক দিন একস্থানে বাস করিত না। চাষবাসের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কখনও এ-স্থান কখনও অন্য স্থান করিয়া বেড়াইত। সাঁওতালেরা যেখানে যায় সে স্থান হাজার জঙ্গল হইলেও তাহা পরিষ্কার এবং কৃষির উপযুক্ত করিয়া লয়। আপন পরিবারের ভরণপোষণের নিমিত্ত যতই কোন পরিশ্রম করিতে হউক না, সাঁওতালেরা তাহা প্রফুল্ল চিত্তে স্বীকার করে। প্রাণান্তেও অপরের দাসত্ব স্বীকার করে না। সাঁওতালদিগের এই সকল স্বাভাবিক সদ্‌গুণের সঙ্গে যদি শিক্ষা থাকিত তাহা হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ হইত।

আজকাল কিন্তু ইউরোপীয় মিশনারিদিগের প্রসাদে অনেক স্থানে সাঁওতালেরা সুন্দর শিক্ষা পাইতেছে। পাঠক পাঠিকা! তোমরা সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট হইতে যে সকল সৎশিক্ষা পাইতেছ, সাঁওতালেরা তাহা পায় নাই। যদিও তাহাদিগের চরিত্রে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তত্রাচ তাহাদিগের মধ্যে এমন সকল সদ্‌গুণ আছে যাহা তোমাদিগের অনুকরণীয়। যদি যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাও তাহা হইলে তোমরাও সাঁওতালদিগের মত শ্রমদক্ষ এবং ধৈর্যশীল হও, এবং আত্মনির্ভর শিক্ষা করো।

অন্য অন্য আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় সাঁওতালদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য, সচরাচর প্রায় একখানি কৌপীন মাত্র, কিন্তু স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অনেকটা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মহিলাদিগের মতো। কী স্ত্রী কী পুরুষ, সকলেই অলংকার ভালবাসে এবং নানা প্রকার পুষ্প এবং পাখির পালক সংগ্রহ করিয়া আপন আপন শিল্প নিপুণতা অনুসারে নানা সুদৃশ্য অলংকার প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা পিত্তল, কাঁসা নির্মিত অলংকারও ব্যবহার করে।

জনার, ভুট্টা, হাঁস, কুক্কুট, মাংস ইত্যাদি ইহাদিগের প্রধান খাদ্য, আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই ; তবে কেহ বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুদিগের সহিত পূর্বকালের শত্রুতাবশত তাহাদিগের ছোঁয়া কোনো দ্রব্য আহার করে না। আমরা কিন্তু যে সকল সাঁওতালের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি তাহারা একথা অস্বীকার করে।

সাঁওতালদিগের কুটিরগুলি সুনির্মিত এবং পরিষ্কার, অনেকে আবার দেয়ালে নানাবর্ণের নানাপ্রকার ছবি এবং লতাপাতা আঁকিয়া রাখে। প্রতি সাঁওতাল পল্লির ঘরগুলি একটি প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে সন্নিবেশিত। প্রত্যেক বাড়িতেই গৃহপালিত পশুপক্ষীদিগের থাকিবার স্থান আছে। অপেক্ষাকৃত সংগতিপন্ন সাঁওতালেরা প্রায় সকলেই মহিষ পুষিয়া থাকে, এবং দধি দুগ্ধের ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। সাঁওতালেরা অতিশয় সংগীতপ্রিয়, সামান্য বাঁশের এমন সুন্দর বাঁশি প্রস্তুত করে যাহার সুস্বরে এমন হৃদয় নাই যে মুগ্ধ হয় না। ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের মতো প্রত্যেক সাঁওতাল পল্লিতেও এক একটি নৃত্য গীতের আড্ডা আছে ; যেখানে গ্রামের বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলে একত্রিত হইয়া নৃত্যগীত করে। সাঁওতালদিগের বিবাহ প্রণালী ধাঙ্গড় এবং কোলদিগের ন্যায়। বহু বিবাহ যদিও প্রচলিত আছে কিন্তু এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে প্রায়ই কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে না।

সাঁওতালদিগের প্রধান দেবতার নাম 'সিঙ্গ বঙ্গা'। কোলদিগের ন্যায় ইহাদেরও বিশ্বাস এই যে, ওই দেবতা সূর্যেতেই স্বপ্রকাশ, ইহা ভিন্ন আরও কতক উপদেবতা আছে। স্ত্রীলোকেরা হাতিকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে, এবং হাতি দেখিলে তাহার সম্মুখে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। হিন্দুদিগের ন্যায় সাঁওতালেরাও শব দাহ করে; এবং দগ্ধ অস্থি নদীতে কিংবা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। সাঁওতালদিগের বিষয় যাহা বলা হইল তাহা অতি সামান্য, অন্য সময়ে ইহাদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত বলা যাইবে।

সখা ● *১৮৮৮ জানুয়ারি*

প্রভাসচন্দ্র রায়

সাঁওতালগণের বিবরণ

সাঁওতাল পরগণা ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত। সৌভাগ্যক্রমে ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনির অধিবেশন হইয়াছে। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে সাঁওতাল সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ আলোচনা অসাময়িক অথবা অযৌক্তিক বিবেচিত হইতে পারে না। সাঁওতাল এই দেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা কোন স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সম্ভবত আর্যজাতি অথবা অন্য কোনো জাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া উত্তর দেশ হইতে ইহারা এই স্থানে উপনীত হইয়াছিল। সাধারণত অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির পূর্ব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া অথবা পূর্ববিবরণ সংগ্রহ করা অতীব কষ্টকর। এই সকল জাতির কোনো বর্ণমালা নাই ; সুতরাং তাহাদের কোনো লিখিত পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল জাতির পূর্ব ইতিহাস উপকথার ন্যায় পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হইয়া আইসে। তাহাতে অধিকাংশ স্থলে বিকৃত ও বিবর্ণিত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ সকলও বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কোনো স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না, কারণ তাহাদের পরস্পরের সামঞ্জস্য নাই—একটি অপরটির বিরোধী। সাঁওতালগণের মধ্যে যে সকল সংগীত প্রচলিত আছে তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহাদের আদি বাসস্থান হিহিরি-পিপিরি ও চায়-চম্পা। এই হিহিরি-পিপিরি চায়-চম্পা কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায়না। সাঁওতাল ভাষায় প্রজাপতির নাম পিপিরি ও ফুল্ল কুসুমিত বৃক্ষের নাম চম্পা। পিপিরি ও চায় শ্রুতি-মধুরতার জন্য দ্বিত্ব করা হইয়াছে ধরিয়া লইলে দ্রুম গুল্ম শোভিনী নানাজাতীয় বিহঙ্গম কুলকুজিত কোনো পর্বত প্রদেশ তাহাদের আদি বাসস্থান স্বরূপে কল্পনা করিতে পারা যায়। মাননীয় পেটি ওয়ার্ড সাহেব ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ৩৪ সংখ্যক প্যারাতে এই সাঁওতালগণকে সান্টার নামে উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে সিংভূম অথবা হাজারিবাগের অধিবাসী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে তাহারা ছোটনাগপুর হইতে ঝালদা নামক স্থানে গমন করিয়াছিল ; পরে ভূমিজ রাজের অধিকারভুক্ত পাতকুমে আসিয়াছিল। অনন্তর মানভুম জেলান্তর্গত পচেট নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিল। তথা হইতে তাহারা শাওন্ত নামক গ্রামে আসিয়া সম্ভবত সেই স্থানের নামানুসারে সাঁওতাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। এইরূপে তাহারা নানাস্থান পর্যটন করিয়া অবশেষে তাহাদের স্বকীয় নামে পরিচিত সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। স্থান পরিত্যাগের সহিত তাহাদের বংশও ক্রমশ বিস্তৃত হইয়াছিল; সুতরাং একস্থান পরিত্যাগকালে সমগ্র সাঁওতাল জাতির সেই স্থান হইতে তিরোভাব অসম্ভব হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে গবর্নমেন্ট এই ভ্রমণশীল জাতিকে এই বিভাগে স্থায়ীভাবে বাস ও কৃষিকার্য করার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

আদমশুমারির দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, অল্পকাল মধ্যে সাঁওতালবংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল বহুপত্যজাতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধভাগে সাঁওতাল পরগণায় ৩০,০০০ সাঁওতাল ছিল। ১৮৭২ অব্দে ৪,৫৫,৫১৩। ১৯০১ অব্দে

৬,৬৩,৪৬১। সাঁওতাল পরগণা ব্যতীত মানভূম, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় ১৮৮১ অব্দে ৩,৪৬,৩৯২ ও ১৮৯১ অব্দে ১১,৬৪,১২১ ব্যক্তি গণিত হইয়াছিল।

নানা কারণে এই জাতি এই প্রদেশে বিদ্রোহীভাবাপন্ন হইলে বঙ্গদেশে প্রচলিত আইনকানুন ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে বিবেচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথকভাবে শাসন করিবার জন্য ১৮৫৫ সালের ৩৭ সংখ্যক কানুন দ্বারা ভাগলপুর ও বীরভূম জেলা হইতে কতক কতক অংশ গ্রহণ করিয়া সাঁওতাল পরগণা গঠিত হইয়াছে। এই প্রদেশের আইন-কানুন ও অধিবাসীগণের আচার-ব্যবহার বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মাননীয় স্যর এস্‌লি ইডেন সাঁওতাল পরগণার প্রথম ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন

এই জাতি মধ্যে প্রচলিত পৃথিবী গঠন সংক্রান্ত প্রবাদ, ইহাদের ধর্ম ও দেবতা, ইহাদের রীতি-নীতি, বিবাহ-প্রথা ও সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা মৎপ্রণীত "পার্বত্য-কাহিনি" নামক গ্রন্থে যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিষয় পুনরুত্থাপিত করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীর মূল্যবান সময় নষ্ট না করিয়া এই জাতির ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ আলোচনা করিতে মনন করিতেছি। আশা করি তাহা বিরক্তিকর হইবে না।

সাঁওতালের কোনো বর্ণমালা নাই। কোনো একটি ভাষার বর্ণমালা যতই প্রকাণ্ড হউক না কেন তাহাতে অন্য ভাষা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সুবিধাজনক হয় না। সংস্কৃত অথবা বাংলার বর্ণমালা যতদূর সম্ভব বিস্তৃত, তত্রাপি ভাষান্তরের সময় সকল শব্দের উচ্চারণযোগ্য ঠিক বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইংরাজি z ও পারস্যভাষায় 3 জৈ বড়ো কাফ্‌ এই সকল বর্ণের তুল্য বর্ণ সংস্কৃত অথবা বাংলায় নাই। তত্রাপি সাঁওতালি ভাষা বাংলা বর্ণমালার ছাঁচে ফেলিতে পারা যায়। আমাদের বিসর্গান্ত শব্দ সকল যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, অধিকাংশ সাঁওতালি শব্দ সেইরূপ ধরনে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সাঁওতালি ভাষায় অনুনাসিক উচ্চারণের আধিক্যতা মনে হয়।

ভাষার গঠন সাধারণত সর্বনাম ও ধাতুর উপর নির্ভর করে। সর্বনাম ও ধাতু কী প্রকারে সংযুক্ত হয়, তাহারা কী প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলে কীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় ইত্যাদি। সর্বনাম ও ধাতু দুইটিই ভাষার প্রধান উপাদান। শরীরের সহিত জীবনীশক্তির যেরূপ সম্বন্ধ মানব ভাষার সহিত ধাতুর সেইরূপ সম্বন্ধ। ধাতু হইতে ক্রিয়া, ও বিশেষ্য উৎপন্ন হয়। দেশ, কাল, পাত্রসূচক সর্বনাম এই সকল অর্থশূন্য, অকর্মণ্য ক্রিয়া ও বিশেষ্যকে জীবনী প্রদান করিয়া ভাবপূর্ণ ও কার্যকুশল করে।

এইরূপ গঠন হিসাবে ভাষার অনেক বিভিন্ন শ্রেণি আছে—

প্রথমত, চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ভাষা কেবল ধাতু মাত্র— ধাতুসকল অন্য ধাতুর সহিত যুক্ত অথবা রূপান্তরিত হয় না।

দ্বিতীয়ত, কয়েকটি ভাষার ধাতু সকল পরস্পর যুক্ত হয়, কিন্তু রূপান্তবিত হয় না।

তৃতীয়ত, কয়েকটি ভাষায় ধাতু স্বয়ং অথবা উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে রূপান্তরিত হয় ইত্যাদি। এক্ষণে দেখিতে হইবে সাঁওতালি ভাষা উল্লিখিত কোন্ শ্রেণির অধীন।

"হাকো" শব্দের অর্থ মৎস্য। দুইটি মৎস্য বলিতে হইলে সাঁওতাল "দুই মৎস্য" অথবা

"মৎস্য দুই" বলে না, তাহারা একটি পৃথক প্রত্যয় শব্দের সহিত যোগ করে—"হাকো কিন" অর্থে দুইটি মৎস্য। কিন অর্থ দুই নহে। এইরূপ অনেক মৎস্য "হাকো কো"। এই "কিন" অথবা "কো" আদি শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, পৃথক থাকে না ; যেমন "দুইটি মৎস্যের" বলিতে হইলে সাঁওতাল "হসকা কিন রিনি" ও "বহু মৎস্যের নিকট" বলিতে হইলে "হাকোকো থেন" বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহা প্রথন শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত নহে। এক্ষণে পরীক্ষা করা আবশ্যক, সাঁওতালি ধাতু পরস্পর যুক্ত ও সন্ধিগত অথবা স্বয়ং কিংবা উপসর্গ প্রত্যয় যোগে রূপান্তরিত হয় কি না। সাঁওতাল ধাতুর শেষ অক্ষর কদাপি লুপ্ত হয় না। সাঁওতালি ভাষা সন্ধি অত্যন্ত ঘৃণা করে। "বড়ে" (বটবৃক্ষ) সাঁওতালি করণকারকসূচক শব্দ "ইয়াতে" "বড়ের" সহিত "ইয়াতে" যুক্ত হইলে "বড়িয়াতে" উচ্চারিত হয় না, সাঁওতাল স্পষ্টরূপে "বড়ে ইয়াতে" উচ্চারণ করে। কাড়া—(মহিষ) "কাড়া ইয়াতে" উচ্চারিত হয়। "তাহিন"—অর্থ "থাকা" (to remain) ইহার ভূত, ভবিষ্যৎ অথবা বচন ও লিঙ্গ প্রভেদে আদি শব্দের পরিবর্তন হয় না। যথা—"তাহিন-আকিন" (তাহারা দুই জন থাকিবে) "তাহিন আকো" (তাহারা সকলে থাকিবে) "তাহিন- এন-আকিন" (তাহারা দই জন ছিল) "তাহিন-এন-আকো" (তাহারা সকলে ছিল)।

সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির মধ্যবর্তী শ্রেণি মধ্যে সাঁওতালি পরিগণিত হইতে পারে। সাঁওতালি ভাষা agglutinative ধরণের ভাষা। ভাষার গঠনে একটি শব্দই যথাক্রমে ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, "ভাগলপুর কেদিনা"—সে আমাকে ভাগলপুরে রাখিয়া ছিল—Literally, he Bhagalpured me.

বিশেষণের সহিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংযুক্ত হইয়া ক্রিয়া সূচনা করে—

বিশেষণ "মরাং" (বড়ো)

"আ"	হয়	......	মরাংআ	বড়ো হয়,
"গিয়া"	নিশ্চয় হয়	....	মরাংগিয়া	বড়ো নিশ্চয় হয়
"ওক' কানা"	হইতেছে	...	মরাংওক' কানা	বড়ো হইতেছে
"ওক' আ"	হইবে	...	মরাংওক'আ	বড়ো হইবে
"তেহেকানা"	ছিল	..	মরাং তেহেকানা	বড়ো ছিল
"এনা"	হইয়াছিল	...	মরাংএনা	বড়ো হইয়াছিল
"আকানা"	হইয়াছে	...	মরাংআকানা	বড়ো হইয়াছে
"লেনা"	নিশ্চয় হইয়াছিল	...	মরাংলেনা	নিশ্চয় বড়ো হইয়াছিল

ক্রিয়ার সহিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কাল সূচনা করে—

ক্রিয়া "রোড়" কহা

"এডা	রোরেড়া	কহা
"এতকানা	রোড় এতকানা	কহিতেছে

"এত তাহেকানা"	রোড় এত তাহেকানা	কহিত
"এত কান তাহেকানা"	রোড়কান তাহেকানা	কহিতেছিল
"আ"	রোড় আ	কহিবে
আকাদা	রোড় আকাদা	কহিয়াছে
কেদা, লেদা	রোড় কেদা	কহিয়াছিল

লিঙ্গ

বিশেষ্যের তিনটি লিঙ্গ আছে— পুং, স্ত্রী, উভ, সর্বনাম ও ক্রিয়ার স্ত্রী- পুরুষভেদ সূচক কোনো চিহ্ন নাই।

নিম্নলিখিত তিন প্রকার বিধানে সাধারণত লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে।

(১) বিভিন্ন শব্দ দ্বারা যথা—

কাড়া (মহিষ)—বিটকিল (মহিষী)

(২) শেষ অক্ষরের বিভিন্নতা দ্বারা যথা—

কোড়া—(যুবক)—কুড়ি (যুবতী)

ভেড়া—ভেড়ি

(৩) বিভিন্ন লিঙ্গ সূচক শব্দ দ্বারা যথা—

এঁড়িয়া সাদম (অশ্ব)—এঙ্গা সাদম (স্ত্রী অশ্ব)

সিম আঁড়ি (মোরগ)—সিম এঙ্গা (মুরগি)

বচন

তিনপ্রকার—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। সাধারণত "কিন" যোগে দ্বিবচন, "কো" যোগে বহুবচন হইয়া থাকে। "কিন" বিশেষ্যের পরে সংযুক্ত হয়, স্থলে স্থলে অগ্রেও হইয়া থাকে।

কারক

কর্তা	হোড়	হোড়
কর্ম	হোড়	মনুষ্য
করণ	হোড়	তে, ইয়াতে, হোতেতে
সম্প্রদান	হোড়	থেন
অপাদান	হোড়	খোন, খনান
সম্বন্ধ	হোড়	রেন, রিয়াক, রিয়াং

চেতনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে রেন, অচেতনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে রিয়াক, রিয়াং।

অধিকরণ	হোড়	রে
সম্বোধন	এ হোড়, এহো, হেণ্ডা ;	

সাঁওতালের নানাপ্রকার বিভক্তি, হর্ষ ও বিস্ময়সূচক শব্দ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। বহুলতা ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

বিশেষণের দুই অথবা বস্তুর মধ্যে উৎকর্ষতাসূচক শব্দও সাঁওতালিতে আছে। "খন" ও "সানাংখন" তজ্জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলিষ্ঠ ঈষৎ-পুষ্ট-ওষ্ঠ সাঁওতালকে দেখিলে মনে হয় কার্য ও পরিশ্রম জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীলতার কোনো চিহ্নপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্ভবত সেই কারণে abstract noun সাঁওতালি ভাষায় নাই বলিলেও চলে; তবে সভ্যতা বিস্তৃতির সহিত নূতন শব্দ সৃষ্টি হইতেছে।

সর্বনাম ও ক্রিয়ার অনেক প্রকার শব্দ দৃষ্ট হয় যেমন—

ইং (আমি) আলাং (আমরা দুই জন— যাহার সহিত কথা হইতেছে)

আলিং (আমরা দুই জন— যাহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে)

আবো (আমরা — যাহার সহিত কথা হইতেছে সে ব্যক্তি সমেত)

আলো (আমরা — যাহার সহিত কথা হইতেছে সে ব্যক্তি ব্যতীত)

এইরূপ অনান্য পুরুষের সর্ববিধ বচন ও কারকসূচক পদ দৃষ্ট হয়।

সংখ্যা

মিট—১	ইয়াই—৬
বার, বারিয়া—২	ইরাল—৮
পি, পিয়া—৩	আরো—৯
পন, পনিয়া—৪	গেল—১০
মোড়ে—৫	গেলমিক—১১
তুরুই—৬	গেলবার—১২

এইরূপ "গেল" এর সহিত পি, পন ইত্যাদি যোগ হইয়া উনিশ পর্যন্ত গণনা হয়। একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্তও এই ধরনে হইয়া থাকে।

মিট ইশি—এককুড়ি

বার ইশি—দুইকুড়ি

ইশির সহিত দুই, তিন ইত্যাদি যোগ করিয়া কুড়ি হিসাবে ২০০ পর্যন্ত গণিত হয়। বর্তমান সাঁওতাল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে "শ" "হাজার" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। সাঁওতালের দশ সংখ্যাধিক গণনা ক্ষমতা একটি বিশেষ ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সাঁওতাল সমাজে কোনো উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক হইলে যদ্যপি নিমন্ত্রণ করিবার দিন হইতে উৎসবের দিনের মধ্যে দশ দিবসের অধিক ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে কতকগুলি রজ্জুতে ওই কয়েক দিবসের সমসংখ্যক গ্রন্থি প্রদত্ত হয় এবং ওই এক একটি গ্রন্থিযুক্ত রজ্জু আত্মীয়কুটুম্ব সদনে প্রেরিত হয়। প্রত্যহ এক একটি গ্রন্থি উন্মুক্ত হয় যে দিবসে শেষ গ্রন্থি উন্মোচিত হয় সেই দিবস উৎসবের দিন। আত্মীয়গণ সেই দিবস উৎসব বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সংস্কৃত অথবা বাংলার অনেক শব্দের সহিত সাঁওতালি অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাষায় 'স্তম্ভকে' 'খুঁটা' কহে সাঁওতালও খুঁটা কহে। সাধারণ ভাষায় 'পেট' বলে, সাঁওতাল স্থূলোদর ব্যক্তিকে "পটিয়া" বলে; সংস্কৃত "চিৎ" যোগে অনেক শব্দ উৎপন্ন হয়। যথা কশ্চিৎ ইত্যাদি—

সাঁওতালি—চেৎ—কী, চেৎ—হং—কোনো দ্রব্য, চেৎ—বো—বোধহয় ;
সাঁওতালি—'যা—যুগ'—অনেক সময় যাবত, অনেকবার
দিন—কালোম—গত বৎসর
দিন—হিলোম—বৎসর,
কালং—আগামী বৎসর,
হাল—কালোম—দুই বৎসর পূর্বে
মাহাং—কালোম—তিন বৎসর পূর্বে

সম্ভবত আর্যজাতির সহিত এই আদিম জাতির সংশ্রব ও সংঘর্ষ হওয়ায় আর্যজাতি তাহাদের কোনো কোনো শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে ইহারাও আর্যজাতির অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ ইংরাজি ভাষাতেও অনেক বাংলাশব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাংলা ভাষাতেও অনেক ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

উভয় ভাষার নিকট সম্পর্ক না থাকিলে এই রূপ শব্দের সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট হয় না। উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতমূলক। বাংলার সহিত সংস্কৃতের এত নিকট সম্পর্ক যে কতকগুলি এরূপ সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয় যে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বাংলা বলিয়া ধারণা হয়। যেমন—

অফল জননগত জনগণ ভরণ।
সকল গরল হর পরভর শরণ॥
মদন দলন কর তপনজদমন।
জয় জয় নর লয় ভব ভয় হরণ॥

খরতর বর শর হত দশবদন।
খগচর নগধর ফণধর শায়ন॥
জগদঘ মপহর ভবভয় শমন।
পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন॥

সেইরূপ সাঁওতালির সহিত-আর্যজাতির ভাষারও অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সাঁওতালের পর্বাদিও আর্যজাতির শাস্ত্রোক্ত পর্বের অনুকরণ। তৎবিষয় 'পার্বত্য-কাহিনীতে' বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা ভাষা সংস্কৃতমূলক হইলেও সাঁওতালি ভাষার দুই-এক স্থলে বাংলা অপেক্ষাও উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয়। যেমন বাংলায় দ্বিবচনের প্রায় ব্যবহার নাই কিন্তু সাঁওতালের তাহা আছে। সাঁওতাল পরোক্ষ অতীত ক্রিয়া ও তৎপূর্বের ক্রিয়ারও ব্যবহার করে এই সকল কারণে সাঁওতাল আর্যজাতিরই কোনো নিম্নতম শ্রেণি বলিয়াও অনুমান করা নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। তাহাদিগকে হিন্দু বলিবার অনেক কারণ আছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ম বিবরণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ।

বিভূতিভূষণ গুপ্ত
সাঁওতালগণের জীবন

আমাদের আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে সীমান্তরেখায় বিরল-তরুচ্ছায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরযুক্ত যে কয়খানি গ্রাম দেখা যায় তাহাদিগের অধিবাসী দরিদ্র সাঁওতালদিগের জীবন সম্বন্ধে কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব। এই সাঁওতালদিগের অধিকাংশই দরিদ্র। গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা ইহাদিগের নাই। তাহাদের সামান্য উপার্জন-লব্ধ ধন আহার এবং পোশাকে ব্যয়িত হয়। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা একটু অবস্থাপন্ন তাহাদের দুই তিনটি গৃহ, একটি গোয়াল, একটি শূকরের খোঁয়াড়, গুটিকতক মুরগি, তিন-চারটি লাঙ্গল, বিঘা-কতক জমি এবং হয়ত কুড়ি ত্রিশ টাকা সঞ্চিত থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা ব্যতীত প্রত্যেকের ব্যবহারপযোগী দ্রব্য, যেমন একটি দড়ির খাট, কয়েকটি বাটি, মাটির হাঁড়ি, একটি কুড়ুল, একটি কাঠের চিরুনি ইত্যাদি আছে।

ইহাদিগের গৃহের চতুষ্পার্শে গোময়-লিপ্ত করা হয় ;চমৎকার পরিষ্কার, কোথাও একটুও ময়লা নাই। কাহারো কাহারো ঘরের চালে লাউ-কুমড়ার চারা লতাইয়া উঠিয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটি ফলও দেখা যায়। ইহারা ফুল অত্যন্ত ভালবাসে। বসন্তকালে ইহাদিগের একটি উৎসব হয়। তখন বসন্ত-দেবতাকে পুষ্পোপহার প্রদান করিয়া ইহারা পুনরায় নূতন পুষ্প কর্ণে অথবা মস্তকে ধারণ করে। এই পূজাকে প্রস্ফুটিত বাহা পূজা বলে। সে সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

ইহারা গাঁদাফুলের অত্যন্ত ভক্ত। তাহাদের গৃহের পার্শ্বে শিম অথবা অন্য কোনো তরি-তরকারির চারা লতাইয়া উঠিবার জন্য ইহারা মাচা নির্মাণ করিয়া দেয়। এগুলিকে সজীব রাখিতে ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। এই মরুভূমির মত অনুর্বর প্রদেশে জলাভাবে কোনো কিছু উৎপন্ন করা অত্যন্ত কষ্টকর। এই সমস্ত মাচার নিম্নে অথবা পার্শ্বে শ্রেণিবদ্ধ ভাবে গাঁদাফুলের ঝাড় দেখা যায়। শীতকালে এই সমস্ত ঝাড় হরিদ্রা-বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং প্রচুর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। আমরাও প্রয়োজন হইলে ইহাদের নিকট হইতে ফুল আনিয়া থাকি। সকলেরই নিজের গৃহের পার্শ্বে একটু একটু জমি আছে। ইহাতে শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। বেগুন, শশা, কুমড়া, ইত্যাদি কাহারো কাহারো খেতে দেখা যায়। তাহা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেরই তিন-চার বিঘা খাজনা করা ধানের জমি আছে। জমিদারকে খাজনা দিয়াও যাহা অতিরিক্ত থাকে, তাহার এবং শাকসবজির সাহায্যে কোনো প্রকারে ইহাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হয় এবং সকলেই তাহাতে সুখী। সভ্যসমাজ হইতে দূরে পড়ায় ইহাদের কোনো উচ্চ আশা নাই। অর্থে মনের প্রকৃত আনন্দ হয় না। মানুষ দরিদ্র অবস্থাতে থাকিয়াও সুখী হইতে পারে। আমি একবার এক সাঁওতাল রমণীর সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কি কিছু অভাব আছে? তোমার পরিবারে লোক-সংখ্যা কত? সে বলিল, আমার কোনো অভাব নাই, আমরা সংসারে চারিজন। আমার পুত্র, পুত্রবধূ এবং একটি শিশু পৌত্র। আমার শূকর আছে, মুরগি আছে, ক্ষেতে ধান আছে, আমার আবার কিসের অভাব? ইহাতেই বুঝা যায় ইহারা কত সুখে জীবন যাপন করে। কিন্তু অর্থাভাবে যে তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয় না, তাহা বলিতেছি না।

এক একটি পরিবার তিন-চার জন অথবা পাঁচজনেও গঠিত হয়। পুরুষরা কাজ করিয়া

দৈনিক চারি আনা করিয়া উপার্জন করে এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহের কার্যসমূহ সম্পন্ন করে। কখনো কখনো স্ত্রীলোকেরাও শারীরিক কর্ম করিয়া জীবিকা উপার্জন করে এবং বালকেরা গো-মেষাদি লইয়া সমস্ত দিন মাঠে-মাঠে চরাইয়া বেড়ায়।

ইহাদিগের ভোজন-ব্যাপার অত্যন্ত সাধাসিধা রকমের। প্রাতে কার্যে বাহির হইবার পূর্বে পুরুষরা বাটিতে শীতল জলে ভাত ভিজাইয়া লইয়া বাহির হয় এবং দ্বিপ্রহরে কর্মস্থলে আহার করে। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র তীর-ধনুক। বাদ্য মাদল এবং পানীয় তাড়ি। এই তাড়িই তাহাদের অত্যন্ত অপকার করিতেছে। যৎসামান্য উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই ইহাতে ব্যয়িত হয়, কিন্তু মদ্যপান ইহাদিগের ভিতর এত প্রচলিত হইয়াছে যে, ইহাকে তাহারা দোষের মধ্যেই গণ্য করে না। যে কোনো উৎসবে, পূজায় বিবাহে, ইহাই ইহাদিগের সর্বপ্রধান পেয়। ইহারা অতিশয় কুসংস্কারাপন্ন। অপদেবতার প্রতি ইহাদের বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং অটল এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ইহাদের পূজা করে। বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে বলিয়া ইহাদিগের কোনো স্থায়ী সমাজ নাই। তবে তিন-চারিটি গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়াএকটি পঞ্চায়েৎ আছে। কোনো অন্যায় হইলে সকলে নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হয় এবং বিচার করে। যে গ্রামের মোড়ল, তাহাকে উচ্চাসন প্রদান করা হয়।

সভায় বাদী-প্রতিবাদী দুই দলের রীতিমত তর্ক আরম্ভ হয়। প্রত্যেকেই মোড়লের আদেশ লইয়া নিজের পক্ষকে সমর্থন করে। এই প্রকারে যে পক্ষ জয়লাভ করে, সেই পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারগণ মক্কেলের নিকট হইতে দুই-এক টাকা পুরস্কার পায়। এই প্রকারে ইহাদিগের বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়। সাঁওতালি ভাষায় ইহার নাম হালিসা। এই হালিসায় আমি কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম। কী বালক, কী বৃদ্ধ—সকলেই এই বিচারে যোগ দিতে পারে, কিন্তু সাবালক না হইলে কোনো পক্ষে যোগ দিয়া তর্ক করিবার ক্ষমতা হয় না। এই সমস্ত গ্রাম-সম্বন্ধীয় বিচার্য বিষয় ইহারা কাহারো নিকট প্রকাশ করে না।

মাংসে ইহাদের বড়ো রুচি। প্রায় সমস্ত পশুপক্ষীর মাংসই ইহারা ভক্ষণ করে।

ইঁদুর, কাক, শূকর, খরগোস, এবং নানাজাতীয় পক্ষী ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। ছয়-সাত বৎসর পূর্বে ইহারা মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিত।

আজকাল এ-বিষয়ে একটু উন্নতি হইয়াছে। আমি একদিন ইহাদের ভোজন-ক্রিয়ার পূর্বে তথায় উপস্থিত ছিলাম। একদিন দূর হইতে জনতা এবং লোকের কোলাহলে কৌতূহলী হইয়া নিকটে গমন করিয়া দেখিলাম বিরাট-আকার দুই শূকর রক্তাক্ত-কলেবরে পড়িয়া আছে, বক্ষে তিরের ফলার ক্ষত-চিহ্ন। বালক-বৃদ্ধ সকলেই প্রফুল্লমুখে শুষ্ক পত্র আহরণে ব্যস্ত। পরে স্তূপাকারে মৃত শূকরের উপর পত্র সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নিদান করা হইল। এমন দুর্গন্ধ ধূম উঠিতে লাগিল যে, আমাকে বাধ্য হইয়া সে-স্থান পরিত্যাগ করিতে হইল। এইপ্রকারে তিন-চারবার শূকরটাকে দগ্ধ করিলে পর কাস্তের সাহায্যে ইহাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া বাড়িতে বাড়িতে প্রেরণ করা হইল এবং সকলে পৃথক-পৃথকভাবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিল।

সন্তান জন্মিলে পাঁচ দিন পর্যন্ত সূতিকা গৃহে থাকিতে হয়। তারপর নবজাত শিশু এবং প্রসূতিকে সকলে স্পর্শ করিতে পারে। নামকরণের সময় গ্রামের সকলে সমবেত হয়, শিশু পিতৃমাতৃহীন হইলে কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তি মিলিত হইয়া শিশুর নাম রাখে। কিন্তু যদি শিশুর পিতামাতা বর্তমান থাকে, তবে পুত্র জন্মিলে পিতার নামই তাকে অর্পণ করা হয়; এবং কন্যা জন্মিলে মাতার নামেই তাহার নাম রাখা হয়।

পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেরই কান বেঁধা হয়। জন্মগ্রহণের তিন-চারি মাসের মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ইহাদিগের মধ্যে উচ্চ-নীচ জাতি আছে। তন্মধ্যে মণ্ডি, হেমবোল এবং হাঁসদাও এই তিনটি প্রধান। এই তিন জাতির পরস্পরের ভিতর উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু কন্যা ও পাত্র এক জাতি হইলে বিবাহ হয় না। নিমন্ত্রিত লোকদিগকে ভোজন করাইবার ভার বরকর্তাকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাহারা বিকালে কন্যাকর্তার বাটিতে সদলবলে আহার করিতে পারেন। বিবাহে বরকর্তার কন্যার পিতাকে বারো টাকা পণস্বরূপ দিতে হয়। এই প্রাপ্য টাকা দেওয়া চাই, ইহার কমও গ্রহণ করে না এবং বেশিও আশা করে না। ইহা ছাড়া আরও কাপড়, গহনা ইত্যাদি দিতে হয়। বিবাহ কন্যার বাটিতেই সম্পন্ন হয়। আমাদের ন্যায় ইহাদেরও একদল ঘটকসম্প্রদায় আছে। তাহারা পাত্রপাত্রী নির্বাচন করিয়া থাকে।

ইহাদের পাঁজি নাই। সুতরাং এক নূতন উপায়ে বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করা হয়।

যতদিন পরে বিবাহ দিবার ইচ্ছা হয়, একটি হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত সূত্রে ততগুলি গ্রন্থি দেওয়া হয়। তৎপরে প্রতিদিন একটি একটি করিয়া খুলিয়া ফেলিতে হয়। শেষ গ্রন্থির দিন বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পূর্বদিন গ্রামের সমুদয় লোক বরকে দেখিতে আসে। তখন কেহ এক টাকা, কেহ একখানি কাপড় ইত্যাদি যার যাহা সাধ্য দিয়া যায়। তাহাতে পাত্র প্রায় নয়-দশ টাকা পায়। বিবাহের দিন প্রাতে 'গায়েহলুদ' হয়। উভয়ের গৃহে পৃথক-পৃথকভাবে বরকন্যার গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। পাত্রী সমবেত এয়োস্ত্রীদিগকে সিঁদুর প্রদান করে।

বিবাহের পূর্বে কন্যা সীমন্তে সিঁদুর ধারণ করিতে পারে না।

যথাসময়ে বর কন্যার গৃহে আগমন করে। এই সময় একটু খেলা হয়। বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী উভয় দল মুখোমুখি হইয়া দণ্ডায়মান হয়। প্রত্যেকেই একটি যষ্ঠি গ্রহণ করে। তারপর পাঁয়তারার মতো কখনও বা উভয়দল সম্মুখে, কখনও বা পিছনে সরিয়া যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক উভয় দলের মধ্যে এই ক্রীড়া চলিতে থাকে। তৎপরে বরযাত্রীরা সমুদায় যষ্টি কন্যাযাত্রীদিগের পদতলে রাখিয়া দেয়। ইহা আত্ম-সমর্পণের চিহ্ন; আমাদের দেশে পূর্বকালে ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করিয়া কন্যা জয় করিয়া তবে বিবাহ করিতেন। ইহাদিগের ভিতর সেই প্রথা ক্রীড়াকারে পরিণত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তৎপরে বরযাত্রীরা ক্রমাগত তাহাদের অস্ত্র পুনর্গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, বারবার এই প্রকার ভাব দেখাইয়া ফিরিয়া আসে, তাহার পর পলায়নোদ্যত হইলেই কন্যাযাত্রীরা তাহাদিগকে হস্তের ইশারায় ডাকিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এখনও সেইপ্রকার ক্রীড়া চলিয়া থাকে। তাহাদের আহ্বানে বরযাত্রীগণ নিকটে আসিলে কন্যাযাত্রীরা হাতের ইশারায় তাহাদের মুখ মুছাইয়া দেয় এবং মুখে খাদ্য প্রদানের ভাব প্রদর্শন করে। অপর পক্ষও হাঁ করিয়া খাদ্য গ্রহণ ও চর্বণের ভাব প্রদর্শন করে। এইপ্রকার অভ্যর্থনা শেষ হইলে তাহাদিগকে বিনোদন করিবার নিমিত্ত নাচ এবং গান আরম্ভ হয়। সাঁওতাল রমণীরা এই নৃত্য ও গীত করিয়া থাকে। সকলে শ্রেণিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হয়, তৎপরে গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিরক্ষা করিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি-সহকারে নৃত্য করিতে থাকে। নৃত্যগীত সমাপ্ত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ বরযাত্রীদিগকে লইয়া একটি উচ্চ মাচার তলে গমন করে। তারপর যষ্টির দ্বারা উভয় দলই তাহাতে আঘাত করে। তাহার অর্থ, এই গৃহ-সম্পত্তি সবই আমাদের উভয়দলের। এইপ্রকারে দুটি পৃথক জাতি পরস্পরের সহিত একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়। তৎপরে দ্বিপ্রহরে

বিবাহ-কাল নির্দিষ্ট হয়। বরকন্যা উভয়ে দুইটি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হয়। তখন সকলে মিলিয়া কন্যাকে পিঁড়িতে উঠাইয়া বরকে তিনবার অথবা পাঁচবার প্রদক্ষিণ করে। ইহা সমাপ্ত হইলে উভয়ের গাত্রে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করা হয় এবং কন্যার সীমন্তে সিঁন্দুর লেপন করা হয়। ইহারা পূর্ব-পর্যন্ত কন্যার মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত থাকে। তার পর কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করা হয় এবং বরকন্যা উভয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ইহাই শুভদৃষ্টি। এইপ্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে সমস্ত দিন নৃত্যগীত ইত্যাদি চলিতে থাকে। কন্যা স্ত্রীলোকদিগের সহিত এবং বর পুরুষদিগের সহিত নৃত্যে যোগদান করে এবং উভয় দল মুখোমুখি হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। এইসময় কন্যাকে তাহার সম্পর্কিতদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রুপ সহ্য করিতে হয়। পাত্রও বাদ যায় না। ইহার পর কন্যা বরের গৃহে তিনদিন যাপন করে। তাহার পর পিতৃগৃহে একবৎসর যাপন করিয়া শ্বশুর-গৃহে আগমন করে এবং স্বামী-সহবাসে কালযাপন করে।

বৎসরে প্রত্যেক মাসেই ইহাদের পূজা অথবা পার্বণ আছে। ইহারা ফাল্গুন হইতে মাস গণনা করে। এই ফাল্গুন মাসে ইহাদের বাহা পূজা অর্থাৎ বসন্ত পূজা। এই পূজার পূর্বে কোনো সাঁওতাল-রমণী পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইতে পারে না, এবং নতুন ফল দেবতাকে না উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে না। চৈত্র মাসে ইহাদিগের কোন পূজা নাই। বৈশাখে হোমপূজা। এই পূজার আরাধ্য দেবতা মহাদেব। ইহারা একটি প্রস্তর শিলার নিকট পূজা প্রদান করিয়া সকলেই মঙ্গল প্রর্থনা করে। কয়েকটি বিশেষ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক পূজার কার্যই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক গ্রামে একঘর করিয়া পুরোহিত আছে। এই পরিবারের মধ্যে বালক বৃদ্ধ সকলেই পূজা করিবার অধিকারী। একটি পাত্রের উপর আতপ চাউল স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখে, তদপুরি একটি সুপারি স্থাপন করে। যদি সেটি নিম্নে পতিত হয় তবে দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন এরূপ মনে করিতে হইবে। নতুবা জানিতে হইবে ঈশ্বর অপ্রসন্ন রহিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে 'এরো পূজা'। গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া সর্দারকে লইয়া ঈশ্বরের পূজা করে এবং তাহার পর প্রত্যেকে নিজের গৃহেও সেই আরাধ্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে।

আষাঢ়ে হরিয়াও পূজা। সেই পূজার ইষ্টদেবতা ইন্দ্রদেব। প্রচুর বারিবর্ষণ করো— এই একমাত্র বর ইহারা তাঁহার নিকট প্রর্থনা করে। শ্রাবণ মাসে কোনো পূজা নাই। ভাদ্রে ছাতা পূজা। কেবলমাত্র আমোদের জন্য এই পূজা হয়। এই পূজায় নৃত্য গীত এবং জাঁকজমকের সহিত বাদ্য হয়। প্রথমে দুটি খুঁটি একহস্ত ব্যবধানে মৃত্তিকাতে প্রোথিত হয়। তৎপর একটি বংশখন্ড আড়াআড়িভাবে স্থাপন করা হয়। ইহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র থাকে এবং একটি দীর্ঘ-সরু বংশ এই ছিদ্রে ঋজুভাবে দাঁড় করানো হয়। তাহার ডগায় কাগজের টোকা নির্মাণ করিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার তলদেশে অনেক ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসে উহারা দিবি অর্থাৎ দুর্গাপূজা করে। এই পূজাতেই সর্বাপেক্ষা ঘটা হয়। নানাবিধ নৈবেদ্য ফলফুল দিয়া ইহার সম্মুখে স্থাপন করা হয় এবং দেবী প্রসন্ন কিনা, তাহা চাউলের উপর সুপারি দিয়া ঠিক করে। তৎপর যে পুরোহিত সে এই মন্ত্র দুই তিনবার উচ্চারণ করে "মা তবে এমাম কানাই" অর্থাৎ মা তবে তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করো। ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় মন্ত্র নাই। প্রায় প্রত্যেক পূজায় বলিদান হয়। এই পূজাতে বিশেষ করিয়া হয়। প্রতিমা একরাত্রি এবং পরদিন বিকাল পর্যন্ত গৃহে থাকে এবং ভাসানের সময় সকলে মিলিয়া নিকটস্থ জলপূর্ণ স্থানে ফেলিয়া দেয়। বলা বাহুল্য এই পূজায় নেশা, নাচ এবং বাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে হয়। প্রত্যেক শুভ অনুষ্ঠান সকলকে লইয়া সম্পন্ন হয়—

কাহারো গৃহে পূজা হইলে সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়। সুতরাং ভোজনও সামান্য-রকমে সম্পন্ন হয়। ভাত এবং কিছু মাংস। ইহাতেই সকলে খুশি।

কার্তিক মাসে সরস্বতী পূজা। ইহারও মূর্তি ক্রয় করা হয় এবং উপরোক্ত নিয়মানুসারে পূজা সম্পন্ন হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে নওবাই অর্থাৎ নবান্ন হয়। ইহা একটি পরব মাত্র। নতুন ধান্য ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইলেই সকলে মিলিয়া দুধ, গুড়, কলা এবং নতুন চাউল দিয়া মাখিয়া গৃহদেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করে।

পৌষ মাসে সহোরাই পূজা। এই পূজাটি বাঁধা পূজা নামে আমাদের নিকট সুপরিচিত।

এই সময়ে গৃহপালিত উপকারী পশুদিগকে ইহারা পূজা করে। বাস্তবিক এইটি খুব চমৎকার। পশুরা যদিও অত্যন্ত নীচ তথাপি তাহারা আমাদের উপকার করে বলিয়া একদিক দিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র এবং এই পূজা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নয়। উক্ত পশুদিগের কপালে সিঁদুর লেপন করিয়া নবীন তৃণ ভক্ষণ করানো হয়। তারপর তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া সকলে মিলিয়া উৎসব করে। মাঘ মাসে মাঘ পূজা। এই পূজাটি 'বর্ষ-শেষ' পূজা। সুতরাং ধুমধামও যথেষ্ট হয়।

ইহারা বিশিষ্ট দিনে অপদেবতাকে পূজা করে। গ্রামের পশ্চিমে প্রকাণ্ড একটি বট বৃক্ষ আছে। অন্ধকার রাত্রে সেই বৃক্ষের নিম্নে জীবন্ত ছাগশিশু বাঁধিয়া রাখে। যদি সকালে তাহাকে পাওয়া যায় তবে কাটিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এযাবৎ কোনো অদৃশ্য হস্ত এই বলি অপহরণ করে নাই। প্রাতে জীবন্ত লোকের হস্তেই তাহাদিগকে প্রাণ হারাইতে হয়।

মৃতের ইহারা সৎকার করে। পরিবারের মধ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বজাতীয়রা সকলে মিলিয়া মৃতদেহ খাটিয়াতে লইয়া শ্মশানে গিয়া পোড়াইয়া ফেলে এবং একটি অস্থি লইয়া সেই দিনই দামোদরে নিক্ষেপ করিয়া আসে এবং স্নান করিয়া গৃহে আগমন করে। এই দিন গ্রামের লোকেরা তাহাদের গৃহে সমবেত হয়। পরে প্রত্যেকেই চুল এবং দাড়ি-গোঁফ ছাটিয়া ফেলে। কেবল সেই পরিবারের সকলে মাথা মুণ্ডন করে। তারপর সকলে মিলিয়া ভোজন করে। মাছ-মাংসও এই খাওয়াতে নিষিদ্ধ নহে।

ইহাদিগের ভাষার একবর্ণও আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু অল্পকাল শিক্ষা করিলেই সরল হইয়া পড়ে। ইহাদিগের ক্রিয়ার আকৃতিগুলিই বিশেষ শিক্ষণীয়। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ একটি বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। উহাদিগের সাতটি ক্রিয়ার আকৃতি আছে। বাংলায় যেমন—তেছি, তেছিলাম, ব, আছি, আছিলাম অভ্যাস এবং আদেশ আছে, ইহাদিগেরও তেমনি 'লেনাই', 'কানাই', 'আকানাই', 'কান্তাহেঁআই', 'আই', 'হেলেনাই', 'মে' ইত্যাদি আছে। এইগুলি সাঁওতালি ক্রিয়ার নামের পরে বসাইয়া দিলেই ভিন্ন ভিন্ন আকার এবং অর্থ ধারণ করে। 'বসা'কে সাঁওতালিতে দুডু বলে। ইহার পর বসিবে, বসিতেছে ইত্যাদি মানে বোঝায়। নিম্নে একটি যথাক্রমে উক্ত পদগুলি বসাইয়া দিলেই যথাক্রমে বসে, তালিকা প্রদত্ত হইল—

দৌড়ান দৌড়	দৌড়ায় দৌড়কানাই	দৌড়াইতেছে দৌড়-আকানাই	দৌড়াইবে দৌড়আই	দৌড়াইতেছিল দৌড়-কান্তাহেঁআই	দৌড়াইয়াছে দৌড়হেলেনাই	দৌড়াইয়াছিল দৌড়লেনাই

নবীনচন্দ্র ঘোষ

সাঁওতাল পল্লী ও সাঁওতাল চরিত্র

পাহাড়িয়া অপেক্ষা সাঁওতালদিগের সংখ্যা অনেক অধিক, এবং তাহারা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। পাহাড়িয়ারা কেবল পাহাড়ে থাকিতে ভালবাসে; নিম্ন, সমতল ভূমি ইহাদের মন আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু সাঁওতালদের অধিকাংশই সমভূমিতে বাস করে, অতি অল্পসংখ্যক পাহাড়ে বা অধিত্যকায় অবস্থিতি করিতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশে পাহাড়িয়াদিগের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ এবং সাঁওতালের সংখ্যা প্রায় বার লক্ষ হইবে। এই বার লক্ষ সাঁওতাল একমাত্র সাঁওতাল পরগণায় আবদ্ধ নহে; গঙ্গা হইতে বৈতরিণী নদী পর্যন্ত প্রায় ৩৫০ মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া। সংখ্যার তারতম্যানুসারে সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, হাজারিবাগ, সিংভূম, মেদিনীপুর, উড়িষ্যার করদমহল, বীরভূম, বাঁকুড়া, ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর ও ভাগলপুরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইহারা নানা কারণে বঙ্গের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ ইউরোপীয়দিগের নিকট সুপরিচিত। ইহাদের কতিপয় লোক, স্বদেশে কর্ম না থাকিলে, ভাগলপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, দিনাজপুর ও সুদূর আসাম প্রদেশে যাইয়া কর্ম করিয়া থাকে। কৃষ্ণ, বলিষ্ঠ ও প্রায় উলঙ্গ দেহ দেখিয়া ও নূতন ভাষায় কথাবার্তা কহিতে শুনিয়া তাহাদের প্রতি সহজেই সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয়। অপিচ, পুলিসের উচ্চ কর্মচারিগণের মুখে সাঁওতাল কনস্টেবলদিগের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারা ডিটেক্‌টিভের কার্যে বিশেষ পারদর্শী না হইলেও, ডাকাইতের অনুসরণ বা আক্রমণকার্যে তাহাদের সমতুল্য কেহ নাই। জঙ্গলের ধারে বাস করে বলিয়া ইহাদের শরীর ম্যালেরিয়ার দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মারাত্মক আরণ্য প্রদেশে ইহারাই প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত হয়। সাঁওতাল পল্লির ত কথাই নাই, সাঁওতাল পল্লিতে যেসকল অভিনব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা সমস্ত ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না। গৃহগুলির উচ্চ ভিত্তি, চালের অতি পরিপাটি ছাউনি, ও প্রশস্ত গৃহ ও বারান্দাগুলি অতি সুন্দর এবং আরামজনক। মেটে দেওয়াল রুচি-অনুসারে লাল, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে বিভিন্নরূপে চিত্রিত। গ্রামের কুত্রাপি ময়লা বা আবর্জনা নাই; গরু, শূকর, মহিষ বা মুরগি দ্বারা ময়লা সঞ্চিত হইবামাত্রই তাহা ঝাঁটাইয়া দূরে নিক্ষেপ করে। প্রত্যেক বাটির সংলগ্ন জমিতে তামাক, সর্ষপ, কপি, লঙ্কা প্রভৃতি সতেজ শস্য সকল নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করে। প্রৌঢ়া ও যুবতীরা লাল পেড়ে ৬ গজি মোটা শাড়ি পরিধান করিয়া অনাবৃতকেশে সুন্দর সুন্দর ফুল, মনোহর পাখির পালক ও বিচিত্র পাতা গুঁজিয়া সানন্দচিত্তে আপন আপন কর্মে নিযুক্ত। কোন বিদেশীর লোক পল্লিভ্রমণে বহির্গত হইলে বালক বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই অনিমেষলোচনে আগন্তুকের অভিনব পরিচ্ছদ ও মুখের প্রতি চাহিয়া থাকে। কোথাও কর্মস্থল বা মাঠ হইতে প্রত্যাগতা যুবতীর দল শ্রেণিক্রমে পরস্পর হাত ধরাধরি ও পরিধেয় বস্ত্র যথেচ্ছ বিন্যস্ত করিয়া, অনাবৃত বা অর্ধাবৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তালে তালে নাচাইয়া মৃদু মধুর গীত গাহিতে গাহিতে পথে চলিয়া যায়। কোন স্থলে বালিকার দল খেলাচ্ছলে যুবতী বা প্রৌঢ়গণের ঝুমুর নাচের অনুকরণ করিতেছে। হাটে, ঘাটে, মাঠে, সর্বত্রই স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত সমভাবে চলিতেছে, খ্রিস্টিয়ান ও মহারাষ্ট্র দেশ ভিন্ন এরূপ প্রথা আর কোথাও নাই। কিন্তু খ্রিস্টিয়ান ও মহারাষ্ট্র দেশেও এত দূর স্ত্রীস্বাধীনতা নাই। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত মাঠে শস্যরোপণ

বা শস্যকর্তন করিতেছে, বড় বড় বোঝা লইয়া গৃহে বা বাজারে যাইতেছে, ভোজের নিমন্ত্রণে স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে দলে দলে রাস্তা চলিতেছে। যুবতী একাকিনী কোন উৎসব দেখিতে গিয়া রাত্রিকালে কোন যুবকের সহিত আপনার গৃহে উপস্থিত হইলে কেহ কোনরূপ আপত্তি করে না। আবার নৃত্যের সময় স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া এক সঙ্গে নৃত্য, বাদ্য ও অশ্লীল গানে রত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যুবক যুবতী দুই জন একত্র হইয়া নিভৃত পথে কোনও দূরবর্তী স্থানে যাইতেছে। পর্বসময়ের ত কথাই নাই, তখন স্ত্রী পুরুষের স্বেচ্ছাচার অদম্য বেগে চলিতে থাকে। পাহাড়িয়াদিগেরও ঐরূপ রীতি আছে বটে, কিন্তু তাহারা দুর্গম পাহাড়ে থাকে বলিয়া সর্বদা তাহা লোকের নেত্রগোচর হয় না। বিশেষতঃ তাহারা বিদেশীদের সঙ্গে সহসা মিশিতে চায় না; এ জন্য তাহাদের কার্যকলাপ লোকে অল্পই দেখিতে পায়। সাঁওতাল রমণীদিগের চরিত্র প্রশংসাযোগ্য না হইলেও উহাদিগের লজ্জাহীনা বলা ঠিক নহে; কারণ মদোন্মত্তা না হইলে ইহারা রমণী-সুলভ নম্রতা কখনও পরিত্যাগ করে না, তবে, ইহারা লজ্জা কাহাকে বলে, তাহা ভালরূপ জানে না। ইহারা সতীত্বের মর্যাদা এখনও শেখে নাই। কুমারীরা যৌবনে পদার্পণ করিয়াও দীর্ঘকাল অবিবাহিতা থাকে বলিয়া অনেক সভ্যতাভিমানী উচ্চ রাজকর্মচারী ইহাদের ক্ষণিক বা স্থায়ী সাহায্যে চিরকুমার ব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে ও হইতেছে। শুধু সাঁওতাল কেন, সাঁওতাল পরগণার অধিকাংশ স্ত্রীলোকের চরিত্র যেরূপ নিন্দনীয়, পৃথিবীতে আর কোথাও সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। পিতা-মাতা বা ভ্রাতা কন্যা বা ভগ্নীগণকে অসৎপথে চলিতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ দেয় ও সাহায্য করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়জাতীয়ের মধ্যে কুৎসিত ব্যাধি যত অধিক, এত অন্য কোথাও নাই। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডায়েরী দেখিলে এ বিষয়ের যথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। আবার বিধবাবিবাহ প্রচলিত। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈদ্য, কায়স্থ এবং আরও ২/১ উচ্চ শ্রেণি ব্যতীত সকল বর্ণের মধ্যেই বিধবাবিবাহ প্রচলিত। গোয়ালা, কুম্ভকার, নাপিত, ধানুক, কাহার, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি সৎশূদ্রজাতীয়েরা প্রাণান্তেও বাঙালি ব্রাহ্মণের প্রস্তুত অন্ন আহার করে না; কিন্তু তাহারা অনায়াসে স্বজাতীয় বিধবা বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছে। বিধবার গর্ভজাত পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইতেছে; কেহই তাহাকে ঘৃণা করে না। অনেক স্থলে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, নাপিত, কুম্ভকার প্রভৃতি জাতীয় অনেক পরিবারে দম্পতীর মধ্যে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী ৮/১০ বৎসরের বড়। ১৪/১৫ বর্ষীয়া মধ্যজাতীয়া হিন্দু যুবতীর সহিত ৮/৯ বর্ষীয় বালকের বিবাহ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায়শঃ মধ্যবর্তী হিন্দুঘরের এই প্রকার কুলবধূগণ নিশীথে দূরতর সঙ্কেতস্থলে উপস্থিত হইয়া, বিভিন্নজাতীয় ও ভিন্নধর্মাবলম্বী কুচরিত্র যুবকগণের সহিত মদ্যমাংসাহারে বিভোর হইয়া হাস্য কৌতুকে রজনী যাপন করিয়া থাকে। মধ্যবর্তী শ্রেণির হিন্দু পরিবারে যখন এইরূপ প্রথা প্রচলিত, তখন নীচজাতীয়ের মধ্যে কত দূর বীভৎস কাণ্ড চলিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সাঁওতাল যুবতী স্বামী কর্তৃক নিগৃহীত হইলে সময়ে সময়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে। এইরূপ বিবাহে যুবতীর পিতাও কিছু পণ গ্রহণ করিয়া থাকে।

সাহিত্য ১৩০৭ পৌষ

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতালদের গ্রামে

আজ প্রায়২৫/২৬ বৎসরের কথা, তখন আমি সাঁওতাল পরগণায় স্কুল পরিদর্শনের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম। একবার গড্ডা মহকুমায় যাইবার আদেশ হইল। ডেপুটি কমিশনার সাহেব সেখানে যাইবেন। যাহারা জেলার পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত আছেন তাহাদের সকলকেই সেখানে যাইতে হইবে।

ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া দুমকা হইতে গো-শকটে উঠিলাম। গো শকটটি আমার মনোমত করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। শকটের উপরে একটি বৃহদাকার পালকি, তাহার তলায় দুইদিকে দুইটি বাক্স। একটিতে চাল ডাল আলু ঘি তেল ইত্যাদি রাখিতাম, অপরটিতে রন্ধনের উপকরণ বাসন ইত্যাদি থাকিত। চাল ডাল সঙ্গে না থাকিলে মফস্বলে বড়োই কষ্ট ভোগ করিতে হইত। এইজন্য সঙ্গে রসদ না লইয়া বাহির হইতাম না।

জ্যোৎস্নালোকে পথ-ঘাট বন উপবন আলোকিত। শালবনের উপর দিয়া জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলিতেছে; ছোটো ছোটো পাহাড়গুলি নীরবে চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিতেছে। আমার শকট মন্থরগতিতে চলিয়াছে, দুই ধারে নিবিড় শাল-জঙ্গল, তাহার মধ্য হইতে সাঁওতাল রমণীদের নৃত্য-গীতের ধ্বনি, মাদলের শব্দ শোনা যাইতেছিল—সেই গান শুনিতে শুনিতে আমি নিদ্রিত হইলাম। সেই রাত্রের মধ্যে প্রায় ২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিলাম। সকালে একটি বাঙলোয় থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, দুইটি ইংরেজ বাঙলোর দুইটি কামরা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, আর স্থান নাই। আমার চাপরাশি পাঠককে বলিলাম—"পাঠক এখন কী করা যায়, মধ্যাহ্নভোজন কোথায় হইবে? পাঠক বলিল", বাবু নিকটে একটি সাঁওতালের গ্রাম আছে—সেখানে একটি পাঠশালাও আছে, যদি বলেন সেইখানে গিয়া রসুই করি, আপনার পাঠশালা দেখাও হইবে।" আমি বলিলাম, "আমি তাহাই চাই! বেশ কথা, সাঁওতালদের গ্রামেই চল, সেখানে যাহা হয় করা যাইবে।" পাঠক-চাপরাশি আমার আগেই সেই গ্রামে চলিয়া গেল—আমি একটি বাঁধের ধারে প্রাতঃকৃত সমাপন করিয়া পুনরায় শকটে আরোহণ করিলাম ও সাঁওতালদের গ্রামে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। দুমকায় অনেক সাঁওতালের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহারা শহরের নিকটে থাকায় তাহাদের মধ্যে সভ্যতা ও কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে—সেইজন্য তাহাদের আচার ব্যবহার ভালো নয়। সেখানকার সাঁওতাল রমণীদের চরিত্র-সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা নাই, দিতে কুণ্ঠিত বোধও করিতেছি। এইজন্য জঙ্গলের মধ্যে শহরের অতিদূরে খাঁটি অকৃত্রিম সাঁওতাল দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম।

ধীরে ধীরে গো-শকট সাঁওতালদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গাড়ি হইতে দেখিলাম গ্রামের বহির্ভাগে গ্রাম্য রাস্তার দুইধারে কতকগুলি সাঁওতাল শ্রেণিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদের মধ্যে যুবক, যুবতী, বৃদ্ধা, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে নির্বাক নিঃস্পন্দ হইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে-গ্রামে কখনও ডেপুটি ইন্সপেক্টরের

শুভাগমন হয় নাই—সুতরাং অদ্য তাহাদের পক্ষে একটি বিশেষ ঘটনা। স্কুলের বড়বাবু কী প্রকারের জীব তাহা তাহারা দেখিতে আসিয়াছে—গ্রাম হইতে প্রায় ৮/১০ টা কুকুরও তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া আছে।

আমি তাহাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিলাম ও কী প্রকারে তাহাদের সম্ভাষণ করিব ভাবিতে লাগিলাম—একটা বুদ্ধি চট করিয়া জোগাইল। আমার তখন নস্য লওয়া অভ্যাস ছিল (এখনও আছে)। নস্যের ডিবেটা বাহির করিলাম এবং সকলকে বলিলাম, 'হাত পাত'। নিজে হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইয়া দিলাম। কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া গম্ভীরভাবে তাহারা হাত পাতিল। আমি একটু-একটু নস্য লইয়া সকলের হাতে দিলাম (অবশ্য ছোটো ছেলেমেয়েদিগকে রেহাই দিয়াছিলাম)। তাহারা নস্য লইয়া কী করিবে তাহা জানিত না, আমি তাহাদের সম্মুখে একটু নস্য লইলাম এবং বলিলাম 'এইরকম কর'। তাহার দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিল—তাহার পর যাহা হইল তাহা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা খুলিল—এমন মুখভরা হাসি কখনও শুনি নাই। হাঁচি, হাসি, চক্ষে জল, নাসিকায় জল, ইহাদের একত্র সমাবেশে দৃশ্যটি বড়ই অদ্ভুতরকমের হইয়াছিল। মেশিন কামানে যেমন শত্রুপক্ষ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়—তেমনি দু-এক কণা নস্যের প্রভাবে সাঁওতালদের দল ভাঙিয়া গেল—হাসিতে হাসিতে এ উহার গায়ে পড়ে, এ উহার গলা জড়াইয়া ধরে, এ মাটিতে গড়াগড়ি দেয়... কোথায় তাহাদের গাম্ভীর্য অন্তর্ধান করিল। কুকুরগুলিও বেগতিক দেখিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল, গ্রাম হইতে যাহারা গৃহকার্যে ব্যস্ত ছিল তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ও ব্যাপারটি কী দেখিয়া-শুনিয়া তাহারাও সেই কোলাহলে যোগদান করিল। আমার কার্য সমাধা করিয়া আমি পদব্রজে স্কুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তাহারাও পশ্চাতে কিয়দ্দুর আমার অনুসরণ করিল—পরে হাসিতে হাসিতে আপন আপন ঘরে ফিরিয়া গেল, তাহারা বুঝিল যে স্কুলের ডেপুটি একটি অদ্ভুত জীব নয়, তাহাদেরই মতন মানুষ।

স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার চাপরাশি রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে। ঘরটি বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে, ঘরের এক কোণে উনান কাটা হইয়াছে—মধ্যস্থলে একটি কম্বল বিছানো হইয়াছে। আমি সেই কম্বলে বসিলাম। স্কুল-গৃহটির নিম্নদেশ দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত—স্থানটি বেশ নির্জন, অদূরে নদীর ওপারে শালজঙ্গল—তাহাতে কৃষ্ণকায় সাঁওতাল বালকেরা গোরু-মহিষ চরাইতেছে ও বাঁশি বাজাইতেছে। তাহাদের পরিধানে একটি করিয়া কৌপীন—দৃশ্যটি বড়োই ভালো লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, দুই-একজন সাঁওতাল আমার নিকট আসিতেছে—তাহাদের মধ্যে একজন গ্রামের 'প্রধান' নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবু তোকে কিছু খেতে দিব, লিবি তো?" সাঁওতাল আমাকে কী খাইতে দিবে? ভাবিলাম ভুট্টা, জুনার ডিংলা—এই দু-চারটা আমাকে উপহার দিবে, আমি বলিলাম, "খাব বই কি। কী খেতে দেবে নিয়ে এস"—তাহারা খুব খুশি হইয়া ফিরিয়া গেল—আমি ভুট্টা জুনারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার পাঠক-ঠাকুর তখন হাঁড়ি চাপাইয়া দিয়াছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে একদল সাঁওতাল-বালক আসিতেছে দেখিলাম। পশ্চাতে 'প্রধান,' তাহাদের সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু জিনিস আছে—প্রথম বালকটি রন্ধনকাষ্ঠের বোঝা মাথায় করিয়া আনিতেছে, দ্বিতীয়টি দুইটি পায়রা ছানা ও ৪টি মাগুর মাছ। তাহার

পশ্চাতে একটি ডালায় সরু চাল ও অড়হরের ডাল—তাহার পশ্চাতে ময়দা ঘি ও উৎকৃষ্ট গুড়। তাহার পশ্চাতে গৃহজাত তরিতরকারি। তাহার পশ্চাতে দধি ও দুগ্ধ। তাহার পর আর মনে নাই। তাহারা একে-একে সমস্ত জিনিসগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল। আমি তো দেখিয়াই অবাক। প্রধান-মহাশয়কে বলিলাম, 'আমি এত জিনিস লইয়া কী করিব? আমি তো একবেলা খাইব?'

প্রধান উত্তর দিল—"তুই আসবি তা তো আমরা জানতাম না—যা সামান্য জিনিস পেলাম তাই দিয়েছি—এগুলি সব তোকে লিতেই হবে।"

আমার একটু রাগ হইল, বলিলাম, "তুমি তো বেশ মজার লোক হে, সামান্য জিনিস বলিয়া এক গাড়ি জিনিস আনিয়াছ। আমার এত দরকার নাই। তুমি নিয়ে যাও। আর যদি আমাকে নিতে হয়, তবে দাম নাও।"

সাঁওতাল বলিল, "দামি যদি দিবি তবে আগে গলায় ছুরি দে।"

এই সময় পাঠক আমাকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু একবার উঠিয়া আসুন তো"—আমি তাহার নিকট উঠিয়া গিয়া বলিলাম, "কী"—পাঠক বলিল, "বাবু উহাদের দামটামের কথা বলিবেন না—তাহাতে উহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হয় ও অপমান বোধ করে, আপনি জিনিসগুলি লউন। উহাদের গ্রামে ভদ্রলোক আসিলে উহারা ওই প্রকারই করিয়া থাকে—আর ওই প্রধানটি গ্রামের মধ্যে বড়ো লোক। আপনি আর কিছু বলিবেন না!"

আমিও বুঝিলাম যে উহাদিগকে চটাইয়া লাভ নাই। অগত্যা প্রধানকে বলিলাম "আচ্ছা, তোমাদের জিনিসগুলি লইলাম।" এই বলিয়া প্রথমত পায়রা ছানাগুলির বন্ধন মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া উড়াইয়া দিলাম আর বলিলাম, "আমি মাংস খাই না"—পাখিগুলি উড়িয়া গেল। তাহার পর প্রধানকে বলিলাম, "তোমাদের স্কুল দেখিয়া আসি চল।" অদ্য পাঠশালাগৃহটি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া প্রধান আপনার আটচালাতেই পাঠশালা বসাইয়াছিল।

পাঠশালায় গিয়া সাঁওতাল-বালকদের সহিত দেখা করিলাম—কতকগুলি বালক আমার ভয়ে জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছিল—১০/১৫ জন মোট উপস্থিত ছিল—তাহারাও ভয়ে জড়সড়। কী করি তাহাদের ভয় ভাঙাইতে হইল—সকলকে বাহিরে আসিতে বলিলাম। একটা হাঁড়ি জোগাড় করিয়া আনা হইল—হাঁড়িটি কিছু দূরে রাখা হইল—একটি ছেলের চোখ বাঁধিয়া দিয়া হাতে একটি শালের লাঠি দিয়া বলিলাম, "ওই হাঁড়িটিকে ভাঙিতে হইবে, যে পারিবে সে একটি লাল-নীল পেনসিল প্রাইজ পাইবে।"

এই বলিয়া ছেলেটিকে একবার ঘুরাইয়া দিয়া বলিলাম, "যাও হাঁড়িটিতে ভাঙিয়া এস।" সে বেচারি ঘুরপাক খাইয়া পূর্বদিকে না গিয়া দক্ষিণ দিকে হাঁড়ি ভাঙিতে গেল ও খানিক দূর গিয়া হাঁড়ি নিকটে আছে ভাবিয়া মাটিতে লাঠি মারিল। আর চারি দিকে হাসির লহরি উঠিল। তাহার চোখ খুলিয়া দেওয়া হইল, আর একজনকে ওই রকম পাঠানো হইল। সে উত্তর দিকে গেল ও মাটিতে লাঠি মারিল। এই প্রকার ৫/৭ টি ছেলে অকৃতকার্য হওয়ার পর একটু দুষ্ট ছেলে কোনো-গতিতে বোধহয় চোখের কাপড়টিকে একটু আলগা করিয়া চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল, এবং হাঁড়িটির দিক ঠিক করিয়া লইয়া সেই দিকে গিয়া হাঁড়িটিকে ভাঙিয়া ফেলিল ও প্রাইজ পাইল। বলা বাহুল্য, এই সময় গ্রামের সমস্ত পুরুষ, রমণী আমাদের চারিধারে দাঁড়াইয়াছিল ও তাহাদের হাস্য ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত

হইতেছিল। সাঁওতাল রমণীদের (বিশেষত অল্পবয়স্কাদের) হাসি একটা শুনিবার জিনিস, ইহার তুলনা নাই। তাহাদের চোখের চাহনিটিও দেখিবার জিনিস। সে চাহনির মধ্যে কোনো প্রকার হাবভাবের লেশমাত্র নাই। ইংরেজিতে "sexless stare of infancy" পড়িয়াছিলাম। এই দৃষ্টি সেই প্রকার সরল স্বচ্ছ ও কপটতাশূন্য, সেইজন্য এতই মধুর—রমণীদের চুলের পারিপাট্যটা কিছু বেশি, আর তাহাদের নিকট ফুলের আদরটা আরও বেশি। প্রত্যেক যুবতীর খোঁপায় ও কানে ফুল দেখিলাম। প্রত্যেকের চুলগুলি তৈলসিক্ত ও সুচিক্কণ। প্রত্যেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুকোমল অথচ বলিষ্ঠ। তাহাদের নিকট আর একবার নস্যের ডিবাটা বাহির করিয়া নস্য দিতে চাহিলাম, কিন্তু সে-বার তাহারা হাসিয়া ছুটিয়া পলাইল।

তাহার পর বালকদের পরীক্ষা লইলাম। তখন তাহাদের ভয় ভাঙিয়াছে—বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক তাহারা পড়ে—আবার ইংরেজি হরফে লিখিত সাঁওতালি ভাষাও কোথাও কোথাও শিক্ষা দেওয়া হয়। মিশনারি সাহেবেরা সাঁওতালি পুস্তক লিখিয়াছেন ও সাঁওতালি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন—ব্যাকরণটি গ্রিক কি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের অপেক্ষাও শক্ত। যাহা হউক, তাহাদিগকে একটু পড়াইয়া, একটু লিখাইয়া দু-চারিটি মানসাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিয়া ছুটি দিলাম ও এক দিনের জন্য স্কুল বন্ধ দিতে বলিলাম। তাহাতে তাহাদের খুব আনন্দ। পাঠশালা দেখিয়া যখন ফিরিলাম তখন প্রায় ১২টা বাজিয়াছে। তাহার পর নদীর জলে স্নান করিয়া আহারে বসিলাম। এ প্রকার মধ্যাহ্ন ভোজন প্রায়ই ঘটে না—মাগুর মাছের ঝোল, অড়হরের ডাল, সুগন্ধি চালের অন্ন, দু-তিনটা ভাজা, ডালনা, দধি ও দুধ—পাকও অতি সুন্দর হইয়াছিল—আহারও প্রচুর পরিমাণে হইল। সাঁওতালদের গ্রামে যে বিধাতা এরূপ আহার জোগাইবেন তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সাঁওতালদের নিকট বিদায় লইয়া আবার গো-শকটে উঠিলাম—পিছনে পিছনে সাঁওতাল পুরুষ, রমণী ও ছেলের দল অনেক দূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়াছিল। শেষে তাহাদিগকে অনেক কষ্টে বিদায় দিলাম। তাহাদের সেই অকপট সরল ব্যবহারে আমি যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সে কথা বলাই বাহুল্য! তাহারা যেন আমার কত আপনার লোক, কতকালের পরিচিত বন্ধু। তাহাদের সেই নীরব আদর-অভ্যর্থনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। সভ্যতার শুষ্ক হাসি ও অভ্যর্থনা ইহার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

প্রবাসী ● ১৩৩২ ভাদ্র

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতাল পুরাণ

হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রে, খ্রিস্টিয়গণের ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে, মুসলমানদিগের কোরাণাদিতে, দ্রাবিড়িগণের পুরাণশাস্ত্রে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক একটা কাল্পনিক বিবরণ আছে, সেইরূপ সাঁওতালদিগেরও একটা পুরাণ আছে। তবে সাঁওতালদিগের লিপিবিদ্যা না থাকায় তাহাদের লিখিত পুরাণ নাই। যাহা আছে তাহা তাহার বংশানুক্রমে শুনিয়া মনে গাঁথিয়া রাখে। তাহাদের এই অলিখিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে, তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের একটা ধারা আছে এবং তাহাদের সভ্যতা ও চিন্তা-প্রণালীর অনুরূপ নানা প্রাচীন কাহিনি আছে।

সৃষ্টিকাণ্ড

অতি প্রাচীনকালে ঠাকুর-বাবা[১] মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সুবিধা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের জন্য নানা প্রকার বিধান করিয়াছিলেন। ঠাকুর বাবার সৃষ্টিতে মানুষকে প্ররিশ্রম করিয়া কোনো কিছু প্রস্তুত করিতে হইত না। মানুষের যাহা আবশ্যক তাহা প্রকৃতিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মাইত। মানুষ ইচ্ছামতো তাহা কুড়াইয়া লইয়া ভোগ দখল করিত। কিন্তু মানুষ নিজের দোষে ঠাকুর বাবাকে চটাইয়া সেই সমস্ত সুবিধা হারাইয়াছে।

তখন সাঁওতালেরা চম্পা রাজ্যে[২] কিস্কুরাজাদিগের[৩] অধীনে পরমসুখে বাস করিত। তাহারা অতি সরল ও ধর্মভীরু ছিল এবং ঠাকুরের পূজা করিত। সেই জন্য ঠাকুরের খুব স্নেহ ছিল। ধান-গাছে তখন ধান জন্মাইত না,—একেবারে তুষবিহীন চাউল গাছে ধরিত, —সাঁওতালদিগকে ঢেঁকিতে ধান ভাঙিয়া চাউল করিয়া লইতে হইত না—গাছ হইতে তুলিয়া লইলেই হইত। কাপাস গাছে তুলা হইত না; একেবারে সাঁওতালদিগের পরিধানোপযোগী বস্ত্র কাপাস-বৃক্ষের ফল-স্বরূপে জন্মাইত। তুলা হইতে সুতা ও সুতা হইতে বস্ত্রনির্মাণের পরিশ্রম সাঁওতালদিগকে করিতে হইত না। আর একটা বিশেষ সুবিধা ছিল এই যে, মাথার উকুন তুলিবার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক হইত না। কারণ মাথার খুলি (skull) তখন জোড়া ছিল না; আবশ্যক মতো খুলিয়া লইয়া পরিষ্কার করিয়া, পুনরায় পাগড়ির ন্যায় মাথায় বসাইয়া দিলেই চলিত।

সাঁওতালদিগের এই পৌরাণিক সুখসম্ভারের অন্তরায় হইয়াছিল একটি হীন-স্বভাবা দাসী। খ্রিস্টিয়গণের ইবা (Eva) ও গ্রিকদিগের প্রজের্পিনার (Proserpina) ন্যায় এই রমনীই সাঁওতালদিগের পৌরাণিক সুখে হানা দিয়াছে। এই রমণী এক রাজার দাসী ছিল। একদিন মাঠে মলত্যাগ কালে গাছ হইতে চাউল তুলিয়া খাইয়া ফেলে। আর একটা

১. বাবা যেমন একটা সংসারের স্বামী বা গৃহস্বামী তেমনি ঠাকুর-বাবা এই বিশ্বসংসারের স্বামী বা কর্তা। বিমান-বিহারী সূর্যদেবই সাঁওতালদের ঠাকুর-বাবা।

২. এই চম্পা কোথায় ছিল?

৩. সাঁওতালদিগের মধ্যে পৌরাণিক যুগে দ্বাদশ শ্রেণি বা বর্ণ ছিল। স্ব-শ্রেণিতে ইহাদের বিবাহ হইত না। ‘কিস্‌কু’ ইহাদের অন্যতম ;কিস্‌কুগণই পৌরাণিক যুগে রাজত্ব করিতেন। তাহাদের রাজত্ব আমাদের ‘রাম-রাজত্বের’ ন্যায় সর্বসুখের হেতুভুত ছিল।

অমার্জনীয় অপরাধ তাহার এই ছিল যে, গোশালা পরিষ্কার করিবার কালে এই রমণী গোময় দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র কলঙ্কিত করিত। ঠাকুর-বাবা এ প্রকার অপবিত্রতা দেখিতে পারিলেন না। এ অপরাধের ভয়ংকর শাস্তি হইল। ঠাকুর-বাবা ক্রুদ্ধ হইয়া গাছে চাউল ধরা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই অবধি গাছে ধান হয়, চাউল হয় না। কারণ তুষাবৃত না থাকিলে পুনঃপুন চাউল এইভাবে অপবিত্র হইত। আর হইল এই যে, গাছে কাপড় জন্মান বন্ধ হইয়া গেল। গাছে সেই অবধি কাপাস ফল ধরে। নতুবা এ[illegible]ভাবে চিরকাল দুষ্টস্বভাবা রমণীগণ নিসর্গজাত বস্ত্র অপবিত্র করিত। আর মানুষের মাথার খুলি [illegible]নুষের মাথায় জুড়িয়া গেল ; পাগড়ির ন্যায় আলগা হইয়া লাগিয়া থাকিল না। কারণ তাহা না হইলে তাহারা মাথা অপবিত্র করিবার সুযোগ পাইত।[৪]

প্রাচীনকালে আকাশখানা পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া থাকিত এবং ঠাকুর বাবা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া সাঁওতালদিগের ঘরবাড়ি দেখিয়া যাইতেন। সেই জন্য সাঁওতালদিগের পূর্বপুরুষগণ ঘরের উঠানে, সদর দরজায় বা খিড়কি দুয়ারে উচ্ছিষ্ট দ্রব্যাদি বা উচ্ছিষ্ট ভোজন পত্রাদি ফেলিয়া রাখিতে ভুয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের আদেশ অনুসারে রাত্রিকালে ঘরে কোনো উচ্ছিষ্ট বাসন রাখিবার উপায় নাই, কারণ ঠাকুর-বাবা সাধারণত রাত্রিকালেই পৃথিবী পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি যদি কোনো গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন দেখিতে পান, তাহা হইলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। ফলে অভিশাপ ও অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্ত্রীজাতিই সাঁওতালদিগের সর্ব অনিষ্টের মূল হইয়াছে। কারণ একদিন এক রমণী রাত্রিকালে আহারের পর উচ্ছিষ্ট শাল-পত্রসমূহ ঘরের বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাতাসে উড়িয়া সেই পাতা আকাশে চলিয়া যায়। তাহাতে ঠাকুর বাবা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবী হইতে আকাশটি বহুদূরে সরাইয়া দিয়াছেন;কারণ মানুষের এত অপবিত্র ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই।

এইজন্য এখনও সাঁওতালেরা রাস্তায় উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিতে নিষেধ করে এবং নিজেরা উচ্ছিষ্ট পাতা রাস্তায় ফেলে না। লোকালয় হইতে দূরবর্তী স্থানে তাহারা উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলিয়া দিয়া আইসে।

সাঁওতালদিগের ঠাকুর-বাবা হইতেছেন ‘সিং চন্দো’ বা সূর্যদেব ; এবং ‘নিন্দ চন্দো’ বা চন্দ্রদেব তাহার পত্নী। সাঁওতালদিগের অপবিত্র ব্যবহারের ঠাকুর বাবা বা ‘সিং চন্দো’ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া পৃথিবীর সমস্ত সাঁওতাল বা মনুষ্যকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েন। আকাশে যে সকল তারা বা নক্ষত্র দেখা যায়, সেখানে দিবাভাগেও ঐ প্রকার তারা দেখা যাইত। দিনমানের তারাগুলি সিং চন্দোর পুত্রকন্যা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন ‘সিং চন্দো’র প্রতিজ্ঞা হইল মনুষ্যজাতির (অর্থাৎ সাঁওতাল জাতির) উচ্ছেদ সাধন করিতেই হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহার পুত্রকন্যাদেরও ধ্বংস করিতে হইবে। তাহা হইলে সৃষ্টি নাশ

৪. এই স্থানে উল্লেখ করা যায় যে, সাঁওতালেরা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। তাহাঁদের আরণ্য-গৃহ মৃত্তিকা-নির্মিত হইলেও অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের দেওয়ালের চতুর্দিক ইহারা লেপিয়া পরিষ্কার করে। উঠানটি রোজ লেপিয়া পরিষ্কার করে। আমাদের অনেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহ অপেক্ষা ইহাদের আরণ্য-গৃহ পরিষ্কার। ইহাদের ঘর ও উঠান চকচকে তকতকে। কোথাও কোনো আবর্জনা নাই। একটি পাতাও পড়িয়া থাকে না।

হইবে। 'নিন্দা চন্দো' স্নেহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তো আর সৃষ্টি নাশ দেখিতে পারেন না। কিন্তু উপায় কী? 'সিং চন্দো'র ইচ্ছায় বাধা দেয় কে? তথাপি 'নিন্দ চন্দো' অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। অনেক কথা-কাটাকাটির পর ঠাকুর-বাবা একটু নরম হইলেন। বলিলেন, নতুন সৃষ্টির জন্য দুইটি মানুষ ও দুইটি তারা রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট যাবতীয় নরনারী ও তারকার ধ্বংস হইবে।

অবশেষে স্থির হইল 'পিলচু-হারাম' ও 'পিলচু-বুধি' নামে যুবক ও যুবতীকে বাদ দিয়া সমস্ত মনুষ্যজাতির ধ্বংস হইবে। আর তারার মধ্যেও শুকতারা ও সন্ধ্যাতারাকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত তারারা ধ্বংস হইবে, এই স্থির হইয়া গেল। সুতরাং ঐ যুবক ও যুবতীর প্রতি সিং চন্দোর আদেশ হইল, "এই গহ্বরে প্রবেশ কর।" তাহারা ভয়-বিহ্বল চিত্তে গর্তে প্রবেশ করিল। তাহার পরে ঐ গহ্বর কাঁচা চামড়া দিয়া সিং চন্দো স্বয়ং ঢাকিয়া দিলেন।

তারপর ধ্বংসকার্য আরম্ভ হইল। এ ধ্বংস হিন্দুদিগের প্রলয়ের ন্যায় পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়া হয় নাই। খ্রিস্ট-ধর্মীয়গণের ন্যায় 'নোআর জাহাজ' (Noah's Ark) সৃষ্টিও হইল না। সূর্যের দাহিকা শক্তি অগ্নিরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। বন, জঙ্গল, মানুষ, জানোয়ার, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—সব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি এই অগ্নিবর্ষণ চলিল। গহ্বরের ভিতরে থাকিয়া সাঁওতাল যুবক ও যুবতী 'বাহা' সুরে গান ধরিল—

"পাঁচ দিন, পাঁচ রাত আগুন বরষিবে!—হো!
পাঁচ দিন, পাঁচ রাত, বড়ো বড়ো রাত! হো!
কোথা রইবি তোরা দুজন সাঁওতাল মানুষ?—হো!
কোথা গেলে রক্ষা পাবি তোরা? হো!
একটা চামড়া আছে একটা চামড়া আছে হে।
একটা পাহাড় আছে একটা পাহাড় হে!
আর একটা আছে তাতে গভর হে।
সেইখানে রব আমরা দুটি হে।
সেইখানে রক্ষা পাব দুটি হে।।"

পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রির অবসানে যখন তাহারা গহ্বরের বাহিরে আসিল, তখন তাহারা প্রথমেই দেখিল একটা 'করকে' গাছের মাথা ভাঙিয়া পুড়িতে পুড়িতে একটা গাভীর উপর পড়িয়াছে, গাভিটি পুড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বেই একটা মহিষ-গাই পুড়িয়া মরিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহারা গান ধরিল—

গাইটি ধক্‌ধক্ ছাই হে ধক্‌ধক্ ছাই!
করকের গাছ পুড়ে ছাই!
পড়ে আছে মহিষ গাই পুড়ে হয়ে ছাই হে
পুড়ে হয়ে ছাই।"

এই প্রকারে যে যে বস্তু তাহারা দেখিল, তাহা দেখিয়াই বিলাপের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। অন্য পক্ষে আকাশের বালক-বালিকা তারকা-কুলের কী হইল দেখুন।

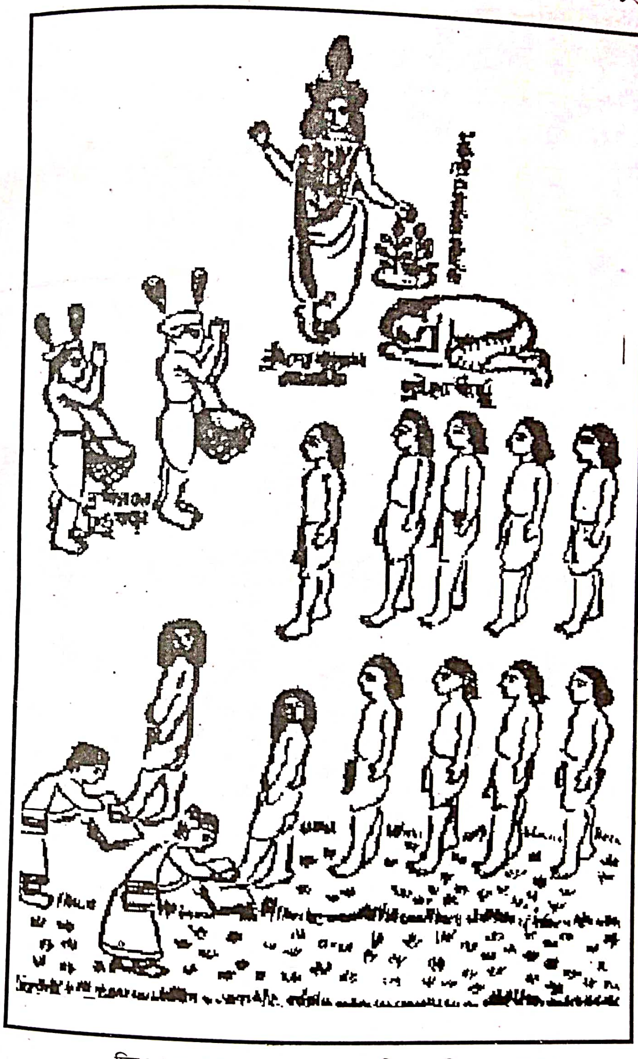

চিত্রঃ ১২৯-১৪০ পৃঃ—খেরওয়াল বংশী ধরমপুথি থেকে নেওয়া

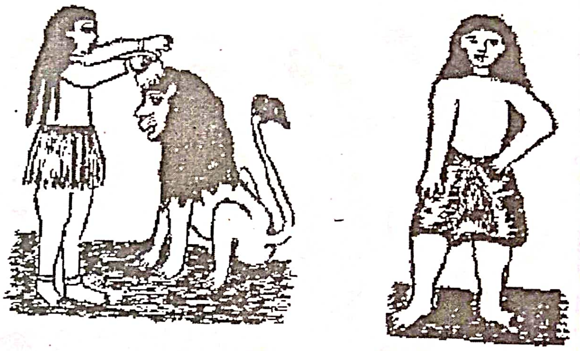

পালো ভাটু খেলায়সিনী

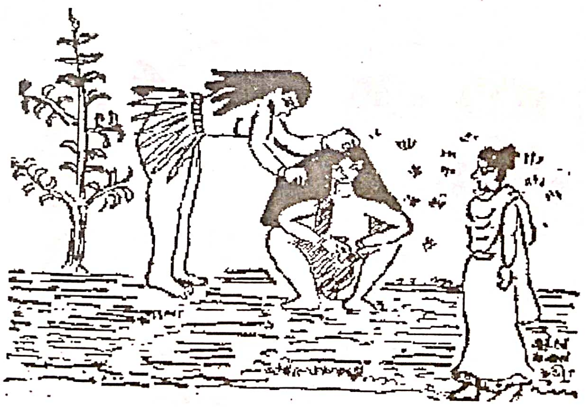

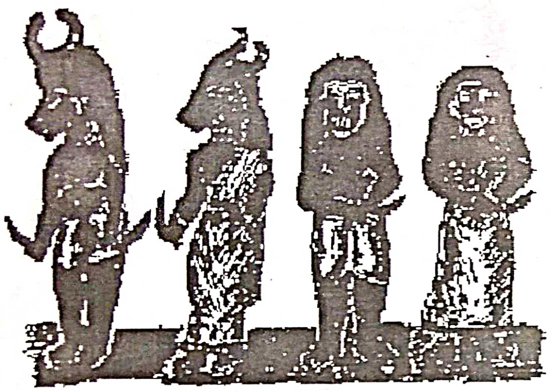

কালসিনী কালচুণ্ডি নাকানচুণ্ডি শশ্মানচুণ্ডি

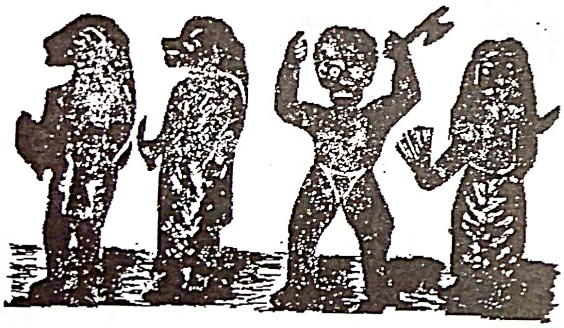

বিলাইচুণ্ডি যোগিনীচুণ্ডি

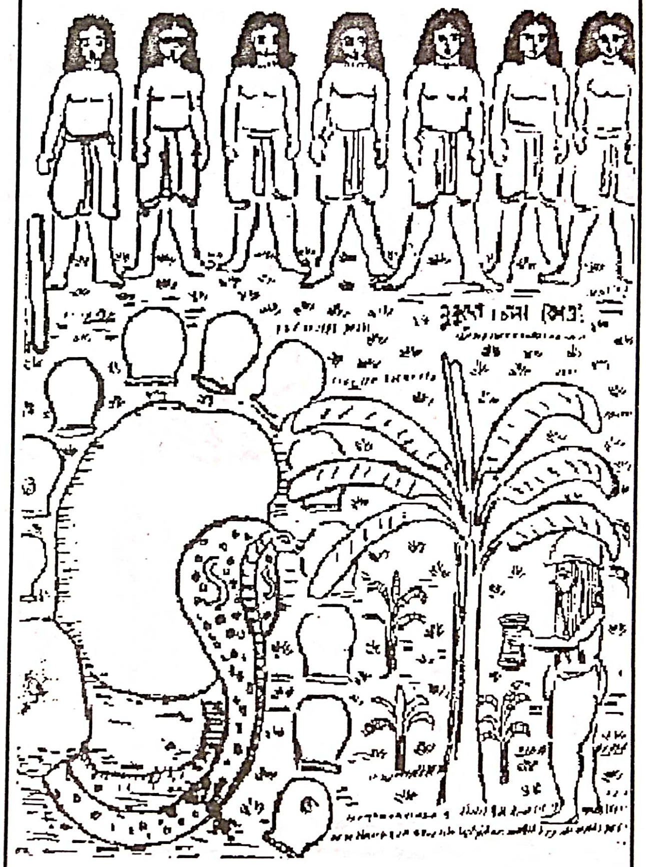

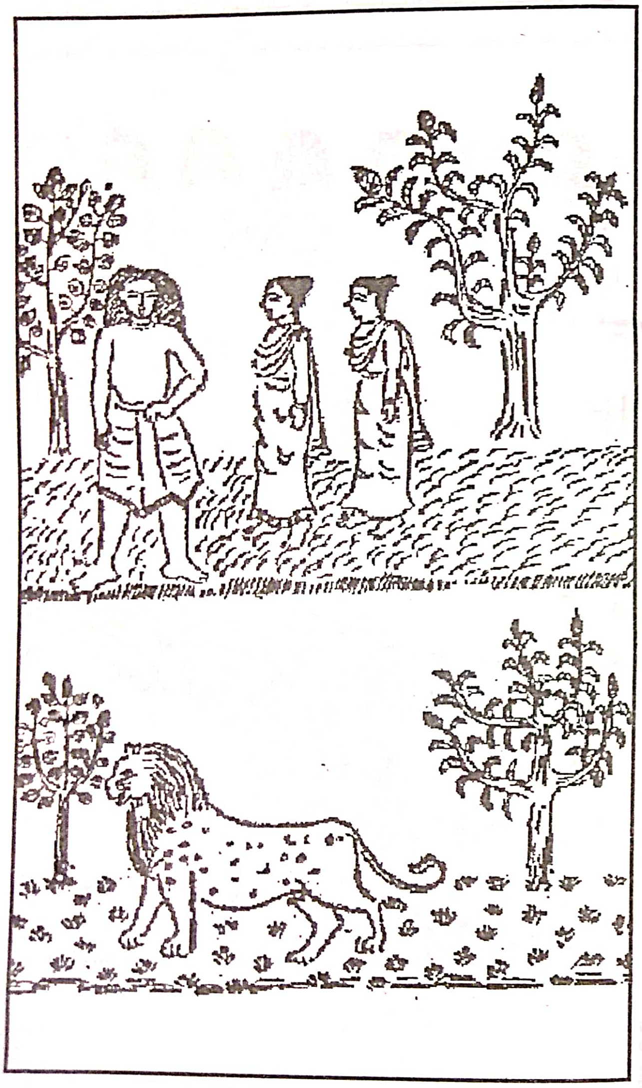

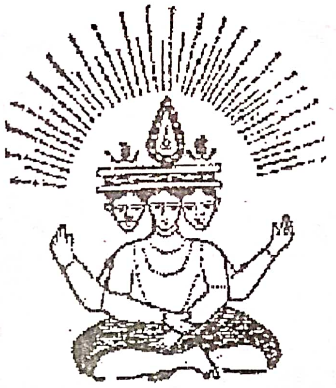

জোমসী বঙ্গা

আবগে বঙ্গা

অড়াঃ বঙ্গা

গড়া আবগে বঙ্গা

লুগু বুরু ঘাণ্টা বাড়ী। টাটীঝারী তুপুন নাই গাড়া।

লঙ্কা দ্বীপ। রাম, লক্ষণ, ছিতা।

নুকুদো তরুই কো

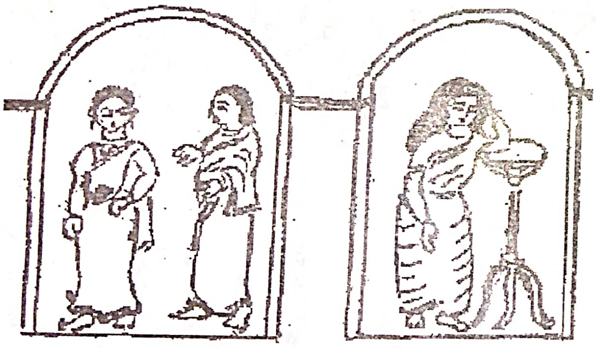

কাপরা, দানগী পুঁড়গী

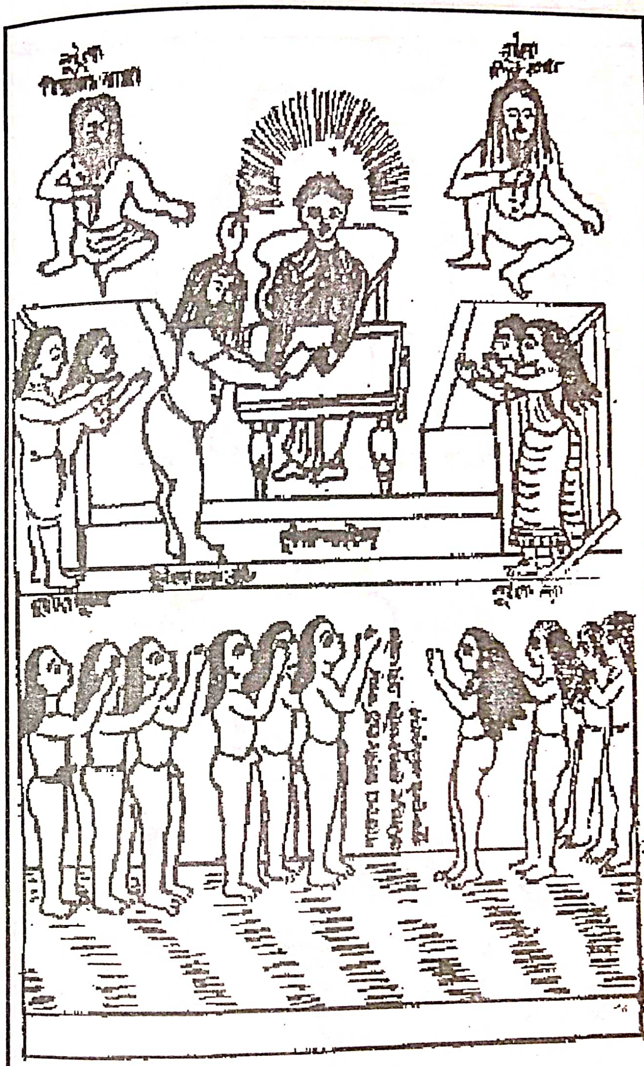

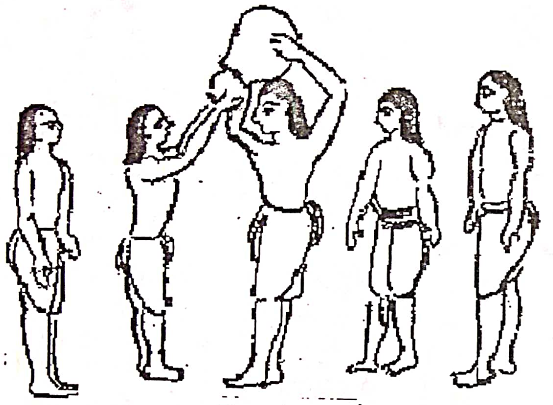

নুকুদো দাঃ দারাসকোঁও

নুইদো সাকিই

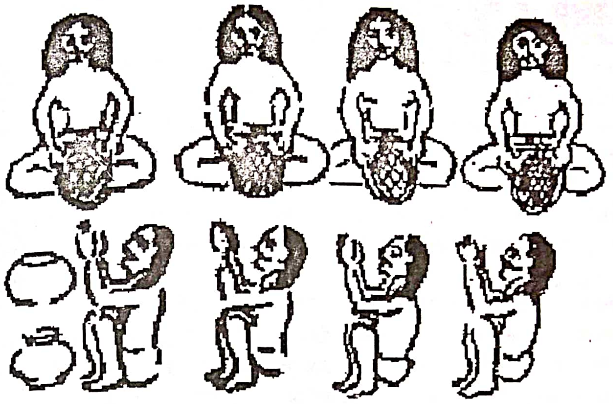

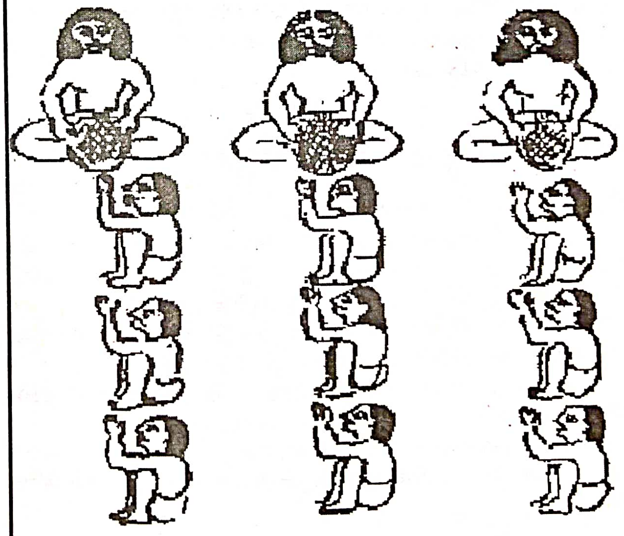

হাজার হইলেও নিন্দ চন্দোর রমণীর হৃদয়। আপন পুত্র-কন্যার ধ্বংস হইবে ইহা মাতৃহৃদয়ে সহ্য হইল না। 'সিং চন্দোর সহিত তিনি একটু চালাকি খেলিলেন। আপনার ভাগের যাবতীয় তারকা- কুলকে তিনি একটা ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। তারপর মুখে রাঙা রং মাখাইয়া সিং চন্দোকে বলিলেন, "আমার মুখ দেখ, আমি আমার ছেলেদের খাইয়া ফেলিয়াছি। তাহাদের রক্তে মুখ রাঙা হইয়াছে। তুমি তোমার ছেলেদের খাইতে পার।" সুতরাং শুকতারা ও সন্ধ্যাতারাকে বাদ দিয়া সমস্ত তারাগুলিকে সিং চন্দো খাইয়া ফেলিলেন। সেই অবধি আর দিনে তারা নাই।

এইরূপ সমস্ত কার্য করিয়া সিং চন্দোর আর দ্বিতীয় বার পৃথিবী দগ্ধ করিবার শক্তি থাকিল না। সুতরাং 'নিন্দ চন্দো' এইবার নিশ্চিন্তমনে আপন পুত্র-কন্যাগণকে লুক্কায়িত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে পুনঃপুন সতর্ক করিয়া দিলেন যে, বাবা তাহাদিগকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন। চাঁদের ছেলেমেয়েরা রাত্রিকালে আকাশে খেলা করিতে লাগিল। 'সিং চন্দো জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া 'সিং চন্দো' 'নিন্দ চন্দো'র দিকে তাড়া করিয়া আসিলেন। ভয়ে তারাগণ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। সেই অবধি তাহারা বিক্ষিপ্তই আছে—তার পূর্বে সকলে একস্থানে ছিল। 'সিং চন্দো' তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া 'নিন্দ চন্দো'কে দুই টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। সেই জন্য সেই কাল হইতে চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তৎপূর্বে চাঁদ সূর্যের ন্যায় চির পূর্ণাঙ্গ ছিলেন।

আর সেই যে দুইজন মানুষ বাঁচিল—'পিলচু-হারাম' ও 'পিলচু বুধি'—তাহাদের দ্বাদশ পুত্র ও দ্বাদশ কন্যা জন্মে। তাহাদের দ্বারা ক্রমশ মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়াছে। তার পর সেই বারো জন হইতে ক্রমে খাদ্যের বিভিন্নতা অনুসারে সাঁওতালদিগের বারো জাতি হইয়াছে।

★ ★ ★ ★

একদিন 'চন্দো' বনে কাঠ কাটিতে গিয়াছেন ; ফিরিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার পত্নী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি কতকগুলি মশা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য মশার কামড়ে অস্থির হইয়া চন্দো গৃহে ফিরিবে। কিন্তু চন্দো তাহা করিলেন না। তিনি কতকগুলি ডাঁশ সৃষ্টি করিলেন, তাহারা মশা ধরিয়া খাইতে লাগিল। তখন নিন্দ চন্দো আরও অনেক জানোয়ার সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিং চন্দো মারিয়া ফেলিলেন। অবশেষে 'নিন্দ চন্দো' একটি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিয়া পাঠাইলেন। সিং চন্দো কতকগুলি কাঠের কুচো ছুঁড়িয়া মারিলেন। কাঠের কুচোগুলি বৃকে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিল। ব্যাঘ্র পলাইল। সে অবধি ব্যাঘ্র বৃককে ভয় করে।

চন্দো ঘরে ফিরিলে তাঁহার পত্নী তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার সৃষ্টির এত জীবজন্তুকে খাইতে দেয় কে?"

চন্দো বলিলেন, "আমি সকলকে খাইতে দিয়াছি।" তাঁহার পত্নী একটি পতঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেখাইলেন লোহার পাত্র মধ্যে পতঙ্গ ঘাস খাইতেছে। চন্দো লজ্জিত হইলেন।

★ ★ ★ ★

জন্মান্তরবাদ

সাঁওতালেরা আত্মার দেহান্তর পরিগ্রহ বিশ্বাস করে। ইহাদের ঠাকুর জল, স্থল, আকাশ, মানুষ, গোরু, মাছ, পোকা ও অন্যান্য যাবতীয় প্রাণী বৃক্ষাদি এককালে নির্দিষ্ট সংখ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সংখ্যা কমেও না, বাড়েও না। যতদিনে দেহ মধ্যে তাহারা বাড়িয়া পূর্ণাঙ্গ হইবে, ঠাকুর তাহা ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে মানুষের শরীরেও কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর আত্মা প্রবেশ করে। আর কুকুর প্রভৃতির শরীরে মানুষের আত্মা প্রবেশ করে। যদি কোনো মানুষের শরীরে মানুষের আত্মা থাকে, তবে তাহার আচার-ব্যবহার ভদ্রোচিত হইবে। বিড়াল কুকুরের আত্মা পাইলে মানুষ কলহপ্রিয় হয়। ভেকের আত্মা পাইলে মানুষ নির্জনতাপ্রিয় ও মুখ-চোরা হয়। বাঘের আত্মা পাইলে মানুষ অত্যন্ত ক্রোধী হয়, কিছুতেই শান্ত হয় না।

এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণ গাছগাছড়া দিয়া চিকিৎসা করিত। তাহার দুই পত্নী ছিল। তাহারা বড়ো কলহপ্রিয় ছিল। তাহাদের কলহে বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যোগীর বেশে গৃহত্যাগ করে। চলিতে চলিতে সে এক শহরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শহরে মড়ক লাগিয়াছে। অসংখ্য মৃতের লাশ একটা গাছের নিচে স্তূপাকারে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গাছের উপরে দুইটা শকুনি ছিল। একটি শুকুনি অন্যটিকে বলিতেছে, "কোন্ লাশটি আমরা প্রথমে খাইব?" অন্য শকুনি কোনো উত্তর না করায় প্রথম শকুনি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। তাহাতে সে বলেন 'দেখিতেছ না নীচে মানুষ আছে।" ব্রাহ্মণ পাখির ভাষা বুঝিত বলিয়া এই সব কথা বুঝিতে পারে। তাহারা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি এখানে বসিয়াছ? তোমার কি কোনো বিপদ ঘটিয়াছে?" ব্রাহ্মণ তাহার পত্নীদ্বয়ের কথা বলিল। শকুনিরা তাহাকে একটি করিয়া পালক খসাইয়া দিয়া বলিল,"এই পালক কানে গুঁজিয়া দেখিলে তুমি মানুষ চিনিতে পারিবে।" তখন ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। ওই পালক কানে দিয়া যাইতে যাইতে ব্রাহ্মণ এক গ্রামে দেখিল, কতকগুলি লোক বিড়াল, কতকগুলি লোক শিয়াল আবার কেহ বা কুকুর! ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার একটি পত্নী কুক্কুরী, ও অপরটি শূকরী। সুতরাং সে ঘরে না ঢুকিয়াই ফিরিল। প্রতিজ্ঞা করিল যে, যে রমণী হাতে করিয়া ভিক্ষা দেয় তাহাকেই বিবাহ করিবে। কারণ অন্য প্রাণীতে মুখে করিয়া ভিক্ষা দেয়।

এক গ্রামে এক চামারের কন্যা তাহাকে হাতে করিয়া ভিক্ষা দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিল, সে প্রকৃতই মানবী। তখন সে চামারকে বিবাহের অভিপ্রায় জানাইল। চামার তাহাতে ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আমরা চামার, আমাদের ঘরে বিবাহ করিলে তোমার জাতিনাশ হইবে। তুমি অমন কথা মুখে আনিও না।" ব্রাহ্মণ তাহাতেও বিচলিত না হওয়ায় চামার অপরাপর চামারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, গ্রামের মন্ডলদিগকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিল। তখন ব্রাহ্মণ তাহার সমস্ত পরিচয় দান করিল। শুনিয়া সকলে খুশি হইল। ব্রাহ্মণ চামার হইয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

★ ★ ★ ★

পরলোক

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়া মানুষকে অতি কষ্টে কালযাপন করিতে হয়। 'চন্দো বোংগা' তাহাদিগকে অত্যন্ত খাটাইয়া লয়। সেখানে মেয়েরা এরন্ড ফল খলে ভাঙিয়া তেল প্রস্তুত করে। বীজ হইতে চন্দো বোংগা মানুষ গড়ে। সারাদিন তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয়। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। যে সকল স্ত্রীলোকের ছেলে আছে তাহারা ছেলেকে স্তন্যদান করিবার জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। আর যে সকল পুরুষ তামাক পাতা চিবাইয়া খায়, তাহারা সেই কার্যের জন্য কিঞ্চিৎ অবসর পায়। এই কারণে সাঁওতালরা তামাক পাতা চিবাইয়া খাইতে শিখে। হুঁকায় তামাক পোড়াইয়া খাওয়ায় কোনো লাভ নাই ; কারণ সেজন্য ছুটি পায় না। এখানে কেহ জল খাইতে পায় না। পুষ্করিণী বা সরোবরে যে সকল ভেক প্রহরী আছে, তাহারা কাহাকেও জলে নামিতে দেয় না। এই জন্য সাঁওতালদের মৃত্যুকালে তাহাদের সঙ্গে জলপানের পাত্র দেওয়া হয়, কারণ পাত্র থাকিলে তাহাতে করিয়া জল তুলিয়া লইয়া তাহারা খাইতে পারে। পরলোকে জল খাইতে পাইবার আর একটা উপায় আছে। জীবিতকালে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিলে সাঁওতালরা পরলোকে জল খাইবার সুবিধা পায়। পুণ্যের ফলে নহে, পাপের শাস্তিস্বরূপে। অশ্বত্থবৃক্ষের পত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া জল কলুষিত করে বলিয়া বৃক্ষরোপণকারীকে জলে নামিয়া পাতা কুড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে তাহার জল খাইবার সুবিধা হয়।

★ ★ ★ ★

তামাকের উৎপত্তি

এক ব্রাহ্মণ-বালিকার কোনো জ্ঞাতি না থাকায় বিবাহ হয় নাই। অবিবাহিত অবস্থায়ই তাহার পরলোক হয়। তাহার শবদাহ করিয়া লোকজন ফিরিয়া যাইলে পর চন্দো ভাবিলেন, "এই বালিকা সংসারে গিয়া অনাদৃত হইয়াছে। ইহাকে এমন একটি বর দান করিব যে, অতঃপর পৃথিবীর সকল লোকেই ইহার সমাদর করিবে"। এই ভাবিয়া তিনি ওই বালিকার শ্মশানে তামাক গাছ জন্মাইয়া দিলেন। এক রাখাল-বালক গোচারণের কালে দেখিল তাহার ছাগলে ওই গাছের পাতা খাইতে লাগিল। রাখাল মনে করিল পাতাটা বোধ হয় মিষ্টি হইবে; তাও সে একটা পাতা লইয়া মুখে দিল। কিন্তু পাতা তিক্তস্বাদ বলিয়া মুখে রাখিতে পারিল না, ফেলিয়া দিল। আর একদিন তাহার দন্তশূল হওয়ায় নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও যখন তাহার রোগ সারিল না, তখন কী মনে করিয়া সে এক পাতা তামাক মুখে দিল। চিবাইতে চিবাইতে তাহার দন্তশূল ভালো হইয়া গেল। তখন সে তামাকপাতা চিবাইয়া খাওয়া অভ্যাস করিল। একদিন এক টুকরা হাড়-পোড়া-চূর্ণ দিয়া একটা তামাক পাতা ঘষিয়া দেখিল তাহাতে তাহার স্বাদ ভাল হয়। সুতরাং সেই অবধি সে চুন দিয়া তামাক পাতা খাওয়া ধরিল। তাহার দেখাদেখি অনেকেই তামাক ধরিল। ক্রমে পৃথিবীতে তামাক পাতার সমাদর বাড়িতে লাগিল। এখন তামাকের চাষ চলিতেছে।

★ ★ ★ ★

হরিচন্দ ও ষোলো-শত গোপিনী

কোনো অবিবাহিতা রমণীর গর্ভসঞ্চার হওয়ায় সে এক জঙ্গলের মধ্যে বাঁশঝাড়ে একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিয়া চলিয়া যায়। এক বন্য গাভি তাহাদিগকে স্তন্যদান করিয়া মানুষ করে। কোনো লোক তাহাদিগকে আনিতে গেলে গাই শিং নাড়িয়া তাড়াইয়া দিত। অবশেষে বালক বালিকা বড় হইয়া পরস্পরকে বিবাহ করিল। তখন গাভি তাহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুর আকাশ হইতে ষোলোশত গোপিনী পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা শিখর রাজ্যে আসিয়া ওই বালক বালিকাকে তাহাদের রাজা ও রানি করিল। রাজার নাম হরিচন্দ। এখন রাজা হরিচন্দের দুর্গ ও রাজধানী কোথায় হইবে তাহা বিচার করিবার জন্য সভা হইল। রাজা ও রানি সভার মধ্যস্থলে বসিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে হিকিম মুহুরি বসিল;বামে বসিল ভুজা ও জগনাথ মুহুরি। গোপিনিরা বৃত্তাকারে তাহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। স্থির হইল, পাচেট পাহাড়ে হরিচন্দের রাজধানী হইবে। পাচেট পাহাড়ে রাজধানী ও দুর্গ নির্মাণ হইয়া গেল। অনেক সাঁওতাল চম্পা হইতে আসিয়া সেখানে বাস করিল। হরিচন্দের শিখর রাজ্য সমৃদ্ধিপূর্ণ হইল। হরিচন্দের পিতা মাতার পরিচয় ছিল না বলিয়া, সাঁওতালরা তাহাকে 'বোংগা' (দেবতা বা অপদেবতা) বলে। রাজা হরিচন্দ 'চাতার' পরব করিয়াছিলেন।

★ ★ ★ ★

অজ্ঞাত-পিতৃক বালক-বালিকা

যদি কোনো ভ্রষ্টারমণীর পুত্র কন্যা জন্মে এবং লজ্জা বা ভয়বশতঃ রমণী ছেলের পিতার নাম না করে, তাহা হইলে প্রসূত সন্তানকে 'চন্দোর ছেলে' বলা হয়। তাহার জন্মকালে প্রতিবেশীদিগের সভা বা উৎসব হয় না। ছেলের শিরমুন্ডন বা নামকরণ (নাতা) হয় না। ছেলে কোনো জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হয় না। পুত্র হইলে তাহার নাম হয় 'চন্দু' বা 'চন্দ্রাই' বা কখনো কখনো 'বীরবন্তো' ; আর কন্যা হইলে তাহার নাম হয় 'চন্দ্রো' বা 'চান্দমুনি' বা 'বোনেলা'। কিছুকাল পরে গোপন রাখিবার শর্তে সন্তানের মাতা তাহার মাতা বা তৎস্থানীয় কোনো রমণীর নিকট সন্তানের পিতার নাম বলে। এবং তখন ছেলের পিতৃবংশের কাহারও নাম অনুসারে ছেলের নাম রাখা হয়। ছেলে বড়ো হইলে তাহার একটা ডাক নাম রাখা হয়। পরে বালকের কীর্তিকলাপ যশস্কর হইলে তাহার নাম নূতন করিয়া রাখা হয় এবং সাঁওতাল বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করা হয়। যদি কখনও পিতা আত্মপ্রকাশ না করে এবং পুত্রকে গ্রহণ করিতে না চাহে, তাহা হইলে মাতা পুত্রকে জন্মকালেই মারিয়া ফেলে বা পুতিয়া রাখে। যাহারা ওঝার কাজ করে তাহারা এই গর্ত খুঁজিয়া হত বালকের অস্থি সংগ্রহ করিয়া রাখে। কারণ এই অস্থি জাদুবিদ্যায় তাহাদের প্রধান সহায়।

★ ★ ★ ★

শ্মশানভীতি

শ্মশানে 'বোংগা' থাকে, 'বোংগা'রা মানুষ খায়। মানুষ মরিলে 'বোংগা' হয়। শ্মশানে 'বোংগা' দেখিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনো লাভ নাই; কারণ 'বোংগা' ঘন ঘন দেহ পরিবর্তন করে। কখনও বা মানুষ বেশে কখনও বা ইতর প্রাণীর বেশে 'বোংগা' বিচরণ করে। তাহারা আক্রমণ করিলে কেহ এড়াইতে পারে না। ছোটো ছেলে মারা গেলে 'ভূত' হয়, আর গর্ভবতী রমণী মারা গেলে 'চুরিন' হয়, গর্ভবতী রমণী গ্রামের বাহিরে বা শ্মশানে যাইতে পায় না। কারণ 'বোংগা' সর্বত্রই তাহাদের অনিষ্ট করিবার জন্য বিচরণ করে।

মানসী ও মর্মবাণী ● *১৩২৯ বৈশাখ*

সরসীলাল সরকার

সাঁওতালি গান

হিন্দুজাতি ও সাঁওতাল জাতি একই বঙ্গজননীর সন্তান। সাঁওতাল জাতি তাহাদের বুদ্ধিমান-হিন্দু ভাইদিগকে অতিশয় সম্মানের চক্ষে দেখে এবং উহাদিগকে আদর্শ করিয়া সতত আপনাদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হিন্দু-ভাইগণ তাহাদিগের এই অবোধ, অথচ সরল, নিরীহ ও সবল শ্রমপটু ভাইদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে না। কাজে কাজেই ইহাদিগকে মিশনারিগণের আশ্রয় লইতে হইতেছে। মানভূম সম্বন্ধে অনেক পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মতো পণ্ডিতবর্গ এই মানভূমের প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন রাজবংশ ও শিলালিপি প্রভৃতি লইয়া বিস্তর পরিশ্রম এবং গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এই মানভূমে সজীব অনার্যজাতিগণ রহিয়াছ; যাহাদের ভাষা, উপকথা, আচার-ব্যবহার ও গান বোধ হয় ভগ্ন শিলালিপি প্রভৃতি অপেক্ষা অতীতের রহস্য অধিকতর উদ্‌ঘাটিত করিতে সমর্থ। বঙ্গ সাহিত্যে এই অনার্য-জাতিগণকে লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা চিরিদনই তাহাদের হিন্দু-ভ্রাতৃদিগের প্রতি মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দু-ভ্রাতৃগণ ইহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া ইহাদের অবজ্ঞাপ্রদর্শন ব্যতীত সুখে দুঃখে কখনও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না।

সাঁওতাল জাতির গান তাহাদের জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহারা পরিশ্রমশীল, কর্ম করিতে করিতে শ্রমভার লাঘবের জন্য গান করিয়া থাকে, বিশ্রামের সময় সংগীত উপভোগ করাই ইহাদের একটি প্রধান আনন্দ। বিবাহ এবং উৎসবাদির সময় দলবদ্ধ হইয়া বাজনার সহিত নৃত্য করিয়া গান করাই ইহাদের প্রধান স্ফুর্তি।

যদি ইহারা কোনো ঘটনা দেখে এবং যাহা ইহাদিগের নিকট আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয় ইহারা তখন সেই বিষয়টি লইয়া গান বাঁধিতে চেষ্টা করে। নমুনা-স্বরূপ গান নীচে দেওয়া গেল। এস্থলে বলা কর্তব্য যে, সাঁওতালি কথা অনেক স্থলে বাংলা ভাষায় ঠিক লেখা যায় না; কারণ সাঁওতালি কথার উচ্চারণ অনেক স্থলে বাংলা অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণমালায় প্রকাশ করা যায় না। মিশনারিগণ সাঁওতালি ভাষা লিখিবার জন্য একরূপ ইংরাজি রোমান বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি নূতন বর্ণও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। যাহা হউক অধিকাংশ এই নূতন বর্ণমালার সাহায্য না লইয়াও সাঁওতালি উচ্চারণের ধাঁধা বাংলা অক্ষরে বুঝানো যায়। তবে একটি অক্ষরের দরকার। এইটি পার্শি আয়েন অক্ষরের স্বরূপ অর্থাৎ Guttural অ। এইটি আমরা লুপ্ত অকার দিয়া প্রকাশ করিব। যেমন পার্শি—মালুম এই কথাটির উচ্চারণ আমাদের কৃত বর্ণমালায় 'মহলুম' এইরূপভাবে প্রকাশিত হইবে।

নিম্নলিখিত সাঁওতালি গানটি বোধহয় কোন অতীত ঘটনার বর্ণনা।

চেতাঙ দিসুমরে ঝুরিকরা লতাঙ দিসুমতে ঝুরিকরা
কিন আড়্গই সড়ক সড়কতে।
তালি সাকামতে কিম পহঞ্জি উলি ডেরেই ভিকিম কলম
রাম রাম কিন পড়াহে।

অর্থ—পশ্চিমের দিক হতে এক জোড়া ছোকরা পূর্বের দিকে চলে গেল রাস্তায় রাস্তায়। তালপাতের বই আমপাতার শিরের কলম রাম রাম করে পড়ছে।

সাঁওতালি কবিগণের ভাষায় কথার সংখ্যা অতি কম ছিল। সাঁওতালি জীবনের ঘটনার বৈচিত্র্য তদধিক কম। কিন্তু বোধ হয় কতকগুলি গানে সাঁওতাল কবিগণ তাহাদের দৈনিক জীবনের সামান্য ঘটনা লইয়া গভীরতর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

অত্‌ললো সেরমাসিতুম,	সিতুম কান্দে মনেওয়া—
সিতুম কান্দে মনেওয়া।	হররিগি চাটানি
হররিগি বাড়ি উমুল	উমুলান পে মানেওয়া—
উমুলান পে মানেওয়া।	

অর্থ—	জমিটি গরম, উপরে রৌদ্র	রৌদ্র লাগছে রৌদ্র লাগছে।
	রাস্তায় পাথর আছে	রাস্তায় বড় গাছের ছাওয়া আছে।
	জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা,	জুড়ায়ে লও মনুষ্যেরা।

এই সংসারে দুঃখ কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর পরিণামে শান্তি আছে, পণ্ডিতগণ ও দার্শনিকবৃন্দ মুনষ্যগণকে ইহাই বুঝাইয়া শান্তি প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। সাঁওতালগণও যখন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে গরম পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া কাঠ কাটে, তখন এই গান লইয়া তাহাদের মনকে ওইরূপ প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে।

নিচের গানটি কোনো বিরহ কাতর সাঁওতাল যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহারই গান—

ওড়াং আরে মা ইঞ্চ আপা।
রাচা রেমা আতো হও।
ওকা রেব মেদা ইঞ্চ যদা।
ইঞ্চ রেয়া দায়া বাড়ে সেনাতাম খান।
বেঞ্চে কইড় মেদা যদ মে।

অর্থ— ঘরেতে মা বাপ।
আঙ্গনাতে তো গাঁয়ের লোক।
কোথায় চোখের জল আমি মুছে দি।
আমার জন্য দয়া তোমার আছে তো।
ঘুরে দেখ চোখের জল মুছে দে।

এই গ্রামে সরলপ্রাণ সাঁওতাল তাহার মনকে প্রবোধ দিতেছে যে, যদিও তাহার স্ত্রী-বিরহে দুঃখে বুক ফাটিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার মা-বাপ রহিয়াছে, গাঁয়ের লোক রহিয়াছে, যাহারা তাহার স্ত্রী অপেক্ষা কম অন্তরঙ্গ নহে। ইহারা যদি তাহাকে আপনার ভাবিয়া জল মুছাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া যাইবে। ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার একটি প্রধান উপায় বিশ্বজনীন দুঃখ কষ্টে আপনাকে মিলাইয়া দেওয়া। সাঁওতাল তাহাদের সরল প্রাণে যে এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহা আজকালকার সভ্য জগতের অতি অল্প জীবই অনুভব করিতে পারে।

সাঁওতালি গানের কোন কোন স্থানে দুই এক লাইন খাঁটি বাংলা থাকে। নিম্নলিখিত গানটি উহার উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। এই গানটি ছেলে ঘুমপাড়ানো গান।

চেতাঙ দিসম ক্ষণ হেয় একালা কয়লার যুগি
মাসে মাবাঙ কহ কয়দে ইমাই সে
কোলে আছে সোনের বঁধু কয়দে ইমাইমে।

অর্থ— উপর থেকে আসছে ভিক্ষুক যোগী
দিয়েদে বড় বধূ ভিক্ষা দিয়ে দে
কোলে আছে সোনার খোকা ভিক্ষা দিয়ে দে।

আর একটি গান দেওয়া হইল। ইহার দুই লাইন সাঁওতালি এবং দুই লাইন বাংলা। যথা—

অত্‌মা লো লোকান	ডাঞ্চন লোহ্‌কান।
সের্‌মা সেতুন কান	হরমঞ্চ লোহ্‌কান।
মনে করো হে ছাতা ধর।	মুচিকে বল হে পায়ে জুতা।

অর্থ—	জমি গরম আছে	পা দুটি জ্বলছে আমার
	উপরে রৌদ্র আছে	শরীরটি জ্বলছে
	ছাতা ধরতে মন কর	মুচিকে পায়ের জুতা
	তৈয়ারি করিতে বল।	

নিম্নলিখিত গানটিতে সূর্যগ্রহণ কেন হয় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে—

মারাঙ বুরুরে দুসেৎ বেরইলে কানায়
হারা লতার লতার তে
মানেওয়া হড়কো বেরইলে কানায়
মানাওয়া মায়া জালাতে
চাদবঙা জনম জনমে হইড়ি এনায়।

অর্থ— বড়ো পাহাড়ে দুসেৎ লোকেরা ছিল
মানুষ পাহাড়ের নীচের জমিতে ছিল
ছিল লোকেরা এক সঙ্গে ঘর করে
ছিল পরস্পরের মায়ার বাঁধনে।
ভগবান সূর্য জন্মে জন্মে ঋণ শোধ করিতে পারিতেছেন না।

গানের মর্মটি সাঁওতালদের এই বিশ্বাসটি জানিলে বুঝা যায়। সাঁওতালদের ধান এবং ধানের চাষ ছিল না। ভগবান সূর্য সাঁওতালদের মঙ্গলের জন্য দোসাৎ জাতির নিকট হইতে এক মুঠা ধান ধার করিয়া সাঁওতালদের প্রদান করেন। ভগবান সূর্যের এই ধার সুদে সুদে বাড়িয়া যাইতেছে, শোধ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য দোসাৎ জাতির কর্তা কখনো কখনো সূর্যদেবকে ধারের জন্য পীড়ন করেন এবং তাঁহার তেজ কাড়িয়া লয়েন। সেই জন্য সূর্যগ্রহণ হইল।

রামায়ণের ঘটনা লইয়া সাঁওতালদের অনেক গান প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটি নিচে দেওয়া গেল।

সীতা কারণতে লঙ্কা গাড়
লএনো জরি জারা ওরে
ওনাতেড়ং তবোয়তেড়ং
হাড়ুম্ চাদ লএ না রে

অর্থ— সীতার কারণে লঙ্কাগড় জ্বলে গিয়েছিল
ওই কারণে সেই কারণে হনুমানও জ্বলে গিয়েছিল।

আর একটি গান দেওয়া গেল। যথা—

উরিন বীরতে বামে লক্ষণকে বল এনা
কইকি ইঙ্গাত কাপাট অলকেদা
রামে লক্ষণ কি বনবাসিন

অর্থ— অরণ্য বনেতে রাম লক্ষ্মণ চলে গেল
কৈকেয়ী কপাটে লিখে মেরে রেখেছিল
'রাম লক্ষ্মণের বনবাস'।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ● ১৩১৬ বঙ্গাব্দ

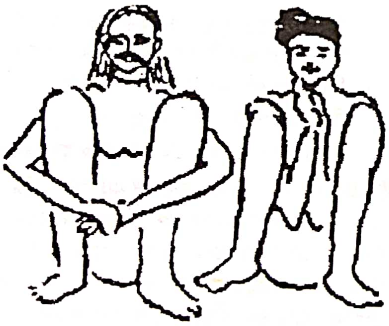

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার
সাঁওতালি গান

আমাদের আশেপাশে অনেক সাঁওতালের বাস। ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার এবং ইহাদের ছেটোবড়ো সুখদুঃখের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ আমাদের সর্বদাই ঘটে। সাঁওতাল কুলি এবং প্রজা না থাকিলে এ-অঞ্চলের চাষবাস একদিনও চলিতে পারে না, অথচ জমিদার, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মহাজনদের অত্যাচার ইহাদের উপর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সাত বৎসরের মধ্যে জমিদার নানা অছিলায় জমা পাঁচ টাকা হইতে চল্লিশ টাকায় লইয়া গিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহারা অনুর্বর কঙ্করময় অসমতল উচ্চভূমি বহু পরিশ্রমে ইহাদের দ্বারা উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত করাইয়া লন, এবং তাহার পর নানা জবরদস্তি-জাল-জুয়াচুরির সাহায্যে সেই জমি ইহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া উচ্চহারে অন্যকে বিলি করেন। তথাপি ইহাদের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সংযম, যে শান্তি, যে সৌন্দর্য এবং অনাবিলতা আছে, সভ্যতাভিমানী খুব অল্প মানব-সমাজেই তাহা সুলভ। ইহারা দরিদ্র, কিন্তু বর্বর নহে।

কিছুকাল হইতে সাঁওতালি প্রেমের এবং বিবাহের গান আমি সংগ্রহ করিতেছি। সংগৃহীত চার পাঁচ শত গানের মধ্যে এমন-কিছু পাই নাই যাহাকে অশ্লীল অথবা ইতর বলা চলে। সব ভাষাতেই অল্পাধিক-পরিমাণে অশ্লীল গান প্রচলিত থাকে, সাঁওতালি ভাষাতেও আছে।—এই শ্রেণির গান "বীরগান" নামে পরিচিত। সাঁওতালি ভাষায় 'বীর' শব্দের অর্থ জঙ্গল—বৎসরের মধ্যে দুই-একবার যখন ইহারা শিকারে যায়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে পুরুষেরা তখন এইসকল গান গাহিয়া থাকে। এদলে মেয়েরা কখনও থাকে না। অল্পবয়স্ক ছেলেদেরও এখানে প্রবেশ নিষেধ। ....বস্তুতপক্ষে মদ্যপানে বিহ্বল কোন সাঁওতালও এধরনের কোন গান গ্রামে, কাছাকাছি গাহিলে কঠিন সামাজিক দণ্ড ভোগ করে এবং এ অপরাধে আট-দশ বছরের মধ্যে গ্রামে দুই-এক জনকেও অপরাধী হইতে শোনা যায় না।

—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

১

গাডা নাড়ে নাড়েতে, তিরিয়ো বদন রে নালম নরং,
ধীরি-মাগাড় রে, দাঃক দ বদন রে নালম বড়ে।

ওরে বদন, নদীর ধারে বাঁশি বাজিও না, পাথরের তলায় রয়েছে যে জল তাকে ঘুলিয়ে তোলা কি উচিত, বদন।

২

গাডা নাড়ে নাড়েতে
সুই-উড় সুই-উড় কোড়াম গোগলকানা;
হড়ম রে সাজাবাজীঞ চেকায় তামা,
ওড়াঃক রে অন্ধন বীনুঃক্‌তামা।

নদীর পাড়ে পাড়ে সুপুরুষটি তো বেশ শিস দিয়ে দিয়ে ফিরছ! শরীরের সাজ দেখে আর কী করব! ঘরে তোমার না আছে ধন, না আছে অন্ন!

৩

দাঃক্‌মাঞ চোঁদাকেঃৎ সাহান গে বাঙ,
তালেবির তালে সাহান দাড়ে গে বাঙ।
দাকা মাঞ দাকা ক্যেবট উতু গে বাঙ,
জোলারে জিয়াল হাকু ঝালিগে বাঙ।

ভাতের জল চাপিয়েছি, কাঠ নেই ; তালের বনে অথচ কত কাঠ! ভাতটা তো কোন রকমে রান্না করলুম, তরকারি তো নেই ; নদীর দ-এ জিয়ল মাছ কত আছে, জাল তো নেই।

৪

সেতাঃক রেগে গ দাঃক্‌লোয়িঞ চালাওলেন
তাইনমতেঞ ব্যঙ্গেঃট লেঃট
নেরা-ডম ডগ্‌ দকো টুঙ্গীওকেদা।
ধীরি চাটাইনি রে উমকাতে
নাড়কাকাতে নুমুলিঞ এগললেঃট
কুড়ি বয়েস দ বানুঃক তিঞী।

ভোরে জল আনতে গিয়েছিলুম, মা—পিছন ফিরে দেখলুম, রেড়িগাছের ডগাগুলো কে ভেঙে দিয়েছে। বড়ো পাথরের চাতালটার উপর স্নান করে মাথা ঘসে নিজের ছায়ার দিকে চাইলুম। যৌবন তো আর আমার নেই!

৫

কুলহি মুচাঃট্‌ রে বাবাম বাবাম বাঁধ কেদা
বাবাম পুখ্‌রি কেদা
তোয়া বাহা বাবাম রহয় কেদা।

ইঞ্‌মা বাবাঞ হারায়েঁন
বাহা মা বাবা মোসঃট এন
হড়মো লিকির লিকির তো আ বাহা।

(গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে যে পথ) সেই কুলহির মুখেতে, বাবা, তুমি বাঁধ বেঁধেছ, পুকুর খুঁড়েছ। তার পাড়ে টগরফুল লাগিয়েছ। আমি তো, বাবা, তোমার ডাগর হয়েছি, এদিকে দোলায়মান টগরগাছের ফুলগুলি শুকিয়ে গেছে।

৬

গতেঞা সাজদ সোনাগে সাজ—
রূপীগে আব্‌রান
নোঁয়াঁকো সাজবাজ চেকাতেঞ হিড়িঞা।
নালে বাচারে মারাঙ অকঃচ জজদারে
জজ দারেরেঞ রাকাঃপ কাদা
রাচা জঃক জঃক তেঞ হিড়িঞ কেদা।

আমার ভাবের লোকের সাজ ছিল সোনার, তার আভরণ ছিল রূপার, সেসব সাজগোজ কী করে ভুলব! আমাদের উঠানে ওই প্রকাণ্ড বড়ো তেঁতুল গাছ। তেঁতুল গাছের উপর তোলা রইল সেসব! উঠান ঝাঁট দিতে দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছে সব।

৭

জজ-দ জইনা ঝামকা ঝাঁকুর
নুলে-দ জইনা থোপা থোপা ;
নুলে জমদ পেড়া সেন্‌নালেপে,
নাপে-মা এঞল্‌তে ডাডিমা ঘাট রে,
পেরেঃচ কাস্তাপেড়াঞ বাঁগিয়াদাঃ।

তেঁতুল ফল ঝামকা-ঝুকুর-ঝুকুর ঝুলছে, থোকায় থোকায় আম ফলেছে—আম খেতে আমাদের ওদিকে যেও, বন্ধু! তোমাদের দেখে জল নেবার বালু-খোঁড়া ডোবার ঘাটে ভরা কলশি ফেলে দিয়ে এসেছি, সখা!

৮

গাডা নাড়ে নাড়েতে, বুগিতে তালে রেঠে জানুম।
দেজ তালাংমে রাটাপাটা
রুকুই তালাংমে দালায় দালায়
হহয় তালাংমে দিলীয় দিলীয়
জজম সানাঞ-কান লুচুর লুচুর।

নদীর ধারে ধারে আমাদের অনেক বেঁটে বেঁটে কুলগাছ।—হাঁচড়ে-পাঁচড়ে তুমি এক

রকম করে গাছে চড়ো, গাছটাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দোলা দিও তুমি, 'এসো এসো' বলে ডেকো আমাকে। খেতে ইচ্ছা করে এখনই আমার মুখে জল আসছে!

৯

নত হরে বিন্দিম তল কেদা,
দারে হরে বিন্দিম তল কেদা,
নিঞরেন জুরি বিন্দিম ত-ল লেখান,
দেনে বানার তীরে রূপী টডর।

মাটিও বাঁধলে মাকড়সা-রানি, গাছও বাঁধলে। আমার জুড়িটিকে আমার সঙ্গে যদি বেঁধে দিতে পার, মাকড়সা, তো তোমার দুই হাতে দুটি রুপোর বালা পরিয়ে দিই!

১০

বানাম রেগে রড় মেনাঃক লান্দা মেনাঃক কাথা
মেনাঃক মুনিরে, তিরিয়ো রেগে মুনি মনদো মেনাঃক
আমাঃক মনে মুন ইঞরে, ইঞাঃক মনে মুনি আমরে
মনে মনে মুনি, তড়ে সুতামতে, তল ইনারে।

বেহালাতে ভাষা আছে, হাসি আছে, কথা আছে, মুনি, বাঁশিতে মন আছে—মুনি, তোমার মনে আমি, আমার মনে তুমি, আকাশ-ভাসা (সুরের) সুতোয় বাঁধা পড়ে গেল সব!

১১

আলে দিসীম দ বগেতে মাতকম দারি,
তিকিন তারাসিং ঞুর আকানা।
হয়মা হিঁসালিয়ে সিতুং টিমালিয়ে
হয়লল দিন দুলাড় আলোম হালাং।

আমাদের দেশে তো মহুয়াগাছের অভাব নেই, দুপুরে বিকালে সব সময়েই তো মহুয়া ঝরে পড়ছে। বাতাস হিংসুটে, রোদ্দুরটা অলস—প্রিয়, গরম বাতাসের দিনে আজ মহুয়া না-ই কুড়লে!

১২

হর হেসাঃক্‌দ হর বাড়ে, নমন-আকান
হ কাঁড়ের আকান।
হড়দকো মেনা ফালনা হপন নেরা হারাওয়াকান
হর জারগো ওয়াকান।
হারা ওয়াকান রেহঞ জারগো ওয়াকান রেহঞ
নাপাবারে ধন গেথঞ জজম কানা।

রাস্তার বট অশথ যেমন বড়ো হয়ে উঠছে ডালপালা ছড়িয়ে, লোকে বলে, অমুক লোকের মেয়ে তেমনি বেড়ে উঠছে, লো, আইবুড়ো থেকে বুড়িয়ে যাচ্ছে। বড়ো হয়ে উঠেছি তো উঠেছি, আইবুড়ো আছি তো আছি, আমার বাপ-মায়েরই সম্পত্তি তো খাই (তাদের তো খাচ্ছি নে।)

১৩

অৎরেমা ধিরি দালান
সেরমা রেমা সনা দালান
হিহিড়ি সনা দলান বার দুয়ার।
চেকাতেঞ ঝিজা চেকাতেঞ বলা
হিহিড়ি সনা দলান বার দুয়ার।

মাটিতে পাথরের দালান, আকাশে সোনার দালান, হিহিড়ির সোনার দালানে বারোটি দরজা। কী করেই বা খুলব, কী করেই বা ঢুকব, বারোদুয়ারি হিহিড়ির সোনার দালানে!

১৪

কুড়ি কুড়ি লে রিয়াঁও এনা,
বাঁইহাড় বাঁইহাড় তে গৈঁঠা হালাঞ।
গাতেকুড়ি দকো মিতীঞ কানা,
নাম দ কররাম ডীরেম* জারগোয়েনা।

মেয়েতে মেয়েতে আমরা সব এসে জুটেছি, মাঠে মাঠে ঘুঁটে কুড়তে। সখীরা বলছে, হাঁ ভাই কারাম-ডাল* তুই যে আইবুড়ো হয়ে রইলি।

১৫

ইং জুরি কুড়ি হঁ বানুঃক কোয়া
ইংদ কুঁয়ারিয়ী
ইঞদং অডং চালাঃক এটাদিসাম!
দারেরে জাপাঃক কাতে
চান্দোসে সামাৎকাতে।
চান্দো রুয়েমে দিনি জুরি।

আমার সমবয়সী মেয়ে তো আর নেই, আজও কুমারী থেকে গেলুম! বেরিয়ে চলে যাবই আমি অন্য কোনো দেশে!
(আহা তা কেন!) গাছে ঠেস দিয়ে, চাঁদের দিকে মুখ করে চাঁদকে বলো, ওগো, আমার জুড়িটি জুটিয়ে দাও!

* কারাম ডীরেম। সই পাতানোর মতো 'কারাম ডীরেম' পাতানোর রীতি আছে। অগ্রহায়ণ মাসে সর্দারের বাড়ির সামনে কারাম গাছের জোড়া ডাল পুঁতে নাচ হয়। এই দুই ডালে যেমন বিচ্ছেদ নেই, তেমনি দুই সখিতে যেন কখনও বিচ্ছেদ না থাকে, 'কারাম-ডাল' পাতানোর সময় এই কামনা করা হয়।

১৬

নায়এ্ঞো হয় গুরেন বাবা হঁয় গুরেন
অকয় মিতাঁএ্ঞা দেমাঁই দুড়ুঃপ।
নালে রাচারে কায়রা দারে
কায়রা গে নিঙ্গাঞ কায়রা গে না-পুঁঞ
কায়রা গেই মিতাঁ-এ্ঞা দেমাঁই দুড়ুঃপ।

মাও মরে গেল, বাবাও মরে গেল, কে আর আমাকে বলবে, মা এসে বোস!—আমাদের উঠোনের সেই কলাগাছটি! ওই কলাগাছই আমাদের মা, ওই কলাগাছই আমাদের বাবা। ওই আজ বলছে, মা, আয় বোস!

১৭

নালে ছটকারে জীনম দারে,
জানুম দারের পুলু-লুমাঁং।
নায়ো হঁয় গুরেন বাবা হঁয় ভিন্দাঁড়েন
তকয় যতন বেন পুলুই-লুমাঁং।

আমাদের বাড়ির সামনে কুলগাছ, কুলগাছে পলু পোকা। মাও মারা গেল, বাবাও পড়ল, কে আর তোমাদের যত্ন করবে, পলু পোকা!

১৮

হড়মো হপনবাবু লেঃক লেকা,
ডানডা হপনবাবু চাঁমকু লেকা,
চেকাতে বাং বাবুম রহড় কান?
নিঞতেমা বাং সাঁরে চান্দোগে
বেনাও লিদিং, জিসুমাসি কিন ঢিলাঁও কিদিঞ।

গাটি তোমার, ভাইটি, ছিল চকচকে, পিছলে যাবার মতো, কোমরটি ছিল ছিপছিপে চাবুকের মতো! শরীর এখন অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?
আমার আপনা থেকে তো নয়, বউ (দিদি), চান্দো (বিধাতা) গড়ে তুলেছিল আমাকে, জিশু মুসাতে জুটে দুরবস্থা ঘটালে!

১৯

আলে বয়হা-দ আঁড়িলে সাঙ্গেয়া
ওড়াঃক রেগে তালে তুম্‌-দা টামাক।
জমক্‌লে রুইয়া জমক্‌লে হিলাঁঃকআ,
হবর আকান গিদরাম দহ কেয়া।

আমরা ভাই কজন সংখ্যায় অনেক, বাড়িতে আমাদের মাদল আর ঢোলক আছে। জমকালো রকম করে আমরা বাজাই, খুব জমিয়ে হেলে দুলে নাচি। কোলে আছে যে ছেলে তাকেও নামিয়ে লোককে এসে জুটতে হয় সে নাচে!

২০

পুরুব খন্‌চ দাঁই পাঁছিম খন্‌চ,
হিঁসিদে হিঁসিদেই হয় লেদারে
ছুটি চাতম ওটাং এন
তালে সাকাম কেঙ্ড়ড় এন
হিঁসিদে হিঁসিদেই হয় লেদারে

দিদি, পূবদিক থেকে পশ্চিমদিক থেকে সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে—তালপাতাগুলো সব ফড়ফড় করছে; মাথার মাথালি, ছাতা সব উড়ে যাচ্ছে; সোঁ সোঁ করছে হাওয়া।

২১

হেন্দে ছাতা চাত্‌ম দোচঃট, দাঁহড়ি
পানে নিমামদয় তকয় কানা?
দাঃক-হিলি তাঙমে গান্ডহিলি বেলমে
তায়নম তেঞ লাঁ-ইয়ামা
তায়নম রেদো হিলিই বোকম কানা।

কালো কাপড়ের ছাতা মাথায়, মোরগের চূড়োর মতো পাগড়ি পরা, যে তোকে পান দিচ্ছিল সে কে, রে?
জল, বউদিদি, তুমি দাও তো, পিঁড়িটা পাত তো, তারপরে বলছি!—
শীগগির, ও যে তোমার ভাই হতে যাচ্ছে, বউদিদি!

২২

নিন্‌গাঞ না পুঞ না তোরে
তুন্দাঃক টামাক সাড়ে কানদো বাবা-গ
ওনা আনজোম আনজোমতে
ওনা আতেন আতেনতে
পোরাইনি সাকাম লেকাঞ চলমল আ।

মা-বাবা গ্রামে লাগড়া আর মাদলের শব্দ হচ্ছে! তাই শুনে শুনে, ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পদ্মের পাতার মতো টলমল করছে (আমার গা)!

২৩

ইঞ্‌-গাঁঞ আঁহুঞদ চান্দোলেকা
হিলিঞদাদাদ ইপিল লেকা
ইঞদঞ জানাম্‌লেন সুরগুজাবুটারে
ইঞাঃক ঞুতুমদ সুরুজমুনি।

মা বাবা আমার চাঁদের মতো, আমার বউদিদি আর দাদা যেন দুটি তারা, আমি জন্মেছিলুম সুরগুজিয়া ফুলের মধ্যে—আর আমার নামটি হচ্ছে সূর্যমণি!

২৪

গাড়া নাড়ে নাড়েতে কাম্বিড় বাহা
দেজঃক তেগি সীরি বের্মাই হাসুরেন
সিঃট গোছাই তেগি গাতে সারাসীতি
গুতুগালাং তেগি গাতে বের্মায় রাকাঃপ।

নদীর পাড়ে পাড়ে কাম্বিড় ফুল। গাছে চড়তেই বেলা ডুবে গেল, সই! আঁচলে ফুল ভরতে ভরতেই নিশুতি রাত হয়ে এল! মালা গাঁথতে গাঁথতেই আবার সূর্য উঠল!

২৫

হেন্দা বীবুগুপি কোড়া
চেকাতে বাংএম রহড় এনা?
গাঁই গুপিতে, তিরিয়ো নরংতে,
বানাম ভিউইংতেঞ রহড়্এনা।

ওগো আমার রাখাল, কী করেই বা এমন শুকিয়ে গেলে তুমি?
এই, গোরু চরিয়ে চরিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে, বেহালা বয়ে বয়ে, কাহিল হয়ে যাচ্ছি আর-কি?

২৬

নাঁই নাঁই তালারে তালা নাঁই তালারে কারাম দারে
কারাম বুটারে সিরীম গ্যেলে
সিরীম গ্যেলে রে টিরীম চেঁড়ে
টিরীম চেঁড়েদয় ম্যেনা
রাজদ রাপাজদ নিঞরেন নেঙ্গানাপা
সাহেব সুবীদ নাপাবারে।

দামোদর নদীর মাঝখানে, মাঝ দামোদরের মাঝে, চাকলদা গাছ। কারাম গাছের তলায় বেনা গাছের শিষ। তার শিষে শিষে নীল রঙের পাখি। তাদের ভাবখানা হচ্ছে, রাজা-রাজড়ারা তো তাদের বাপ, মা, সাহেব-সুবারা হল তাদের ভাই-বেরাদার।

২৭

হেন্দাবাবু মীন্দীড়িয়ী, নাবেনাঃক রীস্কীবেন তোকাকেদা?
নীলিঞঃক রীস্কীদ নোড়াঃক্রে নেমাঃক-আ
পিতল তল তিরিয়ী পিটারিরে।

ওহে বাপু মাদল-বাজিয়ে, তোমাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সব গেল কোথায়?
আমাদের আনন্দ বাড়িতে রয়ে গেছে, পিতল-বাঁধানো বাঁশিটি পেটারিতে (ফেলে এসেছি)

২৮

হাটেম চালাঃক্গ বাটেম চালাঃক
সোনা ছাতার গ কিরিঞ্যাঞ মে!
হ্যাটিঃঞ চালাঃক বীবু বাটিঞ চালাঃক
সোনা ছাতার বীবু বীঞ কিরিঞ্যা—
নোরঞ কিরিঞাম তীরে যুগে।

হাটে যাচ্ছ, মা, তুমি পথে বেরুচ্ছ, আমার জন্যে একটা সোনার ছাতা কিনে দিও!
পথেই তো, বাছা, আমি বেরুচ্ছি, হাটেই তো চলেছি। সোনার ছাতা তো কিনব না, মেয়ে একটি কিনে আনব, হবে তোর চিরযুগের!

২৯

রীসি মা বীসতি টোলা মা পে্য টোলা
বারেয়া গেয়াকিন্ রীসিকা দ
রাসিকা এ্যালতে অলংকার এ্যালতে,
হড়ম রেনাঃক গামছা হাঁসরেনা।

ভারি বসতিওয়ালা গ্রাম, তার তিন তিনটে টোলা। বাজিয়ে দুজনেই রসিক বটে! মাদলবাজিয়ে (রসিক) দুটিকে দেখে, তাদের অলংকার আর রঙ্গভঙ্গ দেখে, গায়ের গামছা আমার আর গায়ে থাকছে না!

৩০

সেদায় দ আইএয়া আর বাবা দকিন ম্যেনা
দোবাবু কীমিমে, রাজান-ভাজান লিঞ বীহওয়া মা।
তেহিংদো আইয়ো আর বাবা দকিন
গুনিয়েন ভীবিয়েন ধীরতি টুন্ডীং তেকিন বীহুয়ীঞকান!

জন্মাবধি মা বাবা বলে বলে পাঠিয়েছে, যা বাছা, কাজ কর, ধুমধাম বাজনা বাজিয়ে পালকি করে বউ এনে দেব! (আর কী না) আজ বাবা আর মা অনেক ভেবে চিন্তে পায়ে হাঁটিয়ে (আবার) বিয়ে দিচ্ছে।

৩১

বেনাও য়ীঞমে কামার বেনাওয়ীঞমে
তিরেনাঃক লীলমুঠি কাজরাটি।
সাজাওয়ীঞমে নায়োগ সাজাওয়ীঞমে
বীহুতুল দাঁউড়া সিন্দুর শাড়ি।

গড়ে দিও, কামার, গড়ে দিও হাতের নীলমুঠি কাজললতা। সাজিয়ে দিস মা, সাজিয়ে দিস বউ-তোলবার চাঙারিতে সিঁদুর আর শাড়ি।

৩২

হলা তিকিন রে মাণ্ডোওয়া, তেহেঞ্তিকিন তেগে
সানাম মাণ্ডোওয়া সাকাম রহংড়েনা।
নিঞাচ মারাং হিলিহোলা তিকিন মাজান জম
রহড়েনা সেঞ গসয়েনা।

কাল দুপুরবেলার বিয়ের পাতার মণ্ডপ, আজকের দুপুর হতেই শুকিয়ে গেছে! আমিও, বড়ো বউদিদি, কাল সেই দুপুরে খেয়েছিলুম, শুকিয়ে গেছি না ঝিমিয়ে আছি (বুঝতে পারছি নে)।

৩৩

ইউমিন মারাং নোড়া করে
অকয় রায়বার লেদা বায় বতরলেন
দুড়ুংপ আকানদঞ লুটুগে লুটুগে
তেঙ্গো আকানদঞ লিকিদে লিকিদে
বতঃবঃক কামদঞ কেটেল কেটেল।

এত বড়ো ঘরে কে ঘটকালি করেছিল? ভয় করেনি তার। বসে থাকলে গা ছমছম করে, দাঁড়ালে গাছের মতো গা কাঁপতে থাকে, ভয়ে শরীর শিউরে শিউরে চমকে চমকে ওঠে!

৩৪

তোকো বুরুরেন চেঁড়ে কানাই
সাঙ্গে সার্জোম সাকাম দারেই এ্যামকান।
তকয় হাপন কানাই নলঃক নল কোড়া,
সঙ্গে বৈহাকুড়ি বাহুই এ্যামকান।

কোন্ পাহাড়ের পাখি এই কানাই যে অনেক-পাতাওয়ালা শাল গাছ চায়? কাদের ছেলে হচ্ছেন এই কানাইটি যাঁর লেখাপড়া জানা আছে, (আর) যিনি অনেক-বোনওয়ালি বউ চান?—

৩৫

নীলিঞগে বয়হা নীলিঞগে এ্যাতেয়া
নাড়া সাকাম দ বালিং জমা।
গুড়লিঞদু-লা তোয়াতিলিং লহ দা
দাহে সেদের বেদের বালিঞ জমা।

আমরা দুই বোন, আমরা, দুটি জা, শাকপাতা খাই না। গুড় ঢালি, তারপর তাকে দুধ দিয়ে আমরা দুজনে ভিজাই। ঘাঁটাঘাঁটি-করা দই-টই আমরা খাই না!

৩৬

গাতে গাতেলাঙ তাঁহেকানা,
উরুনি বীরলাং বলয়েনা
গাতে গাতেলাঙ বালা-য়া-য়েন।

সখীতে সখীতে আমরা দুটিতে ছিলুম, গহন অন্ধকার বনে ঢুকে কখন হারিয়ে গিয়েছিলুম, আজ আবার সখীতে সখীতে আমরা বেয়ান হয়েছি!

৩৭

সেদায় দ নিঙ্গেন দ কামি রেয়াঙ গে রঁড়েইঞা
তিহিঞ দ নিঙ্গীঞ দ বিদীয়িঙ্গি রড়িঞ আঞ্জম।

আগে মা আমাকে কাজের কথাই বলেছে, আজ শুধু বিদায়ের কথাই শুনছি।

৩৮

সড়ক সড়ক তেং চালাঃক কানা
তালা সড়ক রেঞ তেন্দোয়েনা
নিয়ে করে জীবন মেনামমে খান
পিতল তল তিরিয়ো জীবন নরঙলেতাম।

পথে পথে চলেছি, মাঝ সড়কে এসে দাঁড়ালুম। এর আশেপাশে কোথাও থাকো যদি তবে তোমার পিতল-বাঁধানো বাঁশিটি একবার বাজাও তো জীবন!

৩৯

সিন চান্দো সেওয়া কাতে
বাহা মান্দার মুলিং রহয়লেদা
কুঁয়ারি ডোরগেঞ বাহা লেদা
হায় রে মন্দরমূলিম বোঙ্গাহাড়েম।

সূর্যদেবের পূজার জন্যে মন্দারমূলী ফুল পুঁতেছিলুম। যতদিন কুমারী ছিলুম মাথায় ফুল গুঁজেছি। চললুম, হায় রে মন্দারমূলী, এখন যক্ষের ধন হয়ে রইলে!

বিশ্বভারতী পত্রিকা ● কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩ (১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ)

রণেন্দ্রবিজয় দাস
সাঁওতালদের পূজা-পদ্ধতি

আমরা যেমন নানাপ্রকার পূজা উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং পূজা বিশেষে যেমন তারতম্য হইয়া থাকে ; সাঁওতালদিগের মধ্যেও সেইরূপ নানাপ্রকার পূজা উৎসবাদির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং পূজা বিশেষে তারতম্যও হইয়া থাকে। আমাদের মধ্যে যেমন বৎসরের বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসনাদি হইয়া থাকে ; আমাদের যেমন দুর্গা পূজা বৎসরের মধ্যে বড়ো পূজা সাঁওতালদিগের মধ্যে তেমনি "বাদ্না" নামক দেবতার পূজাই সমস্ত পূজার শীর্ষস্থানীয়।

এই "বাদ্না" পূজা পৌষ মাসে হইয়া থাকে। ইহার কোনো নির্দিষ্ট দিন ঠিক নাই। গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া তাহাদের সর্দারের সহিত পূজার দিন ঠিক করে। কিন্তু ইহা পৌষ মাসেই করিতে হয়। এই পূজার কার্য ক্রমান্বয়ে তিনদিন চলিতে থাকে। পূজার প্রথম দিনে পূজারী দ্বারা গ্রাম হইতে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে পূজার কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। এই পূজারীকে সাঁওতালরা নায়কে বলে।

নায়কে অর্থাৎ আমাদের যেমন পুরোহিত পূজাদির কার্য করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও এমন এক পরিবার আছে যার কাজ শুধু পূজা উপাসনাদি করা; এই পরিবারের লোককে তারা নায়কে বলে।

পূজার প্রথম দিন সকালবেলা হইতেই গ্রামবাসী হইতেই এক একটি করিয়া মুরগি ও চাল, ডাল ইত্যাদি পূজার উপকরণ সকল সংগ্রহ করা হয়। এই সংগ্রহ কার্য শেষ হইলে পর; বেলা আটটা-নয়টার সময় গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া খোলা মাঠের দিকে চলিয়া যায় এবং কিছুদূর গিয়া একটি সমতল জায়গা পরিষ্কার করে এবং গোবর ও জল দ্বারা লেপন করে। তারপর জায়গাটা একটু শুকাইলে চালের গুঁড়ি দ্বারা আলপনার মতো করিয়া একহাত চওড়া দুটি লাইন টানে এবং যতগুলি পরিবার মিলিয়া এই পূজা করে লাইন দুটিকে চালের গুড়ি দিয়া ঠিক ততগুলি ভাগ করে। সেই প্রত্যেক ভাগের মধ্যে নায়কে এক এক মুঠা চাল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাখিয়া দেয় এবং তাহার উপর প্রত্যেক পরিবারের এক মুরগি ছাড়িয়া দেয়। চাল খাওয়া শেষ হইলে পরে নায়কে এক একটি করিয়া মুরগি বলি দেয়। আমরা যেরূপ দেবতার কাছে পাঁঠা বলি দিয়া থাকি তাহারা ঠিক সেইরূপ দেয় না। তাহাদের বলি দেওয়ার একটু বিশেষত্ব আছে। মুরগিটাকে ধরিয়া এক একখানা ধারালো ছুরি তার গলায় লাগাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উপর ও নীচে দুটি টান দিয়া—ছাড়িয়া দেয়। তারপর বলি দেওয়া হইলে সমস্ত লোকেরা মিলিয়া সেই মুরগিগুলি একজায়গায় রান্না করিয়া আহার করে। নায়কে কিন্তু সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করে না। সে নিজের রান্না নিজে করে। তারপর একটি মুরগির ডিম ভাঙিয়া তাহার কুসুম একটি গাছের পাতায় করিয়া নায়কে পুড়াইয়া খাইয়া খোসাটি সেই পূজার নির্দিষ্ট আলপনার উপর রাখিয়া দেয়। এই সমস্ত কাজ করিতে করিতে বেলা প্রায় তিন-চারটা বাজিয়া যায়; তখন গ্রামের সমস্ত গোরুর পালকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া পূজার জায়গার উপর দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয় এবং যে গোরুটি সর্বপ্রথমে সেই ডিমের

খোসাটি মাড়ায় সেই গোরুটিকে ধরিয়া তাহার পায়ে সিঁদুর দিয়া সাজাইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে এই গোরুটির মালিককে পরের একটি বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে তিন সের মদ সমস্ত গ্রামবাসীকে পান করাইতে হয়। এই মাঠের পূজার সময় স্ত্রীলোকেরা সেখানে যায় না। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সকলে মিলে গোরুরপাল লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

সন্ধ্যা হইলে পরে লোকেরা কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হইয়া খুব মদ পান করে। তারপর সমস্ত স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া নাচ-গান করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। মদের নেশা যখন খুব প্রবল হয় তখন তাহাদের গান ও আমোদ খুব জমিয়া উঠে এইরূপে তাহাদের সমস্ত রাত আমোদে কাটিয়া যায়।

পরের দিন সকালবেলা আট-নয়টা পর্যন্ত উপবাস করে এবং আপন আপন বাড়ির উঠানের কতকটা জায়গা গোলাকৃতি করিয়া গোবর দিয়া লেপিয়া তার উপর পূর্বোক্ত মতে আলপনা কাটে ও সেই জায়গাটির উপর প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা একটি করিয়া শূকর বলি দেয়। সেই শূকরটিকে পুড়াইয়া কাটিয়া ভাত ও সেই মাংস একটা থালাতে করিয়া তাহাদের উঠানের আলপনা কাটা জায়গায় রাখিয়া "বাদ্না" দেবের ভোগ দেয়। ভোগ দিবার সময় তাহারা দুই একটি মন্ত্রও বলে। তারপর হাতের মধ্যে জল লইয়া সেই নৈবিদ্যের চারিধারে ছড়াইয়া দিয়া সেই প্রসাদ পরিবারের প্রত্যেক লোককে অল্প অল্প করিয়া দেয়। এই দিনের পূজা তারা নিজেরাই করিতে পারে আর নায়কের প্রয়োজন হয় না। তারপর আবশ্যক মতো আরও শূকর কাটিয়া ভাত তরকারি রাঁধিয়া বেশ মজলিশ করিয়া খায়। তারপর সন্ধ্যা হইলে পর পূর্ব দিনের মতো মদ পান করে এবং স্ত্রী পুরুষ দুইই একত্রে গান করিতে করিতে ও নাচিতে নাচিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং সমস্ত রাতই এইভাবে কাটাইয়া দেয়। তৃতীয় দিন তাদের কিছু করিতে হয় না এই দিন তাদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের দিন।

চতুর্থ দিন নিজেদের ইচ্ছামতো কেহ বা কিছু না খাইয়া কেহ বা একটি মুরগি মারিয়া তারই ঝোল করিয়া খাইয়া একত্রে নিকটস্থ কোনো বনে তির-ধনুক লইয়া শিকারে চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া কেহ বা কাঠবিড়ালি, কেহ বা খরগোশ কেহ বা কোনো পাখি বা অন্য কোনো কিছু শিকার করে। বেলা বারোটা একটার সময় নিজেদের শিকার লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। এবং তাহা রান্না হইলে পর তাহা খাইয়া গ্রামের নিকটবর্তী খোলা মাঠে চলিয়া যায়। সেখানে নানাপ্রকার কৌশলের খেলা দেখানো হয়। গ্রামের সর্দারও সেখানে উপস্থিত থাকে।

সর্দার অর্থাৎ যেমন আমাদের কাপ্তেন আমরা ঠিক করি তাহারাও তাহাদের সর্দার ভোট দিয়া ঠিক করে। গ্রামের ছোটো বড়ো সকল প্রকার অভিযোগই এই সর্দার মীমাংসা করে এবং সকলকেই তাহার বিচার মানিয়া চলিতে হয়।

খেলার জায়গায় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উপস্থিত থাকে। সেখানে গ্রামের সমস্ত যুবকগণ তির-ধনুক হাতে লইয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদের কাছ হইতে কিছু দূরে একটি খোঁটা পোতা হয় সেই খোঁটাকে লক্ষ্য করিয়া তির ছুড়িতে থাকে। তির ছোঁড়া শেষ হইলে, হাড়ি ভাঙা খেলা হয়।

এই হাড়ি-ভাঙা খেলাটি ভারি মজার। সমস্ত খেলোয়াড়রা সারি বাঁধিয়া এবং সারি

হইতে কিছু দূরে একটি কলশি রাখিয়া দেয়। সর্দার এক একজনকে চোখ বাঁধিয়া ঘুরপাক খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেয়, চোখ বাঁধা লোকটি হয়তো হাড়ির দিকে না গিয়া ঠিক বিপরীত দিকে গিয়া মাটিতে সজোরে আঘাত করে তখন এই কাণ্ডটি দেখিতে বড়োই হাসি পায়। কেহ হয়তো হাড়ি পার হইয়া অনেক দূরে গিয়া মাটিতে আঘাত করে এইরূপে অনেক কষ্টের পর বহু ভাগ্যের ফলে হয়তো কেহ ঠিক কলশির উপর আঘাত করিতে পারে। এইরূপে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক দেখাইবার পর যে খোঁটাটিকে পূর্বে লক্ষ্য করিয়া প্রথম তির ছুড়িয়াছিল সেই খোঁটাটি তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। তারপর সর্দারের সম্মানার্থে এই খোঁটার এক খণ্ড তাহাকে দেওয়া হয় সেও তাহার পরিবর্তে তাহাদের মদ ও মুড়ি খাওয়ায়। তারপর বাকি অংশগুলি তাদের সমাজের কুলীনদের সম্মান প্রদর্শনার্থে বাড়িতে গিয়া এক একখণ্ড করিয়া দিয়া আসে। তারাও তাহাদিগকে মদ ও মুড়ি দিয়া সন্তুষ্ট করে। এই কাজ শেষ হইলে পরে তাহারা আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যায়। এইরূপে সেই বৎসরের মতো "বাদ্না" দেবের পূজা শেষ হয়।

শান্তিনিকেতন ● ভাদ্র ১৩৩১

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সাঁওতালদের বিবাহ ও গীত

বাংলাদেশ, বিশেষ করে রাঢ়ের এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতিদের বাস। পাহাড়ের কোলে, নদীর ধারে, অগভীর জঙ্গলের ভিতরে বা গা ঘেঁষে এরা নিজেদের গ্রাম ও সমাজ তৈরি করে নিয়েছে। বর্ণহিন্দু গ্রামের বাইরে কখনও দলবদ্ধ ভাবে, খাপছাড়াভাবে গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণির সঙ্গেও বাসা বেঁধেছে। আজও এরা আর্যেতর সভ্যতার আদিম রূপটি প্রায় সমান বিশিষ্টতার সঙ্গে বহন করে চলেছে। আর্য সামাজিকতার সংস্পর্শে এসে এদের আচার-ব্যবহারে বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে একথা সত্যি কিন্তু সামাজিক উৎসবে, পুজাপার্বণে আজও সেই কৌমচেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ, সেই অরণ্যআদিম মানসিকতা। পচাই আর মহুয়ার নেশায় বিভোর হয়ে দল বেঁধে নৃত্য করে মেয়েপুরুষ সকলেই। ঘটা করে ফুলের সাজ পরে মেয়েরা। জীবনের আদিম ছন্দ ফিরে আসে—মাদলের বাজনা বাজে—মাতন লাগে মেয়ে মরদের মনে। প্রতিটি সামাজিক উৎসবই এই অকৃত্রিম আনন্দের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সাঁওতালদের সামাজিক রীতিনীতি, আচারানুষ্ঠান, বিচারপদ্ধতি বা শাস্তিদান আপন বৈশিষ্ট্যে একক। সামাজিক শাসনরীতির দিক হ'তে এরা নিজস্ব আইনকানুন মেনে চলে। বিবাহের ক্ষেত্রেও একটি সুনির্দিষ্ট প্রথা মেনে চলা হয়। আর্যসমাজেও বিবাহের ক্ষেত্রে বৈদিক অনুশাসন অন্দরমহলের প্রতিপত্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। লৌকিক আচার ও গীত মেয়েদের নিজস্ব। সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে অনিবার্য কারণেই—কিন্তু সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানেও লৌকিক আচারের দুরতিক্রম্য প্রভাব আজও বিদ্যমান। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে বিবাহের অনুষ্ঠানে—তার শাস্ত্রসম্মত রূপ বজায় রাখার জন্য—কিন্তু অন্দরমহলের লৌকিক অনুষ্ঠান ছাড়া বিবাহের কথা কেউ কল্পনাই করতে পারে নি। বোধকরি এই একটি ক্ষেত্রেই—অন্দরমহলের লৌকিক আচার ও নৃত্যগীতে—অন্-আর্য আর অন্ত্যজ শ্রেণির উৎসবের সঙ্গে আর্য সমাজের উৎসবের অবিশ্বাস্য সাদৃশ্য। নৃত্যগীত আর ছড়াই হচ্ছে মেয়েদের মন্ত্র। বৈদিক আচারের সঙ্গে লৌকিক আচার, বিবাহের প্রস্তাবনা হতে নববধূর বিদায় পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই সমান্তরালভাবে চলে। কেউ কারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

উচ্চবর্ণের হিন্দুসামজের মতই সাঁওতাল সমাজে পাত্র বিবাহযোগ্য হলে পিতামাতা একজন ঘটক নিযুক্ত করে। উপযুক্ত পাত্রী সন্ধান করার পর উভয়পক্ষের লোকজন একস্থানে মিলেমিশে পাত্রপাত্রী দেখে নেয়। উভয়পক্ষ রাজী হলে বিবাহের দিন স্থির হয়।

পাত্রপক্ষ প্রথমে পাত্রীর আত্মীয় ও গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি হতে দুজন করে লোক পাত্রগৃহে নিমন্ত্রণ করে। এই প্রথায় অনেক খরচ বেশি পড়ে। প্রথার নাম 'হরোঃ চিখ্না'। অধিকাংশের আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় শুধু মাত্র গ্রামের দু'চারজন গৃহস্থ ও কন্যাপক্ষের কয়েকজন আত্মীয়স্বজন পাত্রগৃহে নিমন্ত্রিত হয়। তবে 'হরোঃ চিখ্না' প্রথার মর্যাদা রাখতে একবিশ দশআড়ি ধান দিতে হয়।

সাঁওতালি প্রথায় পাত্রীপক্ষকে পণ দিতে হয়। বাঁধা পণ ১২৲ (বারো টাকা) মাত্র। বিবাহের দিন স্থির হলে পাকা সূতোয় গিঁট পড়ে। বিবাহের দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই গিঁট

পড়বে। ঘটক সেই গিঁট দেওয়া সূতো আর দশপাই চাল নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে পৌছে দেবে। এই প্রথার নাম 'জামাই তিরি' ও 'বালাতিড়ি'।

বিবাহের নির্দিষ্ট দিন বরযাত্রীদের জন্য আবশ্যকমত চাল, ডাল, তরকারি ইত্যাদি পাত্রপক্ষ সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। ঢাক ঢোলের বাদ্যসহ বরপক্ষ পাত্রীর গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। প্রতি গ্রামেই বিবাহ উপলক্ষে সাহায্যাদির জন্যে একজন 'জগমাঝি' থাকে। বরযাত্রী গ্রামে উপস্থিত হওয়া মাত্র জগমাঝি একঘটি জলসহ আশীর্বাদ গ্রহণের অনুষ্ঠানাদি করবে। প্রথমে বরযাত্রীদল গ্রামের বাইরে কোথাও কোন গাছতলায় বিশ্রাম করবেন। ঘটক পাত্রীপক্ষের বাড়ি হতে পাত্রকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলসীতে জল, থালা, বাটি, গুড় ও মাদুর নিয়ে এসে পাত্রকে আলিঙ্গন করবে। তারপর পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাড়িতে আসবে।

তারপর বিবাহ। সিঁদুরদানের পদ্ধতি—তিনজন লোক একটি বড় ডালায় পাত্রীকে তুলে দিয়ে ঘরের বাইরে আনবে, পরে পাত্র একজনের কাঁধে চেপে পাত্রীর মাথায় কপালে সিঁদুরদান করবে। সিঁদুরদান হলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। গ্রামের 'জগমাঝি' তখন বরযাত্রীদের পাত্রীপক্ষের বাড়িতে নির্দিষ্টস্থানে বসার ব্যবস্থা করে সাধ্যমত পচাই মদ ও মাংস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে দেয়।

পরদিন সকালে বরযাত্রীগণ খাওয়াদাওয়ার পরে নববিবাহিতা বধূ ও পাত্রীপক্ষের কিছু আত্মীয়স্বজনসহ পাত্রপক্ষের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়।

তৃতীয় দিন পাত্রীর সঙ্গে যারা এসেছে—তারা পাত্রের কাছে একটি বলদ পাবে। এই প্রথার নাম 'বারে ইতেৎ'। দ্বিতীয়বার বিবাহের ক্ষেত্রেও সাঁওতাল সমাজে বিশেষ রীতিনীতি প্রচলিত আছে। যদি বিবাহের পরে স্বামী স্ত্রীর কোন কারণে মনের বা দেহের মিলন না হয়—তাহলে দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্বে ছাড়পত্র নিতে হবে। এই রীতির নাম 'ছাড়িওয়া'। সমাজের ছাড়পত্র ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করলে সাঁওতালী আইন অনুসারে তাকে ৬০৲ (ষাট) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। যদি ছাড়পত্র নেয় তাহলে শুধু সাড়ে সাত টাকা পণস্বরূপ লাগবে। তবে এই বিবাহে বিশেষ কিছু লৌকিক আচার নেই। দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে বর্তমানে আরও বার টাকা বেশি নেওয়া হয়।

যদি কোন পাত্র 'ছাড়িওয়া' থাকে এবং পাত্রী কুমারী থাকে অর্থাৎ সিঁদুরদান হয় নি, এমন অবস্থা ঘটলে পাত্রকে ষোল টাকা পণ দিতে হ'বে, আর প্রথম বিবাহের প্রথানুযায়ী পাত্রকে সমস্ত খরচ বহন করতে হ'বে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর পাত্র দ্বিতীয়বার বিবাহে ইচ্ছুক হ'লে একুশ টাকা পণ লাগে। এছাড়াও প্রথম বিবাহের মতই সমস্ত খচর বহন করতে হবে। বিধবা হওয়ার পরে বিবাহের ক্ষেত্রে সাড়ে ন'টাকা পণ লাগে।

সাঁওতালদের সমাজে সমগোত্রীয় পাত্রপাত্রীর মাঝে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই জাতীয় বিবাহ আইনগ্রাহ্য ক্ষমাহীন অপরাধ। কেউ হৃদয়গত দুর্বলতার জন্য সমগোত্রে বিবাহ করলে সাঁওতালদের সর্বোচ্চ আদালতে তার বিচার হ'বে। চারিপাশের গ্রামের লোকজন পাত্রপাত্রীর উপর নির্যাতন করবে ও উভয়কেই সমাজ হতে উচ্ছেদ করা হবে। বিবাহোত্তর জীবনে দম্পতির মতের মিল না হ'লে ছাড়পত্র নিয়ে সামাজিক অধিকার পাওয়ার জন্য সমাজের সমস্ত উপস্থিত লোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকের হাতে একটি করে টাকা দিতে হবে।

সহমিলন না হলে স্বামী অথবা স্ত্রী যে কেউ আবেদন করলেই ছাড়পত্র দেওয়া হয়। স্বামী যদি স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে রাখতে না চায়—তাহ'লে ছাড়পত্র নেওয়ার জন্য একটি কাঁসার বাটি ও একটি শাড়ি লাগবে। পুরোন আইনানুসারে স্বামীকে সাড়ে সাত টাকা ও একটি বলদ দিতে হ'ত। স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করলে ছাড়পত্রের জন্য সাড়ে সাত টাকা ও পণস্বরূপ বারো টাকা—মোট সাড়ে উনিশ টাকা লাগে।

বিবাহের দিন ধার্য হওয়ার সময় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মেয়েরা যৌথভাবে নাচ ও গান করে। এই গানের নাম 'ছাটিয়ার গান'। পুরুষেরা বাজায় মাদল, নাগরা আর বাঁশি।

তোকোর মা রাচারে
ইঁড়ি গেলে দ
তোকোর মা বাটেরে
এঁড়বা গেলে দ
আমকা মা রাচারে
নিঁড়ি গেলে দ
আমকি মা বাটেরে
এঁড়বা গেলে দ
নিয়ালজঙ্গে সানাইয়া
নিঁড়ি গেলে দ
বাড়ে জঙ্গে সানাইয়া
এঁড়বা গেলে দ

কার উঠোনে
মেয়ের বিয়ে?
কার উঠোনে
ছেলের বিয়ে?
অমুকের উঠোনে
মেয়ের বিয়ে।
অমুকের উঠোনে
ছেলের বিয়ে।।
মেয়ের বিয়ে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে।
ছেলের বিয়ে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছে।।

বর্ষীয়সী মহিলার দল গান গাইবে—

টুনু ডেং গে টুনু ডেং
মিরু টুনু ডেং হো
হোনোরে অংগে হোনে রে অং
কারে হোনো রে অং
তিন কটায়া গোনং দ
মিরু টুনু ডেং হো
তিনকটায়া সাদে দো
কারে হোনে রে অং
মোড়ে টাকা গনং দ
মিরু টুনু ডেং হো
দাম কং নুরি সাদে দো
কারে হোনো রে অং

পূর্ব বাংলায়ও 'পাটিপত্তর'-এর দিন অর্থাৎ পাকাকথা হও্যার দিনটি হতেই মেয়েদের লৌকিক প্রথা ও গীতি শুরু হয়। তারপর বিয়ের আগের দিন শেষ রাত্রে বিয়ে বাড়ির একপাল মেয়ে ও বৌ দল বেঁধে চলেছে পুকুর কিংবা নদীর ঘাটের দিকে। মেয়েদের কারও হাতে বরণ-কূলা, কারও কাঁখে জলের মঙ্গল কলসী। ছোট ছোট মেয়ের দল চলেছে শাঁখ বাজাতে বাজাতে। পিছন পিছন আসছে ঢোল আর কাঁসি। কখনও বা 'সাঁনদার'ও (সানাই বাদক) থাকে এই দলে। পূর্ববঙ্গে একেই বলে 'জলসইতে যাওয়া'। পুকুরের দিকে বা নদীর ঘাটে যেতে যেতে তারা গান করে—

আইজ রামের অধিবাস কাইল রামের বিয়া গো কমলা,
আমরা জল ভরিতে যাই, সই আমরা জলে যাই।

কিংবা

তোমার রামের অধিবাসের রাণী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রাণী নিশি প্রভাত হইল।।
তোমরা সখি আনগো হলুদ, আন গো হলুদ, সকলে!
আমার রামেরে সিনান করাও অতি সকালে।।

(বাংলার পল্লীগীতি : চিত্তরঞ্জন দেব)

প্রায় একই প্রথায় সাঁওতালদের বিবাহেও মেয়েরা মিলিতভাবে 'দা বাপলা সিরিং' অর্থাৎ জল সওয়ার গান করে। বর্ষীয়সী মহিলারাই প্রধান ভূমিকা নেয়। আদিবাসীদের একটি অতিপরিচিত সুরে গান ধরে। খুশির জোয়ার বয়ে যায় সকলের চোখেমুখে—

তাঁহারে তা নানা তারে না
তাঁহারে তা না নানা হো
তা নানা তাহারে তা
না নানা হো
পখোরি গি পখোরি
তকই বেয়াং পকোরি
বান্দে লাই গি বান্দে লাই
তকই রেয়াং বাহা বান্দে লাই
পখোরি গি পখোরি
বান্দে লাই গি বান্দে লাই—
আমকি রেয়াং বাহা বান্দে লাই।

এই পুকুর কার?
এই বাঁধ কার?
এই পুকুর
অমুক লোকের পুকুর
এই বাঁধ
অমুক লোকের বাঁধ

বিয়ের অনুষ্ঠান চলতে চলতে মেয়েরা 'মাড়োয়ার গান' ধরে—

তোকোর মা রাচারে দা বোম্বোক
দা বোম্বোক মানা চাউলি বুহল
আমকা মা রাচারে দা বোম্বোক
দা বোম্বোক মানা চাউলি বুহল
তোকোর রহই লে নিম দ
হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ
তোকোর যতন লে নিম দ
হিপিড় হিপিড় নিম দ
নিম দারে দ।

: কার উঠোনে জল দাঁড়িয়েছে!
জল দাঁড়িয়ে চাল ভেসে গেল।
অমুক লোকের উঠোনে জল দাঁড়িয়েছে
জল দাঁড়িয়ে চাল ভেসে গেল।।

কে পুঁতলো নিম গাছ!
নিমের পাতা দুলছে
কে যত্ন করেছে এই নিমগাছ
নিমের পাতা দুলছে।।

উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের মত এদের সমাজেও শুভদৃষ্টি প্রচলিত। শুভদৃষ্টির এই মুহূর্তটিকে কল্যাণময় ও আনন্দপূর্ণ করে তোলার জন্য গান শুরু হয়—

আতো গাতিকুড়ি কোড়া
মায়া জালাং ছাড়া কিঁদেই
ইন্দ ভেজ কান বোঙ্গা দেউড়ে
ইং রেনাং মায়া জালা মিনা আনাং মেন খাং
কাদাম বাহা তে চাপা দিন পে
ত্রিয়ে ডুরিয়ে তে গেদু জিন পে
দেউড়ে চিতাং কুলি শহর নুর।

: এই গ্রামের ছেলেমেয়ের সাথে
মিলেমিশে ছিলাম
আমি দেবতার ডালাতে চেপে
এদের মায়া ছেড়ে দিলাম—
আমার মায়া দয়া আছে
আমার কদমফুলে
বাঁশের ডুরি দিয়ে ইসারা করে ডাকিস
ডালার উপর থেকে উপুড় হয়ে পড়বো।

নববধূ চলেছে শ্বশুরালয়ে তার স্বামীর সঙ্গে। পরিবারের সঙ্গে গ্রামের লোকজন ভিড় করেছে বিদায়ক্ষণে। গ্রামের মেয়ে আজ গ্রামের বাইরে চলে যাচ্ছে। সকলেরই মন সাময়িক বেদনাভারে ভারাক্রান্ত। বিদায়কালে গানের মাঝে মেয়েকে উপদেশ দেয়—

রাঁসি আতো রেন কুড়ি কানাম
বে রনিঁ আতোরে পাড়া ওনা
রনি আতো নালম দিশেঁ গাঁতি মিয়া ছাড়াও মে
হড়ুম আলম ঢিলে দায়াম এঁড়ে অ।

: বড় গাঁ-এর মেয়ে ছিলি, ছোট গাঁয়ে পড়লি। বড় গা-এর কথা মনে রাখিস না। মেলামেশা ছেড়ে দে। শরীর খারাপ করিস না। শরীরের মায়াযত্ন করবি।

এদের বিবাহের 'জগমাঝি'ই আমাদের নাপিত। উচ্চবর্ণের সমাজে বিবাহকালীন বৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতে নাপিত ও তার পরিবার পাত্রপাত্রীকে সাহায্য করে। বিবাহের পাত্রপাত্রীর অনুসন্ধান ও যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই আমাদের ঘটকের মুখ্য কাজ। পাত্রপাত্রী নির্বাচনপর্ব সমাধান হলেই ঘটকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সাঁওতালসমাজে বিবাহের দিন পর্যন্ত ঘটকের প্রয়োজন হয়। উচ্চকোটির সমাজে জলসওয়া, সিঁন্দুরদান, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি বিবাহকালীন অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীন কৌমসমাজের রীতিনীতিরই ঐতিহ্যানুসরায়ী বলে মনে হয়।

চতুষ্কোণ ১৩৭৪ অগ্রহায়ণ

কমল চৌধুরী
সাঁওতালি রূপকথা

আমাদের এই সোনার বাংলার মানুষ সাঁওতালদের কথা আমরা জানি কমই। একদিন ওরাই ছিল এদেশের মাটির মানুষ। ওদের থেকে যাদের গায়ে জোর বেশি, তারা এসে ওদের একদিন তাড়িয়ে দিল। তখন সব সাঁওতাল গিয়ে গাছপালায় ঢাকা জঙ্গলে বাস করতে থাকে। সেখানেই চাষবাস করে, আনন্দে দিন কাটায়। আমাদের ঠাকুমা দিদিমার মতই ওদের ঠাকুমা দিদিমারাও নানান রূপকথা বলে নাতি-নাতনীদের ঘুম পাড়াতো। গান শোনাতো। তাদের বলা পাঁচটি গল্প।

ভাগ্যের লিখন

গভীর বনের ধারে ছোট ছোট মাটির বাড়ি। বাড়িগুলোর কোথাও কোথাও সুন্দর আলপনা আঁকা। ওদের সব বাড়ি যেন সাজানো রঙে আর ছবিতে। কিন্তু ওরা বড়ো গরিব। সারাদিন গ্রামের মানুষ দূরে যায় কাজের খোঁজে আর শিকার করতে। ওদের বাড়ির মেয়েরাও কাজ করে। দিন শেষ হওয়ার আগেই সবাই ফিরে আসে গাঁয়ে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। সারাদিনে একটা মানুষেরও কথা শোনা যায় না। দিনের শেষে গ্রাম জেগে ওঠে। সবাই জড়ো হয় এক জায়গায়। শুরু হয়ে যায় নাচ আর গান। এমন সময় বনের ভিতর থেকে ডেকে ওঠে বাঘ। বার বার ডাকতে থাকে। কিন্তু কোনো মানুষেরই ভয় নেই। তারা চলে নেচে গেয়ে।

এই গাঁয়েই থাকত দু ভাইবোন। বাবা মা নেই ওদের। সারাদিন গ্রামের পথে খেলে বেড়ায়। যা জোটে তাই খায়। চারদিকে যখন আঁধার নেমে আসে, তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ে।

এখন ওরা বেশ বড়ো হয়েছে।

একদিন সাঁঝের বেলায় ওদের গাঁয়ে এল এক শিকারি। বনে সে সারাদিন শিকার করেছে। তারও বয়স কম।

সেই শিকারি এসে উঠল ছেলেটি আর মেয়েটির বাড়ি। ওরা তাকে খেতে দিল রাতের খাবার। তারপর তিনজনেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সারাদিন তিনজনে ঘুরে বেড়ায়। আর গান করে। মেয়েটির সঙ্গে শিকারির ভাব হল। দুজনে দুজনকে ভালোবাসল। তারপর মেয়েটি শিকারিকে বিয়ে করল। শিকারির সঙ্গে চলে গেল তাদের গাঁয়ে।

ছেলেটি একা একাই থাকে। বোনকে না দেখতে পেয়ে ওর মন ভালো নেই। বোনকে

দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের গাঁয়ে যেতে হলে বড়ো বন পেরোতে হয়। সেই বনে থাকে বাঘ, ভালুক—আরো নানারকম জন্তু। একদিনে সেই বন পেরিয়ে যাওয়া কঠিন। অনেক দূরের পথ।

তবুও একদিন ছেলেটি চলল বোনের বাড়ি। সারাদিন ধরে হেঁটে হেঁটে গভীর বনে যখন পৌঁছাল, তখন রাত নেমে এসেছে। চারদিক থেকে বাঘ আর বুনো জন্তুর ডাক ভেসে আসছে। ভয় পেয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ল একটা মহুয়া গাছের নিচে।

ছেলেটিকে দেখে মহুয়া গাছ বলল, তাড়াতাড়ি গাছে উঠে পড়ো। এখুনি বাঘ আর বনের জন্তুরা এসে পড়বে।

ভয় পেয়ে ছেলেটি গাছে উঠে পাতার মাঝে লুকিয়ে পড়ল। সেখানে বসে দেখল, একটা বাঘ এসে দাঁড়াল গাছের নিচে।

বাঘ গাছকে বলল, গাছ ভাই, গাছ ভাই, আমার সঙ্গে চলো গাঁয়ের মোড়লের বাড়ি। সেখানে আজ মোড়লের বউ-এর ছেলে হবে।

গাছ বলল, না রে ভাই, আমি আজ যেতে পারব না। আমার বাড়িতে অতিথি আছে। তুমি সেখানে গিয়ে সব দেখে এসে আমার বলবে।

একথা শুনে, বাঘ চলে গেল।

ছেলেটি বুঝতে পারল, এ নিশ্চয় তারই বোন। কারণ, বোনের বর তো গাঁয়ের মোড়ল। সারারাত ধরে সে ভাবল। ভেবে ভেবেও বুঝতে পারল না, কী করবে! কখন ভোর হয়ে গেল, তা সে বুঝতে পারল না।

ভোর হতেই আবার বাঘ এসে হাজির।

বাঘ মহুয়া গাছকে ডেকে বলল, গাছ ভাই গাছ ভাই, মোড়লের বউ-এর ছেলে হয়েছে। কিন্তু এই ছেলেটি একদিন বাঘের হাতে মারা পড়বে।

একথা শুনে, ছেলেটি ঝটপট নেমে পড়ল গাছ থেকে। তখন বাঘ চলে গেছে দূরে। ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছোল বোনের বাড়িতে।

বোন দাদাকে পেয়ে খুব খুশি। দাদারও মনে আনন্দ ধরে না। কিন্তু ছোটো বাচ্চাটার কথা সে কাউকে বলল না। নিজে সবসময় তির ধনুক, কাটারি নিয়ে থাকে। বাঘ এলেই মারবে।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। অনেক আদর যত্নে বোনের বাড়ি কাটিয়ে ফিরে গেল নিজের বাড়ি। যাওয়ার সময় বারবার করে বলে গেল, ছেলের বিয়ের আগে যেন তাকে খবর দেওয়া হয়।

বোনের ছেলেটি বড়ো হয়ে ওঠে। ওর বিয়ে ঠিক হতেই খবর পৌঁছে গেল মামার কাছে। মামাও এসে হাজির।

মামার হাতে তির ধনুক আর কাটারি। সব সময় যেন ভাগনেকে পাহারা দিচ্ছে। ভাগনে যে ঘরে ঘুমোয় তার বাইরে সারা রাত পাহারা দেয়। মাঠে ঘাটে যেখানেই যাক না কেন, মামা তার পিছু ছাড়ে না।

বিয়ে মানে নাচ গান খাওয়া দাওয়া আর হই হল্লা। সবাই মেতে থাকে আনন্দে। মামা কিন্তু কোনো কোনো কিছুতেই নেই। তার চোখ যেন কী খুঁজে বেড়ায়।

এইভাবে কেটে যায় কয়েকদিন।

একদিন সকালে ভাগনে যায় মাঠের দিকে একা একা। মাঠের পাশেই জঙ্গল।

সেখানে বসে আছে বাঘ। আজ তার এতদিনের অপেক্ষার শেষ হবে। সে এবার ছেলেটাকে খাবে!

ভাগনে কাছে যেতেই লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মামার কাটারির কোপে বাঘের মুন্ডু আলাদা হয়ে যায়।

গাঁয়ের সব লোক ছুটে আসে সেখানে।

এবার মামা সকলকে ডেকে বলে, সে কোথায় শুনেছিল, বাঘের হাতে ছেলেটি মারা পড়বে।

সবাই অবাক!

এবার মরা বাঘের মুন্ডুতে লাথি মেরে ভাগনে বলে, ও, তুই আমাকে খেতে চেয়েছিলি! দেখ, কেমন মজা!

কিন্তু বাঘের দাঁত লেগে ভাগনের পা গেল কেটে। সেখান থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। সে রক্ত আর বন্ধ হয় না।

এক সময় মরা বাঘের পাশে শুয়ে ভাগনেও মারা পড়ে।

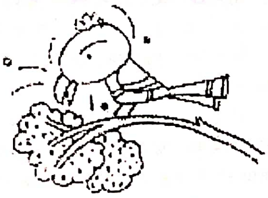

স্বপ্ন যখন সত্যি হল

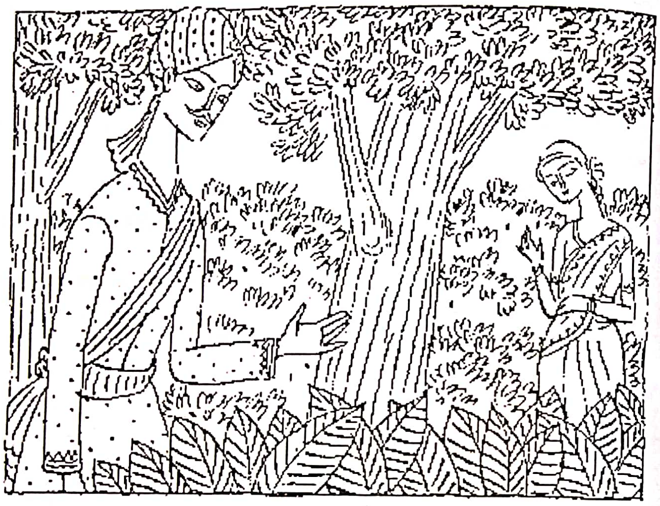

এক যে ছিল রাজা। তার ছিল দুই রানি। বড়ো রানির ছেলে ছিল না। ছোটো রানির দুই ছেলে। পরে বড়ো রানির এক ছেলে হল। ছোটো রানি আর তার দুই ছেলে ভাবল, রাজা বড়ো রানির ছেলেকে যদি রাজ্য দিয়ে দেয়, তবে তাদের কিছুই জুটবে না। তারা রাজার কান ভারী করতে থাকে। রাজাকে নানান কথা বলে, বড়ো রানির ওপর রাগিয়ে দিতে থাকে। রাজা বড়ো রানি আর তার ছেলেকে আর একটা বাড়ি বানিয়ে, সেখানে পাঠিয়ে দেয়।

একদিন রাতে রাজা স্বপ্ন দেখল, একটা সোনার চিতাবাঘ, একটা সোনার সাপ আর একটা সোনার বানর এক সঙ্গে নাচছে। কিন্তু এই স্বপ্নের মানে কি? রাজা ভেবেও কোনো অর্থ খুঁজে পেলেন না।

অবশেষে রাজা ছোটো রানি ও তার ছেলেদের ডাকল। তারাও স্বপ্নের অর্থ বুঝতে পারল না।

বড়ো রানির ছেলেকে ডাকা হল রাজসভায়। সে এসে বলল, তিনটি সোনার প্রাণী হলাম আমরা তিন ভাই। স্বপ্নের অর্থ হল, আমরা যেন তিন ভাই রাজা হওয়ার জন্য লড়াই না করি। তিনজন তো একসঙ্গে রাজা হতে পারে না। একজন পারবে। যে ভাই সোনার চিতাবাঘ, সোনার সাপ আর সোনার বানর নাচাতে পারবে সবার সামনে, সেই রাজা হবে।

ছোটো রানি ও তার ছেলেরা এই সমস্যা সমাধান করতে পারল না।

বড়ো রানি, তার ছেলেকে বলল, জঙ্গলে এক সাধু আছে। তুমি তার কাছে যাও। সেই সব বলতে পারবে।

রাজপুত্তুর বেরিয়ে পড়ল সাধুর খোঁজে। এক জঙ্গলে সাধুর দেখা পেল সে। সাধু তখন ঘুমিয়ে। পাশে জ্বলছে আগুন। সেখানে বসে তামাক খাওয়া শুরু করল রাজপুত্তুর।

সাধুর ঘুম গেল ভেঙে। জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কে রে'?

—'আমি তোমার ভাগনে'।

—'তা ভাগনে! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এত রাতেই বা কেন এলে?'

—'মা বলেছে, সোনার চিতাবাঘ, সোনার সাপ আর সোনার বানরের খবর তুমি বলতে পারবে।'

সাধু উঠে গিয়ে উনুনে হাঁড়ি চাপালে। তিন দানা চাল ফেলল হাঁড়িতে। ভাত হল এক হাঁড়ি। দুজনে খেয়ে শেষ হয় না সে ভাত।

সাধু রাজপুত্তুরকে বললে, জঙ্গলের আরো ভিতরে চলে যা। সেখানে আমার ছোটো ভাই আছে। সেই বলতে পারবে, তোর স্বপ্নের কথা।

সকালে ঘুম ভাঙতেই রাজপুত্তুর চলল দ্বিতীয় সাধুর খোঁজে। তার সঙ্গে দেখা হতেই তাকে সব জানাল রাজপুত্তুর। সাধু একটা হাঁড়ি চাপাল। দু দানা চাল ফেলল হাঁড়িতে। ভাত হল এক হাঁড়ি। সে ভাত তারা খেয়েও শেষ করতে পারে না।

শেষে রাজপুত্তুরকে বললে জঙ্গলের আরও ভিতরে আছে আমার ছোটো ভাই। সেই বলে দেবে, কোথায় আছে সোনার চিতাবাঘ—সাপ আর বানর।

রাজপুত্তুর চলল সাধুর খোঁজে। পেয়েও গেল তাকে। সব শুনে সাধু হাঁড়িতে এক দানা চাল দিয়ে এক হাড়ি ভাত রাধল। খাওয়া শেষে সাধু রাজপুত্তুরকে বলল, তাকে কী করতে হবে।

সাধুর কথামতো রাজপুত্তুর কামারশালায় গিয়ে একটা মস্ত ঢাল বানিয়ে আনল। ঢালের চারদিকে এমন ধার যে কিছু পড়লেই কেটে দুটুকরো হয়ে যাবে। ঢালের মাঝ খানের হাতল ধরে রাখতে হবে।

সাধু বলল, ঢালটা নিয়ে রাখতে হবে সাপ আর সাপিনীর বাঁশের ঘরের দরজায়। তারা যখন ঘর থেকে বেরোতে যাবে, তখনই কেটে মারা পড়বে। ভিতরে থাকে তাদের মেয়ে। রাজপুত্তুর এগিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে। সেই দেবে সোনার চিতাবাঘ-সাপ আর বানরের সন্ধান।

সন্ধ্যাবেলায় সাপ আর সাপিনী বেরোতে গিয়ে কাটা পড়ে মরল। তারপর তাদের মেয়েকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল রাজপুত্তুর। সে কিন্তু সাপ নয়, মানুষ।

মেয়ের সঙ্গে কথা বলল রাজপুত্তুর। দুজনে ভাব হল। তারপর রাজপুত্তুর থেকে গেল সাপের মেয়ের বাঁশের ঘরে। সাপের মেয়ে তাকে বলে দিল সে যেন কখনও দক্ষিণ বা পশ্চিম দিকে না যায়।

আর সেই ভুলটাই করে বসল রাজপুত্তুর। একদিন সে গেল পশ্চিম দিকে। দেখল একপাল চিতাবাঘ নাচ করছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্তুর হয়ে গেল, একটা সোনার চিতাবাঘ। কিন্তু সাপের মেয়ে তাকে আবার রাজপুত্তুর করে দিল।

আবার একদিন রাজপুত্তুর গেল দক্ষিণে। দেখল একপাল সোনার সাপ নাচ করছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্তুর হয়ে গেল, একটা সোনার সাপ। কিন্তু সাপের মেয়ে তাকে আবার রাজপুত্তুর করে দিল।

এবার রাজপুত্তুর গেল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সেখানে দেখল একপাল সোনার বানর নাচ করছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্তুর হয়ে গেল সোনার বানর। কিন্তু সাপের মেয়ে তাকে আবার, রাজপুত্তুর করে দিল।

এতদিনে রাজপুত্তুরের বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। সাপের মেয়েকে বলল, তার বাবার স্বপ্নের কথা।

সাপের মেয়ে বলল, কোনো চিন্তা নেই। সময় হলে দেখিয়ে দেবে সোনার চিতাবাঘ-সাপ আর বানরের নাচ।

রাজপুত্তুর আর সাপের মেয়ে চলল বড়ো রানির বাড়ির দিকে। পথে দেখা হল তিন সাধুর সঙ্গে তারপর একদিন তারা পৌঁছে গেল বড়ো রানির বাড়ি।

এবার রাজাকে খবর পাঠানো হল। একটা বড়ো ময়দানে অনেক দোকান আর চাপা ঘর বানাতে হবে। বড়ো রানির বাড়ি থেকে ময়দান পর্যন্ত পথ থাকবে ঢাকা। সেখানে বসে নাচ দেখাবে সাপের মেয়ে।

রাজার আদেশে সবই তৈরি হল। লোকও জমল অনেক। এমন মজার জিনিস আগে কখনও দেখেনি তারা। রাজপুত্তুর নিয়ে এল সোনার চিতাবাঘ, সোনার সাপ আর সোনার বানর। সারা দিন ধরে লোকে দেখল সেই নাচ। নাচ দেখে লোকে আর বাড়ি ফিরতে চায় না। ময়দানে যত দোকানপাট আর ছাউনি ছিল সব হয়ে গেল সোনার।

রাজা তো অবাক। ছোটো রানির বাড়ি ছেড়ে রাজা চলে গেল বড়ো রানির বাড়ি।

তারপর সাপের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল রাজপুত্তুরের। রাজার সিংহাসনে বসে সে দেশ শাসন করতে থাকল।

ছোটো রানির সব কারসাজি শেষ হয়ে গেল।

দুই বোনের গল্প

সারাদিন দুই বোন খেলে বেড়ায়। মা বাবা কাজে বেরোলেই ওরাও বেরিয়ে পড়ে। পাড়ার সব ছেলে মেয়েই এসে জোটে মহুয়া গাছের নিচে।

শুধু খেলা নয়, ওরা ঘরের কাজও করে।

একদিন রোদে বসে পাহারা দিচ্ছে ধান। একটা গাছের নিচে বসে ছিল দুই বোন। একটা কাক এসে বসল গাছে। কাকটার মুখে একটি সুন্দর পাকা ফল। ফলটা চাইল মেয়েরা।

কাক দেখল মেয়েদের। তারপর ফেলে দিল ফলটা নিচে। বোন দুজন ফলটা পেয়ে খুশি।

হাতে নিয়ে ফলটা খেতে থাকে। যেমন সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে, খেতেও তেমনি।

মেয়েরা কাককে বলল, কাক ভাই, এই ফল কোথায় পেলে!

কাক বলল, চলো আমার সঙ্গে। সেখানে গেলে অনেক ফল পাবে।

মেয়েরা চলল কাকের সঙ্গে। কাক চলল উড়ে। ওরা হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে বসে পড়ে গাছের নিচে। কাকও বসে গাছের ডালে। তারপর আবার চলতে থাকে।

বেশ কয়েকদিন পরে ওরা পৌঁছায় একটা জঙ্গলে। সেখানে একটা মস্ত গাছে ফলে আছে অনেক, অনেক ফল।

দুই বোনের মনে আনন্দ আর ধরে না। গাছ থেকে কেবল ফল পাড়ে, আর খায়। ফল খেয়ে সময় কেটে যায়।

এমন সময় বড়ো বোনের পায় জল তেষ্টা। ছোটো বোনকে বলল, পাতার বাটি বানিয়ে, পাহাড়ি ঝরনা থেকে জল নিয়ে আসতে।

ছোটো বোন যায় জল আনতে।

এমন সময়, এক বাঘ এসে খেল বড়ো বোনকে।
ছোট বোন ফিরে এসে পেল, দিদির মাথার খুলি আর এক গোছা চুল।
বাঘ বসে ছিল পাশের জঙ্গলে। ছোটো বোনকে দেখেই সে গর্জে উঠল।
ভয় পেয়ে ছোটো বোন উঠে পড়ল একটা গাছে। ভয়ে সে আর গাছ থেকে নামে না। সাতদিন ধরে থাকল সেই গাছের ওপর।
একদিন মেয়েটিকে দেখতে পেল দুই রাখাল। অনেক মিনতি করে তাকে নামাল গাছ থেকে। একজন রাখাল মেয়েটিকে বিয়ে করল।
মেয়েটি কিন্তু দিদির মাথার খুলি আর চুলের গোছা নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। রেখে দিল তাদের ঘরের কাছেই। বর্ষার জল পড়ে মাথার খুলি থেকে জন্মাল চিচিঙ্গা গাছ। আর চুল থেকে জন্মাল বাঁশঝোপ।
চিচিঙ্গা ফল হল অনেক। সেগুলো পেকে শুকিয়ে গেল। বাঁশঝোপে আকাশ ঢেকে গেল।
রাখাল দুজন থাকত একই জায়গায়। একজন থাকত তার বউ নিয়ে। অপর একজন থাকত একা একা।
ওদের একদিন বাঁশি বানাবার শখ হল। বাঁশ কেটে বানাল বাঁশি। শুকনো চিচিঙ্গা দিয়ে বানালো একতারা।
কিন্তু বাঁশি বাজাতেই সবাই অবাক। একটা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। ছোটবোন বুঝতে পারে এ তার দিদির কান্না। দিদি তাকে ছেড়ে যায়নি। আশপাশেই আছে। সে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে।
যে রাখাল বিয়ে করেনি, সে হল অবাক বেশি। তার ঘরে ছিল বাঁশি আর একতারা। রোজই সে কাজে বোরোয়। ফিরে এসে দেখে, তার ঘরদোর পরিস্কার। কে যেন ঝাঁট দিয়ে রেখে গেছে।
রাখালের বউ-ও শুনল এসব কথা।
একদিন দুই রাখাল গেছে বনে। রাখালের বউ একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। চারদিক চুপচাপ, কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমন সময় দোতারার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। সে এসে ঘরদোরের কাজ করে দেয়। রাখালের বউ, চিনতে পারে মেয়েটিকে। এই তো তার দিদি।
সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে দিদিকে। বলল, আর তোমাকে কোথাও যেতে দেব না।
রাখাল দুজনে ফিরে এসব শুনে মহাখুশি। যে রাখালের বিয়ে হয়নি, তার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল।
দুই রাখাল, দুই বউ, আর তাদের ছেলেমেয়েরা আনন্দে দিন কাটায়।

ভয় পেয়ে পালায় যোগী

গাঁয়ে থাকে কত রকম মানুষ—তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এক গাঁয়ে থাকে চার যোগী। কোনো কাজ নেই তাদের। ওরা লোকের কাছে ভিখ মেগে খায়। যা জোটে তাতেই খুশি। না জুটলেও কাউকে কিছু বলে না।
চার জন একসঙ্গে বেরোয় রাস্তায়। নিজেরা কথা বলে।
একদিন ওরা বেরিয়েছে। ভাবছিল আজ ওরা রাজার বাড়ি যাবে ভিক্ষে করতে। কিন্তু রাজার সঙ্গে কথা বলেনি কোনোদিন। তাই ভাবছিল কী বলে কথা শুরু করবে।
যেতে যেতে দেখল একটা মেঠো ইঁদুর মাটি খুঁড়ে জমা করছে। ইঁদুরের কাজ দেখল তারা। তাই দেখে একজন যোগী বলল, আমি রাজাকে বলব মাটি খোঁড়ে খপ খপ। এতেই রাজার বোঝা উচিত, আমি কি চাই।
অন্য তিন যোগী ভাবতে থাকে, তারা কী বলবে!
এমন সময় ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে কয়েকটা ব্যাং ভয়ে লাফিয়ে পড়ে পুকুরের জলে।
ব্যাঙের লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এক যোগী বলে ওঠে, আমি বলব, বসে পড়ে ধপাধপ। রাজা বুঝবেন আমি কী চাইছি।
বাকি থাকল আর দুই যোগী। ওরা ভেবে কুলকিনারা খুঁজে পায় না।
এমন সময় দেখল, একটা শুয়োর কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। শুয়োরের সমস্ত শরীরটা জল কাদায় মাখামাখি। একবার মাখে কাদা, আর একবার যায় জলে।
বাকি দুই যোগীর একজন বলল,—ঘসে ঘসে যাও, আর জল দাও।
আর এক যোগী বলল, আমি বলব অন্য কথা। শহরটা বেশ বড়ো। রাজার তহশিলদারকে বলব, শহরটাকে ঘুরে ঘুরে দ্যাখো।

এবার চার যোগী যাচ্ছে রাজবাড়ি। পথে একজন লোকের দেখা পেল। তাকে বলল, একটা কাগজে তাদের ভবনাগুলো লিখে দিতে। কারণ রাজবাড়ি যেতে যেতে তারা সব ভুলে যাবে। আর ওরা লিখতে পড়তেও জানে না।

যোগীরা পৌঁছে গেল রাজবাড়ি। রাজার হাতে দিল কাগজটা। রাজা কাগজটা পড়তে থাকে—পড়তে থাকে—পড়তে থাকে। কিন্তু মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারে না। রাজার চোখ মুখের ভাব দেখে যোগীরা ভয় পেয়ে যায়। ওরা যে লিখতে পড়তে জানে না। রাজা পড়তে বললেই বিপদ। ভয়ে ওরা পালায় সেখান থেকে।

রাজার যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে আছে এক তহশিলদার, আর এক নাপিত। তহশিলদার হিসাব রাখে। আর নাপিত রোজ সকালে কাটে রাজার দাড়ি।

সেদিন তহশিলদারের মাথায় চাপল ভূত। সে নাপিতকে বলল, দাড়ি কাটবার সময় রাজার গলাটা কেটে দিবি। তাহলে এতবড়ো রাজ্যটা হবে আমাদের।

লোভী তহশীলদার আবার রাজার নায়েবকে বলল, চলো আজ রাতে রাজবাড়িতে সিঁধ কেটে আমরা সব সোনাদানা সরিয়ে ফেলি।

নায়েবের কথাটা পছন্দ হল।

আস্তে আস্তে রাত বাড়তে থাকে। নায়েব আর তহশিলদার রাজবাড়িতে সিঁধ কাটতে থাকে। রাজামশাই তখন ঘরে বসে যোগীদের কাগজটা পড়ে বুঝতে চাইছিল, কাগজে কী লেখা আছে।

হঠাৎ রাজামশাই বলে ওঠে "মাটি খোঁড়ে খপ খপ।"

একথা শুনে ভয় পেয়ে গেল তহশিলদার। তারা যে সিঁধ কাটছে। রাজা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। তখন তারা কাজ বন্ধ করে বসে পড়ে মাটিতে।

সেই সময় রাজা বলে ওঠেন, "বসে পড়ে ধপাধপ"।

একথা শুনেই তহশিলদার আর নায়েব পালায় সেখান থেকে।

পরদিন সকালে নাপিত দাড়ি কাটার ক্ষুরে শান দিয়ে চলেছে।

ঠিক তখন রাজা বললেন, "বুঝেছি, তুমি কী চাও।"

এবার কিন্তু নাপিত ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, তহশিলদার নিশ্চয় সব বলে দিয়েছে। ভয়ে সে রাজার পা ধরে কাঁদতে থাকে। তহশিলদারের কথা বলে দেয় রাজাকে।

রাজা নায়েবকে বললেন, নাপিত আর তহশিলদারকে কয়েদ করতে।

নায়েব যখন রাজার ঘরে ঢুকছিল, তখন রাজা বললেন, "মাটি খোঁড়ে খপ খপ।"

নায়েব ভাবল, রাজা সব জেনে ফেলেছে। ভয়ে সে সব স্বীকার করল।

রাজা তো অবাক। রাজবাড়ির বাইরে গিয়ে দেখে এল, যেখানে ওরা সিঁধ কাটছিল।

রাজা তিনজন অপরাধীকে কয়েদ করলেন।

আর যোগীদের খোঁজে লোক পাঠালেন। কিন্তু কোথায় যোগীরা! তাদের টিকিটি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না। তারা রাজার ভয়ে, এদেশ ছেড়ে পালিয়েছে অন্য দেশে।

বোকা রাজা

রাজার ছিল বেজায় দেমাক। কাউকে পরোয়া করত না। রাজা ভাবত, তার মতো বড়ো রাজা নেই আর কোথাও। আর রাজা যা ভাবে অন্য কেউ তা ভাবতেই পারে না।

একবার রাজার মনে হল, দেখাই যাক না তার মনের কথা কেউ আঁচ করতে পারে কি না।

রাজবাড়ির যাবতীয় লোকজনকে ডেকে পাঠানো হল। সকলের কাছে রাজা জানতে চাইল, তার মনের কথা কি, বলতে হবে। বলল সবাই যে যার মতো, কিন্তু একটিও পছন্দ হল না রাজার।

রাজা তখন দেওয়ানকে ডেকে বলল, একমাসের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে বের করো, যে আমার মনের কথা বলতে পারবে।

দেওয়ান সারা রাজ্য খোঁজ করে, তেমন কাউকে খুঁজে পেল না। মাসও শেষ হয়ে এল প্রায়।

এমন সময় দেওয়ানের মেয়ে বলল, কিছু ভেবো না। ঠিক সময় মতো আমি একজনকে হাজির করব।

দেওয়ান শুনে খুব খুশি। যাক তাহলে তাকে এনিয়ে ভাবতে হবে না।

রাজার কাছে যাওয়ার দিন, দেওয়ানের মেয়ে তার সঙ্গে নিল তাদের বাড়ির রাখালকে। দেওয়ান অবাক হল দেখে, মেয়ে বলল, কোনো চিন্তা নেই। ওই সামলে দেবে সব।

দেওয়ান রাখালকে নিয়ে হাজির রাজার সামনে। তাকে দেখে রাজা মাথায় ওপর তুলল একটা আঙুল।

সঙ্গে সঙ্গে রাখাল, তার মাথার ওপর তুলে ধরলো, দুটো আঙুল।

যেই রাজা মাথার ওপর তিনটি আঙুল তুলে ধরল, অমনি রাখাল মাথা নাড়িয়ে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করল।

রাজা হেসে খুন। মনের মতো জবাব পেয়ে গেছে বলে রাজার আনন্দ আর ধরে না।

এসব দেখে দেওয়ান তো অবাক। কী এমন হল, যার এক কণাও ঢুকল না তার মাথায়।

দেওয়ান রাজাকে বলল, আমাকে একটু খুলে বলবেন কী হল!

রাজা বলল, আমি এক আঙুল তুলে বলতে চেয়েছিলাম, আমি একাই রাজা। ও দু আঙুল তুলে বলল, না, আর একজন রাজা আছে। তিনি ভগবান।

তারপর তিন আঙুল তুলে বললাম, আর একজন রাজা আছে কি না। ও মাথা নাড়িয়ে বলল, না আর কেউ নেই। আমি একাই রাজা।

তারপর যে যার বাড়ি চলে গেল।

দেওয়ান রাতে রাখালকে ডেকে জানতে চাইল রাজার সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে।

রাখাল বলল, আমার মোটে তিনটে ভেড়া আছে। রাজা একটা আঙুল তোলায় ভাবলাম রাজা একটা ভেড়া চাইছে। এতবড়ো রাজাকে কী একটা ভেড়া দেওয়া যায়, তাই আমি দুটো ভেড়া দিতে চাইলাম। এরপর রাজা তিনটি আঙুল তুলল। বুঝলাম রাজা তিনটে ভেড়াই চায়। তখন আমি পালিয়ে আসছিলাম ওখানে থেকে।

রাজার বুদ্ধির বহর দেখে দেওয়ানের হাসি আর থামে না। রাখালকে সেদিন দেওয়ান পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াল।

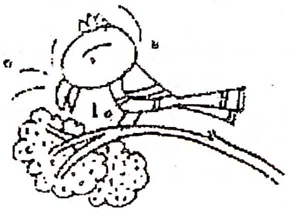

সাঁওতালী ভাষা

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত
(মোস্ট মহানাদ, হুগলি)

দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ—১৩২৮
প্রথম হইতে ৮ম ফর্মা পর্যন্ত
৬৩নং নিমতলা স্ট্রীট
বাণীপ্রেসে জে. এন, দে দ্বারা
এবং
অবশিষ্টাংশ ২৯ নং বৈঠকখানা
রোড সাথী প্রেসে শ্রী হেমচন্দ্র রায়
দ্বারা মুদ্রিত।

[© The Copy right reserved]

[মূল্য।। ১১ আনা]

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা সাঁওতালী ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিবার জন্য এই পুস্তকখানি রচিত হইল। আমি যেরূপ উপায়ে শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহানাদ
২০ শে আষাঢ়, ১৩২১

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথমবারে অসংখ্য ভুল ছিল। এবার সম্পূর্ণ নির্ভুল ও যথাযথ উচ্চারণ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং বহু সংখ্যক টীকা দ্বারা ভাষাটি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে আমি কোনও পুস্তকাদির কিছুমাত্র সাহায্য গ্রহণ করি নাই। আরম্ভ সময়ে দাঁতড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমান বিপিন বিহারী প্রামাণিক এবং পরিসমাপ্তিকালে মহানাদ ইউ, এফ্ সি, মিশন স্কুলের হেড পণ্ডিত খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, সুশিক্ষিত সাঁওতাল, শ্রীযুক্ত আর্নেস্ট সরেন প্রধানতঃ এই দুই সহৃদয় ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াই আমি এই "সাওতালী ভাষা" প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছি। সেজন্য আমি ইহাদের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

মহানাদ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩২৮

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়
সাঁওতালী ভাষা
শব্দ পরিচয়

সাঁওতাল .... হড়্
ভাষা .... ভাকা, পার্সী।[১]
সাঁওতালী ভাষা .... হড়্ — ভাকা।
কথা .... রড়্। কাথা।[২]
সাঁওতালী কথা ..... হড়্ রড়্।

*　　*　　*

ঈশ্বর ..... চাঁদু বোংয়া, সের্মা চাঁদো।

ঠাকুর, দেবতা, প্রতিমা ..... বোংয়া।

মানুষ ..... হড়্।[৩]
মনুষ্য জাতি ..... মানুয়ী।
হিন্দু ..... দেকো।
ব্রাহ্মণ ..... বাব্ড়েঁ।[৪]

হাড়ি, বাউরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির হিন্দু ..... ডেংকে।

মুসলমান ..... তুড়ুক্।
ইংরাজ ..... জেটে।

*　　*　　*

১. সাঁওতালদের লিখিবার নিজেদের কোন ভাষা নাই। উহারা পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে মাতৃভাষার অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।
২. কথোপথনের কথা—রড়্। কোন বিষয়ক কথা—কাথা।
৩. সাঁওতালি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "আদিতে....সমস্ত কেবল জলময় ছিল। মারাং বুরু (ধরম্ গুরু) স্বর্গ হইতে রেশমী সূতা ধরিয়া নামিয়া আসেন এবং জলের উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হন। তাঁহার দেহের দুইটি ময়লা হইতে রাজহংস ও রাজহংসী পক্ষী উৎপন্ন হয়। মারাং বুরুর আদেশে সিংহাসনখানি পদ্মগাছ হইয়াছিল। ঐ পদ্মপত্রের উপর পক্ষীরা দুইটি অণ্ড প্রসব করে। সেই সময় পৃথিবী সৃষ্টি করিবার জন্য মারাং বুরু অনেক অনেক রাজাকে বলিয়াছিলেন। কুমীর রাজা, কাঁকড়া রাজা, শামুক রাজা, চিঙ্গড়ী রাজা প্রভৃতি কেহ পারে নাই, কিন্তু কাছিম রাজা এবং কেঁচো রাজা এই দুইজনে পারিয়াছিল। কেঁচো রাজা পদ্মের মৃণালের ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাটি তুলিয়াছিল এবং কাছিম রাজা পিঠের উপরে মাটি ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে পৃথিবী সৃষ্টি হয়। ঐ দুইটি অণ্ড হইতে "পিল্ চু হাড়াম্" ও "পিল্ চু বুড়্হি" জন্মগ্রহণ করে। ইহারাই সকল মানুষের আদি পিতামাতা।"
৪. ব্রাহ্মণঠাকুর.......বাব্ড়েঁ খোংয়া।

মা	.....	আয়ু
বাবা	....	আপুং
মাতা পিতা	.....	এঙ্গা আপা।
ভাই	.....	বয়হা
ভগিনী	.....	মিসেরা
দাদা	.....	দাদা।
মেজ্ দাদা	.....	তালা দাদা
সেজ্ দাদা	.....	সাঁজলা দাদা।
ছোট দাদা	.....	হুডিং দাদা
ছোট ভাই	.....	বকৎ।
দিদি	.....	দাই।
ছোট ভগিনী	.....	মিসেরা।
জ্যেঠা	.....	গোংগো আপুং / মারাং আপুং।
জ্যেঠা মহাশয়	.....	গোংগো বাবা
জ্যেঠাই	.....	গোংগো আয়ু।
খুড়া	.....	হুডিং আপুং
খুড়া মহাশয়	.....	হুডিং বাবা।
খুড়ি	.....	হুডিং আয়ু
পিতামহ / মাতামহ	.....	গড়ম্ আপুং
পিতামহী / মাতামহী	.....	গড়ম্ আয়ু
পিসা	.....	কুমাং
পিসি	.....	হাতম্।
মেসো	.....	কাকা।
মাসী	.....	কাকী।
মামা	.....	মামা।
মামী	.....	মামী। হাতম্।
শ্বশুর	.....	হোঁন্ ঝ হাঁর।
শাশুড়ী	.....	হান্হাঁর।
বৈবাহিক	.....	বালা কোড়া / বালা হেরেল্।

বৈবাহিকা	.....	বালা কুড়ী / বালা এরা।
শ্যালক	.....	এর্ ওয়েল্
বড় শ্যালক	.....	বা হোঁন্ঝ্ হাঁর
শ্যালক পত্নী	.....	মিসেরা।
শ্যালী	.....	আঝনার্
ভগিনীপতি	.....	তেঁইয়াং
স্বামী	.....	হেরেল
স্ত্রী	.....	ওডাঃ গম্‌কে।
পুত্র	.....	হপন্।
পুত্র বধু	.....	বাহু।
কন্যা	.....	কুড়ী হপন্।
জামাতা	.....	জাঁ ওয়াই।
পৌত্র / দৌহিত্র	.....	গরম। কড়ার্।
প্রপৌত্র	.....	গড়ম্ হপন্
নাতিনী	.....	গড়ম কুড়ী।
নাতজামাই	.....	গড় মুকুড়ী জাঁ ওয়াই।
কুটুম্ব	.....	পেড়া
সখা / সই	.....	ফুল্।
শত্রু	.....	বাইরী
বেটাছেলে	.....	কৌড়া হপন্।
মেয়েছেলে	.....	কুড়ী গিদ্রা / হপন্এরা।
শিশু	.....	গিদ্রা
ছেলে .. পিলে	.....	গিদ্রা পিদ্রা
যুবক	.....	কোড়া।
যুবতী	.....	কুড়ী
বৃদ্ধ	.....	হাড়াম।
বৃদ্ধা	.....	বুড়হি।
পুরুষ	.....	হেরেল। / কোড়া হড়্।

স্ত্রী লোক ..... মায়ুজু। কুড়ী হড়্।
বিধবা ..... রান্ডি
নপুংসক ..... মায়ও।

* * *

রাজা ..... রাজা। মারাং বাবু।
প্রজা ..... পর্‌জা।
প্রভু ..... কিষাড়্।
ভৃত্য ..... গুতি।
চাক্‌রানী ..... কাড়্‌মী।
রাধুনী ..... দাকাইঃচ্।[৫]
রাখাল ..... গুপিহঃচ।
শিক্ষক ..... { চেৎইঃচ। শেঁড়াইঃচ্।
ব্যবসাদার ..... বাঁড়িয়া।
ক্রেতা ..... কিরিংইঃচ্।
বিক্রেতা ..... আক্‌রিঃইংচ্।
ঘটক ..... রায়বার্ ইঃচ্।
গায়ক ..... সেসেরিং ইঃচ্।
বাদক ..... রুরু ইঃচ।
নর্তক } নর্তকী } ..... এনেইঃচ।
কানা ..... কাঁড়া।
খোঁড়া ..... খোড়্‌দা
আজন্ম খঞ্জ ..... লেড়্‌হা।
কালা ..... { কালা বাং আঞোমআ।
বোবা ..... কোংকা হড়্।
নির্বোধ } বোকা } ..... লেল্‌হা।
ক্লান্ত ..... লাঙ্গা
রোগা বা পেট মোটা ..... ডোবেয়া।

৫. ইঃচ্ শব্দ মনুষ্যবাচক; চ্ এর উচ্চারণ অল্প হইবে।

গর্ভবতী (স্ত্রীলোক) ..... ভারি হড়্‌মো।
গর্ভবতী (জীবজন্তু) ..... গুর্ভিন্।
রোগী ..... আজারাকান হড়্।
চিকিৎসক ..... ওঝ্‌হা। ডাক্‌তর।
গরিব, ক্ষুধার্ত ..... রেংএজ্ হড়্।
লোভী ..... লুব্‌ভি।
ভিক্ষুক ..... ককয় হড়্
কৃপণ ..... চিরিঃৎ হড়্।
দাতা ..... দিয়াহারি।
পুন্যবান, সাধু ..... ভাগেইঃচ।
চোর ..... কোম্‌ড়ো।।
মাতাল ..... বুল্‌হড়্।
পাপী, অপরাধী ..... কাই আন্। কাইইঃচ্।
বিচারক ..... পার্‌গানা।
ভূত ..... ভূত, জেন্, যুগিন্;
পেতনী ..... চুড়্ কিন্।
ডাহনি ..... লুবুড়ী।

* * *

গরু ..... ডাংরা
মরা গরু ..... গঃজ ডাংরা
গাভী ..... গাই।
বাছুর ..... মিহু।
ষাঁড় ..... ষাঁড়। আঁড়িয়া।
বলদ ..... উরিঃচ।
মহিষ ..... কাড়া।
মহিষী ..... বিৎকিল্।
মহিষ শাবক ..... কাডি।
ছাগল ..... ম্যারম্।
ভেড়া ..... গাড়্‌রা।
গাধা ..... গাধ্‌হা।
ঘোড়া ..... সাদম্।
কুকুর ..... সেতা।
বিড়াল ..... পুশী।

বাঘ	.....	তারুব্।
ভালুক	.....	বানা।
সিংহ	.....	জাটা কুল
সিংহী	.....	কুল।
হস্তী	.....	হাথ্হি।
বানর	.....	হাঁড়ু।
রূপী বানর	.....	গাঁড়ি।
সাপ	.....	বিইং।
ব্যাঙ্	.....	রটে।
ইঁদুর	.....	গোডো।
নেংটিয়া ইঁদুর	.....	চুটিয়া।
কাঠ্ বিড়াল	.....	তোড়্।
মশা	.....	শিং্কড়িঃচ্।
মাছি	.....	র।
প্রজাপতি	.....	পিপিড়্ জান্।
মৌমাছি	.....	ত্যারম্।
বোল্তা	.....	সুসুর্ বান। সুসুর্ বাঁধ।
ভীমরুল	.....	বুনুম্ বাড়োরিন।
গুররে পোকা	.....	উরু।[৬]
জোঁক	.....	জোঁক।
কুমির	.....	তায়ান্।
পোকা	.....	তিজু।
পিঁপিড়া	.....	মুইজ্[৭]
জিঁয়া পিঁপিড়া	.....	সুনুম্ মুইজ
ক্ষুদি পিঁপিড়া	.....	আরা মুইজ্
উই	.....	ভুকু, ইঁদির্
কেঁচো	.....	ভুকু, হাঁদির্[৮]
কেঁচো	.....	কেচুয়া। লেম্ ডেৎ।
আরশুলা	.....	শুঁয়াড়ী

---

৬. যে গুব্‌রে পোকা উড়ে, তাহাই "উরু" আর যেগুলি গোবরের ভিতরে থাকে, তাহাদিগকে "গুরিইঃ তিজু" বলে।

৭. জ এর উচ্চারণ স্পষ্ট হইবে না।

৮. উইটিপির উই .... "ভুকু"। কাষ্ঠাদির উই .... "হঁদির।"

পক্ষী	.....	চ্যাঁড়ে।[৯]
মুরগি	.....	সিম্।
মোরগ	.....	সিম যান্ডি।
পাহি হাঁস	.....	গেডে।
রাজহংস	.....	হাঁস
রাজহংসী	.....	হাঁসিল্।

* * *

মুখ	.....	মোচা।
চোক	.....	মেংৎ।
নাক	.....	মু
কান	.....	লুতুর্।
ঠোঁট	.....	লুটি।[১০]
গোঁপ দাড়ি	.....	গোচো।[১১]
দাঁত	....	ডাটা।
দাঁতের গোড়া	....	মাস্‌কুড়া।
জিহ্বা	....	আলাং।
মস্তক	....	বহঃ
স্কন্ধ	....	তারেন্।
গলা	.....	হটঃ
কণ্ঠনালী	.....	নাড়ুরি।

---

৯. কতকগুলি পক্ষীর নাম, যথা—

শালিক	—	বোনা। কিস্‌নি।
টিয়া	—	দয়।
মাছরাঙা	—	কিকির।
বক	—	কোঁ।
বাজ	—	পাঝাড়ু।
গুয়েনেংটি	—	চারে কিস্‌নি।
ঘুঘু	—	পোতাম্।
কাক	—	কাহ্।
কোকিল	—	কুহু, কোহেল।
চড়ুই	—	ঘাড়োয়া।

প্রত্যেক পক্ষীর নামের শেষে "চ্যাঁড়ে" যোগ করা যাইতে পারে, যেমন শালিক পাখি বোনা চ্যাঁড়ে। কোকিল কোহেল চ্যাঁড়ে ইত্যাদি।

১০. উপরোষ্ঠ—চেতান লুটি। নিম্নোষ্ঠ—লাতার লুটি।

১১. গোঁপ—চেতান গোচো। দাড়ি—লাতার গোচো।

ঘাড়	.....	তৎকা
বুক	.....	কোড়াম্।
পিঠ	.....	দেয়া।
পেট	.....	লাজ্।
স্তন	.....	নুনু
গা	.....	হড়মো
হাত	.....	তিঃ।[১২]
পা	.....	জাঙ্গা।[১৩]
লেজ	.....	চাঁড়লম্।
আঙুল	.....	কাটুব্।[১৪]
অন্ডকোষ	.....	পেস্‌কা য়্যাণ্ডে।
পুং- চিহ্ন	.....	ল ঃ জ্।
স্ত্রী- চিহ্ন	.....	চুচুঃ।
ত্বক	.....	হার্‌তা।[১৫]
চুল	.....	উব্।
রক্ত	.....	মায়াং।
মাংস	.....	জেল্।
অস্থি	.....	জাং।
মজ্জা	.....	তোর মোল।
শুক্র	.....	লেড়্।
মল	.....	ইজ্।
মুত্র	.....	আড়ু।
ঘাম	.....	উদ্‌গার্।
গয়ের	.....	খারাঃ
শ্লেষ্মা	.....	সুলুই।

১২. কনুই এর উপরদিক — সোপো এবং নিম্নভাগ মোকা।

১৩. হাঁটুর উপরদিক “বুলু” ; নিম্নদিককে—ঠিটড়াঃ বলে।

১৪. অঙ্গুলির নাম, যথা— বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ..... এংগ্‌আ কাটুব্।
তর্জনী ..... উদুঃ কাটুব।
মধ্যমা ..... তালা কাটুব।
অনামিকা ..... মুদম্ কাটুব্।
কনিষ্ঠা ..... সিঃপ কাটুব।

১৫. গো-চর্ম—জংরা জারতা।

সর্দি	.....	মাদা।
কাশি	.....	খো।
হাঁচি	.....	হাচিম্, আচিম্।
বাতকর্ম	.....	গাসিঃ।
বমি	.....	উদুলোও, তলাও।
ছেলেদের বমি বা দুধ তোলা	.....	বেঃ চ্।
জ্বর	.....	রুয়া।
পিপাসা	.....	তেতাং।
ফুলা	.....	মওয়া। ভারাও।
বেদনা	.....	হাসো।
আঘাতের দাগ	.....	হদ্‌রি।
উদরাময়	.....	লাজ্ ওভোক্।
মহামারী	.....	মালট্।
নিশ্বাস প্রশ্বাস	.....	সাহেংৎ।
প্রাণ	.....	জীউই

* * *

জল	.....	দাঃ।
আগুন	.....	সেংগেল।
জ্বালানী কাঠ	.....	সাহান্।
চাউল	.....	চাউলে।
আতপ চাউল	.....	আদোয়া চাউলে।
সিদ্ধ চাউল	.....	তেকে চাউলে।
ক্ষুদ	.....	খোদে।
ভাত	.....	দাকা।
বাসিভাত	.....	বাস্‌কে দাকা।
ফেন	.....	দাঃতে। আঁড়ি দাঃ মাড়ি।
ডাইল	.....	ডাল
মাসকলাই	.....	রামড়া।
মটর	.....	বাট্‌ড়া।
তরকারি	.....	উতু।
আলু	.....	সাং।
বেগুন	.....	বেংগাড়্।

লাউ ..... হতঃ।
কুমড়া ..... কোঁঃঢা
সীম ..... মাল্‌হান্।
মুলা ..... মুলা।
ডুমুর ..... লওয়া।
শাক ..... আড়াঃ।
পুঁইশাক ..... পুরাই আড়াঃ।
কুমড়া শাক ..... কোঁঃঢা আড়াঃ।
পোলছাতু ..... ওট্।
মাছ ..... হাকো।[১৬]
পাঁঠার মাংস ..... ম্যারম্ জেল্।
কাছিম ..... হরঃ।
গুগ্‌লি ..... রকচ্।
শামুক ..... গৌংহা।
ঝিনুক ..... চাচ্‌না। ঝুনুক্।[১৭]
কাঁক্‌ড়া ..... কাট্‌কোম্।
ডিম ..... বেলে।
হাঁসের ডিম ..... গেডে বেলে।
মুরগির ডিম ..... সিম্ বেলে।
পিঁয়াজ ..... পেয়াজ।
রশুন ..... রাঁশুড়্।
তৈল ..... সুনুম।
নারিকেল তৈল ..... নারিকেল সুনুম
কেরোসিন তৈল ..... হাসা সুনুম্। ডিবা সুনুম্
লবন ..... বুলুং
লঙ্কা ..... মারিচ্।
হলুদ ..... শাশাং।
সরিষা ..... তুড়ি
সুপারি ..... গুয়া।

---

১৬. বোয়াল .... বোয়াড়, চিঙ্গড়ী .... ইচাঃ, শোল .... কারশেলা, রুই .... রুই, মিরগেল .... মিড়িক, কাৎলা .... কাৎলা। পুঁটী .... পুঁঠী, মৌরলা .... মৌরলা, ঘেলে—চাউলে জুরা, পাঁকাল ... দুঁড়ি, চ্যাং .... চড়্‌কা, সিঙ্গী ..... সিসিং। মাগুর ...... মাগ্‌রি, কই .... কই।

১৭. জীবিত ঝিনুককে "কাৎলা" বলে।

ময়দা ..... ময়দা।
চাউলের গুঁড়া ..... হলং।
রুটি ..... 'রুটি।
দুধ ..... তোয়া।
ঘি ..... গতম্।
সর ..... ছালে।
দই ..... দাহে।
ঘোল ..... ঘর।
মুড়ি ..... খাজাড়ি।
মুড়্‌কি ..... মুড়কি।
চাউল ভাজা ..... চাউলে আতা।
ছোলা ভাজা ..... ছোলা আতা।
চিঁড়া ..... তাবেন।
গুড় ..... গুড়।
মধু ..... ত্যারম্ সুনুম্।
সন্দেশ ..... লাড়ু।
জলখাবার ..... দাঃ হউ আ।
আম ..... উল্।
কাঁঠাল ..... কান্‌ঠাড়্।
শশা ..... তাহের্।
পেঁপে ..... অমৃৎ।[১৮]
কলা ..... কায়রা।
পাকাকলা ..... বেলে কায়রা।
কাঁচাকলা ..... বেরেল কায়রা।
আনারস ..... কিয়া কান্‌ঠাড়্।
পিয়ারা ..... আন্‌জির্।
ডালিম ..... ডালিম্।
বেল ..... সিঁজো।
কয়েত বেল ..... কয়ের্, বেলে।
জাম ..... শ, কোদ।[১৯]
লেবু ..... জাম্বির।

---

১৮. আসামের "মধুফল"।

১৯. বড় জাম— "শ" ছোট জাম— "কোদ্"।

তেঁতুল	.....	জজ অ।
কুল	.....	জানুম্।
তাল	.....	তালে।
কলাপাতা	.....	কায়রা স্যাকাম্।
পদ্মপাতা	.....	পয়রানি বাহা স্যাকাম্
শালপাতা	.....	সারজম্ স্যাকাম্।
দোক্তা	.....	রহড় থামাকুর।
চুরট	.....	চটা, চুটি, পুংগি।
দেশালাই	.....	সেংগেল খাড়ি কোম্‌ড়ো সেংগেল।
কল্কে	.....	চিলিম্
তামাক	.....	থামাকুর।
গাঁজা	.....	গাঁজা। মারাং থামাকুর।
মদ	.....	পাউরা।
পঁচুই মদ	.....	হান্ডি।
ঔষধ	.....	রান।
মলম ঔষধ	.....	ঘিপি রান্।

* * *

ধান	.....	হোড়ো।
আগ্‌ড়া	.....	পেটেঃচ্।[20]
বীজ ধান	.....	ইতাঃ।[21]
বীজ বা ধানের চারা	.....	তলা।
খড়	.....	বুসুব্। সাউড়ি। গোড়া কাটি।[22]
খড়ের গাদা	.....	{ বুসুব্ পাড়ুই। সাউড়ি পাড়ুই। গোড়াকাটি পাড়ুই।
গাড়ি	.....	গাড়ি।
গরুর গাড়ি	.....	উরিইঃ গাড়ি।
মহিষের গাড়ি	.....	কাড়া গাড়ি।
ঘোড়ার গাড়ি	.....	সাদম্ গাড়ি।

২০. দুই হস্তে ভাঙাকেও "পেটেঃচ" বলে।

২১. যে কোনো বীজকে "ইতাঃ" বলা যায়। যেমন— শশাবীচি—তাহের্ ইতাঃ। কাঁঠাল বীচি- কান্‌ঠাড় ইতাঃ ইত্যাদি।

২২. এলোমেলো খড় — "বুসুব্", আটি খড় — সাউড়ী বা গোড়াকাটি।

লাঙল	.....	নাহেল্।
গরুর লাঙ্গল	.....	উরিইঃ নাহেল্।
মহিষের লাঙ্গল	.....	কাড়া নাহেল্।
ফাল	.....	ফাল
নিরজিন	.....	বোটা।
ইষ	.....	ইষি।
যোয়াল	.....	আড়ার্।
আঁক্‌ড়ো	.....	আখড়া।
আঁওৎ	.....	নাংলে।
মই	.....	আঁড়গোম্।
কোদাল	.....	কুড়ি।
কাস্তে	.....	দাঁৎরোম।
কাটারি	.....	কাটারি।
কুড়ুল	.....	টাংগা।
বাইস	.....	ওয়াস্।
ক্ষুর	.....	হলাঃৎ।
কাঁচি	.....	কাপ্‌চি, কাঁউচি।
ঝুড়ি	.....	ঠেকা
বস্তা	.....	থলি।
কুলা	.....	হাটা।
ঝাঁটা	.....	জনঃ।
নগা	.....	ডাং।
দড়ি	.....	বাবের্।
সূতা	.....	সূতাম্।
রেশমী সূতা	.....	তোড়ে সূতাম।
কাপড়	.....	কিচ্‌রিঃ, গেঁদড়া, লুগ্‌ড়ি।
পুঁটুলি	.....	কিচ্‌রিঃ ঘ্যাট্।
জামা	.....	আংরোখ।
জুতা	.....	পানাহি।
মোজা	.....	দৎঅ।
ছাতা	.....	চাতম্।
খাটিয়া	.....	পার্‌কম্।
বিছানা	.....	আটেঃৎ।

চেটা	.....	পাটিয়া।
মাদুর	.....	শুঁড়ি পাটিয়া।
বালিশ	.....	বালিশ, শিতান্।
থালা	.....	থারি।
ঘটি	.....	লোটা।
বাটি	.....	বাটি।
গাড়ু	.....	ঝারি লোটা।
হাঁড়ি	.....	টুকুই।
বড় কলসী	.....	কান্জ।
ছোট কলসী	.....	ঠিলি।
ধুচুনী	.....	টুংকি।
শিল	.....	রিরি ধিরি।
নোড়া	.....	গুড়্ গুড়্।
কপাট	.....	শিল্পিং।
কুঁড়ের ঝাঁপ	.....	টাটি।
তালা	.....	কুঁজি, কুলুপ্।
চাবিকাঠি	.....	কুঁজি খাড়ি। কুলুপ্ খাড়ি।
লণ্ঠন	.....	লণ্ঠন।
ল্যাম্প	.....	ডিবা।
প্রদীপ	.....	দেওহে।
মাদল	.....	তুম্দা।
ধামসা	.....	টামাক্।
চড়চড়ি	.....	রেগড়া।
ঢাক	.....	রাহাড়্।
বাঁশি	.....	তিরিও।
বেহালা	.....	বানাম্।
বেহালার ছড়ি	.....	আঃ।
তির	.....	সার্।
ধনুক	.....	আঃ।
তির ধনুক	.....	আঃ সার্।
লাঠি	.....	ঠেংগা।
তরবারি	.....	তার্ওয়াড়ে।

*　　*　　*

দেশ	.....	দিশম।
গ্রাম	.....	আতঃ।
জন্মভূমি	.....	জানাম দিশম্।
শ্বশুর বাড়ি	.....	নাইহার্।
কুটুম্ব বাড়ি	.....	পেড়া ওড়াঃ।
ঘর / বাড়ি	.....	ওড়াঃ
উঠান	.....	রাচা।
খামার	.....	খারাই।
রাস্তা	.....	হর্।
গলি	.....	কুল্হি।
গলির মধ্যস্থল	.....	তালা কুল্হি।
বড় রাস্তা	.....	ডাহার।
মাঠ	.....	বাদ, মাঠ্।
জমি	.....	ক্ষাৎ, হাসা।
জমির আল	.....	আড়ে।
মাটি	.....	হাসা।
পাথর	.....	ধিরি।
কাদা	.....	লছদ্।
গোবর	.....	গুরিইঃ।
ছাই	.....	তরজ্।

*　　*　　*

সোনা	.....	সোনা।
রূপা	.....	রূপা
গহনা	.....	গহনা। (সাকম্, খাড়ু, বাংকি।)
আংটি	.....	মুদম্।
ফুলের মালা	.....	বা:মালা।
টাকা	.....	ট:কা।
পয়সা	.....	পইসা।
আধ পয়সা	.....	তালা পইসা।
এক আনি	.....	মিৎ আনি।
দু আনি	.....	বার্ আনি।

*　　*　　*

গাছ ..... দারে।[২৩]
মরাগাছ ..... গঃজ দারে।
বাঁশ ..... মাঃ।
ঘাস ..... ঘাঁস।
বন ..... বীর।
ঝোপ ..... পোর, লাটা।[২৪]
গুঁড়ি ..... গাঁড়িয়া।
ডাল ..... ডার।
পাতা ..... স্যাকাম্।
ফুল ..... বাহা।[২৫]
ফল ..... জ।
আঁঠা ..... লোড়ে।
শুষ্ক আঁঠা ..... গের্।
বীচি ..... জাং।[২৬]

* * *

পাহাড় ..... বুরু।
ছোট পাহাড় ..... হারা। ডুংগ্রি।
নদী ..... নাই।
খাল ..... গাজ
সমুদ্র ..... দরেয়া জালাপুরি।
পুষ্করিণী ..... পুক্রি।
গর্ত ..... ভুগা।

* * *

---

২৩. আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের যে নাম লিখিত হইয়াছে, উহার সহিত "দারে" যোগ করিলেই গাছ বুঝায়। যেমন, আমগাছ—উল্‌দারে, কাঁঠাল গাছ .... কান্‌ঠাড় দারে, শশাগাছ—তাহের দারে, ইত্যাদি। অন্যান্য কতিপয় গাছের নাম যথা—অশ্বত্থ— হেসাঃ। বট—বাড়ে। সিমুল—য়্যাদেল, শাল—সারজম। পদ্মগাছ—পয়রানি বাহা দারে। কলাগাছ— কায়রা দারে।

২৪. একটি গাছের ঝোপকে "পোর" বলা যায় এবং অনেক গাছ একত্রে যে ঝোপ হয়, তাহাকে "লাটা" বলে।

২৫. লাল ফুট .... উপাল্।
পদ্মফুল .... পয়রানি বাহা।
চাঁপা .... চাম্পা।
টগর, স্বর্ণ চাঁপা } .... তোয়া বাহা।
গাঁদা ফুল .... কুশনি বাহা।

২৬. বপন করিবার বীজ বা বীচি — ইতাঃ।

চন্দ্র ..... নিদা চাঁদো
সূর্য ..... সিন্ চাঁদো, বের।
নক্ষত্র ..... ইপিল্।
আকাশ ..... আস্‌মান্।
স্বর্গ ..... সেরমা।
মর্ত বা পৃথিবী ..... ধারতি, নোয়াপুরী।

* * *

জন্ম ..... জানাম্।
মৃত্যু ..... গঃজ।
বয়স ..... উমোর্।
নাম ..... হঁতুম্।
নামকরণ ..... ছাটিয়ার্।
বিবাহ ..... বাপ্‌লা।[২৭]
নিকা ..... সাংগা।
জাতিচ্যুত ..... অমাতিয়া।
প্রায়শ্চিত্ত ..... জমমাৎ।
শ্রাদ্ধ ..... ভাঁডান্।

* * *

অন্ধকার ..... হঁউৎ
আলো ..... মার্‌শাল্।
রৌদ্র ..... সেতম্।
বৃষ্টি ..... দাঃ।
ছায়া ..... উমুল্।
কুয়াসা ..... কুহোড়া।
মেঘ ..... রিমিল্।
বাতাস ..... হয়্।
ঝড় বৃষ্টি ..... হয়্ দাঃ।
ঠাণ্ডা ..... রেয়াড়্।
শীত ..... রাবাং।
গ্রীষ্ম ..... লল্ অ।
আগুনের উত্তাপ ..... এলাং।

* * *

---

২৭. বিবাহ করিতে যাওয়া .... বাহু মোং।

সুখ ..... সুখ।
দুঃখ ..... দুখ্।
পাপ ..... ক্বাই।
পুণ্য ..... ভাগে।
রোগ ..... আজার্।
শোক ..... কাঁহিস্।
আশা } ভরসা } ..... আশ্।
ভয় ..... বতর।
সাহস ..... দিল্।

*   *   *

ভাল ..... ভাগে। বোগি । নাপায় । বেশ্ ।
মন্দ ..... বাড়িইঃচ । বাং বেশা । বাং বোগি আ ।
ভালয় ভালয় ..... নায় নাপায়।
সত্য ..... সারি।
মিথ্যা ..... য়্যাড়ে।

*   *   *

সাদা ..... পোঁড়্।
কাল ..... হেঁদে।
সবুজ ..... হাড়িয়ার্।
লাল ..... আরাঃ।
হল্‌দে ..... শাশাং আরাঃ।

*   *   *

নূতন } টাট্‌কা } ..... নাওয়া।
কচি ..... বালে।
কাঁচা ..... বেরেল্।
পাকা ..... বেলে।
পুরাতন ..... মারে।
ভাঙা ..... রাপুৎ।
ফাটা ..... পাড়াঃ।
ছেঁড়া ..... অড়েঃচ্।

মরা ..... গঃজ্।
শুষ্ক ..... রহড়্।
ভিজা ..... লহৎ।
পচা ..... শেয়া।

*   *   *

গন্ধ ..... স
দুর্গন্ধ ..... আড়িস্ গিস্।
সুগন্ধ ..... ভবক্।

*   *   *

সরু ..... নান্‌হা।
মোটা ..... মোটা।
ভারি ..... হামাল্।
লঘু ..... রাওয়াল্।
ঘন ..... ইবিল্।
পুরু ..... দারিয়া।
পাতলা ..... এতাং।
শক্ত ..... ক্যাটেজ্।
নরম ..... লাবিঃ ইৎ।
পিছল ..... লেঞ্জেৎ।
খস্‌খসে ..... সায়গাঃৎ।

*   *   *

তিক্ত ..... হাড়্ হাঃৎ।
কষায় ..... কাষা।
লোনা ..... রাহাম্।
ঝাল ..... ঝাল্।
অম্ল ..... জজ্ অ।
মিষ্ট ..... হেড়েম্।
সুস্বাদ্ ..... সেবেল।

*   *   *

ছোট ..... হপন্। ছড়িং।
বড় ..... মারাং। হাপ্‌ড়া।
অল্প ..... কাটিইঃ।
একটু ..... কাটিঃ চুলুম্।

একটু একটু	.....	কাটিঃ কাটিইঃ।
কিছু কিছু	.....	নাসে নাসে।
বেশি / অনেক	.....	আডি।
বহুসংখ্যক / অনেকগুলি	.....	আডি উতার।
পৃথক	.....	ভিনা।
অত্যন্ত	.....	বেজাঁয়।
সমুদয়	.....	ঋত। সানাম্
আবশ্যকের অতিরিক্ত	.....	এঁয়ঃ।

*   *   *

গান	.....	সেরিং।[২৮]
বাজনা / খেলা	.....	রু।
নাচা	.....	এনেঃচ্
ঠাট্টা	.....	থুতি।
ভালবাসা	.....	দুলাড়্।
সন্তোষ	.....	কুসি।
আনন্দ	.....	রাস্কা।
ঝগড়া	.....	খাপারিও।

২৮. গান অনেক রকম আছে। নিম্নে কতকগুলি গানের নাম লিখিত হইল—

বীর সেরিং { অশ্লীল গান। যাহা বাড়িতে গাওয়া যায় না। (বীর — বন, সেরিং গান = বনের গান)

লাগ্ড়ে সেরিং — সকল সময়ে গাহিবার গান।

বাপ্‌লা সেরিং — বিবাহের গান।

তোতোঃৎ সেরিং — বীজ ভাণ্ডার গান।

রহয় সেরিং — ধান্য রোপনের গান। বর্ষাকালের গান।

হ্যাড়্‌হ্যাৎ সেরিং — নিড়ানের গান।

কারাম্ সেরিং — আশ্বিন কার্তিক মাসের গান।

সহরায় সেরিং — কালিপুজার সময়ের গান।

মাঃ মোড়ে সেরিং / বাহা সেরিং } বসন্তকালের গান।

রাগ—রাগি	.....	এন্দ্রে।
গালি	.....	এগের্।
প্রহার	.....	দাল্।
হাসি	.....	লান্দা।
কান্না	.....	রাঃ।

*   *   *

আজ	.....	তেহেং।
আজই	.....	তেহেংগি।
আগামী কল্য	.....	গাপা।
আগামী পরশু	.....	মিয়াং।
আগামী তরশু	.....	এঁদরায়।
অগামী নরশু	.....	ফের্ এঁদ্ রায়।
গতকল্য	.....	হোলা।
গত পরশু	.....	মাহেদের্।
গত তরশু	.....	অন্ মাইদের্।
সময়	.....	জোখাঃ।
বেলা	.....	বেড়া।
সকালে	.....	সেতাঃবে সেতাঃ বেড়া।
স্নানের সময়	.....	তোপন্ জোখাঃ। তোপন্ বেড়া।
জলখাবার সয়ম	.....	দাঃ হুঁউ জোখাঃ।
দুপুর বেলা	.....	তিকিন্ জোখাঃ। মাজাং বেড়া।
বৈকালে	.....	তারাসিন্।
সন্ধ্যাবেলা	.....	আয়ুব্ বেড়া।
এবেলা	.....	নোয়া বেড়া।
ওবেলা	.....	ধিনাং।

আজিকার মধ্যে কোনো সময় ..... যাঁহা তিন্।

মাস বা বছরের মধ্যে কোন্ সময় ..... যাঁহা তিস।

দিনের বেলা	.....	মারশাল জোখাঃ।
রাত্রি	.....	নিদা
দিন	.....	মাহা। দিন্।
বার	.....	হিলোঃ।
মাস	.....	চাঁদো।
বৎসর	.....	সের্মা।
আগামী বৎসর	.....	কালম্।

গত বৎসর	.....	দিন্ কালম্।
এখন	.....	নিৎ।
এখনই	.....	নিৎগি।
এখনও	.....	নিৎহঁ।
তখন	.....	উন্ জোখাঃ। উন্রে।
তখনই	.....	উন্ জোখাঃগি।
তখন ও	.....	উন্ জোখাহঁ।
সেদিন	.....	ওনাদিন্।
যে সময়	.....	যাঁহা জোখাঃ।
সৃষ্টির প্রথমে বা আদিতে	.....	সেদায়।
আগে	.....	পাহিল্ আগিল্।
পরে	.....	তায়ম্তে।
বর্তমান	.....	নাহাঃ।
ভবিষ্যৎ	.....	হাপেন্।
চুপি চুপি	.....	বাই বাই।
ধীরে ধীরে	.....	বাই বাইতে।
শীঘ্র	.....	শাট্ মেন্তে। চট্তে মে। চুরমার। হাকো পাকো। আটু পাটু
দেরিতে	.....	বিলোম্ তে।
খানিক পরে	.....	কাটিঃ ভুলুম্ তায়ম্ তে।
তারপরে	.....	আদ অ।
অনেকক্ষণ	.....	আডি ঘাড়ি।
কবে	.....	তিস্।
কখন	.....	তিরে।
চিরকাল	.....	যায়যুগ।
ইহকাল	.....	নোয়াপুরী।
পরকাল	.....	হানাপুরী।

* * *

ঐ, উহা	.....	ওনা।
এটা	.....	ওনাটা।
এই ; ইহা	.....	নোয়া। নুই।[২৯]

২৯. প্রাণীর পক্ষে "নুই" এবং ছড়পদার্থে "নোয়া" ব্যবহৃত হইবে। যেমন—এই লোক .... নুই হড়্। এই ঝুড়ি .... নোয়া ঠেকা।

ইহা ; এইটা	.....	নোয়াটা।
আর / এবং	.....	আর্।
অথবা	.....	সে।
কিন্তু	.....	মেন্খান্।
তাহা হইলে / তবে	.....	এন্ডেখান্।
বোধ হয়	.....	জানিইঃ।
কেবল	.....	এখেন্।
ও	.....	হঁ।[৩০]
ই	.....	গি।
সেজন্য	.....	ওনাতৈগি।
এত	.....	উনাঃ। নুনা।
কত	.....	তিনা।
কি	.....	চেৎ। চেলে।
কোন্	.....	ওকা।
রকম	.....	লেকা।
কোন রকম	.....	ওকা লেকা।
কি রকম	.....	চেৎ লেকা।
এইরূপ	.....	নোংকা। নোয়া লেকা।
ঐ রূপ	.....	ওন্কা। ওনা লেকা।
হাঁ	.....	হেঁ।
না .... বাং		আল্ অ। অহ ; আঊরী
কেন	.....	চেদাঃ।
ইত্যাদি	.....	এমান্।

* * *

এখানে	.....	নোডে।
সেখানে	.....	হাঁড়ে।
যেখানে	.....	যাঁহারে।
ওখানে	.....	অন্তে অন্অঁড়ে।
কোথায়	.....	ওকারে ওকাতে।

৩০. চাউলও—চাইলে হঁ। (কিন্তু চাউল ও তরকারি স্থলে—"চাউল আর উতু" বলিতে হইবে।) আমিও—ইংহঁ। আমরাও—আলেহঁ । এখন ও নিৎহঁ। ইত্যাদি।

দিক	.....	সেঃৎ।
কোন্ দিক	.....	ওকা সেঃৎ।
এদিক	.....	নতে। অন্তে।
ও দিক	.....	ওনা সেঃৎ।
কোন্ দিক দিয়া	.....	ওকা লেকাতে ওকা সেঃৎতে।
কোন্ পথে	.....	ওকা হরতে।
বামে	.....	কঁয়ে। লেংগা।
দক্ষিণে	.....	এতম্। জোজোম্।
বাঁ ধারে	.....	কঁয়ে সেঃৎ। লেংগা ধারে লেংগাতে।
ডাইন ধারে	.....	এতম্ সেঃৎ। জোজোম্ ধারে।
নীচে	.....	লাতা-র্‌রে।
উপরে	.....	চেতান্‌রে।
উচ্চস্থানে (ডাঙায়)	.....	ঘুটুরে।[৩১]
খুব্ উপরে	.....	চট্‌রে।[৩২]
সম্মুখে	.....	লাহাতে। লাহারে।
পশ্চাতে	.....	তায়ম্‌তে। তায়ম্‌রে।
নিকটে	.....	শোর্‌রে।
দূরে	.....	সাংগিংরে।
সুদূরে	.....	আডি সাংগিংরে।
সঙ্গে	.....	তুলুই। সাঁওতে।
ভিতরে	.....	ভিৎরিরে। ভিতার্‌রে।
বাহিরে	.....	টাঁডিরে।

* * *

৩১. বর্ষাকালের জমির আল বা জলের নিকটস্থ উচ্চস্থানকে "ঘুটু" বা "আড়ে ঘুটু" বলে, কিন্তু জমিতে যখন জল থাকে না, তখন আলের উপরে বলিতে "আড়ে চেতান্‌রে" হইবে।

৩২. গাছের উপরে — দারে চেতান্‌রে।
গাছের খুব উপরে — দারে চট্‌রে।
গাছের ও উপরে — দাঁরেহঁ চট্‌রে।

গণনা করা—লেখা

১.	....	মিৎ।
২.	....	বার।
৩.	....	পে।
৪.	....	পোন্।
৫.	....	মোড়ে।
৬.	....	তুরুই।
৭.	....	এয়ায়।
৮.	....	ইরাল্।
৯.	....	আরে।
১০.	....	গেল্।
১১.	....	গেল্ মিৎ।
১২.	....	গেল্ বার্।
১৩.	....	গেল্‌পে।
১৪.	....	গেল্ পোন্।
১৫.	....	গেল্ মোড়ে।
১৬.	....	গেল্ তুরুই।
১৭.	....	গেল্ এয়ায়।
১৮	....	গেল্ ইরাল।
১৯.	....	গেল্ আরে।
২০.	....	বার্ গেল ইসি।
২১.	....	বার গেল্ মিৎ।
২২.	....	বার্ গেল বার।
২৩	....	বার গেল্ পে।
২৪.	....	বার গেল্ পোন্।
২৫.	....	বার গেল মৌড়ে।
২৬.	....	বার গেল্ তুরুই।
২৭.	....	বার গেল্ এয়ায়।
২৮.	....	বার্ গেল্ ইরাল্।
২৯.	....	বার গেল্ আরে
৩০.	....	পেগেল্ মিৎ ইসি গেল্।
৩১.	....	পেগেল মিৎ।
৩২.	....	পেগেল্ বার।
৩৩.	....	পেগেল্ পে
৩৪.	....	পেগেল্ পোন্।
৩৫.	....	পেগেল্ মোড়ে।
৩৬.	....	পেগেল্ তুরুই।
৩৭.	....	পেগেল এয়ায়।
৩৮.	....	পেগেল্ ইয়াল।
৩৯.	....	পেগেল্ আরে।
৪০.	....	পোন্ গেল্। বার ইসি।
৪১.	....	পোন গেল্ মিৎ।
৪২.	....	পোন্ গেল্ বার্।
৪৩.	....	পেন্ গেল্ পে।
৪৪.	....	পোন্ গেল্ পোন্
৪৫.	....	পোন্ গেল্ মোড়ে।
৪৬.	....	পোন্ গেল্ তুরুই।
৪৭.	....	পোন্ গেল্ এয়ায়।

৩৩. বার গেল্ মিৎ (দুদশ এক) একুশ, ঐরূপ মিৎ ইসি মিৎ (এক কুড়ি এক) অর্থেও একুশ বুঝায় ২২ মিৎ ইসি বার (এক কুড়ি দুই) ২৩-মিৎ ইসি পে (এক কুড়ি তিন) ২৪-মিৎ ইসি পোন্ (এক কুড়ি চার) ইত্যাদি প্রকারেরও গণনা করা হইয়া থাকে।

৪৮. .... পোন্ গেল্ ইরাল।
৪৯. .... পোন্ গেল্ আরে।
৫০. .... { মোড়ে গেল্ । বার্ ইসি গেল।
৫১. .... মোড়ে গেল্ মিৎ।
৫২. .... মোড়ে গেল্ বার্।
৫৩. .... মোড়ে গেল্ পে।
৫৪. .... মোড়ে গেল্ পোন্।
৫৫. .... মোড়ে গেল্ মোড়ে।
৫৬. .... মোড়ে গেল্ তুরুই।
৫৭. .... মোড়ে গেল্ এয়ায়।
৫৮. .... মোড়ে গেল্ ইরাল্।
৫৯. .... মোড়ে গেল্ আরে।
৬০. .... { তুরুই গেল্ পে ইসি।
৬১. .... তুরুই গেল্ মিৎ।
৬২. .... তুরুই গেল্ বার্।
৬৩. .... তুরুই গেল্ পে।
৬৪. .... তুরুই গেল্ পোন্।
৬৫. .... তুরুই গেল্ মোড়ে।
৬৬. .... তুরুই গেল্ তুরুই।
৬৭. .... তুরুই গেল্ এয়ায়।
৬৮. .... তুরুই গেল্ ইরাল্।
৬৯. .... তুরুই গেল্ আরে।
৭০. .... { এয়ায় গেল্। পে ইসি গেল্।
৭১. .... এয়ায় গেল্ মিৎ।
৭২. .... এয়ায় গেল্ বার।
৭৩. .... এয়ায় গেল্ পে্।
৭৪. .... এয়ায় গেল্ পোন্।

৭৫. .... এয়ায় গেল্ মোড়ে।
৭৬. .... এয়ায় গেল্ তুরুই।
৭৭. .... এয়ায় গেল্ এয়ায়।
৭৮. .... এয়ায় গেল্ ইরাল্।
৭৯. .... এয়ায় গেল আরে।
৮০. .... { ইরাল্ গেল্। পোন্ ইসি।
৮১. .... ইরাল গেল্ মিৎ।
৮২. .... ইরাল গেল বার।
৮৩. .... ইরাল্ গেল্ পে।
৮৪. .... ইরাল্ গেল্ পোন্।
৮৫. .... ইরাল্ গেল্ মোড়ে।
৮৬. .... ইরাল্ গেল্ তুরুই।
৮৭. .... ইরাল গেল্ এয়ায়।
৮৮. .... ইরাল্ গেল্ ইরাল।
৮৯. .... ইরাল্ গেল্ আরে।
৯০. .... { আরে গেল্। পোন্ ইসি গেল।
৯১. .... আরে গেল্ মিৎ।
৯২. .... আরে গেল্ বার।
৯৩. .... আরে গেল্ পে।
৯৪. .... আরে গেল্ পোন্।
৯৫. .... আরে গেল্ মোড়ে।
৯৬. .... আরে গেল্ তুরুই।
৯৭. .... আরে গেল্ এয়ায়।
৯৮. .... আরে গেল্ ইরাল্।
৯৯. .... আরে গেল্ আরে।
১০০. .... শায়, মোড়ে ইসি।
২০০. .... বার শায়।
১০০০. .... গেল্ শায়।

একটা .... মিৎটাং।
দুইটা .... বায়েয়া।
তিনটা .... পেয়া।
চারিটা .... পোনেয়া।
পাঁচটা .... মোড়ে গোটাং
ছয়টা .... তুরুই গোটাং।
সাতটা .... এয়ায় গোটাং।
আটটা .... ইরাল্ গোটাং।
নয়টা .... আরে গোটাং।
দশটা .... গেল্ গোটাং।
পঁচিশটা .... বার্‌গেল্ মোড়ে গোটাং।
একা নবুইটা .... আরেগেল্ মিৎটাং।

* * *

দুই তিন .... বার্‌পে।
তিন চারি .... পে পোন্।
সাড়ে পাঁচ .... তুরুই তালা।
সাড়ে ছয় .... তুরুই তালা।
এক গন্ডা .... মিৎ গান্ডা।
দুই কুড়ি .... বার্ ইসি।
পাঁচ পন .... মোড়ে পন।
একবার .... মিৎ ধাও, মিৎ ছট্।
দুইবার .... বার্ ধাও, বার ছট
তিনবার .... পে ধাও, পে ছট্

* * *

১ম দিন .... পাইলো হিলোঃ।[৩৪]
২য় দিন .... জোসার্ হিলোঃ
৩য় দিন .... তেসার হিলোঃ।

শেষ দিন .... চাবাঃ হিলোঃ।
পরীক্ষায় ১ম.... মির্।
পরীক্ষায় ২য়.... দোজ্।
পরীক্ষায় ৩য়.... তেজ্।
নিম্ন বা শেষ.... ট্যাড়্।

* * *

অর্ধেক .... তালা।
দেড় পয়সা .... মিৎ পইসা তালা।
আড়াই পয়সা .... বাব্ পইসা তালা।
দেড় টাকা .... মিৎ টাকা তারা[৩৫]
আড়াই টাকা..... বার টাকা তারা।
তিন চারিদিন.... পে পোন্ মাহা।
পাঁচটা কাঁঠাল .... মোড়ে গোটাং কান্ ঠাড়্।
দুই শত আম .... বার শায় উল্।
একটু তামাক.... কাটিঃ চুলুম থামাকুর।

* * *

সাদা গোরু .... পোড়্ ডাংরা।
রাঙা ঘোড়া .... আরাঃ সাদম।
বড় ইঁদুর .... মারাং গোডো থাপড়া গোডো।
ছোট গাছ .... হপন দারে। কাটিইঃ দারে।
লাল ফুল .... আরাঃ বাহা।
কাল কাপড় .... হেঁদে কিচ্‌রীঃ।
ঠান্ডা বাতাস .... রেয়াড়্ হয়।
অত্যন্ত শীত .... বেঁজায় রাবাং।
ভীষণ রৌদ্র .... বেজায় সেতম্।

---

৩৪. হিলোঃ বার, যেমন-রবিবার—রবি হিলোঃ। সোমবার- সোম্ হিলোঃ।

৩৫. আধ পয়সা স্থলে "তালা" হয়, কিন্তু আধ টাকায় সময়— "তারা" বলিতে হইবে।

খুব গরম .... বেঁজায় ল্‌লঅ্।
শক্ত মাটি .... ক্যাটেজ্ হাসা।
ভাঙা ঝুড়ি .... রাপুৎ ঠেকা।
নূতন হাঁড়ি .... নাওয়া টুকুই
পুরাতন চাউল.... সারে চাউলে।
ভিজা খড় .... লহৎ বুসুব্।
সরু দড়ি .... নান্‌হা বাবের্।
মোটা বাঁশ .... মোটা মাঃ।
ছেঁড়া কাপড় .... অড়েঃচ কিচ্ রিং।
পচা মাছ .... শেয়া হাকো।
টক আম .... জজ-অ উল্।
কাল বাছুর .... হেঁদে মিহু।
কুকুর ছানা .... সেতা হপন্।
একটা লোক .... মিৎটাং হড়।
শিমুল ফুল .... য়্যাদেল্ বাহা।
মিথ্যা কথা .... য়্যাড়ে কাথা।
ভাল মানুষ .... ভাগে হড়্।
মানব জীবন .... মানুয়ী জীউই।

* * *

কাজ .... কামি্।
বেতন } .... কুড়াই।
মজুরি }
গরু চরান .... আতিইং।
চষা .... সিও।
সার ফেলা .... গুরিইঃ গিডি।
সার ছড়ান .... গুরিইঃ ছড়িয়াও।
বীজ বপন .... এর্।
রোপন .... রহয়।
জল সেচন .... দাঃ আরেজ্।
বীজ ভাঁঙা .... তোতোঃৎ।

নিড়ান .... হ্যাড়্ হ্যাৎ।
কোপান .... মাগ্।
ধান কাটা .... হোড়ো ইর্।
ধান তোলা .... হোড়ো রাকাব্।
ধান বহন করা.... হাসা গেমের্।
মাটি বহন করা.... হাসা গেমের্।
মাটি ফেলা .... হাসা গিড়ি।
খড়ের গাদা দেওয়া .... পাড়ুই ইদিয়া।
ধান ঝাড়া .... হোড়ো দাল্,
হোড়ো থাপা
ধান মাড়া .... য়্যান্।
ধান সারা .... হোড়ো এওয়েব,
হোড়োতে।
ধান মাপা .... সং
ধান বেচা .... হোড়ো আক্‌রিং
পালুই ছাওয়া.... পাড়ুই দাব্।
খড় ঝাড়া .... বুসুব্ কোটা।
ঘর ছাওয়া .... ওড়াঃ দাব্।
কাপড় বোনা.... তেঁইং।
কাপড় সেলাই করা .... রং।
ফুলের মালা গাঁথা .... (বিনাসুতায়)
খেঁজুর পাতার চেটা বোনা .... গালাং।
সুতায় মালা গাঁথা .... গুতু। হারাড়্।
তীরে বেঁধা .... হারাড়্।
লেখা .... আল্।

* * *

পরিষ্কার করা .... টাঁডি।
ঝাড়ু দেওয়া .... জগ্।
ধোওয়া .... আবুক্, আরুব্।[৩৫]

---

৩৬. হাত-পা ধোওয়া "আবুক"; কোন জিনিস ধোওয়া— "আরুব্"

বাসন মাজা .... গিতিল্।
তামাক সাজা.... থামাকুর কাসাও।
কল্কে ঝাড়া .... চিলিম্ কোটা।
ফু দেওয়া .... অং।
হাওয়া দেওয়া.... এওয়ের্।
আগুন নিভান.... ইঁড়ি ঃ চ
তামাক খাওয়া.... থামাকুর ইঁউ।
চুরট খাওয়া .... চটা ইঁউ। চুটিইঁউ
পুংগি ইঁউ।

* * *

বসা .... দুডুপ্।
দাঁড়ান } .... তেংগোন।
থামা }
অপেক্ষা করা .... হাপে, তাংগি।
শোওয়া .... গিতি ইঃচ[৩৭]
ঘুমান .... জাপিৎ।
দৌড়ান .... দ্বাড়্।
বেড়ান .... দাঁড়ান্।
গাছে উঠা .... দারে দেঃচ্।
নামা .... আঁড় গো।
কামান .... হয় অ।
অশৌচ কামান .... লপ্‌তা।[৩৮]
স্নান করা .... তোপন্। উম্।
ডুব দেওয়া .... ডুবুইঃচ্।
রন্ধন করা .... ইসিন্।
সিদ্ধ করা .... তেকে।

---

৩৭. গিতিইঃচ, ডুবুইঃচ, প্রকৃতি শব্দের শোষক্ত চ-এর উচ্চারণ অল্প হইবে।
৩৮. ছেলে হওয়ার পর নবম দিনে কামানকে "লপ্‌তা" বলে।

পোড়ান .... রাপা।
ভাজা .... আতা।
পান করা .... ইঁউ।
খাওয়া .... জম্।
খাওয়ান .... জম্ ইচ্।
মুখে তুলিয়া খাওয়ান .... আজো।
বাহ্যে করা .... দাঃ সেৎ জোং।
প্রস্রাব করা .... আড়ু জোং।

* * *

আসা .... হেইঃচ
যাওয়া .... চালাঃ। সেন্।
থাকা .... তাঁহে
ফিরে আসা .... রুয়াড়্ হিজুঃ।
ফিরে যাওয়া.... সেন্ রুয়াড়্।
পৌছান .... তিও।
লওয়া .... সাব্। হাতাও।
দেওয়া .... এম্।
চাওয়া } .... কয়।
ভিক্ষা করা }
পাওয়া .... এঁয়াম।
ডাকা .... হই।
চীৎকার করা.... কিক্ ইয়েয়াও।
বলা .... মেন্।
চুপি চুপি বলা .... খায় খয়।
বলিয়া দেওয়া } .... লাই।
নালিশ করা }
জিজ্ঞাসা করা .... কুলি।
কথার উত্তর .... মেন্ রুয়াড়্।
পাঠান .... কোল্।
আনা .... আগু।

ফেলা ছড়ান	.... গিডি। য়্যর্।
কুড়ান	.... হালাং।
তোলা	.... রাকাব্।
উপড়ান	.... তোৎ।
রাখা	.... দহ্।
বহন	.... গেমের্।
মাড়ান	.... লেবেট্।
চট্কান	.... সিপি।
মিশান	.... মিদ্।
বাঁধা	.... তল।
গিরা দেওয়া	.... গাঁট্।
দুই হস্তে ভাঙা বা দোমড়ান, মচ্কান	.... মাগ্
কাটা	.... গেঃৎ মাগ[৩৯]
মারা	.... দাল্ গঃজ্।
শিকার করা	.... সেঁদ্রা।
যুদ্ধ করা	.... লাড়হাই।
গরুতে গুঁতাগুঁতি	.... রপঃ।
পরাজিত করা	.... ভাগাও।
তাড়ান	.... লাগা, খুদাউ।
ছাড়িয়া দেওয়া	.... আড়াঃ। ছাডাও
ধরা	.... সাব্।

কামড়ান	.... গের্।
পলায়ন করা	.... দাড়্।
লুকান	.... চোকো।
গোপন করা	.... ওকো।
ঠকাইয়া লওয়া	.... য়্যাড়ে।
কথায় ঠকান	.... আৎ।
দেখা	.... ইঁয়েল্, ঞেল্।
শুনা	.... আঞোম্।
প্রবেশ করা	.... বল্অ্।
বুঝা	.... বুঝ্। বুঝাউ।
জানা	.... বাড়ায়, বাড়ায়।[৪০]
পারা	.... দাড়ে।
শিখা	.... চেঃৎ শেঁড়া।
ভুলা	.... হিড়িং।
বেচা	.... আক্রিং।
পসন্দ করা	.... কুসি।
ঘটকালি	.... রায় বার্।
নিমন্ত্রণ	.... নেওতা।
পরিবেশন	.... আঁড়তি।
পরামর্শ	.... গাল্ মারা ও
কথোপকথন	.... রপড়্।
প্রণাম	.... গঁড়।
নমস্কার	.... মোহার।

৩৯. পেঁচাইয়া কাটা—গে-ঃৎ, কোপাইয়া কাটা-ম্যপ্।

৪০. স্ত্রীলোকেরা "বাড়ায়া" বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাক্য যোজনা

আমি ; আমাকে	.... ইং।
আমার	.... ইং-আ
তুই,[৪১] তোকে	.... আম্।
তোর	.... আম্ আ।
সে; তাহাকে	.... উনি।
তাহার	.... উনি আ।
কে; কাহাকে	.... অকয়
কাহার	.... অকয় আ।
যে; যাহাকে	.... যাঁহায়
যাহার	.... যাঁহায় আ

* * *

আমরা, আমাদিগকে	.... আলে, আবো।[৪২]
আমাদের	.... আলে আ। আবো আ।

তোরা, তোদিগকে	.... আপে
তোদের	.... আপে আ।
তাহারা তাহাদিগকে	.... উন্কু
তাদের	.... উন্কু- আ।
ইহারা ইহাদিগকে	.... নুকু
ইহাদের	.... নুকু আ।
কাহারা কাহাদিগকে	.... অকয় কো।
কাহাদের	.... অকয় কো আ।
যাহারা; যাহাদিগকে	.... যাঁহায় কো।
যাহাদের	.... যাঁহায় কো আ।

* * *

আমার মা	.... এঙ্গাইং।[৪৩]
তোর মা	.... এঙ্গাম্।
তার মা	.... এঙ্গাৎ।
আমার বাবা	.... আপুইং
তোর বাবা	.... আপুম্।

৪১. আমরা সাঁওতালদিগকে "তুই" বলি তাহারাও আমাদিগকে "তুই বলে। সেজন্য এই পুস্তকে তুই, তোর প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইবে। সঙ্গমসূচক বাক্যে পার্থক্য এই রূপ—

তুই— আ।
তুমি— হো।
আপনি— গো।
রে—এয়া।
মহাশয়— বাঘা।

যথাস্থানে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

৪২. যাহার সহিত কথা হইতেছে তাহাকে ছাড়া ... আমরা .... আলে, আর তাহাকে লইয়া .... আমরা .... আবো।

৪৩. ইং আ (আমার) শব্দের শেষে বসিলে "ইং" হয়। যেমন—এঙ্গাইঃ (এঙ্গা + হং)। হপনইঃ (হপন্ + ইং) ইত্যাদি। আম আ (তোমার) পরে বসিলে—আম্, মে, উম্, ওম্, এম্, অম হয়, যেমন-এঙ্গাম্ (এঙ্গা + আম) কুড়ি হপন্ মে (কুড়ি হপন্ + মে) ইত্যাদি। উনি আ (তাহার) শব্দের শেষে বসিলে আৎ, অৎ, এৎ, ওৎ হয়। যেমন-এঙ্গাৎ (এঙ্গা + আৎ), ওড়াঃ গম্কেৎ (ওড়াংগমকে + এৎ) ইত্যাদি।

তার বাবা .... আপাৎ।
আমার খুড়া .... হুডিং আপুঁইং
তোর খুড়া .... হুডিং আপুম্।
তার খুড়া .... হুডিং আপাৎ।
আমার জ্যেঠা .... গোংগোইং।
তোর জ্যেঠা .... গোংগোম।
তার জ্যেঠা .... গোংগোৎ।
আমার স্ত্রী .... ওড়াঃ গম্‌কে ইং।
তোর স্ত্রী ....ওড়াঃ গম্‌কেম্।
তার স্ত্রী .... ওড়াঃ গংম্ কেৎ
আমার পুত্র .... হপন্‌হং
তোর পুত্র .... হপন্ মে।
তার পুত্র .... হপন্ তেৎ।
আমার কন্যা .... কুড়ি হপন্ ইং।
তোর কন্যা .... কুড়ি হপন্ মে
তার কন্যা .... কুড়ি হপন্ তেৎ
আমার ছোট ভাই .... বকহং।
তোর ছোট ভাই .... বকম্।
তার ছোট ভাই .... বকৎ।
আমার দাদা .... দাদাইং।
তোর দাদা .... দাদোম্।
তার দাদা .... দাদাৎ।

*   *   *

ইং, আম্, উমি (আমি, তুম, সে কিম্বা আমাকে, তোমাকে, তাহাকে) শব্দের মধ্যে ও অন্তে বসিলে নিম্নলিখিত রূপ রূপান্তর হয়, যথা—

ইং, মধ্যে বলিলে .... এং
আম্ মধ্যে বসিলে .... এম্, অম্ মে।
উনি মধ্যে বসিলে .... এ
ইং শেষে বসিলে .... ইং, আহং অইং।
আম্ শেষে বসিলে .... আম্। মে।
উনি শেষে বসিলে .... আয়। অয়।

যেমন-
পরশু আমি আসিব.... মিয়াং এং হিঃজুঃ আ।
পরশু আসিব আমি .... মিয়াং হিংজু আঁইং।
পরশু তুমি অসিবে.... মিয়াং এম্ হিঃজুঃ আ।
পরশু আসিবে তুমি .... মিয়াং হিঃজু আম্।
পরশু সে আসিবে .... মিয়াং এ হিঃজুঃ আ।
পরশু আসিবে সে .... মিয়াং হিঃজু আয়।

আরও—
আমি জানি .... বাড়ায় আইং, বাড়ায়পি আঁইং
তুই জানিস .... বাড়ায়াম্।
সে জানে .... বাড়ায়ায়।
আমি তোকে জানি .... বাড়ায় মেগি আঁহাং
আমি তাকে জানি .... বাড়ায় এগি আঁইং।
তুই আমাকে জানিস্ .... বাড়ায় এংগি আম্।
তুই তাকে জানিস .... বাড়ায় এগি আম্।
সে আমাকে জানে .... বড়ায় এগি আয়।
সে তোকে জানে .... বাড়ায় মেগি আয়।

*   *   *

পরশু দুজন (আমিও সে) আসিব ....মিয়াং হিঃজু আলিং মিয়াং লিং হিংজু আ।
পরশু তোরা দুজন আসিস্ .... মিয়াং হিঃজু আবেন্। মিয়াং বেন হিঃজু আ।
পরশু তারা দুজন আসিবে .... মিয়াং হিঃজু আকিন্। মিয়াং কিন্ হিঃজু আ।
উহারা দুজন আসিবে .... উন্‌কিন্ হিঃজু আ।
ইহারাই দুজন্ আসিবে .... নুকিন্ গি হিঃজুঃ আ।

পরশু আমরা (তুমি ছাড়া) আসিব .... মিয়াং হিঃজু আলে। মিয়াং লে হিঃজুঃ আ।
পরশু আমরা (তোরা ও আমি) আসিব .... মিয়াং হিঃজু আবো মিয়াং বো হিঃজুঃ আ।
তোরা আসিস্ (দুজনের বেশি) ..... মিয়াং হিংজুঃ আপে। মিয়াং পে হিঃজু আ।
তাহারা আসিবে (দুজনের বেশি) .... মিয়াং হিঃজু আকো; মিয়াং কো হিঃজুঃ আ।

কোন কোন স্থলে দ্বিত্ব বা দুই-ই হয়।
যেমন
আমরা দুজন / আমি ও তুমি } .... আলাং লাং
আমরা দুজন / আমি ও সে } .... আলিং লিং
তোরা দুজন .... আবেন্ বেন্।
তারা দুজন .... আকিন্ কিন্।
উহারা দুজন .... উন্‌কিন্ কিন্।
ইহারা দুজন .... নুকিন্ কিন্।
আমরা অনেকে (তুমি ছাড়া) } .... আলে লে্।
আমরা অনেকে তুমি সহ } .... আবো বো।
তোরা অনেকে. .... আপে পে।
তাহারা অনেকে .... আকো কো, উনুকুকো।[৪৪]
আমরা দুজন আসিব (আমি ও তুমি) } .... আলাং লাং হিঃজুঃ আ।
আমরা দুজন আসিব (আমি ও সে) } .... আলিং লিং হিঃজুঃ আ।
তোরা দুজন আসিবি .... আবেন্ বেন্ হিঃজুঃ আ।
তাহারা দুজন আসিবে .... আকিন্ কিন্ হিঃজুঃ আ।
উহারা দুজন আসিবে .... উন্‌কিন্ কিন্ হিঃজুঃ আ।
ইহারা দুজন আসিবে.... নুকিন্ কিন্ হিঃজুঃ আ।
আমরা আসিব (তুমি ছাড়া) .... আলে লে হিঃজুঃ আ।
আমরা আসিব (তুমি সহ) .... আবো বো হিঃজুঃ আ।
তোরা আসিবি .... আপে পে হিঃজুঃ আ।
তাহারা আসিবে .... { আকো কো হিঃজুঃ আ। / উন্‌কুকো হিঃজুঃ আ।

*   *   *

আমি জানি না .... বাইং বাড়ায়া।[৪৫]
তুমি জানিস্ না .... বাম্ বাড়ায়া।[৪৬]
সে জানে না .... বায় বাড়ায়া।[৪৭]
আমি ও তুই জানি না .... বাং লাং বাড়ায়া।
আমি ও সে জানি না .... বাং লিং বাড়ায়া।
তোরা দুজন জানিস না .... বাং বেন্ বাড়ায়া।
তাহারা দুজন জানে না / উহারা দুজন জানে না / ইহারা ছজন জানে না } .... বাং কিন্ বাড়ায়া।

৪৪. আকো কো — তাহারা কতক লোক। উন্‌কু কো — তাহারা সকলে। আকক বা উন্‌কুক বলা যাইতে পারে।

৪৫. "বাংইং স্থলে "বাইং" হয়।
৪৬. বাং + আম্ = বাম্।
৪৭. বাং + এ = বার। "উনি বাং বাড়ায়ায়" বলা যায়। শা অকয়ই — কেহও

আমরা জানি না (তুমি ছাড়া) .... বাং লে বাড়ায়া।
আমরা জানি না (তুমি সহ) .... বাং ব বাড়য়া।
তোরা জানিস্ না .... বাং পে বাড়ায়া।
তাহারা জানে না .... বাং কো বাড়ায়া।
কেহ জানে না .... অকয়হঁ বাং কো বাড়ায়া।
আমি পারিব না .... বাইং দাড়েয়াঃ আ।
আমি দিব না .... বাইং এমোঁঃ আ।
আমি লইব না .... বাইং হাতাও আ।
আমি যাইব না .... বাইং চালাঃ আ।
আমি আসিব না .... বাইং হিঃজুঃ আ।

* * *

তুই যাস্ না .... আলম[৪৮] চালাঃ আ।
তুই আসিস না .... আলম্ হিঃজুঃ আ।
তুই দিস্ না .... আলম্ এমোঃ আ।
তুই আনিস না .... আলম্ আগুই আ।
তুই ফেলে দিস না .... আলম্ গিডিয়া।
তুই রাগ করিস না .... { আলম্ রাগি আ। / আলম এন্দ্রে আ। }
তুই গালি দিস না .... আলম্ এগের্ আ।

* * *

দ বা দো প্রয়োগ। যথা—
এখন আমি পারিব না .... নিংদো[৪৯] বাইং দাড়েয়াঃ আ।
আজ আমি দিব না .... তেঁহেং দ বাইং এমোঃ আ।

আমি সেখানে যাব না .... হাঁড়ে দ বাইং চালাঃ আ।
তুই তাহাকে দিস না .... উনিদ আলম্ এমায় আ।[৫০]
এখানে আনিস না .... নোডেদ আলম্ আগুই আ।
সেখানে তুই যাস না .... হাঁড়েদ আলম্ চালাঃ আ।
কাল তুই আসিস না .... গাপাদ আলম্ হিঃজুঃ আ।

* * *

আছে .... মেনাঃ। হেনা ঃ[৫১]
ছিল .... তাঁহে কানা।
রহিল .... তাঁহে এনা।
নাই .... { বানু ঃ আ। বানুয়ানাং। / বানুগি আ।[৫২] }
ফুরাইল .... চাবায় এনা।
ফুরাইয়াছে .... চাবা আকানা।
সেখানে আছে .... হাঁড়ে মেনা আ।
এখানে ছিল .... নোড়ে তাঁহে কানা।
কার কাছে রহিল .... অকয় ঠেন্ তাঁহে এনা?
টাকা নাই .... টাকা বানুঃ আ।
কাপড় নাই .... কিচ্‌রীঃ বানুয়ানাং।

৪৮. আল্ অ + অম্ = আলম্, (না তুই)
৪৯. কেবল এখন দিতে পারিব না, অন্য সময়ে পারিব, আজ দিব না, অন্য সময়ে দিব, এইরূপ ভাবার্থ থাকিলে দ বা দো প্রয়োগ হয়। দ বা দো একই কথা, যেমন— নিংদ বা নিংদো।
৫০. তাহাকে দিস না বলিয়া "আলম্ এমায় আ হইয়াছে। এমঃ + আয় = এমায়
৫১. কোন কোন স্থলে (জড় পদার্থে) হেনাঃ হয়। যেমন- এখানে একটা পুকুর আছে। অন্ অঁণ্ডে মিৎটাং পুক্‌রী হেনাঃ আ।
৫২. কোন জিনিস নাই স্থলে "বানুঃ আ, বানুয়ানাং" এবং কোন প্রাণী বা লোক নাই স্থলে "বানুগি আ" হইবে। বহুবচনে "বানুকো আ' হয় যেমন- তাহারা নাই—উন্‌কুদ বানুকো আ।

বেলা নাই .... বেড়া বানুগি আ।[৫৩]
সে বাড়ি নাই .... উনিদ ওড়াঃরে বানুগি আ।
তেল ফুরাইল .... সুনুম্ চাবায় এনা।
লবণ ফুরাইয়াছে .... বুলুং চাবা আকানা।

* * *

হইবে .... হোয়ওঃ আ।
হইতেছে .... হোয়ওঃ কানা।

হইল[৫৪] .... হোয় আকানা।
হইয়াছে .... হোয় আকানা।
হইয়াছিল[৫৫] .... হোয় লেনা।
হইবে না .... বাং হোয়ওঃ আ।
হইতেছে না .... বাং হোয়ওঃ কানা।
হয় নাই .... { বাং হোয় আকানা। / আউরী হোয়ওঃ আ। }
কাল কাজ হইবে .... গাপা কামি হোয় ওঃ আ।

কি রকম হইতেছে .... চেৎ লেকা হোয়ওঃ কানা?
আজ অনেক কাজ হইল .... তেঁহেংদ[৫৬] আডি কামি হোয়এনা
এইবার ভাল হইয়াছে .... নোয়া ছট্ ভাগে হোয় আকানা
কাল অনেক বেলা হইয়াছিল .... হোলাদ আডি বেড়া হোয়লে না।
এ রকম হইবে না .... { নোয়া লেকাদ বাং হোয়ওঃ আ। / নোংকাদ বাং হোয়ওঃ আ }
কেন হইতেছে না .... চেদা বাং হোয় ওঃ কানা?
ভাল হয় নাই .... { ভাগেদ বাং হোয় আকানা / ভাগেদ আউরী হোয়ওঃ আ। }

* * *

যাইতে হইবে .... চালাও হোয়ওঃ আ
যাইতে (ই) হইবে .... { চাঃলাও হোয়ওঃ আ। / চালাও গি হোয়ওঃ আ। }
লইতে (ই) হইবে .... { সাঃব হোয়ওঃ আ / সাব্‌গি হোয়ওঃ আ।[৫৭] }

৫৩. চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এ সকল প্রাণীবাচক ধরা হয়, সেজন্য "বেড়া বা নুপি আ" হইয়াছে।
৫৪. যাহা এইমাত্র হইয়াছে।
৫৫. যাহা পূর্বে হইয়াছে।
৫৬. যাইতেই হইবে, লইতেই হইবে প্রভৃতি স্থলে বাংলায় যেখানে নিশ্চয়ার্থে ই যুক্ত হয়, সাঁওতালি ভাষায় এইরূপ স্থলে প্রথম অক্ষর জোরে উচ্চারণ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথম বর্ণে বিসর্গ যোগ হইবে, অথবা শব্দের শেষে "গি" যোগ হয়। যেমন- চালাও স্থলে চাঃলাও অথবা চালাওগি। যে শব্দ বিশেষ জরুরী বা দরকারি বুঝাইবে তাহার প্রথম বর্ণেঃ যোগ হয়। শেষে "গি" দিলে প্রথম অক্ষরে জোর বা বিসর্গ যোগ হইবে না।
৫৭. একেবারে লওয়া বুঝাইলে "হাঃ তাও হোয়ওঃ আ" অথবা "হাতাওগি হোয়ওঃ বলিতে হইবে।

আসিতে (ই) হইবে .... { হিংজু গি হোয়ওঃ আ।
হিংজুঃ গি হোয়ওঃ আ। }

আনিতে (ই) হইবে .... { আঃগু হোয়ওঃ আ।
আগুগি হোয়ও অ। }

আমার সঙ্গে যাইতে হইবে .... ইং তুলুই চাঃলাও হোয়ওঃ আ।
আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে .... ইং তুলুইগি চাঃলাও হোয়ওঃ আ।
দুইটা ঝুড়ি লইতে হইবে .... বারেয়া ঠেকা সাঃব্ হোয়ওঃ আ।
জল খাবার লইতে হইবে .... দাঃ ইউ আ হাঃতাও হোয়ওঃ আ।
ও বেলা এখানে আসিতে হইবে .... ধিনাং নোডো হিংজু হোয় ওঃ আ।
অনেক দূর হইতে জল .... আডি সাংগিং খন্ দাঃ।
আনিতে হইবে .... আঃগু হোয়ওঃ আ।

* * *

* নিশ্চয়ার্থে কতক শব্দের প্রথম অক্ষর দুইবার উচ্চরিত হয়। যেমন—জম্ স্থলে জজম্। এম্ স্থলে এএম্ উদাহরণ যথা—

খাইতে হইবে .... জজম হোয়ওঃ আ।
দিতে হইবে .... এএম্ হোয় ওঃ আ।
আজ মাঠেই ভাল খাইতে হইবে .... তেঁহেংদ মাঠ্ রেগি দাকা জজম্ হোয়ওঃ আ।
কৃষ্ণকে দুই আনা দিতে হইবে .... বার্ আমাদ কিষ্টো এএম্ হোয়ও আ।

* * *

এক মাত্র "কাতে" শব্দের যোগে সমস্ত অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাইয়া থাকে। যেমন—

যাইয়া .... চালাও কাতে। শেন্ কাতে।
আসিয়া .... হেজ কাতে।
খাইয়া .... জম্ কাতে।
লইয়া .... সাব্ কাতে। হাতাও কাতে।
বসিয়া .... দড়ুপ কাতে।
শুইয়া .... গিতিক্ কাতে।

দ্রব্যাদির দর বুঝাইতেও "কাতে" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কি দর .... তিনা কাতে?

আলু কি দরে বিক্রয় হইতেছে .... সাংদ তিনা কাতে আক্‌রিং হোয়াওঃ কানা?
কি দরে ধান বিক্রয় হইল .... তিনা কাতে হোড়ো আকরিং হোয় এনা?

* * *

কর বা করিস এই দুইটি শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ সাঁওতালি ভাষায় কিছু নাই। তবে "মে" শব্দের যোগে ঐরূপ অর্থ বুঝায়। যেমন—

কাজ কর বা কাজ করিস .... কামি মে।
রোপন কর বা রোপন করিস .... রহয়ে মে।
গ্রহণ কর বা গ্রহণ করিস .... হাতাও মে।
নালিশ কর বা নালিশ করিস .... লাইমে। ইত্যাদি।

* * *

কর, নে, যা প্রভৃতি আদশেসূচকার্থে "মে" হয়। যেমন—

কাজ কর .... কামি সে।
আয় .... হিংজুঃ মে।
ব'স .... দুডুপ্ মে।
যা .... চালাঃ মে।
দে .... এমাইং মে।
নে .... সাব্ মে। হাতাও মে।
আন .... আগুই মে।
রাখ .... দহয় মে।
বল .... মেন্ মে।
শোন .... আঞ্জোম মে।
খাও .... জম্ মে।
শোও .... গিতিঃ চ্ মে।

* * *

আ, মে, আইং আম্, আয়, এদা; কানা, কেদা, আকাদা, লেদা—এই শব্দগুলি দ্বারা করা (কর ধাতু) প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ইহারাই করা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য ক্রিয়া প্রকাশ করিতেও এইগুলি সেই সেই ক্রিয়ার সহিত যোগ হয়। যথাক্রমে ইহার উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা—

কর
করিস } .... মে।

আমি করিব	আঁইং।[৫৮]
তুই করিবি	আম্। মে।
সে করিবে	আয়।
আমি করিতেছি	কানাইং। এদাইং
তুই করিতেছিস	কানাম্। এদাম্।
সে করিতেছে	কানায়। এদায়।
আমি করিলাম	কেদাহং।
তুই করিলি	কেদাম্।
সে করিল	কেদায়।
আমি করিয়াছি	আকাদাইং।
তুই করিয়াছিস	আকাদাম্।
সে করিয়াছে	আকাদায়।
আমি করিয়াছিলাম	লেদাইং।
তুই করিয়াছিলি	লেদাম্।
সে করিয়াছিল	লোদায়।
কাজ কর	কামি মে।
একমনে কাজ করিস	মিৎ মন্‌তে কামি মে।
আমি কি করিব	চেৎ চিকায়[৫৯] আইং? চেৎ এং চিকায় আ?
তুই কি করিবি	চেৎ চিকায় আম? চেৎ এম্ চিকায় আ?
সে কি করিবে	চেৎ চিকায় আয়? চেৎ এ চিকায় আ?
আমি কাপড় সেলাই করিতেছি	কিচ্‌রীঃ এবং রঃ এদা।
তুই কি করিতেছিস	চেৎ এম্ চিকায় এদা? চেৎ চিকায় এদাম্? চেৎ এম্ ইয়া[৬০] এদা?
সে কি করিতেছে	চেৎ চিকা এদায়?

৫৮. "আঁইং"-এর "ইং" এর মত উচ্চারণ হইবে। যেমন— "আঁই"।

৫৯. "চিকায়" শব্দের অথ "কি করা"।

৬০. ইয়া অর্থে করা বুঝায়, কিন্তু ইহার ব্যবহার অতি বিরল।

তুই কি কাজ করিতেছিস	চেৎ এম্ কামি এদা? চেৎ এম্ কামি কানা? চেৎ কামি এদাম? চেৎ কামিম্[৬১] কামি এদা?
সে কি কাজ করিতেছে	উনি চেৎ কামি এদায়?
আমি তোর এত কাজ করিলাম	আম্ আ নুন কামি এং কামি কেদা।
তুই আজ অনেক কাজ করিলি	তেঁহেংদ আডিম্[৬২] কামি কেদা।
সে অতি অন্যায় কাজ করিল	উনিদ বেজাঁয় এ বাড়িঃচ্ কামি কেদা।
আমি একলাই কাজ করিয়াছি	এস্কার্‌গি এং কামি আকাদা।
তুই ভাল কাজ করিয়াছিস	ভাগে কামিম্ কামি আকাদা।
সে অনেক উপকার করিয়াছে	উনিদ আডি ভাগে আকাদায়।
আমি তার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম	উনি তুলুই এং ইয়েপেল্ লেদা[৬৩]
তুই তার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলি	উনি তুলুই এম্ খাপারিও লেদা
সে তিন দিন কাজ করিয়াছিল	উনি পে মাহা কামি লেদায়।
আয় আসিস	দেলা। হিজুঃ মে[৬৪]
আমি আসিব	হিজুঃ আইং।
তুই আসিবি	হিজুঃ আম্।

৬২. আডি + এম্ = আডিম্।

৬৩. পরস্পরের মধ্যে কোন কার্য করা বুঝাইলে, সেই ক্রিয়ার প্রথম্ অক্ষরের পর একটি প বসে এবং পূর্ব স্বরের উচ্চারণ ভেদে এ প এ অকার বা আকারাদি যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন—
দেখা—ইঁয়েল বা এঞেল।
পরস্পর দেখা বা সাক্ষাৎ করা — ইয়েপেল বা এঞেপেল।
তীরে বিদ্ধ করা—তুইং পরস্পর তীরে বিদ্ধ করা—তুপুইং।
ভাগ করা—হাটিং পরস্পর ভাগ করা—হাপাটিং।
মারা—দাল্ পরস্পর মারামারি করা—দাপাল্।
কামড়ান—গের্। পরস্পর কামড়া কামড়ি করা— গেপের।
মরা—গজ্ পরস্পর হত্যা করা—গপজ।
কিলমারা—কিলাও পরস্পর কিলাকিলি করা—কিপিলাও।

৬৪. দূর হইতে ডাকিলে "নোডে হিজুঃ মে" এবং নিকট হইতে ডাকিলে "দেলা" বা "হিজুঃমে" বলিতে হইবে।

সে আসিবে	হিজুঃ আয়।
আমি আসিতেছি	হিজুঃ কানাইং।
তুই আসিতেছিস	হিজুঃ কানাম্।[৬৫]
সে আসিতেছে	হিজুঃ কানায়।
আমি আসিয়াছি	হেজ্ আকানাইং।
তুই আসিয়াছিস	হেজ্ আকানাম্।
সে আসিয়াছে	হেজ্ আকানায়।
আমি আসিয়াছিলাম	হেজ্ লেনাইং।
তুই আসিয়াছিলি	হেজ্ লেনাম্।
সে আসিয়াছিল	হেজ্ লেনায়।
এখানে আয়	নোডে হিঃজু মে।
আমার বাড়িতে আসিস্	ইংআ ওড়াঃতে হিজুঃ মে।
আমি কাল আসিব	গাপা হিজুঃ আঁইং, গাপা এং হিজুঃ আ।
তুই কখন আস্‌বি	তিরেম্ হিজুঃ আ?[৬৬] তিরে হিজুঃ আম?
সে কখন আসিবে	তিরে এ হিজুঃ আ? তিরে হিজুঃ আয়?
আমি বাড়ি হইতে আসিয়াছি	ওড়াঃখন্ হিজুঃ কানাইং?
তুই কোথা হইতে আসিতেছিস	ওকাখন্ এম্ হিজুঃ কানা? ওকাখন্ হিজুঃ কানাম্ এয়া।
তুমি কোথা হইতে আসিতেছ	ওকাখন্ হিজুঃ কানাম্ হো?
আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন	ওকাখন্ বেন্[৬৭] হিজুঃ কানা গো?
সে মাঠ হইতে আসিতেছে	উনি মাঠ্‌থন্ হিজুঃ কানায়।
আমি এই মাত্র আসিয়াছি	নিৎগি হেজ্ আকানাইং। নিৎগি এং হেজ্ আকানা।
তুই কবে আসিয়াছিস	তিস্ এম্ হেজ্ আকানা?
সে আজ আসিয়াছে	তেঁহেং হেজ্ আকানায়। তেঁহেং এ হেজ্ আকানা।

৬৫. নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপরকে "হিজুঃ কানাম্" বলা যায় না। "হিজুঃ কানাম্ হো' অথবা "হিজুঃ কানাম্ এয়া" বলিতে হইবে।
৬৬. তিরে + এম = তিরেম্ (কখন তুই)
৬৭. সম্ভ্রমসূচক দ্বিবচনে "বেন" ব্যবহৃত হয়।

আমি দুইবার আসিয়াছিলাম	বার্ ধাও হেজ্‌লেনাইৎ। বার্ ধাও এং হেজ্‌লেনা।
তুই কখন আসিয়াছিলি	তিরেম্ হেজ্‌লেনা? তিন্‌রেম্ হেজ্ লেনা?
তোর বেহাই কালে আসিয়াছিল	হোলা বালাম্[৬৮] হেজ্ লেনায়।

* * *

বস	দুড়ুপ্ মে।[৬৯]
বসিব	দুড়ুপ্ আঁইং। দুড়ুবঃ আঁইং।
এখানে ব'স	নোডে দুড়ুপ মে।
এখানেই বসিব	নোডেপি দুড়ুবঃ আইং।
আমি বসিব না	বাং দুড়ুবঃ আঁইং। বাইং দুড়ুবঃ আ।
শোও	গিতিঃচ্ মে।
শুইব	গিতিঃচ্ আঁইং।
এখানে শোও	অন্ অঁড়ে গিতিঃচ্ মে।
ঐখানেই শুইব	অন্ অঁড়েগি গিতিঃচ্ আঁইং। অন্ অঁড়েগি এং গিতিঃচ্ আ।
আমি শুইব না	বাং গিতিঃচ্ আঁহং বাইং গিতিঃচ্ আ।
সে শুইয়াছে	গিতিঃচ্ আকানায়।

* * *

যা যাস্	চালাঃ মে্ দো।[৭০]
যাইব	চালাঃ আঁইং।
যাইবি	চালাঃ আম?[৭১]
যাইবে	চালাঃ আয়।
যাইতেছি	চালাঃ কানাইং।
যাইতেছিস	চালাঃ কানাম্।
যাইতেছে	চালাঃ কানায়।

৬৮. "বালা কোড়াম্" এর নামান্তর "বালাম্"
৬৯. আদরপূর্ব্বক বলিতে হইলে পূর্ব্বে "মা" বলিতে হয়। যেমন—মা দুড়ুপ মে" "মা সাব্ মে" "মা জম্ মে" ইত্যাদি।
৭০. বিদায় দিবার সময় যাও বলিতে হইলে "দো চালাঃ মে" বলিতে হয়
৭১. জিজ্ঞাস্য স্থলে "চালাঃ আম্" এবং আদেশসূচক "চলোঃ মে" হইবে।

গিয়াছি	....	চালাও এনাইং।
গিয়াছিস	....	চালাও এনাম্।
গিয়াছে	....	চালাও এনায়।
গিয়াছিলাম	....	দুকানাইং। শেন্ লেনাইং।
গিয়াছিলি	....	দুকানাম্।
গিয়াছিল	....	দুকানায়। শেন্ আকানায়।
গেলে পর বা যাওয়ার পর	....	চালাও এন্ খান্।
সেখানে যা	....	হাঁড়ে চালাঃ মে।
তুই আমার সঙ্গে যাস্	....	ইং তুলুই চালাঃ মে।
আমি কখন যাইব	....	তিবে এং চালাঃ আ?
তুই কবে যাবি	....	তিস্ এম্ চলোঃ আ?
সে কবে যাইবে	....	তিস্ এ চালাঃ আ?
আমরা কবে যাইব	....	তিস্ লে চালাঃ আ?
তোরা কবে যাবি	....	তিস্ পে চালাঃ আ?
তাহারা কবে যাইবে	....	তিস্ কো চালাঃ আ?
আমি সন্ধ্যার সময় তোর বাড়িতে যাইব	....	আয়ুব্ বেড়া আম্ আ ওড়াঃতে চালাঃ আইং। আয়ুব্ বেড়া আম্ আ ওড়াঃতে এং চালাঃ আ।
তুই আমার সঙ্গে যাবি	....	ইং তুলুই চালাঃ আম? উনিদ আম তুলুই চালাঃ আয়।
সে তোর সঙ্গে যাইবে	....	উনিদ আম তুলুই এ চালাঃ আ।
আমি কুটুম্ববাড়ি যাইতেছি	....	পেড়া ওড়াঃতে চালাঃ কানাইং। পেড়া ওড়াঃতে এং চালাঃ কানা।
তুই কোথায় যাইতেছিস	....	ওকাতে চালাঃ কানাম্? ওকাতে শেনঃ কানাম্? ওকাতেম্[৭২] চালাঃ কানা? ওকাতেম্ শেনঃ কানা?
সে বিবাহ করিতে যাইতেছে	....	উনিদ বাহুজোং শেনঃ কানায়। উনিদ বাহুজোং চালাঃ কানায়।
আজ সেখানে দুবার গিয়াছি (গেলাম)	....	তেহেংদ হাড়ে। বার্ ধাও চালাও এনাইং। তেঁহেংদ হাঁড়ে বার্ ধাও এং চালাও এনা।

৭২. ওকাতে + এম = ওকাতেম।

তুই কতবার গিয়াছিস (গেলি)	....	তিন্ ধাও চালাও এনাম? তিন্ ধাও এম্ চালাও এনা?
সে মাঠে গিয়াছে (গেল)	....	উনিদ মাঠ্তে চালাও এনায়। উনিদ মাঠতে এ চালাও এনা।
জলা হাটে গিয়াছে	....	জলা হাটতে চালাও এনায়। জলা হাট্তে এ চালাও এনা।
তাহারা দুজন গিয়াছে	....	চালাও এনা কিন্।[৭৩]
জলা ও তার স্ত্রী হাটে গিয়াছে	....	জলা আর্ ওড়াঃ গম্কেৎ হাটতে চালাও এনা কিন্। জলা আর্ ওড়াঃ গম কেৎ হাট্তে কিন চালাও এনা।
আমি তোদের বাড়িতে গিয়াছিলাম	....	আপে আ ওড়াঃ তে দুকানাইং। আপে আ ওড়াঃতে এং দুকানা। আপে আ ওড়াঃতে শেন্ লেনা ইং। আপে আ ওড়াঃতে এং শেন্ লেনা।
সে যাওয়ার পর আমি গিয়াছিলাম	....	উনি চালাও এন্ খান্ এং দুকানা।
তুই কোথায় গিয়াছিলি	....	ওকাতে দু কানাম্? ওকাতেম্ দুকানা?
তুই সেখানে বৈকালে গিয়াছিলি	....	হাঁড়ে তারাসিন্রে দুকনাম? হাঁড়ে তারাসিন্ রেম্[৭৪] দুকানা। তারা সিন্রে হাঁড়েম্ দুকানা।
সে কোথায় গিয়াছিল	....	ওকাতে দুকানায়?
তাহারা সকালে গিয়াছিল	....	উন্কুদ সেতাঃরে দুকানা ক। উনকুদ সেতাঃরে ক দুকানা।
আমি প্রায়ই সেখানে যাই	....	হাঁড়ে এং চালাঃ গি আ।
আমি সেখানে প্রত্যহই যাই	....	হাঁড়ে দিন্গি[৭৫] চালাঃ আঁইং হাঁড়ে দিন্গি এং চালাঃ আ।

* * *

দে দিস্	....	এমাইং মে।[৭৬]
দিব	....	এমঃ আঁইং।

৭৩. চলাও এনা + আকিন্ = চালাও এনাকিন্।
৭৪. তারা সিন্ রে + এম = তারা সিন্ রেম্।
৭৫. দিনিগ – প্রত্যহই।
৭৬. দয়া করিয়া দাও স্থলে অগ্রে "দেন" বলিতে যেমন—দেন এমাইং মে।

দিবি .... এমঃ আম্?
দিবে .... এমঃ আয়।
দিতেছি .... এমঃ কানাইং।
দিতেছিস .... এমঃ কানাম?
দিতেছে .... এমঃ কানায়।
দিলাম .... এম্ কেদাইং।
দিলি .... এম্ কেদাম্?
দিল .... এম্ কেদায়া।
দিয়াছি .... এম্ আকাদাইং।
দিয়াছিস্ .... এম্ আকাদাম্।
দিয়াছে .... এম্ আকাদায়।
দিয়াছিলাম .... এম্ লেদাইং।
দিয়াছিলে .... এম্ লেদাম্।
.... এম্ লেদায়।

সব টাকা আমাকে দে .... ধতঃ টাকা এমাইং মে।
তুই এই টাকা চাঁদুকে দিস্ .... নোয়া টাকাদ[৭৭] চাঁদু এমায়[৭৮] মে।
পরশু তোকে টাকা দিব .... মিয়াং রে[৭৯] আম্ টাকা এমঃ আঁইং মিয়াং রে টাকা এমাম্[৮০] আঁইং।
তুই কাল টাকা দিবি .... গাপা টাকা এমঃ আম?
সে আজ না হয় কাল টাকা দিবে .... তেঁহেং সে গাপা টাকা এমঃ আয়? তেঁহে বাংখান গাপা[৮১] টাকা এমঃ আয়।
আজ এই এক টাকা দিতেছি .... তেঁ হেংদে নোয়া মিৎ টাকা এমঃ কানাইং। তেঁহেংদ নোয়া মিৎ টাকা এং এমঃ কানায়।
কাহাকে টাকা দিতেছিস .... { অকয় টাকা এমঃ কানাম? / অকয় টাকাম[৮২] এমঃ কানা?
সে টাকা দিতেছে .... { উনিদ টাকা এমঃ কানায়। / উনিদ টাকায় এমঃ কানা।[৮৩]

---

৭৭. কেবল এই টাকা বলিয়া "নোয়া টাকাদ" (দ) হইয়াছে।
৭৮. চাঁদু ৩য় পুরুষ, সেজন্য "আয়" যোগে "এমায়" হয়। এম + আয় এমায়।
৭৯. পরশু নিশ্চয় টাকা দিব স্থলে "মিয়াংরে" এবং পরশুর মধ্যে টাকা স্থলে মিয়াংতে হয়। নিশ্চয়ার্থে "রে" এবং সংশয়ার্থে "তে" হইবে।
৮০. এম + আম = এমাম্।
৮১. আজ না হয় কাল, বলিতে "তেঁহেং বাংখান্ গাপা" হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস্য স্থলে "তেঁহেং সে গাপা" হইবে।
৮২. টাকা + এম = টাকাম্।
৮৩. টাকা + আয় = টাকায়।

আমি এখনই টাকা দিলাম .... নিৎগি টাকা এম্ কেদাইং। নিৎগি টাকা এং এম্ কেদা।
তুই এখনই টাকা দিলি .... { নিৎগি টাকা এম্ কেদাম? / নিৎগি টাকাম্ এম্ কেদা।
সে এখনই টাকা দিল .... নিৎগি টাকা এম্ কেদায়। নিৎগি টাকায় এম্ কেদা।
পরশু টাকা দিয়াছি .... সাহেদেরেরে টাকা এম্ আকাদাইং। মাহেদেররে টাকা এং এম্ আকাদা।
পরশু তোকে ৫ টাকা দিয়াছি .... মাহেদের্রে মোড়ে টাকা এবং আকাও ওয়াৎ মে আ[৮৪]
পরশু তাহাকে ৫ টাকা দিয়াছি .... মাহেদের্রে মোড়ে টাকা এং এম্ আকাও আদে আ।[৮৫]
কাহাকে টাকা দিয়াছিস .... অকয় টাকাম্ এম্ আকাও আদে আ?
কাল তুই ৫ টাকা আমাকে দিয়াছিস .... হোলা আম্ মোড়ে টাকাম্ এম্ আকাও আদেং আ।[৮৬]
আজ সে ১০ টাকা আমাকে দিয়াছে .... তেঁহেং উনি গেল্ টাকায় এম্ আকাও আদিং আ।
আজ সে ৩ টাকা তোকে দিয়াছে .... তেঁহেং উনি পে টাকায় এম্ আকাও ওয়াৎ মে আ।
ধান কাটার সময় ২ টাকা দিয়াছিলাম .... হোড়ো ইর্ জোখাঃ বার্ টাকা এম্ লেদাইং। হোড়ো ইর্ জোখাঃ বার্ টাকা এং এস্লেদ।
তুই টাকা দিয়াছিলি .... { আম টাকা এম্ লেদাম্? / আম্ টাকাম্ এম্ লেদা।
তুই কাহাকে টাকা দিয়াছিলি .... আম্ অকয় টাকাম্ এম আদে আ?
সে টাকা দিয়াছিল .... উনি টাকা এম্ লেদায়।
সে তোকে টাকা দিয়াছিল .... উনি আম্ টাকা এ এম্ আদ্ মে আ।
আজ টাকা দিতে পারিব না .... তেঁহেং টাকা অহ এং এম্ দাড়েয়া আ।

* * *

---

৮৪. তোমাকে দিয়াছিলাম বলিতে হইলে "এম্ আকাও ওয়াৎ মে আ" বলিতে হইবে "ওয়াৎ" উচ্চারণ করিবার সময় "আৎ" হইয়া যায়।
৮৫. আৎ + এ = আদে।
৮৬. আৎ + ইং = আদিং।

দিয়া আসিব	....	ইদি হটকাঃ আইং।
দিয়া আসিবি	....	ইদি হটকাঃ আম?
দিয়া আসিবে	....	ইদি হটকাঃ আয়।
দিতে যাইতেছি	....	ইদি হটকাঃ চালাঃ কানাইং। ইদি হটকাঃ এং চালাঃ কানা।
দিতে যাইতেছিস	....	ইদি হটকাঃ চালাঃ কানাম্? ইদ হটকাঃ এম্ চালাঃ কানা।
দিতে যাইতেছে	....	ইদি হটাকাঃ চলাঃ কানায়। ইজি হটকার এ চালাঃ কানা। ইদি হটয়[৮৭] চালাঃ কানা।
দিয়া আসিয়াছি	....	ইদি হট আকাদাইং।
দিয়া আসিয়াছিল	....	ইদি হট আকাদাম্?
দিয়া আসিয়াছে	....	ইদি হট আকাদায়।
কাল টাকা দিয়া আসিব	....	গাপা টাকা ইদি হটাকার আঁইং।
কখন টাকা দিয়া আসিবি	....	তিরে টাকা ইদি হটাকাঃ আম্?
আজ টাকা দিয়া আসিবে	....	তেঁহেং টাকা ইদি হটকাঃ আয়।
আমি জলখাবার দিতে যাইতেছি	....	দাঃ ইউআ ইদি হটকাঃ চালাঃ কানাইং। দাঃ ইঁউ আ ইদি হটকাঃ এং চালাঃ কানা।
তুই জলখাবার দিতে যাইতেছিস	....	দাঃ ইঁ উআ ইদি হটকাঃ চালাঃ কানাইং। দাঃ ইঁউ আ ইদি হটকাঃ এং চালাঃ কানা।
সে জলখাবার দিতে যাইতেছে	....	দাঃ ইউ আ ইদি হটকা চালাঃ কানায়। দ্বাঃ ইউ আ ইদি হটকাঃ এ চালাঃ কানা।
টাকা দিয়া আসিয়াছি	....	টাকা ইদি হট আ কাদাইং। টাকা এং ইদি হট আকাদা।
তোর ভাইকে টাকা দিয়া আসিয়াছি	....	বকম্ টাকা ইদিহট আকাও আদে আঁহং।
তুই কুড়ুল দিয়া আসিয়াছিস	....	টাঙ্গা ইদিহট আকাদাম? টাঙ্গাম্ ইদিহট আকাদা?
যে জলখাবার দিয়া আসিয়াছে	....	উনি দাঃ ইঁউআ ইদিহ'ট আকাদায়। উনি দাঃ ইঁউ আ এ ইদিহট আকাদা।

*   *   *

নে	....	সাব্ মে্ হাতাও মে।[৮৮]
লইব	....	সাব্ আঁইং। হাতাও আঁইং।

৮৭. হট + এ + হটয়। পুনরায় ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা না থাকিলে "কাঃ" যোগ হয় না।

৮৮. একেবারে লওয়া "হাতাও" আর সঙ্গে লওয়া বুঝাইলে "সাব" বলিতে হইবে।

লইবি	....	সাব আম্? হাতাও আম্?
লইবে	....	যাব্ আয়। হাতাও আয়।
লইতেছি	....	স্যাব্ এদাইং সাসাব্ কানাইং[৮৯] হাতাও এদাইং। হাঃতাও কনাইং।
লইতেছিস	....	সাব্ এদাম? সাসাব্ কানাম্? হাতাও এদাম। হাঃতাও কানাম?
লইতেছে	....	হাতাও এদায়, সাসাব্ কানায়। হাতাও এদায়। হাঃতাও কানায়।
লইয়াছি	....	সার আকাদাইং। হাতাও আকাদাইং।[৯০]
লইয়াছিস্	....	সার আকাদাম্। হাতাও আকাদাম্।
লইয়াছে	....	সার আকাদায়। হাতাও আকাদায়।
লইয়াছিলাম	....	সাব্ লেদাইং। হাতাও লেদাইং।[৯১]

৮৯. বর্তমানকাল বুঝাইতে অর্থাৎ লইতেছি, আনিতেছি, বলিতেছি প্রভৃতি স্থলে "এদা" ও "কানা" যোগ হয়। এদা যোগে শব্দের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কানা যোগ হইলে শব্দের রূপান্তর হইয়া থাকে, কতকগুলি ক্রিয়াবাচক শব্দের প্রথম অক্ষরে বিসর্গ যোগ এবং কতকগুলির প্রথম অক্ষর দুইবার উচ্চারিত হয়। নিম্নে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল—

(প্রথম অক্ষরে ঃ যোগ)
আগু + কানা = আঃগু কানা।
হাতাও + কানা – হাঃতাও কানা।
দহ + কানা – দঃহ কানা।
(প্রথম অক্ষর দুইবার উচ্চারণ)
সাব্ + কানা = সাসাব্ কানা।
শেঁড়া + কানা – শেঁশেঁড়া কানা।
(প্রথম অক্ষর দুইবার উচারণ আবার প্রথম অক্ষরে ঃ (যোগ)
মেন্ + কানা – মেমেন্ কানা।

যেখানে ক্রিয়াবাচক শব্দের শেষে হসন্ত থাকে, সেখানে শেষ অক্ষরে বিসর্গ যোগ হয়।
যেমন— শেন্ + কানা – শেনঃ কানা।
এম্ + কানা – এমঃ কানা।

যেখানে স্বভাবতঃই বিসর্গ আছে, যেখানে কোন পরবির্ত্তন হয় না। যথা—
চালাঃ + কানা – চালাঃ কানা।
চেঃৎ + কানা – চেংৎ কানা।

৯০. অনেকক্ষণ হইল লইয়াছি "হাতাও আকাদাইং" এবং একটু পূর্বে বা এইমাত্র লইয়াছি স্থলে "হাতাও কেদাইং" হইবে্ ঐরূপে "হাতাও আকাদাম্" ও "হাতাও আকাদায় 'স্থলে' "হাতাও কেদাম" ও "হাতাও কেদায়" হইবে।

লইয়াছিলি	....	সাব্ লেদাম্। হাতাও লেদাম্।
লইয়াছিল	....	সাব্ লেদায়্। হাতাও লেদায়।
একখানা কোদাল নে	....	মিৎটাং কুড়ি সাব্ মে।
ঝুড়িটাও নে	....	ঠেকাইঁ সাব্ মে।
পয়সা নে	....	পইসা হাতাও মে।
আমি দেশালাই লইব	....	ইং‌দ সেংগেল খাড়ি সাব্ আঁইং ইং‌দ সেংগেল খাড়ি এং সাব্ আ।
তুই তামাক লইবি	....	আম্‌দ থামাকুর এম্ হাতাও আম? আম্‌দ থামাকুর এম্ হাতাও আ?
সে কোদাল লইবে	....	উনিদ কুড়ি সাব্ আয়। উনিদ কুড়ি এ সাব্ আ
আমি কাস্তে লইতেছি	....	ইং‌দ দাঁৎরোম্ সাব এদাইং। ইং‌দ দাঁৎরোম্ এং সাব্ এদা। ইং‌দ দাঁৎবোম্ সাসাব্ কানাইং। ইং‌দ দাঁৎরোম্ এং সাসাব্ কানা[৯২]
তুই কি লইতেছিস	....	আ ম্‌দ চেৎ সাব্ এদাম্? আম্‌দ চেৎ এম্ সাব্ এদা? আম্‌দ চেৎ সাসাব্ কানাম্? আম্‌দ চেৎ এম্ সাসাব্ কানামা? আম্‌দ চেৎ এম সাসাব কানা? চেৎ হাতাও এদাম? চিৎ হাতাও এদাম? চেৎ এম হাতাও এদা? চেৎ হাঃতাও কানাম্? চেৎ এম্ হাঃতাও কানা?
সে চাউল লইতেছে	....	উনিদ চাউলে হাঃতাও এদায় উনিদ চাউলে এ হাতাও[৯৩] এদা। উনিদ চাউলে হাঃতাও কানায়। উনিদ চাউলে এ হাঃতাও কানা।

৯১. বহুদিন পূর্বে লওয়া বুঝাইতে "লেদা" বলিতে হয়।
৯২. এইরূপে "হাতাও" শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে।
৯৩. চাউল অপরের জন্য লইতেছে হইলে "হাতাও" স্থলে "সাব" বলিতে হইবে।

আমি দড়ি লইয়াছি	....	ইং‌দ বারেব্ হাতাও আকাদাইং। ইং‌দ বারের্ এং হাতাও আকাদা। ইনদ বারের সাব্ আকাদাইং। ইং‌দ বারের্ এং সাব্ আকাদা।
তুই মই লইয়াছিস	....	আঁড়্ গোম্ সাব্ আকাদাম্? আঁড়্ গোম্ এম্ সাব্ আকাদা।
সে জলখাবার লইয়াছে	....	উনিদ দাঃ ইউ্ আ হাতাও আকাদায়। উনিদ দাঃ ইঁউ আ এ হাতাও আকাদা।
তাহারা জলখাবার লইয়াছে	....	উন্‌কুদ দাইঁউআ সাব্ আকাদাকো। উনকুদ দাঁইঁ উআ কো সাব্ আকাদা। উন্‌কুদ দাঃ ইঁ উআ হাতাও আকাদাকো। উন্‌কুদ দাঃ ইঁ উআ কো হাতাও আকাদা।
আমি টাকা লইয়াছিলাম	....	ইং‌দ টাকা হাতাও লেদাইং। ইং‌দ টাকা এং হাতাও লেদা।
তুই কাপড় লইয়াছিলি	....	আম্‌দ কিচ্‌রীঃ হাতাও লেদাম? আম্‌দ কিচরীঃ এম হাতাও লেদা।
সে চাউল লইয়াছিল	....	উনিদ চাউলে হাতাও লেদায়। উনিদ চাউলে এ হাতাও লেদা।

* * *

আন	....	আগুই মে।[৯৪]
আনিব	....	আগুই আঁইং। ইং এং আগুই আ।[৯৫]
আনিবি	....	আগুই আম? আগুই মে।[৯৬] আম্ এম্ আগুই আ।
আনিবে	....	আগুই আয়। উনি এ আগুই আ।
আমরা দুজনে আনিব (আমি ও তুমি)	....	আলাং লাং আগুই আ।
আমরা দুজনে আনিব (আমি ও সে)	....	আলিং লিং আগুই আ।

৯৪. "মা আগুই মে" বলা যায়।
৯৫. অপরে আনিবে না, আমিই আনিব, এইরূপ স্থলে "ইং এর আগুই আ" হইবে।
৯৬. জিজ্ঞাস্য স্থলে "আগুই আম্" এবং আদেশ সূচকে "আগুই মে" হয়।

আমরা আনিব (অনেকে)	আবো বো আগুই আ।
তোরা আনিবি (দুজনে)	আবেন্ বেন্ আগুই আ।
তোরা আনিবি (অনেকে)	আপে পে আগুই আ।
তাহারা আনিবে (দুজনে)	আগুই আকিন্। উনকিন্ কিন্ আগুই আ।
তাহারা আনিবে (অনেকে)	আগুই আকো। উন্‌কুকো আগুই আ।
আমি আনিতেছি	আগু এদাইং আঃগু কানাইং।
তুই আনিতেছিস	আগু এদাম্ আঃগু কানাম্।
সে আনিতেছে	আগু এদায় আঃগু কানায়।
আমি আনিয়াছি	আগু আকাদাইং। ইং এং আগু আকাদা।[৯৭]
তুই আনিয়াছিস	আগু আকাদাম্। আম্ এম্ আগু আকাদা।
সে আনিয়াছে	আগু আকাদায়। উনি এ আগু আকাদা।
তাহারা আনিয়াছে	আগু আকাদা কো। উনকুকো আগু আকাদা।
আমি আনিয়াছিলাম	আগু লেদাইং।
আমিই আনিয়াছিলাম	ইং এং আগু লেদা। ইংগি এং আগু লেদা।
তুই আনিয়াছিলি	আগু লেদাম্।
তুইই আনিয়াছিলি	আম্ এম্ আগু লেদা্। আম্‌গি এম্ আপু লেদা।
সে আনিয়াছিল	আগু লেদাকো।
তাহারাই আনিয়াছিল	উনকুকো আগুলেদা। উন্‌কুগিকো আগুলেদা।
আজ তোদের জন্য মুড়ি মুড়কী আনিব	তেঁহেং আপে লাগিঃৎ খাজাড়ী মুড়কী আগু আইং। তেঁহেং আপে লাগিঃৎ খাজাড়ী মুড়্‌কী ইং এং আগুই আ।
আমার ঝুড়িটা তুই আনিবি....	ইং আ ঠেকা আগুই আম্? ইংআ ঠেকাম্[৯৮] আগুই আ।
আমার ছেলে জলখাবার আনিবে	হপন্‌ইং দাঃ ইউ আ আগুই আয়। হপ্‌নইং দাঃ ইঁউ আ এ আগুই আ।

৯৭. আমিই আনিয়াছি আর কেহ আনে নাই, এইরূপ উত্তর দিবা সময় "ইং এং আগু আকাদা" হয়।
৯৮. ঠেকা + এম্ = ঠেকাম।

একখানা কলাপাতা আন	মিৎটাং কায়রা স্যাক্বাম্ আগুই মে।
তুই জল আন	দাঃ আগুই মে।
তোরা জল আন	দাঃ আগুই পে।
পুকুর হইতে জল আন	পুক্‌রী খন্ দাঃ লো[৯৯] আগুই মে।
কলসী হইতে জল আন	কান্‌জ খন্ দাঃ তাং[১০০] আগুই মে।
আমি একটা জিনিস আনিতেছি	ইংদ মিংটাং জিনিস।[১০১] আগু এদাইং ইংদ মিংটাং জিনিস এং আগুএদা। ইংদ মিৎটাং জিনিস আঃগু কানাইং। ইংদ মিৎটাং জিনিস এং আঃগু কানা।
তুই কি আনিতেছিল	আম্‌দ চেৎ আগু এদাম্? আম্‌দ চেৎ এম্ আগু এদা? আম্‌দ চেৎ আঃগু কানাম্? আম্‌দ চেৎ এম্ আঃগু কানা?
সে মাদল আনিতেছে	উনিদ (শা)[১০২] তুম্‌দা আগু এদায়। উনিদ তুম্‌দা এ আগু এদা। উনিদ তুম্‌দা আঃগু কানায়। উনিদ তুম্‌দা এ আঃগু কানা।
আমি দুই টাকা আনিয়াছি	বার্ টাকা আগু আকাদাইং। বার টাকা এং আগু আকাদা বার্ টাকা ইং এং আগু আকাদা।
তুই মাছ আর তরকারি আনিয়াছিস	হাকো আর উতু আগু আকাদাম্? হাকো আর উতু এম্ আগু আকাদা। হাকো আর উতু আম্ এম্ আগু আকাদা।
সে চাউল আর কাঠ আনিয়াছে	উনিদ চাউলে আর সাহান্ আগু আকাদায় উনিদ চাউলে আর্ সাহান্ এ আগু আকাদা। চাউলে আর সাহান উনি এ আগু আকাদা।
তাহারা পাঁচুই মদ আর ছোলাভাজা আনিয়াছে	উন্‌কুদ থান্‌ডি আর ছোলা আতা আগু আকাদাকো। উন্ কুদ হান্‌ডি আর ছোলা আতা কো আগু আকাদা। হান্‌ডি আর ছোলা আতা উন্‌কুকো আগু আকাদা।

* * *

৯৯. পাত্র ডুবাইয়া তরল পদার্থ তোলো বা জলাশয় হইতে জল তোলো—"লো"।
১০০. কোন পাত্র হইতে তরল পদার্থ তালো "তাং"।
১০১. জিনিস—জিনিস, দুরিব, বাসুৎ।
১০২. (শা) গনেশ মাদল আনিতেছে বলিতে হইলে উনিদ "স্থলে" গান্‌শাদ" হইবে। যেমন—গান্‌শাদ তুমুদা—আগু এদায়। ইত্যাদি।

রাখ, রাখিস	....	দহয় মে।
রাখিয়াছি	....	দহ আকাদাইং। এং দহ আকাদা।
রাখিয়াছিস	....	দহ আকাদাম? এম্ দহ আকাদা।
রাখিয়াছে	....	দহ আকাদায়? এ দহ আকাদা।
রাখিয়াছিলাম	....	দহ লেদাইং এং দহ লেদা।
রাখিয়াছিলি	....	দহ লেদাম? এ দহ লেদা।
রাখিয়াছিল	....	দহ লেদা? এ দহ লেদা।
রাখিব	....	দহয় আঁইং এং দহয় আ।
রাখিবি	....	দহয় আম? এম্ দহয় আ।
রাখিবে	....	দহয় আয়? এ দহয় আ।
রাখিতেছি	....	দহ এদাইং। এং দহয় এদা। দঃহ কানাইং দঃহ কানা।
রাখিতেছিস	....	দহ এদাম্ এম্ দহ এদা। দঃহ কানায়? এম্ দঃহ কানা।
রাখিতেছে	....	দহ এদায়। এ দহ এদা। দঃহ কানায়? এ দঃহ কানা।
রাখিলাম	....	দহ কেদাইং। এং দহ কেদা।
রাখিলি	....	দহ কেদাম্? এম্ দহ কেদা।
রাখিল	....	দহ কেদায়? এ দহ কেদা।
ঐ আলের উপর রাখ	....	ওনা আড়ে চেতান্‌রে দহয় মে।
ভাল করিয়া রাখিস	....	বেশ্ লেকা কাতে দহয় মে।
তার সম্মুখে রাখিয়াছি	....	উনি আ লাহারে (সামাংরে) দহ আকাদাইং। উনি আ লাহারে (সামাংরে) এং দহ আকাদা।
কোথায় রাখিয়াছিলি	....	ওকারে দহ আকাদাম্? ওকারে এম্ দহ আকাদা?
ঐখানে রাখিয়াছে	....	অঁন্ অঁড়ে দহ আকাদায়। অঁন্ অঁড়ে এ দহ আকাদা।
নারানের মায়ের কাছে রাখিয়াছিলেন	....	নারান এঙ্গাৎ ঠেন্ দহ লেদাইং নারান এঙ্গাৎ ঠেন্ এং দহ লেদা।
তুই ঝুড়ি কোথায় রাখিয়াছিলি	....	ঠেকাদ ওকারে দহ লেদাম্? ঠেকাদ ওকারে এম্ দহ লেদা?
সে ঘরের ভিতরে ধান রাকিয়াছিল	....	উনিদ ওড়াঃ ভিৎরিরে হোড়ো দহ লেদায়। উনিদ ওড়াঃ ভিৎরিরে এ হোড়ো দহ লেদা।

আমি মনে রাখিব	....	মন্‌রে দহয় আঁইং। মন্টরে এং দহয় আ।
তুই মনে রাখিবি	....	মন্‌রে দহয় আম্? মন্‌রে এম্ দহয় আ। মন্‌রে দহয়মে।
সে অনেক দিন মনে রাখিবে	....	উনিদ আড়ি দিন মন্‌রে দহয় আয়। উনিদ আড়ি দিন্ মনরে এ দহয় আ।
আমি ধীরে ধীরে রাখিতেছি	....	ইংদ বাইবাইতে দহ এদাইং ইংদ বাই বাইতে এং দই এদা। ইংদ বাইবাই তেগি দঃহ কানাইং। ইংদ বাইবাইতেগি এং দঃহ কানা।
তুই খুব তাড়াতাড়ি রাখিতেছিস	....	আম্‌দ বেজাঁয় চুর্‌মার কাতে দহ এদাম্ আমদ বেজায় চুর্‌মার কাতে দঃহ কানাম? আম্‌দ বেজায় চুর্‌মার কাতে এম্ দঃহ কানা।
সে কেমন আস্তে আস্তে রাখিতেছে	....	উনিদ চেৎলেকা বাইবাইতে দহ এদায়। উনিদ চেৎলেকা বাইবাইতে এ দহ এদা। উনিদ চেৎলেকা বাইবাইতে দঃহ কানায়। উনিদ চেৎলেকা বাইবাইতে এ দঃহ কানা।
আমি এই মাত্র এখানে পয়সা রাখিলাম	....	ইংদ নিৎগি নোতে পইসা দহ কেদাইং ইংদ নিৎগি নোড়ে পইসা এং দহ কেদা।
এখানে তুই কখন রাখিলি	....	নোড়ে আম্‌দ তিরে দহ কেদাম্ আম্‌দ নোড়ে তিরেম্ দহ কেদা।
সে এখানে রাখে নাই	....	উনিদ নোড়ে বাং দহ আকাদায়। উনিদ নোড়ে বাং এ দহ আকাদা।

* * *

বল্	....	মেন্ মে
বলিস	....	মেতায় মে।
বলিয়াছি	....	মেন্ আকাদাইং।
বলিয়াছিস	....	মেন্ আকাদাম্?[১০৩]
বলিয়াছে	....	মেন্ আকাদায়।
বলিলাম	....	মেন্ কোদাইং।
বলিলি	....	মেন্ কেদাম?
বলিল	....	মেন্ কেদায়।
বলিয়াছিলাম	....	মেন্ লেদাইং।

১০৩. প্রশ্নে "মেতাদে আম?" হয়।

বলিয়াছিলি .... মেন্ লেদাম্?

বলিয়াছিল .... মেন্ লেদায়।

বলিব .... মেন্ আঁইং।

বলিবি .... মেম্ আম?

বলিবে .... মেন্ আয়।

বলিতেছি .... মেন্ এদাইং। মেনেন্ কানাইং।

বলিতেছিস .... মেন্ এদাম্? মেমেন্ কানাম্?

বলিতেছে .... মেন্ এদায়। মেমেন্ কানায়।

সত্য কথা বল .... সারি কাথা মেন্ মে্। সারি কাথা বড় মে্।

ঠাকুরদাসকে বলিস .... ঠাকুরদাস মেতায় মে্।

আমি অনেকবার বলিয়াছি .... ইং আডি ধাও মেন্ আকা দাইং। ইং আডি ধাও এং মেন্ আকাদা।

আমি তাহাকে অনেকবার বলিয়াছি .... ইং আডি ধাও উনি মেন্ আকাও আদে আ।[১০৪]

তুই এই কথা বলিয়াছিস .... আম্ নোয়া কাথা মেন্ আকাদাম? আম্ নোয়া কাথা এম্ মেন্ আকাদা।

তুই তাহাকে কি বলিয়াছিস .... উনি চেৎ মেতা দে আম? আম্ উনি চেৎ এম্ মেতা দে আ।

সে এই কথা বলিয়াছে .... উনি[১০৫] নোয়া কাথা মেন্ আকাদায়। উনি নোয়া কাথা এ মেন্ আকাদা।

সে আমাকে সকল কথা বলিয়াছে .... উনি সানাম্ কাথা এ মেতাদিং আ। উনি সানাম্ কাথা এ মেন্ আকাও আদিং আ।[১০৬]

সে তোকে সকল কথা বলিয়াছে .... উনি সানাম্ কাথা আম্ এ মেতাৎ মে আ। উনি সানাম্ কাথা আম্ এ মেন্ আকাও ওয়াৎ মে আ।

আমি সকল কথাই বলিলাম .... ইংদ সানাম্ কাথাগি মেন্ কেদাইং। ইংদ সানাম্ কাথাগি এং মেন্ কেদা।

---

১০৪. তাহাকে বলিয়াছি সে জন্য "মেন্ আকাও আদে আ।"

১০৫. এই লোক বা নিকটস্থ লোক বুঝাইলে "উনি" স্থলে "নুই" বলিতে হইবে।

১০৬. আমাকে বলিয়াছে, সেজন্য "এ মেতাদিং আ" অথবা "এমেন্ আকাও আদিং আ।"

তুই কেমন করিয়া এমন কথা বলিলি .... আম্ চেৎ লেকাতে নোয়া লেকা কাথাদ মেন্ কেদাম? আম্‌দ চেৎ লেকাতে নোয়া লেকা কাথা এম্ মেন্ কেদা?

সে কত কথাই বলিল .... উনিদ তিনা কাথাগি মেন্ কেদাম্। উনিদ তিনা কাথাগি এ মেন্ কেদা।

আর দুজন লোক আনিতে বলিয়াছিলাম .... আর বার্ হড় আগুই মেন লেদাইং। আর বার্ হড় আগুই এং মেন্ লেদা।

তুই আনিবি বলিয়াছিলি .... আম্ এম্ আগুই মেন্ লেদামত। আম্ এম্ আগুই আ এম্ মেন্ লেদা।

সে আসিবে না বলিয়াছিল .... উনিদ বায় হিজুঃ আ মেন্ লেদায়। উনিদ বায় হিজুঃ আ এ মেন্ লেদা

তোর সঙ্গে আমি সাঁওতালি কথা বলিব .... আম্ তুলুই হড়তে এং রড় আ।[১০৭]

আমার সঙ্গে তুই তঁ সাঁওতালি কথা বলিবি .... ইং তুলুই হড়তে এম্ বড় আ।

তোর সঙ্গে সে সাঁওতালি কথা বলিবে .... আম তুলুই হড়তে এ রড় আ।

আমি তোকে বলিতেছি .... ইং আম এং মেতাম্ কানা।[১০৮]

তুই কি বলিতেছিস .... চেৎ মেন্ এদাম? চেৎ এম্ মেন এদা? চেৎ মেমেন্ কানাম্? চেৎ এম্ মেমেন্ কানা?

সে ভালই বলিতেছে .... উনিদ ভাগে গি মেন্ এদায়। উনিদ ভাগে গি এ মেন্ এদা। উনিদ ভাগে গি মেমেন্ কানায়। উনিদ ভাগেগি এ মেমেন কানা।

শেখ, শিখিস .... শেঁড়ায় মে। চেঃৎ মে।

শিখিয়াছি .... শেঁড়া আকাদাইং। এং শেঁড়া আকাদা। চেঃৎ আকাদাইং এং চেৎ আকাদ।

শিখিয়াছিস .... শেঁড়া আকাদায়? এম্ শেঁড়া আকাদা, চেঃৎ আকাদাম? এম্ চেংৎ আকাদা।

শিখিয়াছে .... শেঁড়া আকাদায়। এ শেঁড়া আকাদা; চেঃৎ আকাদায়। এ চেঃৎ আকাদা।

---

১০৭. "আম্ তুলুই হড় রড় মেন্ আইং" এরূপ অনুবাদ ঠিক হইলেও উহা ভাষায় প্রয়োগ নাই।

১০৮. তোমাকে বলিতেছি, সেজন্য "এং জেতাম্ কানা" হয়।

শিখিব .... শেঁড়া আইং। এং শেঁড়া আ। চেঃৎ আইং, এং চেঃৎ আ।

শিখিবি .... শেঁড়া আম্? এম্ শেঁড়া আ। চেঃৎ আম? এম্ চেঃৎ আ।

শিখিবে .... শেঁড়া আয়্। এ শেঁড়া আ। চেঃৎ আয়। এ চেঃৎ আ।

শিখিতেছি .... শেঁড়া এদাইং। এং শেঁড়া আ। চেঃৎ এদাইং। এং চেঃৎ আ।

শিখিতেছিস .... শেঁড়া এদাম? এম্ শেঁড়া আ। চেঃৎ এদাম্? এম্ চেঃৎ আ।

শিখিতেছে .... শেঁড়া এদায়। এ শেঁড়া আ। চেঃৎ এদায়। এচেঃৎ আ।

আমার কাছে শেখ বা শিখিস .... ইংঠেন্ শেঁড়ায় মে। ইংঠেন্ চেঃৎ মে।

আমি কিছু কিছু শিখিয়াছি .... ইংদ নাসে নাসে শেঁড়া আকাদাইং। ইংদ নাসে নাসে এং শেঁড়া আকাদা। ইংদ নাসে নাসে চেঃৎ আকাদাইং। ইংদ নাসে নাসে এং চেঃৎ আকাদা।

না, তুই অনেক কথা শিখিয়াছিস .... বাং আ, আম্দ আডি কাথা এম্ শেঁড়া আকাদা। বাং আ, আম্দ আডি কাথা এম্ চেঃৎ আকাদা।

সে সব কথা শিখিয়াছে .... উনিদ ঋতঃ কাথা শেঁড়া আকাদায়। উনিদ ঋতঃ কাথা এ শেঁড়া আকাদা। উনিদ ঋতঃ কাথা চেঃৎ আকাদায়। উনিদ ঋতঃ কাথা এ চেঃৎ আকাদা।'

তোর কাছে আমি শিখিব .... উনি্ ঠেন্ শেঁড়ায় আঁইং। উনি্ ঠেন্ এং শেঁড়ায় আ।

আমার কাছে তুই শিখিবি .... ইঃ ঠেন্ শেড়া আম? ইংঠেন্ এম শেঁড়ায় আ।

তোর কাছে সে শিখিবে .... আম্ ঠেন্ শেঁড়ায় আয়। আম্ ঠেন্ এ শেঁড়ায় আ।

আমি তার কাছে শিখিতেছি .... ইং উনিঠেন্ শেঁড়া এদাইং। ইং উনিঠেন্ এং শেঁড়া এদা। ইং উনিঠেন্ শেঁশেঁড়া কানাইং। ইং উনিঠেন্ এং শেঁশেঁড়া কানা। ইং উনিঠেন্ চেঃৎ এদাইং। ইং উনিঠেন্ এং চেঃৎ এদা। ইং উনিঠেন্ চেঃৎ কানাইং। ইং উনিঠেন্ এং চেঃৎ কানা।

তুই আমার কাছে শিখিতেছিস.... আম্ ইংঠেন্ শেঁড়া এদাম্? আম্ ইংঠেন্ এম্ শেঁড়া এদা। আম্ ইংঠেন্ শেঁশেঁড়া কানাম্। আম ইংঠেন্ এম্ শেঁশেঁড়া কানা। আম্ ইংঠেন্ চেঃৎ কানাম্? আম ইংঠেন্ এম্ চেঃৎ কানা। আম ইংঠেন চেঃৎ এদাম্। আম্ ইংঠেন্ এম্ চেঃৎ এদা।

যে তোর কাছে শিখিতেছে .... উনিদ আমঠেন্ শেঁড়া এদায়। উনিদ আম্ঠেন্ এ শেঁড়া এদা উনিদ আম্ঠেন্ শেঁশেঁড়া কানায়্। এ শেঁশেঁড়া কানা। উনিদ আম্ঠেম্ চেঃৎ এদায়। উনিদ আম্ ঠেন্ চেঃৎ এদা। উনিদ আম্ঠেন চেঃৎ কানায়। উনিদ আম্ঠেন এ চেঃৎ কানা।

* * *

শিখান .... শেঁড়া হচ। চেঃৎ হচ।

আমি তোকে শিখাইব .... শেঁড়া হচ মে আঁইং। চেঃৎ হচ মে আইং।

আমি তাহাকে শিখাইব .... শেঁড়া হচ এ আঁইং। চেঃৎ হচ এ আঁইং।

তুই আমাকে শিখাইবি .... শেঁড়া হচ ইং আম্? চেঃৎ হচ ইং আম?

তুই তাহাকে শিখাইবি .... শেঁড়া হচ এ আম্? চেঃৎ হচ এ আম্

সে আমাকে শিখাইবে .... শেঁড়া ইচ্ ইং আয়। চেঃৎ হচ মে আয়্।

সে তাকে শিখাইবে .... শেঁড়া ইচ্ মে আয়। চেঃৎ ইচ মে আয়।

* * *

আমাকে সাঁওতালি কথা শিখাবি .... হড়্ রড়্ শেঁড়া হচ ইং আম? হড়্ রড়্এম্ শেঁড়া হচ ইং আ? হড়্ রড়্ চেঃৎ হচ ইং আম্? হড়্ রড়্ এম্ চেংৎ হচ ইং আ?

খা .... জম্মে। ইউ মে।[১০৯]

ভাত খা .... দাকা জম্ মে।

জল খাবার খা .... দাঃ ইউ আ জম্ মে।

আজ তিনটার সময় ভাত খাস্ .... তেঁহেং চপ বাজা জোখাঃ দাকা জখ্ মে।

খাইয়াছি .... জম্ আকাদাইং। এং জম্ অকাদা।

খাইয়াছিস .... জম্ আকাদাম্?[১১০] এম্ জম্ আকাদা।

খাইয়াছে .... জম্ আকাদায়। এ জম্ আকাদা।

---

১০৯ যাহা চর্বন করিয়া খাইতে হয়, তাহাকে "জম্" এবং যাহা পান করিতে হয়, তাহাকে "ইঁউ" বলে। যেমন—মুড়ি খা-খাজাড়ী জম্ মে। ভাত খা-দাকা জম্ মে। সন্দেশ খা-লাড়ু জম্ মে। জল খা—দাঃ ইঁউমে। পাঁচুই মদ খা- হান্ডি ইঁউমে। তামাক খাঁ—থামাকুর ইঁউ মে্ ইত্যাদি।

১১০. শব্দের সহিত "আম্" যোগ্ কেবল নিজের স্ত্রীর সহিত কথাবার্তায় এবং অপরের সহিত প্রশ্নচ্ছলে মাত্র ব্যবহৃত হয়। যেমন—স্ত্রীকে "চেৎ জম্ আকাদাম্"? অপরকে "চেৎ এম্ জম্ আকাদা।"

তুই কি খাইয়াছিস .... চেৎ জম্ আকাদাম? চেৎ এম্ জম্ আকাদা!
সে মুড়ি খাইয়াছে .... উনিদ খাজাড়ী জম্ আকাদায়। উনিদ খাজাড়ী এ জম্ আকাদা।
আমরা ভাত খাইয়াছি .... আলেদ দাকাজম্ আকাদা লে। আলেদ দাকালে জম্ আকাদা।
তোরা কি খাইয়াছিস .... আপেদ চেৎ জম্ আকাদ। পে? আপেদ চেৎ পে জম্ আকাদা?
তাহারা বাসি ভাত খাইয়াছে .... উন্‌কুদ বাস্‌কে দাকা জম আকাদা ক। উন্‌কুদ বাস্‌কে দাকা ক জম আকাদা।
খাইব .... জম্ আঁইং। ইঁউ আঁইং।
খাইবি .... জম্ আম্। ইঁউ আম।
খাইবে .... জম্ আয়। ইঁউ আয়।
আজ আমি কিছুই খাইব না .... তেঁহেংদ চেৎহঁ বাং জম্ আঁইং। তেঁহেংদ চেৎহঁ বাইং জম্ আ।
তুই চুরুট খাবি? .... পুংগি ইঁউ আম? চুটি এম্ ইঁউ আ?
সে তামাক খাইবে .... উনিদ থামাকুর ইঁউ আয়। উনিদ থামাকুর এ ইঁউ আ।
খাইতেছি .... জম্ এদাইং। জজম্ কানাইং। ইঁউ এদাইং। ইঁউ কানাইং।
খাইতেছিস .... জম্ এদাম্ জজম্ কানাম্। ইউ এদাম্। ইঁউ কানাম্?
খাইতেছে .... জম্ এদায়। জজম্ কানায়। ইঁউ এদায়। ইঁউ কানায়।
খাওয়ান .... জম্ হচ। ইঁউ হচ।
আমি তোমাকে খাওয়াইব .... জম্ হচ মে আঁইং।
আমি তাহাকে খাওয়াইব .... জম্ হচ এ আঁইং।
তুমি আমাকে খাওয়াইবে .... জম্ হচ ইং আম্।
তুমি তাহাকে খাওয়াইবে .... জম্ হচ এ আম্।
সে আমাকে খাওয়াইবে .... জম্ হচ ইং আয়।
সে তোমাকে খাওয়াইবে .... জম্ হচ মে আয়।
সে তাহাকে খাওয়াইবে .... জম্ হচ এ আয়।
কাল না হয় পরশু তোকে পাঁচুই খাওয়াইব .... পাপা বাংখান্ মিয়াং হান্ডি এং হঁউ হচমে আ।
আজ তাহাদিগকে মুড়ি মুড়কি খাওয়াইব .... তেঁহেংদ খাজাড়ী মুড়কি এং জম্ হচ কো আ।
আমাকে সন্দেশ খাওয়াবি না .... লাড়ুদ বাং এম্ জম্ হচ ইং আ?

* * *

এ পর্যন্ত বহুসংখ্যক উদাহরণ ও সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে; উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে। এক্ষণে তাম, তিস, এর কথা বলিয়া দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করিব একটি "কঃ" (কোন কোন স্থলে "কে") প্রয়োগে তাম্ তিস্, ৩ বুঝায়।

যেমন—

আসিতাম .... হেজ্[১১১] কঃ আইং।
আসিতিস .... হেজ্ কঃ আম্।
আসিত .... হেজ কঃ আয়।
যাইতাম .... চালাও কঃ আঁইং।
যাইতিস .... চালাও কঃ আম্।
যাইত .... চালাও কঃ আয়।
দিতাম .... এম্ কঃ আঁইং।
দিতিস .... এম্ কঃ আম্।
দিত .... এম্ কঃ আয়।
লইতাম .... হাতাও কে আইং।
লইতিস .... হাতাও কে আম্।
লইত .... হাতাও কে আয়।
আনিতাম .... আগু কে আঁইং।
আনিতিস .... আগু কে আম্।
আনিত .... আগু কে আয়।
রাখিতাম .... দহকে আইং।
রাখিতিস .... দহকে আম্।
রাখিত .... দহ কে আয়।

বলিতাম .... মেন্ কে আইং।
বলিতিস .... মেন্ কে আম্।
বলিত .... মেন্ কে আয়।

শিখিতাম .... শেঁড়া কে আঁইং। চেঃৎ কে আঁইং।
শিখিতিস .... শেঁড়া কে আম্। চেঃৎ কে আম্।
শিখিত .... শেঁড়া কে আয়। চেঃৎ কে আয়।

---

১১১. "হেইঃচ্" (আসা) শব্দ স্থান বিশেষে "হিজু" ও "হেজ্" হয়।

খাইতাম	.... জম্ কে আঁইং। ইঁউ কে আঁইং।[১১২]
খাইতিস	.... জম্ কে আম্। ইঁউ কে আম্।
খাইত	.... জম্ কে আয়। ইঁউ কে আয়।
কাল সকালেই আসিতাম	.... হোলা সেতাঃ বেড়ারোগ হেজ্কঃ আঁইং
	হোলা সেতাঃ বেড়ারেগি এং হেজকঃ আ।
তোর সঙ্গেই যাইতাম	.... আম্ তুলুই গি চালাও কঃ আঁইং।
	আম্ তুলুই গি এং চালাও কঃ আ।
তার সঙ্গে দেখা হইলে টাকা দিতাম	.... উনি তুলুই ইঁয়েপেল্ হোয়লেন্ খান্ টাকা এম্ কঃ আঁইং। উনি তুলুই ইঁয়েপেল্ হোয়লেন খান্ টাকা এং এম্ কঃ আ।
আগে জানিলে আমি লইতাম	.... আগিল্‌রে বাড়ায় লেন্‌খান্ হাতাও কে আইং।
	আগিল্‌রে বাড়ায় লেনখান্ এং হাতাও কে আ।
আমি না দেখিলে তুই লইতিস	.... ইংদ বাং ইঁয়েল্ লেন্‌খান হাতাও কে আম্?
	ইংদ বাং ইঁয়েল্ লেন্‌খান্ এম্ হাতাও কে আ।
গরুটা এখনই ধান খাইত	.... ডাংরাদ নিৎগি হোড়ো জম্‌কে আয়্।

*   *   *

তোমাকে দিতেও পারি	.... এম্ কেমাইং (কঃ + এম্ + আঁইং = কেমাইং)
তাহাকে দিতেও পারি	.... এম্ কে আঁইং। (কঃ + এ + আঁইং = কেআঁইং)
তাহাকে দিতেও পার	.... এম্ কে কেম্। (কঃ + এ + আম্ = কেআম্)
আমাকে দিতেও পার	.... এম্ কিং আম্ (কঃ + ইং + আম্ = কিংআম্)
তোমাকে দিতেও পারে	.... এম্ কেমায়। (কঃ + এম + আয় = কেমায়)
তাহাকে দিতেও পারে	.... এম্ কে আয়। (কঃ + এ + আয় = কে আয়)
আমাকে দিতেও পারে	.... এম্ কিং আয়। (কঃ + ইং + আয় = কিংআয়)
তোমাকে মারিতেও পারি	.... দাল্ কেমাইং।
তাহাকে মারিতেও পারি	.... দাল্ কে আঁইং।
তাহাকে মারিতেও পারি	.... দাল্ কে আম্।
আমাকে মারিতেও পার	.... দাল্ কিং আম্।
তোমাকেও মারিতেও পারে	.... দাল কেমায়।
তাহাকে মারিতেও পারে	.... দাল্ কে আয়।
আমাকে মারিতেও পারে	.... দাল্ কিং আয়।

---

১১২. খাইতাম (অনিশ্চয়ার্থে) .... জম্‌কে আঁইং।
খাইয়া লইতাম (নিশ্চয়ার্থে) .... জম্ কঃ আইং।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিধ সন্ধান

আমি তোমার কাজ করিব	.... আম্ আঃ এং কামি আ।
আমি তাহার কাজ করিব	.... উনি আঃ এং কামি আ।
আমি আমার কাজ করিব	.... ইং আঃ এং কামি আ।
তুমি আমার কাজ করিবে	.... ইং আঃ এম্ কামি আ।
তুমি তাহার কাজ করিবে	.... উনি আঃ এম্ কামি আ।
তুমি তোমার কাজ করিবে	.... আম্ আঃ এম্ কামি আ।
সে আমার কাজ করিবে	.... ইং আঃ এ কামি আ।
সে তোমার কাজ করিবে	.... আম্ আঃ এ কামি আ।
সে তাহার কাজ করিবে	.... উনি আঃ এ কামি আ।
সে তাহার নিজের কাজ করিবে	.... উনি আয় আঃ এ কামি আ।

*   *   *

কেন পারিব না	.... চেদা বাইং দাড়েয়া আ?
কেন পারিবি না	.... চেদা বাং দাড়েয়া আম্?
	চেদা বাং এম্ দাড়েয়া আ?
	চেদা বাম্ দাড়েয়া আ?
কেন পারিবে না	.... চেদা বায় দাড়েয়া আ?
কেন মানিস না	.... চেদা বাং দাড়ায় আম্?
	চেদা বাং এম্ বাড়ায় আ?
	চেদা বাম্ বাড়ায় আ?
কেন হইবে না	.... চেদা বাং হোয়ওঃ আ?
কেন দিবি না	.... চেদা বাং এম্ এমঃ আ?
কেন রাগ করিতেছিস	.... চেদা এন্রেঃ কানাম্?
	চেদা এম্ এন্রেঃ কানা?
	চেদা রাগিঃ কানাম্?
	চেদা এম রাগিঃ কানা?
কেন গালি দিতেছিস	.... চেদা এম্ এগের এদা?
	চেদা এম্ এ এগের্ কানা?
কেন বলছিস না	.... চেদা বাং এম্ মেন্ এদা?
	চেদা বাং এম্ মেমেন্ কানা?
কেন বলিতে পারিতেছিস না	.... চেদা বাং এম্ মেন্ দাড়েয়া কানা?
কেন আসিস নাই	.... চেদা বাং হেজ্ লেনাম্?
	চেদা বাং এম্ হেজ্ লেনা?

হাসিতেছিস কেন	.... চেদা এম্ লান্দা এদা? চেদা এম লান্দ্ কানা?[১১৩]
মেঘ ডাকিতেছে	.... রিমিল সাডি কানা।
ব্যাং ডাকিতেছে	.... রটে এ রাঃ এদা। রটে রাঃ এদাক।
একটা ব্যাং ডাকিতেছে	.... রটে এ রাঃ এদা। রটে রা এদায়।[১১৪]
অত্যন্ত মশা কামড়াইতেছে	.... শিক্ড়ীঃ বেজায় ক গেংগের কানা। শিকড়ীঃ বেজাঁয় গেংগের কানাক।
মেঘ ছাড়িতেছে না	.... রিমিল্ বাং ছাড়াও আকানা।[১১৫]
ঐ জল পড়িতেছে	.... ওনে দাঃ জরঃ কানা।[১১৬]
সে কাপড় শুকাইতেছে	.... উনিদ কিচ্রীঃ রহড়্ এদায়। উনিদ কিচ্রীঃ রঃহড়্ কানায়।
(প্রশ্ন) এখনও শুকায় নাই	.... নিৎহঁ বাং রহড়্ আকানা?
(উত্তর) এখনও শুকায় নাই	.... নিৎহঁ আউরী রহড়্ আকানা। নিৎহঁ আউরী রহড়ঃ আ।
ওখানে রাখিস না	.... অন্ অঁড়ে (অন্ডেদ) আলম্ দহয় আ।
আমি আর বেশিক্ষণ কাজ করিতে পারিব না	.... ইংদ আর্ আডি খাড়ি অহ এং কামি দাড়েয়া আ।
না, এখনও অনেক বেলা আছে	.... বাং আ, নিৎহঁ আডি বেড়া মেনায় আ।[১১৭]
রৌদ্রে কাপড় শুকাইতে দে	.... সেতোংরে কিচ্রীঃ তাসে মে। সেতো রে গেঁদ্‌ড়া তাসে কাঃ মে।[১১৮]
উঠানে ধান শুকাইতে দে	.... রাচারে হোড়ো তাসে মে। রাচারে হোড়ো তাসে কাঃ মে।

১১৩. কানা যোগ করিলে "লান্দা" শব্দের পরবর্তী আকার লোপ পায় এবং (্) হসন্ত যোগ হয়। যেমন— লান্দ্ কানা।

১১৪. "রটেএ রাঃ এদা" বা "রটে বাঃ এদায়"—ইহার যথাযথ অনুবাদ যথাক্রমে "ব্যাং সে ডাকিতেছে" বা "ব্যাং ডাকতেছে সে"। "এ" বা "আয়" এক বনে বলিয়া একটা ব্যাং-এর স্থলে "মিৎটাং রটে" বলিতে হইবে না।

১১৫. এখানে সচরাচর "কানা" স্থলে "আকানা" (ছাড়ে নাই) শব্দ প্রয়োগ হয়। কিন্তু "রিমিল বাং ছাঃডাও কানা" বলা যায়।

১১৬. নির্দিষ্ট ঐ—ওনা। অনির্দিষ্ট ঐ—ওনে।

১১৭. না অর্থে-বাং, আউরী আল্ অ, অহ, বাংআ প্রভৃতি কিরূপ স্থলে ব্যবহৃত হয়, তাহাই এই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৮. নিকটে কোন কাজ করিতে বলিলে "কাঃ" প্রয়োগ হয়। যেমন— নিকটে শুকাইতে দে—তাসে কাঃ মে। নিকটে ফেল—গিডি কাঃ মে ইত্যাদি।

জমির জল শুকাইয়া গিয়াছে	.... ক্ষ্যাৎরে দাঃ আঞ্জেৎ আকানা।[১১৯]
গোবর ফেলে দে	.... গুরিঃ ইঃ গিডি মে। গুরিঃ ইঃ গিডি কাঃ মে। গুরিঃ ইঃ গিডি কাম্।[১২০]
ছাই ছড়াইয়া দে	.... তরজ ছড়িয়াও মে। তরজ্ য়্যার্ কাঃমে।
কুকুরটাকে তাড়াইয়া দে	.... সেতাদ মা লাগাকায় মে।[১২১] সেতাদ মা লাগা এম্।[১২২]
এই লোকটাকে তাড়াইয়া দে	.... নুই হড়্দ মা লাগা এম্। নুই হড়্দ মা লাগাকায় মে।
বসিয়া আছি	.... দুড়ুপ্ আকানাইং।
বসিয়া আছিস	.... দুড়ুপ আকানাম্?
বসিয়া আছে	.... দুড়ুপ আকানায়।
শুইয়া আছি	.... গিতিক্ আকানাইং।
শুইয়া আছিস	.... গিতিক্ আকানাম্।
শুইয়া আছে	.... গিতিক্ আকানায়।
ঘুমাইতেছে	.... মাপিৎ এদায়। মাঃপিৎ কানায়।
ঘুমাইতেছিস	.... মাপিৎ এদাম্? মাঃ পিৎ কানাম্?
সে ডাকিতেছে	.... হঃহয় এদায়। হঃহয় কানায়।
সে গালি দিতেছে	.... এগের এদায়। এঃ এগের কানায়।
সে অত্যন্ত রাগিয়াছে	.... উনিদ বেজাঁয় এ রাগি আকানা। উনিদ বেজাঁয় এ এন্রে আকানা।
কামড়াইতেছে	.... গের্ এদায়। গেঃগের্ কানায়।
ছাড়িতেছে না	.... বাং এ ছাড়াও এদাম্। বাং এ ছাঃ জও কানায়।
কামড়াইয়া ছাড়িতেছে না	.... বাং এ আড়াঃ এদায়।

* * *

পাঁচুই[১২৩] খাইয়া মাতাল হইয়াছিস	.... হান্ডি হঁউকাতে বুল্ আকানম? হান্ডি হঁউকাতেম্ বুল্ আকানা?

১১৯. শুষ্ক—রহড়—শুকান - তাসে। জল শুকাইয়া যাওয়া — আঞ্জেৎ।

১২০. গিডি + কাঃ + আম্ = গিডিকাম্।

১২১. প্রাণী বলিয়া "কায়" হইয়াছে। লাগ + কাঃ + এ = লাগাকায়।

১২২. লাগা + এ + আম = লাগাএম্।

১২৩. এক প্রকার স্বল্প মূল্যের ধেনো মদ। সাঁওতালি শাস্ত্রে মনুষ্য সৃষ্টির পরই এই মদ্য পান (হান্ডি ইঁউ) ব্যাপার কথিত হয়। সাঁওতালদের সকল উৎসবেই ইহার অত্যাধিক প্রচলন আছে।

আমি পাঁচুই খাই নাই ;মদ খাইয়াছি .... হান্ডিদ বাইং ইউ আকাদা পাউরা ইউ আকাদাইং।
তোর নেশা হইয়াছে .... বুল্ আকানাম্?
না, আমার নেশা হয় নাই .... বাং আ, বাং বুল্ আকা নাইং।
মিথ্যা কথা বলিতেছিস .... য়্যাড়ে কাথা এম্ মেন্ এদা। য়্যাড়ে কাথা এম্ মেমেন্ কানা।
মিথ্যা নয় .... য়্যাড়ে দো রাং।
আর খুব নেশা হইয়াছে .... বেঁজায় বুল্ আকানায়
সে বমি করিতেছে .... উনিদ উদুলোও এদায়। উনিদ উঃছলোও কানায়।
এইবার ঠিক্ হইয়াছে .... নোয়া ধাওদ ঠিক হোয় আকানা।
তুই কতটা পাঁচুই কিনিবি .... তিন্ হান্ডি এম্ কিরিং আ?
আমি এক হাঁড়ি লইব .... ইংদ মিৎ টুকুই হাতাও আঁইং। ইংদ মিৎ টুকুই এং হাতাও আ।
আট আনা দাম দিতে হইবে .... ইরাল্ আনা দাম এম্ হোয়ওঃ আ।
তাহাই দিব .... উনাঃগি এমঃ আঁইং।

* * *

তালগাছ ফলিয়াছে .... তালে দারে জ আকানা।[১২৪]
ফুল গাছে ফুল হইয়াছে .... বাহা দারেরে বাহা আকানা।
ফুল ফুটিয়াছে .... বাহা সাড়্ আকানা[১২৫]
সিমুল ফুল ফুটিয়াছে .... য়্যাদেল্ বাহা সাড়্ আকানা।
ওটা কি ফুল .... ওনাদ চেৎ বাহা?
গাঁদা ফুল .... কুশ্নি বাহা।
পড়িয়া যাইতেছে (দ্রব্যাদি) .... হিরিজিঃ কানা। জরঃ কানা। ইঁউরুঃক কানা। বুজুরঃ কানা।[১২৬]
বস্তা ছেদা হইয়াছে .... থলী ভুগা আকানা।
ছিদ্র দিয়া ধান পড়িতেছে .... ভুগাথন্ হোড়ো বুজুরঃ কানা।
ধান পড়িয়া যাইতেছে .... হোড়ো ইঁউরুঃক্ কানা।

---

১২৪. তালগাছ জড় পদার্থ বলিয়া "আকানায়" হয় নাই।
১২৫. সাড়্ = প্রস্ফুটিত হওয়া।
১২৬. চালিবার সময় পড়িয়া—থিবি্জঃ। আপনি পড়িলে—জরঃ। বস্তাসহ ধান বা পাত্রসহ দ্রব্য পড়িয়া গেলে—ইউরুঃক। ছিদ্র দিয়া পড়া- বুজুর্। ঝুঁড়ি বা বস্তা পড়ে নাই, ছিদ্র নাই অথচ উপর হইতে ধান পড়িয়া যাইলে- হিরিজঃ।

ঝুড়ির ধান পড়িতেছে .... ঠেকা খন্ হোড়ো হিরিজঃ কানা।
কলসী হইতে জল পড়িতেছে .... বিলিখন্ দাঃ জরঃ কানা।
নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে .... মুখন্ মায়াং জরঃ কানা।

* * *

পথে অত্যন্ত কাদা হইয়াছে .... হর্‌রে বেজায় লসদ্ আকানা।
রাস্তা অত্যন্ত পিছল হইয়াছে .... হরং বেজাঁয় লেঞ্জেৎ আকানা।
পড়িয়া যাইব .... ভিনদাড়্ গদঃ আইং।
পড়িয়া গেলাম .... ভিন্দাড়্ গট্ এনাইং।
আমি পড়িয়া গিয়াছি .... ভিন্দাড়্ আকানাইং।
কাপড়ে কাদা লাগিয়াছে .... কিচ্‌রীঃরে লখদ লাঠা[১২৭] আকানা।
অত্যন্ত অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইতেছি না .... বেজাঁয় ইউৎ আকানা, চেৎহঁ বাং ইঁয়েল এয়াম এদা।
কিছুই দেখা যাইতেছে না .... চেৎহঁ বাং ইঁয়েলোঃ[১২৮] কানা।
কোন্ পথে যাইব .... ওকা হর্‌তে চালা ঃ আইং ? ওকা হর্‌তে এং চালাঃ আ?
কোন্ দিক দিয়া যাইব .... ওকা লেকাতে চালাঃ আইং? ওকা লেকাতে এং চালাঃ আ? ওকা সেঃৎতে চালাঃ আঁইং? ওকা সেঃৎতে এং চালাঃ আ?
তুই কোন্ পথে যাবি .... আমদ ওকা হর্‌তে চালাঃ আম্? আম্‌দ ওকা হর্‌তে এম্ চালাঃ আ?
তোর কথা শুনিতে পাইতেছি না.... আম্ আ কাথা বাইং আঞ্জোম এয়াম্ এদা।
সেখানে পৌছিতে কত রাত্রি হইবে .... হাঁড়ে শেন্ তিওতে তিন্ নিদা[১২৯] হোয়ওঃ আ? হাঁড়ে শেনোঃ তে তিন্ নিদা হোয়ওঃ আ?
এই পথে যা .... দো নোয়া হরতে।* নোয়া হরতে চালাঃ মে।
ধীরে ধীরে যা .... বাই বাইতে চালাঃ মে।
শীঘ্র আসিস .... শাট মেন্‌তে হিজুঃ মে। চটতে হিজুঃ মে।
সেখানে যাস না .... হাঁভেদ আলম্ চালাঃ আ। হাঁভেদ আল্‌অ এম্ চালাঃ আ।

---

১২৭. লাগা – লাঠা।
১২৮. বিশেষণে—"ইয়েলোঃ" হয়।
১২৯. এক্ষণে বাংলা ভাষায় এর ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে।

তার কথা শুনিস না .... উনি আ কাথা আলম্ আঞ্জোম্ আ।

মিথ্যা কথা বলিস না .... য়্যাডে কাথা আলম্ রড়্ আ।
য়্যাড়ে কাথা আলম্ মেন্ আ।

অত দূরে যাইতে হইবে না,
এইখানে ব'স .... উন্ সাংগিংদ বাং চাঃলাও হোয়ওঃ আ, নোডে দুড়ুপ্ মে।

তোরা কেবল গল্প করিস না .... এখেন্ আল্ অপে রপড়্ আ।

তুই এখানে বেশিক্ষণ থাকিস না .... আম্ নোডে আডি খাড়ি আলম্ তাঁহে না।[১৩২]

আমি এখানে অধিকক্ষণ
থাকিতে পারিব না .... ইংদ নোডে আডি খাড়ি অহ এং তাঁহে দাড়েয়া আ।

আমার সঙ্গে আয় .... ইং তুলুই হিজুঃ মে।

অনেক দূরে যাইতে হইবে .... আডি সাংগিংতে চাঃলাও হোয়ওঃ আ।

* * *

তামাক সাজ .... থামাকুর কাসাও মে।

কল্কে কোথায় আছে .... চিলিম্দ ওকারে হেনাঃ আ?

ঝাড়ু দে .... জগ্ মে।

ঝাড়ু দিয়া পরিস্কার কর .... জঃ টাডি মে।

ঘর বন্ধ কর .... ওড়াদ সিং হটকাও মে।

ঘরের কপাট বন্ধ কর .... ওড়া শিল্লংদ শিং হটকাও মে।

থালা মাজ .... থারি গিতিল্ মে।

গরুটা বাঁধা ছিল, এখনই
খুলিয়া গিয়াছে .... নুই ডাংরা তল্ তাঁহে কানায়, নিৎগি লাড়া এনায়।

সাঁওতালি ভাষায় নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ঞ ব্যবহার না করিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না। যথা—
নিদা স্থলে ঞিদা।
ইঁয়েল স্থলে ঞেল্।
ইঁয়েপেল স্থলে ঞেপেল্।
এঁও স্থলে ঞেও
ইঁউৎ স্থলে ঞিউৎ।
ইঁউ স্থলে ঞিউ।

১৩০. সম্মতি সূচকে "দা" হয়।

১৩১. তাঁহেন্ + আ = তাঁহেনা। "তাঁহেং আ" হইতে পারে। তাঁতে মানে—থাকা।

১৩২. তল্ + এ = তলে।

ঐ গরুটাকে ঘরের ভিতরে বাঁধ .... উনি ডাংরা ওড়া ভিৎরিবে তলেমে।[১৩৩]

বৈকালে গুরু চরাবি .... তারাসিন্তে ডাংরা আতিইং কম্।

স্নানের সময় গা ধোওয়াইয়া দিবি .... তোপন্ জোখাঃ হড়্মো আরুব্ এম্।

এই বার মাঠে চল .... নোয়া ধাও মাঠরে চালাঃ মে।

বীজ ধান ছড়াইতে পারবি .... হোড়ো ইতাঃ ছড়িয়াও এম্ দাড়েয়া আ?

ধানের ঝুড়ি মাথার উপর নে .... হোড়ো ঠেকা বহঃ চেতান্রে দহয় মে্ হোড়ো ঠেকা দিপিল্ মে।[১৩৩]

না হয় কাঁধের উপর নে .... বাংখান্ তারেন্ চেতান্রে দহয়মে বাংখান্ গঃগ মে।[১৩৪]

ঐ আলের উপরে রাখ .... ওনা আড়ে চেতান্রে দহয় মে।

সে একটু তামাক চাহিতেছে .... উনিদ কাটিঃ চুলুম্ থামাকুর্ কয় এদায়।
উনিদ কাটিঃ চুলুম্ থামাকুর এ কয় এদা।

ঐ খানে আছে দে .... অন্ অঁডে হেনাঃ আ, এমায় মে।

* * *

তোর নাম কি .... চেলে আম্ আ? আম্ আ ইঁতুমদ্ চেৎ?

তোর বাপ্ আছে .... আপুম্ মেনায় তাম্ আ?[১৩৫]

তোর ভাই বোন্ আছে .... আম্রেন্ বয়হা মিসেরা মেনাকো তাম্ আ?

তোর বিয়ে হয়েছে .... আম্ আ বাপ্লা হোয় আকানা?

তোর ছেলেপিলে আছে .... হপন্মে মেনাকো তাম্ আ?
গিদ্রা পিদ্রা মেনাকো তাম্ আ?

তার স্বামী আছে .... হেরেল্ মেনায় তায় আ?

আমার চাকর আছে .... গুতি মেনায় তিং আ।

ফুল্টুসী তোর কে হয় .... ফুল্টুসীদ এম্ চেলে আয় আ? ফুল্টুসীদ আমরেন্ (আমিঃজ্) চেলে হোয়ওঃ আয়?

জলার বাড়ি কোথায় .... জলা আ ওড়াঃদ ওকারে?

গনেশ বাড়িতে আছে .... গান্শা ওড়াঃরে মেনায় আ?

বাড়িতে নাই .... ওড়াঃবেদ· বানুগি আ।

---

১৩৩. মাথার উপর লওয়া — দিপিল্।

১৩৪. কাঁধের উপর লওয়া — গঃ।

১৩৫. নিজের (যাহাতে অপরের অধিকার নাই) বুঝাইলে একটি "ত" বসে যেমন—
তোমার আছে — মেনায় তাম্ আ; (ত + আম্ = তাম্)
তাহার আছে — মেনায় তায় আ। (ত + আয় = তায়)
আমার আছে — মেনায় তিং আ। (ত + ইং = তিং)।

তাহাকে বলিস। আমি কাল
তার সঙ্গে দেখা করিব .... উনি মেতায়মে, গাপা উনি তুলুই এং ইঁয়েপেলঃ আ।
যদি বলে কেন আসিবে .... মেন্খান্ এ[১৩৬] চেদা এ হিজুঃ আ।
বলিস, লাঙলের জন্য আসিবে .... মেতায়মে, নাহেল্ লাগিৎ এ হিজুঃ আ।
আরে কেও জলা আসছিস .... এয়া অকয়, জলা হিজুঃ কানাম?[১৩৭]
হাঁ মহাশয় .... হেঁ বাবা।
এঃ গু মাড়াইয়াছিস .... ইস্, ইজ্ লেবেট্ কেদাম? ইস্ ইজ্ এম্ লেবেট্ কেদা?
যা, পা ধুইয়া আয় .... দো, জাঙ্গা আবুক্ হিজু মে। দো, জাঙ্গা আবুকঃ মে্।
একটু তোপন্ জল[১৩৮] মাথায় দে .... কাটিঃ চুলুম্ তোপন্ দাঃ বহরে এমাম্ মে্।
ঠিক বটে .... ঠিক্গি।

* * *

দাঁড়া রে দাঁড়া .... এয়া হাপে। তেঙ্গোলেন্ মে।
ওরে শোন .... এয়া আঞোম মে।
তুই কোথায় গিয়াছিলি .... ওকাতে দুকানাম্? ওকাতেম্ দুকানা?
রাম কোথায় গিয়াছে .... রামদ ওকারে শেন্ আকানায়? রাম ওকাতে দুকানায়?
বলিতে পারি না .... অহ এং মেন্ দাড়েয়া আ। বাইং মেন্ দাড়েয়া আ।
তোর সঙ্গে কয় জন আছে .... আম্ তুলুই তিন্ হড়। মেনা কো আ?

---

১৩৬. মেন্খান্ এ যদি বলে।
১৩৭. জলা আসছ বলিলে "জলা হিজুঃ কামান্ হো' বলিতে হইবে।
১৩৮. দামোদর নদের নাম "তোপন নাই"। হিন্দুর গঙ্গজলের ন্যায় সাঁওতালের তোপন্ দাঃ অতীব পবিত্রা ও মুক্তিদায়িনী। সুদুর পল্লীগ্রাম হইতে সাঁওতালেরা পিতা মাতা প্রভৃতির অস্থি দামোদরে (তোপন্ নাইরে) অর্পন করিয়া থাকে। পূর্বে তিনটি মাত্র ঘাট ছিল, এক্ষণে অনেক ঘাঁট হইয়াছে। তোপন নাই পার হইয়া গেলে পাপ হয় ও জাতি থাকে না, পূর্বকালে এইরূপ নিয়ম (শাস্ত্রের আদেশ) ছিল। কালক্রমে অনেকে এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দূরদেশে যাতায়াত করিতে থাকে। তখন একটি সভায় বহু তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হয় যে, "যখন আমাদেরই পুত্র কন্যা, ভাই ভগিনী প্রভৃতি তোপন্ নাই পার হইয়া গিয়াছে, তখন আমাদের সকলেরই যাওয়া হইয়াছে; জাতি গিয়া থাকে- সকলেরই গিয়াছে।" ইহার পর হইতে ঐ নিয়ম আর তত দোষের বলিয়া কেহ মনে করে না।

আমরা স্ত্রী পুরুষে ৬ জন .... আলে হেরেল্ মায়জুতে লে তুরুই হড়্ আ।
আর একজন কোথায় গেল .... আর মিন্ হড়্দ ওকাতে চালাও এনায়?
তুই কার কাজ করিতেছিস .... আম্দ অকয় আ এম্ কামি কানা? আম্দ অকয় আ কামি কানাম্?
ডাক্তার বাবু তোকে ছাড়িতেছে না .... ডাক্তার বাবুদ আম্ বাং এ আড়াঃ এৎ মে আ।
কাল কাজ শেষ হয় নাই .... হোলাদ কামি বাং চাবালে না।
এখনও হয় নাই .... নিৎহঁ আউরী হোয়ওঃ আ?
আজ হইবে .... তেঁহেং হোয়ওঃ আ।
অনেক বেলা হইয়াছে .... আডি বেড়া হোয় আকানা।
তোর মনিব এখনও জলখাবার
দেয় নাই .... নিৎহঁ আমিঃচ কিঁষাড় দাঃ ইঁউ আ বাং এ এম্ আকাদা? নিৎহঁ আমিঃ চ্ কিঁষাড়্ দাঃ ইঁউ আ বাং এম্ আকাদায়।[১৩৯]
এখন ও জলখাবার বেলা হয় নাই .... নিৎহঁ দাঃহঁউ বেড়া আউরী হোয়ওঃ আ।
কোথায় বীজ ভাঙা হইতেছে .... ওকারে তলা তোতোঃৎ হোয়ওঃ কানা?
তোরা ঘন করিয়া রোপন করিস .... ইবিল এঁ ও[১৪০] রহয় পে।
একটু ধর যেন সরু না হয় .... সাব্ এঁ ও পে, আল্ অ নান্ হা মা।[১৪১]
পাতলা করিস না .... আল্ অ পে এতাং আ।
কে চীৎকার করিতেছে .... অকয় কিক্ইয়ে আও এদায়?
উহারা দুজন মারামারি করিতেছে .... উন্কিন্ কিন্ দাপাল কানা।
দেখ, দেখ, থামা (ছাড়াইয়া দে) .... ইঁয়েল্ মে, ইয়েল্ কিন্ মে, ছাঃড়াও কিন্ মে।[১৪১]
ছেলেকে মারিস না .... গিদ্ রাদ আলম দালে আ।[১৪২]
ছেলেকে কাঁদাস না .... গিদ্রাদ আলম্ রাঃ হচ এ আ।
পালারে, পালা মারবে .... এয়া দাড়ুমে, দাড়ুমে—দাদাল্ আয়।
লুকাও .... ওকোন মে।[১৪৩]

* * *

তুই কাঠ কুড়াইতেছিস .... সাহান এম্ হালাং এদা? সাহান্ হালাং এদাম্?

---

১৩৯. মিৎ হড়্ বলা রীতি নাই। "মিন্ হড়্" অথবা "মিৎটাং হড়" হইবে।
১৪০. এঁও যোগে পরিমিত অপেক্ষাও অধিক বুঝায়।
১৪১. মা – মেন।
১৪২. দাল্ + এ = দালে।
১৪৩. কোন জিনিষ লুকাও—ওকোয় মে। তুমি নিজে লুকাও—ওকোন্ মে।

তোরা কাঠ কুড়াইতেছিস .... সাহান্ পে হালাং এদা? সাহান্ হালাং এদা পে?

তোদের মনিব কাঠ দেয় নাই .... আপে কিষাঁড়্দ সাহান্ বাংএ এম্ আকাদা?

ওটা নিসনা .... ওনাদ আলম্ হাতাও আ।

এটা পরের, আমার নয় .... নোয়াদ এটাঃ হড়্ আ,[১৪৪] ইং আদ বাং।

তোরা আমার বাগানের কাঠ লইতেছিস .... আপেদ ইং আ বাগ্ ওয়ান্ খন্ সাহান্ পে হাঃতাও কানা?

তবে আমার কাজ করিস না কেন .... এন্তেখান চেদা ইং আ কামি বাংপে কামি আ?

আমরা তোর কাজ করিব .... আলেদ আম আ কামি কামি আ লে।

তুই যেদিন আসিতে বলিবি, সেই দিনই আসিব .... আমদ যাঁহা হিলোঃ এম্ মেন্ আ, ওনা দিন্ রেগি হিজুঃ আলে।

পরশু তোরা আটজন আসিস .... ইরাল্ হড়্দ মিয়াং হিজুঃ পে।

* * *

তোমরা চোর্‌কে ঘেরাও কর .... কোম্‌ড়ো এসেঃৎ এপে।[১৪৫]

লোকটা অপরাধী .... উনি হড়্দ ক্বাইইঃচ্ গি উনিদ ক্বাইটঃচ্ (ক্বাইয়ান্) হড়্।

বাবুর কাছে নালিশ কর .... বাবু ঠেন্ লাইমে।

এখনই দশ টাকা জরিমানা হবে .... নিৎগি গেল্ টাকা ডাঁড়ম্ হোয়ওঃ আ।

না, এবার ওকে ছেড়ে দে .... বাং আ, নোয়া, দুটুদ আড়াঃ কায় মে।

তোর মত বুদ্ধি হলেই হয়েছে আর কি.... আম্ লেকা বুদ্ধি হোয় লেন্ খান্ হোয় আকানা আরদ চেৎ।

আমি তোকে বলিয়া দিব .... ইং লাই আম্ আ।

আমি তাকে বলিয়া দিব .... ইং লাই আয় আ।

তুই আমাকে বলিয়া দিবি .... আম্ লাই আঁইং আ।

তুই তাহাকে বলিয়া দিবি .... আম লাই আয় আ।

সে আমাকে বলিয়া দিবে .... উনি লাই আঁইং আ।

সে তোকে বলিয়া দিবে .... উনি লাই আম্ আ।

* * *

---

১৪৪. পর এটা ঃ। অপর লোকের - এটাঃ হড়্ আ।
১৪৫. এসেঃৎ- ঘেরা। চাকা।

আমি না গেলে তোর কাজ হইত না .... ইংদ বাইং শেন্ লেন্ খান্ আম্ আ কামি অহ হোয় কো আ।

তুই না গেলে আমার কাজ হইত না .... আম্ বাম শেন্ লেন্ খান্ ইংআ কামি অহ হোয় কো আ।

আমি না গেলে তার কাজ হইত না .... ইংদ বাইং শেন্ লেন্ খান উনি আ কামি অহ হোয় কো আ।

তুই না গেলে তাহার কাজ হইত না .... আম্ বাম্ শেন্ লেন্ খান উনি আ কামি অহ হোয়কো আ।

সে না গেলে আমার কাজ হইত না .... উনি বায় শেন্ লেন্ খান্ ইং আ কামি অহ হোয়কো আ।

সে না গেলে তোর কাজ হইত না .... উনি বায় শেন্ লেন্ খান্ আম আ কামি অহ হোয়কো আ।

* * *

তোর একখানা বেয়ারিং চিঠি আসিয়াছে .... আম্ আ মিৎটাং বেয়ারিং চিঠি হেজ আকানা।

চারিটা পয়সা দিতে হইবে .... পোন্ পইসা এম্ হোয়ওঃ আ।

কোথা হইতে আসিয়াছে .... ওকাখন হেজ্ আকানা?

কে পাঠাইতেছে .... অকয় কোল এদায়?

তোর দেশ থেকে এসেছে .... আম্ আ দিশম্ খন্ হেজ্ আকানা

ঝড়ু মাজি পাঠাইয়াছে .... ঝড়ু মাজি কোল্ আকাদায়।

তুই গান জানিস .... সেরিং এম্ বাড়ায়া?

গান জানি, কিন্তু এখন গাহিতে পারিব না .... সেরিং দ এং বাড়োয়া মেন্‌খান নিৎদো বাইং সেরিং দাড়েয়া আ।

কেন? .... চেদা?

ক্ষুধা লাগিয়াছে .... বেং এজ্ কান্ দো।

এখন আনন্দ হইতেছে না .... নিৎদ রাস্কা বাং হোয়ওঃ কানা।

আচ্ছা, মদ খেয়ে একদিন তোকে গান শুনাইব .... আছা, হান্ডি ইউ কাতে মিৎদিন সেরিং আঞ্জোম্ হচ মে আঁইং।

* * *

সে গাড়ি চাপা পড়িল নাকি .... গাড়িতে এ তেন্[১৪৬] এনা সে চেৎ আ?

---

১৪৬. চাপা— তেন্।

মুরগির বাচ্চাগুলি ঢাকা দাও .... সীম হপন্ হারুপ্[১৪৭] কাঃ কো মে।

ভাত বাঁধবি না মুড়ি ভাজবি .... দাকাম্ ইসিন্ আ, সে খাজাড়ি এম্ আতায় আ?

আজ কি খাইবি .... তেঁহেংদ চেৎ এম্ জম্ আ?

আমার মনে হয়, আজ না খাওয়াই ভাল .... মনেতে এং মেন্ এদা, তেঁহেংদ বাং জম্‌গি বোগি আ।

এখানে একটি কি পচিয়াছে .... নোডেদ মিৎটাং চেৎ চোং[১৪৮] শেয়া আকানা।

দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে .... আড়িস্ গি স ওডোকঃ কানা।

এখানে তাড়াতাড়ি চল .... নোডেদ চট্‌তে চাঃলামে।

তারপর কি হইল .... আদ্ অ চেৎ হোয় এনা?

তারপর ঐ হইল .... আদ্ অ ওনে (ওনে লেকা) হোয় এনা।

আমাদের কথা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না.... আলে আ রড়ু অকয়হঁ বাং কো বুঝ্ দাড়েয়া কানা।

আমাদের কথা কেহই বুঝিতে পারে না.... আলে আ রড়্ অকয়ই বাং কো বুঝ্‌দাড়েয়া আ।

আমাদের একই রকম কত কথা আছে, যেমন— আলে আ মিৎ লেকাগি আডি রড়্ হেনাঃ আ, যাঁহা লেকা—

কুলিকে দে আ .... তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

ইঁয়েল্ কে দে আ .... তাহাকে দেখিল।

মেতা দে আ .... তাহাকে বলিল।

তোড়্‌কে দে আ .... তাহাকে বিঁধিল।

মেতা কো আ .... তাহাদিগকে বলিল।

বানু কো আ .... তাহারা নাই।

ও ডোক্ এৎ কো আ .... তাহাদিগকে বাহির করা হইতেছে।

ও ডোক্ এৎ কোথান্ .... বাহির করিতেছে ত?

রুয়াড়্ লেন খান্ .... ফিরে গেলে পর।

হোয় লেন্ খান্ .... হওয়ার পর।

এয়াম্ লেন্ খান্ .... পাওয়া গেলে পর।

* * *

১৪৭. ঢাকা— হারুপ। চাপা দিয়া ঢাকা দেওয়া- তেন্ হারুপ্।
১৪৮. অনিশ্চয়ার্থে "চোং" যোগ হয়।

তোর জ্বর হইয়াছে .... রুয়া কানাম্?

হাত দেখি .... তিং তুনুম্ তাম্‌আ।[১৪৯]

কয় দিন হইল .... তিন্ দিন্ হোয় এনা?

কখন জ্বর হয় .... তীরে রুয়া এহবঃ আ?[১৫০]

জ্বর আসিবার সময় শীত হয় .... রুয়া এহবঃ মোখাঃ রাবাং মে আ?

জ্বর ছাড়িবার সময় ঘাম হয় .... রুয়া আরেজঃ জোখাঃ উদ্‌গার মে আ?

বাহ্যে কি রকম হয় .... চেৎ লেকাম্ দাঃ সেৎ আ?

বমি হয় .... উদুলোও বাড়ায় আম্?[১৫১]

সর্দি কাশি আছে .... খো মাদা হেনাঃ আ?

কি বলিলি, কাশিতে বুকে লাগে .... চেৎ এম্ মেন্ কৈদা, খো জোখাঃ কোড়াম্‌রে হাসো মে আ?

মাথা বেদনা আছে .... বহঃ হাসো মে আ?

হাত পা কামড়ায় .... তি জাঙ্গাকো হাসো মে আ?

তোর পায়ে কি হইয়াছে .... জাঙ্গারেদ এম্ চিকা আকানা?[১৫২]

জিব্ বাহির কর .... আলাং ওডোক্ তাম্।

ব'স (অপেক্ষা কর) ঔষধ দিব .... তাংগিমে, রান্ এমো আঁইং।

* * *

তোরা কোথায় আছিস .... ওকারে মেনাঃ পে আ?

কোথাকার তুই .... ওকারেন্ কানাম্?

তোরা কোথাকার .... আপেদ ওকারেন?

তোর বাড়ি কোথায় .... আম্ আ ওড়াঃদ ওকারে?

তোর দেশ কোথায় .... আম্ আ দিশম্দ ওকারে?

তোরা কতজন আসিয়াছিস .... তিন হড়্‌পে হেজ্ আকানা?

অনেক লোক আসিয়াছে .... আডি হড় হেজ্ আকানা ক।

আমি একাই আসিয়াছি .... ইংদ এস্কার্‌গি হেজ্ আকানা। এস্কারগ্রিং হেজ্ আকানা।

তোরা কবে দেশে যাবি .... আপেদ তিস্ দিশম্‌তে পে চোলাঃ আ?

১৪৯. তি + ইং = তিং । তুনুম— হাত দেখা।
১৫০. এহব্ — আরম্ভ হওয়া।
১৫১. এখানে "বাড়ায় আম" শব্দের অর্থ— করিয়া থাক।
১৫২. "আম্ আ জাঙ্গারেদ চেৎ হোয় আকানা" বলিলে ভুল হয় না, কিন্তু ভাষায় প্রচলন নাই।

আবার কি মাসে আসবি	.... আর্ ওকা চাঁদোতে পে হিজুঃ আ?
এ বৎসর কত টাকা উপার্জন করিয়াছিস	.... নোয়া সের্ মারেদ তিন্ টাকা এম্ কামি আকাদা?
আমি চিঠি দিলে আসিস	.... চিঠি ইং অল্লেখান্ হিজুঃ মে।
আমি চিঠি দিলে আস্‌বি ত	.... চিঠি ইং অল্লেখান্ হিজুঃ আম? চিঠি ইং অল্লেখান্ হিজুঃ আসেম্?[১৫৩]
তুই কি বলছিস	.... আম্‌দ চেৎ এম্ মেন্ এদা?
দেশে টাকা পাঠাবি	.... দিশম্‌তে টাকাম্ কোল্ আ?
কত টাকা তিন্ টাকা?	.... তিন্ আ?
কাহাকে পাঠাবি	.... অকয় এম্ কোল্ আয় আ?
কোন্ গ্রাম, ডাকঘর কোথায়	.... চেৎ আতঃ ডাকঘরদ ওকারে?
কে পাঠাইতেছে	.... অকয় এ কোল্ এদা? অকয় কোল্ এদায়?
এখানে কার বাড়িতে আছিস	.... নোডেদ অকয় আ? ওড়াঃরে মেনাম্ আ? নোডেদ মেনাম আ? নোডেদ অকয় আ? ওড়াঃরে মেনাঃ মে আ?
ডাকঘরে যা, এই কাগজ আর পাঁচ টাকা এক আনা পোষ্ট মাষ্টারকে দিস	:... ডাক্ ওড়াঃতে চালাঃ মে, নোয়া কাগজ আর মোড়ে টাকা মিৎ আনা ডাকবাবু, এমায় মে্।

*   *   *

শ্রী পতি আসছে	.... শ্রীপতি হিজুঃ কানায়। শ্রীপতি এ হিজুঃ কানা।
ভাল আছিস	.... বোগি বাড়াগি আম?
ভাল আছি, তুই কেমন	.... বোগিগি আঁইং আমদ চেৎ লেকা?[১৫৪]
তুই কবে দেশ থেকে এসেছিস	.... দিশম্ খন্ তিস এম্ হেজ্ আকানা?
তোর দাদা কেমন আছে	.... দাদাম্‌দ চিৎ লেকা মেনায় আ?
ছেলে পিলে কেমন আছে	.... গিদ্রা পিদ্রাদ চেৎ লেকা মেনাঃ কো আ?
তোদের দেশে এবার ধান কেমন হইয়াছে	.... আগে দিশমরে নোয়া সেরমারেদ চেৎ লেকা হোড়ো হোয় আকানা?
আজ তোর চিঠি লেখা হবে না	.... তেঁহেংদ আম্ আ চিঠি অল্ বাং হোয়ওঃ আ।
আজ ফিরে যা	.... তেঁহেংদ শেন্ রুয়াড়ঃ মে। তেঁহেংদ রুয়াড শেনঃ মে।

১৫৩. আ + সে = এম্ আসেম্।

১৫৪. যদি রোগী বলে ভাল আছি তাহা হইলে "বোগি বাড়ায়গি আইং" হইবে।

তবে বল, কি লিখিব	.... এন্ডেখান্ মেন্ মে, চেৎ এং অল আ। মা তবে মেন্ মে, চেৎ অল্ আঁইং।
আমার ছোট ভাইকে লেখ,	.... বক ইং অল্ আয়্ মে।

"প্রিয় ভ্রাতঃ

আমি গত কল্য ভালোয় ভালোয় এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। আশা করি, এখানে ভালরূপ কাজ পাওয়া যাইবে। তুমি বাড়ির ছেলেপিলেদিগকে ভালরূপে প্রতি পালন করিবে। মনুষ্য জীবন সুখ দুঃখে পরিপূর্ণ। আমার জন্য তোমরা ভাবনা করি ও না।

তোমার

দাদা।"

"দুলাড়িয়া[১৫৫] বকইং

হেলো ইং নায় নাপায়তেগি নোডে এং হেজ্ সেটের আকানা। আশঃ কানাইং নোডে ভাগে লেকা কামি এঁ য়ামঃ আ। আম্ ওড়াঃ রেন্ সানাম্ গিদ্রা পিদ্রা ভাগে লেকাতে আসুল কম্। মানুয়ী জীউই সুখ দুখ্‌তে পেরেঃজ আকানা। ইং লাগিংৎদ আল্অ পে ভাব্‌নাঃ আ।

আমিঃ চ্

দাদাম্"

সন্তুষ্ট হইয়াছিস	.... কুসি এনাম্?
তুই শাস্ত্র জানিস	.... ছাচ্ তোর কাথাম্ বাড়ায় আ?
কিরূপে মানুষ জন্মিয়াছিল, সেই শাস্ত্র আমাকে শুনা	.... চেৎ লেকাতে হড়্ জানাম্ লেনাক, ওনা ছাচু তোর কাথাদ আঞ্জোম্ হচইং মে।
শাস্ত্র ঐ জলার কাছে শোন	.... ছাচ্ তোর উনি জলা ঠেন্ আঞ্জাম্ মে।
সাঁওতালি শাস্ত্র	.... হড়্ ছাচ্‌তোর।

১৫৫. পত্র লিখিবার সময় দুলাড়িয়া সকলকে বলা যায়। যেমন— "দুলাড়িয়া বকইং" "দুলাড়িয়া দাদাইং" "দুলাড়িয়া আপুইং" ইত্যাদি। ইংরাজী Dear এর অনুকরণে দুলাড়িয়া শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা নাই। সাঁওতালদিগের নিজের দেশ স্বনাম খ্যাত সাঁওতাল পরগণার নানাস্থানে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকগণ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রোমান বা ইংরাজি অক্ষরে সাঁওতালি ভাষার পুস্তক ছাপিয়া শিক্ষা দান করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই "দুলাড়িয়া" প্রচলন করিয়া থাকিবেন; কিন্তু দুলাড়িয়া সাঁওতালি ভাষায় বহুকাল হইতেই আছে। মহানাদ ইউ, এফ, সি মিশন স্কুলের হেড মাস্টার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় বলেন— প্রথমে সি. এম. এস. মিশনের ক্যানন্ কোল্ সাহেব সমস্ত বাইবেল সাঁওতালি ভাষাতে অনুবাদ করেন পরে সাঁওতাল মিশনের পাদরি ক্রাপশ্রুড্ সাহেব ঐ বাইবেলের কিয়দাংশ। সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন ও অসম্পূর্ণ থাকিতেই তাহার দেহান্তর হয়। এক্ষণে ঐ মিশনের পাদরি বোডিং সাহেব ঐ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং উহাই এক্ষণে পাঠ্য পুস্তকরূপে প্রচলিত আছে। পাদরি ক্যাম্বেলের প্রণীত সাঁওতালি অভিধান আছে। শুনা যায় উহার মূল্য ৩০্ টাকা।

"সেদায় সানাম্ এখেন্ দাঃগি তাঁহেকানা। সের্মা খন্ "মারা" বুরু[১৫৬] তোড়ে সুতাম্তে চিল্উ আং[১৫৭] আঁড়গো লেনায়। আর্ দাঃ চেতান্রে সোনেগর্ মাচি[১৫৮] বেল্[১৫৯] কাতে এ দুড়ুপ্ এনায়। উনি আ বাবেয়া হড়্মো মাইলাখন হাঁস, হাঁসিল্ চ্যাড়ে কিন্ জানাম্ এনা। মারাং বুরু আ থুকুম্তে ওনা সোনেগর্ মাচি পয়রানিবাহা দারে এনা। ওনা পয়রানিবাহা স্যাকাম্ চেতান্রে উন্কিন্ বারেয়া চ্যাঁড়ে কিন্ বেলে কেদা। উন্রে ধারতী বেনাও লাগিঃৎ "মারাং বুরু" আডি আডি রাজ কয় মেতাৎ কো আ। তায়ান্ রাজা, কাট্কোম্ রাজা, ইচাঃ রাজা, গোংহা রাজা এমান্দ বাংকো দাড়ে আদা॥[১৬০] মেন্খান হররাজা আর কেুঁচুয়া রাজা কিন্ দাড়ে আদা, কেঁচুয়া রাজা পয়রানি বাহা ডার্ ভিৎরি ভিৎরিতে ও বল্অ কাতে হাসা এ বুরজ্[১৬১] রাকাব্ কেদা, আর্ হর রাজা দেয়া চেতান্রে ওনা হাসাকয় আতাং[১৬২] কেদা। নোংকাতে ধারতী বেনাও এনা। ওনা বারেয়া বেলে খন্ "পিলচু হাড়াম্" আর "পিলচু বুড়্হি" কিন্ জানাম্ এনা। হকিম্ গি সানাম্ হড়্ রেন্ আগিল্ এঙ্গা আপা।"[১৬৩]

আর কি, তবে এখন আমি .... আরদ চেৎ, এন্ডেখান্ নিংদো ওড়াঃতে চালা আইং। না, শ্রীপতি একটা গান গা .... বাং আ, শ্রীপতি মিৎটাং সেরিং মে।

লাগ্ড়ে সেরিং[১৬৪] .... সাঁওতালি সুর।

"বনেরো গুড়ুরি,[১৬৫] কি খাঁয়ে আছে বেচারি।
শিকারিতো আছে বেনা বুদা আহড়,[১৬৬]
শিকারিতো বেনা বুদা আহড়ে,
গুড়ুরিতো চরি চরি বেড়ায়।"

---

১৫৬. মারাং বুরুর অপর নাম "লিটা" ও "ধরম্গুরু"। শ্রীযুক্ত আর্নেস্ট সরেন বলেন— সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল শাস্ত্রে মারাংবুরুকে শয়তান বলা হইয়াছে, উহা ভুল।
১৫৭. চিল্ উআং—ঝুলা।
১৫৮. সোনেগর মাচি— সিংহাসন।
১৫৯. বেল্—স্থাপন করা।
শা ক + এ = কয়।
১৬০. আৎ + আ = আদা।
১৬১. বুরুজ—উত্তোলন করা।
১৬২. আতাং—গ্রহণ করা।
১৬৩. এই শাস্ত্রের যথাযথ বঙ্গানুবাদ ২য় পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য।
১৬৪. লাগড়ে সেরিং প্রায়ই বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় মিশ্রিত গান্, সাঁওতাল পরগণা বাংলা ও বিহার প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অনেক সাঁওতাল শৈশবকাল হইতেই বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে ও সাঁওতালি ভাষাতে অনেক বাংলা শব্দ প্রক্ষিপ্ত দেখা যায় এবং বাংলা বর্ণমালা দ্বারা যেরূপ বিশুদ্ধ ভাবে সাঁওতালি ভাষার উচ্চারণ প্রকাশ করা যায়, সেরূপ অপর কোন ভাষায় হইতে পারে না, সেজন্য বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইলে সাঁওতালদের পক্ষে বাংলা বর্ণমালাই সমধিক উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই।
১৬৫. গুঁড়ুরি—গুড় গুড়ে পাখি।
১৬৬. বেনা বুদা আহড়্—বেনা বোপের আড়ালে।

ও কি রকম গান বাংলা কি সাঁওতালি গান কিছু বুঝিলাম না, আর একটা খাঁটি সাঁওতালি গান গা—ওনাদ চেৎ লেকান্ সেরিং দেকো সে হড়্ সেরিং, কাটিঃ চুলুমহঁ বাইং বুবনাউ লেদা, আর মিৎটাং এখেন্ হড়্ সেরিং সেরিংমে।

বাপ্লা সেরিং। সাঁওতালী সুর।

(বিবাহের সময় এই গান হয়)

"নাপায় গো হান্ হাঁর্ ইং
নাপায় গো হোন ঝ্ হাঁর ইং

টাকা সোনাতে কিন্ কীরিং লিদিং।
সিঁদুর শাড়িতে কিন্ নাতাং লিদিং।"

অনুবাদ ঃ শাশুড়ী ভাল, শ্বশুর ভাল। দুজনে টাকা সোনা দিয়ে আমাকে কিনেছে। সিঁদুর শাড়ি (বিবাহকালীন বরপক্ষের প্রদত্ত বস্ত্র) দিয়ে এনেছে।

বাহবা, বাহবা, বাহবা, { আছা আছা আছা / লীলো, লীলো লীলো।

সম্পূর্ণ — চাবাএনা।

কালীপদ ঘোষ

সাঁওতালি ভাষা

সাঁওতাল জাতিকে আমরা জংলী বলে জানি। কিন্তু জংলী হ'লেও এদের ক্ষুদ্রভাষার মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে; এদেরও ভাষা একেবারে ব্যাকরণকে, ছাড়াতে পারেনি। তারা কারও কাছে কথা ধার করে নেয়নি। তাদের বেষ্টনীর মধ্যে যেটুকু জ্ঞান ছিল তা প্রকাশ করতে তাদের ভাষার অভাব হয়নি। কিন্তু এখন সভ্যতার যেটুকু সংস্পর্শ পেয়েছে তার মধ্যে আর তাদের নিজস্ব কিছু নেই—সব আমদানি করা কথা। এখন এদের ভাষার মধ্যে অনেক বিজাতীয় কথা আশ্রয় পেয়েছে। ভারতের যেখানেই সাঁওতাল আছে, তাদের সকলেরই ভাষা এক। তবে হয়ত এটুকু প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হতে পারে।

তারা চিরদিন পাহাড়, জঙ্গল, গাছ, পাতা প্রভৃতি দেখে আসছে, সেইজন্য তাদের ভাষায় ও সব কথার অভাব হয় না।

যেমন—

গাছ = দারে	জঙ্গল = বীর	মেঘ = রিমিল
পাতা = সাকাম্	পাহাড় = বুড়	চাঁদ = চাঁদোবোঙ্গা
কাঠ = সাহান্	আকাশ = সেরমা,	
ফুল = বাহা	নক্ষত্র = ইপিল	

তাদের ব্যবহার্যের মধ্যে লোহা সোনা, রূপা ছিল না, তাই লোহার সাঁওতালি নাম মেড়্হেন। কিন্তু সোনা রূপাকে তারা সোনা রুপাই বলে।

অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তারা লোহার জিনিষই ব্যবহার করত আর তাতে অনেক রকম জিনিষ হত।

যেমন—

টাঙ্গি = কাগি	কুড়ল = বুড়িয়া
বর্শা = বরছি	কাটারি = দাতরুম (সঃ দাএ = দা)
গাইতি = কাঁকুয়া	কোদাল = কুড়ি

তাদের খাদ্যও তখন অতি সাদাসিধা ধরনের ছিল। ধানের চাষ তারা জানত, কিন্তু এখনকার মত এত রকম তরকারি তাদের ছিল না। খাদ্যের মধ্যে তেতুল, নুন, মাছ, মাংস, ভাত, বুনোআলু নানা প্রকারের শাক। তাদের তরকারির নাম—

বেগুন = বেঙ্গার	মাছ = হাকু	শাক = আড়া
তেতুল = যজ,	মাংস = জীল	ভাত = দাফা
নুন = বুলুং	ডিম = বিলি,	তরকারি = উতু

কিন্তু ডাল, পান, সুপারি, কপি ইত্যাদির নাম তাদের ভাষায় নেই বোধ হয়। শুদ্ধ কলাই সিদ্ধ করে খেত। তাই কলাই এর সাঁওতালি নাম উপি।

তাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে গাই বলদ, ঘোড়া, ভেড়া আর মহিষ ছিল, কারণ এইগুলির নাম সাঁওতালি ভাষায় পাওয়া যায়।

গাই = ডাংরি	ঘোড়া = সাদাম,	কুকুর = সীতা
বাছুর = মিহ	ছাগল = মেরম্	বানর = ডাংরা,
ভেড়া = মেড়াহি।	মহিষ = কাড়হা।	বলদ = ডাংরা

তাদের জঙ্গলের মধ্যেও যে সব জান্‌ওয়ার দেখতে পেত তারও নাম এদের ভাষায় পাওয়া যায়।

ব্যাঘ্র = তারুপ
শৃগাল = তুইয়ু
হনুমান = গোড়ি ইত্যাদি।

এদের পরিধানের শুদ্ধ কাপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না, কারণ আর কিছুর সাঁওতালি নাম আমরা পাই না। কাপড় = লুগরি। এ ছাড়া আমরা জামার একটা সাঁওতালি কথা 'দত' পাই। আমার মনে হয় এটা সাঁওতালরা এক রকম গাছের ছালকে পিটিয়ে গেঞ্জির মত করে। পরে তা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে জুতা ছাতা প্রভৃতির চলন হয়েছে। কিন্তু তার সাঁওতালি কথা জুতোম্ আর ছাতোম্।

তেলের মধ্যে এরা সরিষা; কোঁড়ো আর রেড়ির তৈল দেখে এসেছে। সুতরাং এই কটারই কথা পাওয়া যায়।

তেল = সুনুম	কোঁড়ো = কুঁইন্তি
সরিষা = তুড়ি	রেড়ি = মারা

এরা বোধহয় বারবারই চাষ করত, তাই ধান সংক্রান্ত সব কথা এদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়।

ধান = হুড়	পাছড়ান = গুম্
জমি = বৈহাড়	ধান ঝাড়া = কোতায়
ধানের শিষ = হুড় গেলে	ধানের আগড়া = পেটেই।

এদের মধ্যে আগে বোধহয় কোন যানের ব্যবস্থা ছিল না, তাই কোন গাড়ির ক া এদের ভাষায় পাওয়া যায় না। আরও বোধহয় এরা পূর্বে লাঙল চাষ করতে জানত না, তাই লাঙলের কোন সাঁওতালি কথা নাই।

ঘরের মধ্যে সব কুঁড়ে ঘর। সুতরাং তারই কথা এদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু পাকা ঘরের বা ইঁটের কথা এদের ভাষায় পাওয়া যায় না।

ঘর = ওড়া	
দড়ি = বারের	বাঁশ = সাচট্

এদের শোবার জিনিষের মধ্যে শুধু এক খাটিয়া আর যদি থাকে ত কাঁথা। কিন্তু কাঁথাও বোধহয় তাদের নিজস্ব নয়। কারণ সাঁওতালি খান্তা কথাটা প্রায় কাঁথারই কাছাকাছি।

ঘাট = পারকোম,	কাঁথা = খান্তা

এরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই বড় সঙ্গীতপ্রিয়। যখন এদের মেয়েরা সারাদিন পরিশ্রমের পর স্তিমিত সন্ধ্যালোকে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি যায়,

তখন এদের সেই শান্ত হাস্যময় মুখছবি দেখে মনে হয় এরাই বুঝি জগতে সুখী। পুরুষেরা সুখে গান খুব কমই গায় তারা শুধু বাঁশিতে আর একতারায় গান করে।

গান = সেঁরেই বাঁশি = তিরিও

একতারা = বানাম্

বর্তমান কালে এদের সব কথায় কানা যোগ হয়ে থাকে যথা—

যাচ্ছে = চলাকানা, খাচ্ছে = মোম্‌কানা, নিচ্ছে = ইদিকানা

ভবিষ্যত কালে 'য়া' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাবে = চলায়া, খাবে = জোম্‌য়া, নিবে = ইদিয়া

অতীত কালে অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়া অনুসারে 'এনা' ও 'কেয়া' যোগ হয়ে থাকে যথা—

গিয়েছিল = লোওলেনা (অকর্ম), খেয়েছিল = জেমরেয়া,

নিয়েছিল = ইতি কেয়া

কাউকে কিছু করতে বলবার সময় (অনুজ্ঞায়) 'মে' যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যা = চলামে, খা = মোম্‌মে, নে = ইদিমে

প্রথম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালে আঁই যোগ হয়ে থাকে, যথা—

যাব = চলা যাই, খাব = জোম আঁই, নোব = ইদি আঁই।

এক বচনে ও বহুবচনে সব এক, কিন্তু কাউকে আজ্ঞা করবার সময় বর্তমান কালে দ্বিবচনে বিন ব্যবহৃত হয়, যথা—

ঠেল = ঢাকায় বিন্।

বিশেষ্য ও 'কানা' যোগে ক্রিয়া হয়ে থাকে, যথা—

তরকারি = উতু, তরকারি করছে = উতুকানা

আমাদের যেমন থেকে, ওদের তেমনি সেই স্থলে 'খাম' ব্যবহৃত হয়। যথা—

পাহাড় থেকে আসছি বুড়খন আপু কানা

আমাদের 'তা হলে', অর্থে ওদের 'খাম' ব্যবহৃত হয়। যথা—

কাজ কর নেলে অনুপস্থিত করব

কামিমে বাংখান্ লাগা মিয়াই।

ধান শুকালে ভাত হবে—হুড় রোহর লেনখান দাকা হুই উয়া

এদের গানের চরণে মিল না থাকলেও একেবারে ভাবের অভাব থাকে না। হাসির গানও এদের মধ্যে যথেষ্ট আছে।

ঘেদায় ইঙ্গায় তিকিন্; ঘেদায় নাপুন তিকিন্

তোয়া তাবিন্ তিকিং হারালিদিয়াকিন

আর বছর আমার বাবা ছিল, মা ছিল, দুধ চিঁড়া ছিল, এ বছর কে আমায় খেতে দিবে?

হাসির গান—

বুড়ুরে সিং আড়া, দাড়ে দে বাং

কচারে লাবোয় গিয়ে তেজ্জাংগে বাং

পাহাড়ে সজিনার শাক আছে; তুলতে পারছি না। ঘরের কোনে মুরগিটা রয়েছে ভগ্নীপতি নেই যে মেরে দেয়।

এ গানটা শুন্‌লে এরা হেঁসে অস্থির হয়ে পড়ে

মোটের উপর আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ভাষাটাকে বেশ একটা লিখবার ভাষায় পরিণত করতে পারা যায়, যদি অক্ষরগুলো তৈরি হয়।

অক্ষর তৈরি সম্বন্ধেও একটু গোল আছে। আমাদের অক্ষরে লিখ্‌লে সব কথার উচ্চারণ ঠিক হবে না। দু-একটা অক্ষর বদলাতে হবে, যেমন পেয়েছিস্ ঞ্জামলেয়া? এর বানান 'ঞ্জ' দিলে কতকটা হয়, কিন্তু এরা যে নাকের ভিতর থেকে একটা সুর বার করে তা হয় না।

প্রবাসী ১৩৩০, বৈশাখ

মোহম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী
সাঁওতালি ভাষা

বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রী কালীপদ ঘোষ মহাশয় সাঁওতালি ভাষা নামধেয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কালীপদ বাবুর প্রবন্ধোক্ত কোন কোন সাঁওতালি শব্দের সহিত বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের আশ্চর্য জনক সাদৃশ্য রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। চির-অসভ্য বুনো সাঁওতালিদের ভাষার শব্দের সহিত বাংলা ও সংস্কৃতের এরূপ অপূর্ব সাদৃশ্য কোথা হইতে কি প্রকারে সংগঠিত হইল তাহা ভাবিবার বিষয় বটে আমরা ভাষা তত্ত্ববিদ্‌দের সুবিধার্থে এস্থানে কালীপদ বাবুর প্রদত্ত কোন কোন শব্দের আলোচনা করিতেছি।

বাংলা	সাঁওতালি	সংস্কৃত
গাছ	দারে	দারু
কাটারি (দা)	দাত্‌রুম্	দাত্র
কাঁথা	খান্তা	কন্থা
ঘাট	পারকোম্	পর্যঙ্কম্
ব্যাঘ্র	তারুপ	তরক্ষু

বাংলা	সাঁওতালি
কোদাল (কুড়াল)	কুড়ি
বেগুন	বেঙ্গার
চাঁদ	চাঁদোরোঙ্গা
যাব (চলে যাইব)	চলা যাঁই
বর্যা (বল্লম)	বর্‌ছি

বিশুদ্ধ বাংলা	সাঁওতালি	দেশজ বাংলা (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)
গাই	ডাংরি	দাম্‌রি
বলদ (গোরু)	কাংরা	দাম্‌রা
ভেড়া	মেড়হি	মেড়া

সাঁওতালগণ ছাগলকে 'মেরম্' বলে, পূর্ব বাংলায় ভেড়াকে মেড়া এবং ভেড়ীকে মেড়ী বলিয়া থাকে। পাহাড়কে সাঁওতালিরা "বুড়" বলে, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত কোন কিছুর উচ্চতা ও বিস্তৃতিজ্ঞাপন 'বুউড়া' ও 'বুউড়' শব্দের সহিত 'বুড়ুর' সুন্দর মিল রহিয়াছে। ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে উলুস্তূপ মাটির টিলা অথবা অন্য কোন জিনিসের স্তূপকে সময় সময় বুউড় বা বউড়া বলে, যথা—"ঐ উলুর বউড়াটা অত্যন্ত উঁচু" 'ওখানে একটা ধানের বউড় দিয়াছে' অথবা বউড় শব্দ ভূরি শব্দের রূপান্তর কি তাহা সুধীবর্গের বিচার্য।

সাঁওতালিরা বাঁশকে "মাচট্" বলে, আমরা বাঁশকে মাচ না বললেও বাঁশের দ্বারা মাচা বা মাচান তৈয়ার করি।

জঙ্গলকে সাঁওতালিরা বীর বলে ফার্সীতে কোন পতিত, অনাবাদী মনুষ্য সমাগম রহিত, পরিত্যক্ত অথবা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানকে বীরান বলে। ঘোড়াকে সাঁওতালিরা সাদোম্ বলে; ফার্সীতে বোধ হয় সাতক বলে। যথা—"সে সাতক দৌড়ায়।"

প্রবাসী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

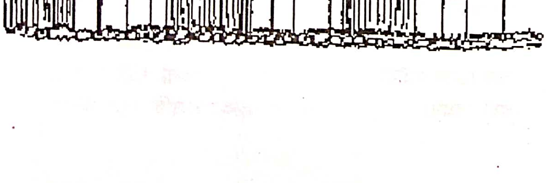

সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত

সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব

ঠিক কোন্ সময়ে সাঁওতালেরা ভারতে এসেছিল তা জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তারা হিমালয় থেকে এসেছিল, আর বাংলা বিহার ওড়িশায় এসে বাস করেছিল। কেউ বলেন তারা সাগর পার থেকে এসেছিল। আবার কেউ বলেন সাঁওতালেরা ভারতেরই আদিম বাসিন্দা। এটা নিশ্চিন্ত যে তারা এই ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী হতে বসবাস করছে। অনুমান যে আর্যগণের ভারত অধিকার করবার পূর্ব হতেই তারা ভারতে ছিল।

বিহারের ছোটোনাগপুর বিভাগে, সাঁওতাল পরগণায়, ওড়িশায় বালেশ্বর জিলায় আর ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে, প্রাচীন বঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায়, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলায় সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকাদি হতে বুঝতে পারা যায় যে, মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে, সাঁওতালদের আদি বাসস্থান, অন্তত আদি ও দীর্ঘকালস্থায়ী উপনিবেশ ছিল। মেদিনীপুর জিলার এই অংশ, ইংরাজ অধিকারের প্রথমে 'জঙ্গল-মহল' নামে স্বতন্ত্র জিলারূপে শাসিত হত। জঙ্গল-মহলকে বিচ্ছিন্ন করে, কতক অংশ মানভূমে, কতক বীরভূমে, কতক বাঁকুড়ায় আর বেশির ভাগ মেদিনীপুর জিলার সঙ্গে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রিঃ অব্দের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

পূর্বে মনে করতাম যে সাঁওতালি বুঝিবা খাঁটি বা অবিমিশ্র ভাষা। এরকম মনে করা ভুল। কোনো জীবন্ত ভাষার পক্ষে স্বীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব। বিবিধ সভ্য ও বর্বরজাতির সহিত সংঘর্ষে ও সাহচর্যে সাঁওতালদের জাতীয় প্রকৃতির যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাহাতে ভাষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। আদিম ও বর্বর সাঁওতাল এখনও ওড়িষার পার্বত্য প্রদেশে বর্তমান। এখনও তারা কাপড় পরে না, বল্‌কলেই লজ্জা নিবারণ করে। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে, সাধারণ হিন্দু চাষি ও গৃহস্থের তুল্য সাঁওতাল চাষি ও গৃহস্থের অভাব নাই। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ডেপুটি, কেরানি, স্কুল-মাস্টার সাঁওতাল, সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জিলায় বিরল নহে। সুতরাং সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নহে।

রেল, কারখানা, মিশন, আইন-আদালত, দোকান, মহাজন, এ সবের আমলে আসে নাই এমন জাতি বা সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনেক ইংরাজি, বাংলা হিন্দি শব্দ তাদের ভাষায় জোর করে ঢুকেছে। তাদের বেছে বার করা কঠিন নয়। তাদের ভাষাও এখন আর সমস্ত জীবন্ত ভাষার মত মিশ্রভাষা। আমার অনুমান হয়, 'আদি ও অকৃত্রিম' সাঁওতালি ভাষা এখন লুপ্তপ্রায়।

আদিতে আর্যের সহিত সংঘর্ষের ফলে অনেক সংস্কৃত শব্দ সাঁওতালেরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তিরধনুকের এমনি অপ্রচলন আজকালকার যুগে, যে, আমরা মনে করি যে, ওটা বুঝি বন্য ও পার্বত্য জাতিদের নিজস্ব অস্ত্র। ভাষা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ওই অস্ত্রও ধার করা। তিরধনুকের সাঁওতালি প্রতিশব্দ নাই। 'তির'কে বলে 'শর', আর ধনুককে বলে 'জ্যা' ; একেবারে খাঁটি সংস্কৃত। অপর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'কাঁড়' কার্মকেরই অপভ্রংশ ; আর ধনুক

হল 'বাঁশ; 'বংশ' আর খুঁজতে হয় না। আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু একথা সত্য যে, প্রচলিত সাঁওতালি ভাষায়, সংস্কৃত শব্দই সর্বাপেক্ষা বেশি—সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। পূর্বেই বলেছি যে অনেক বাংলা, হিন্দি ও ওড়িয়া শব্দ সাঁওতালি ভাষায় সম্পদবৃদ্ধি করেছে।

প্রদেশভেদে একই শব্দের রূপান্তর দেখা যায়। বীরভূমের সাঁওতাল রাস্তাকে বলে 'কুলহি'। কুলি বাংলা শব্দ। মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর থানার আর বালেশ্বর জিলার সাঁওতালেরা, পথকে বলে 'দান্ড'। আপনারা পুরী শ্রীক্ষেত্রের 'বড়োদান্ড' শুনিয়াছেন।

সাঁওতালকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'সাঁওতাল, ওড়িশায় বলে 'সাঁতাড়', বীরভূমে বলে 'মাঝা'। নিজেদের মধ্যে বলে 'হড়'। 'হড়' বা 'হর' খাঁটি কোলারীয় শব্দ। সাঁওতাল ও কোলেরা নিজেদের বলে 'বীরহর'। 'বীর' মানে জঙ্গল, যার থেকে, কেউ কেউ বলেন, 'বীরভূমির' নাম হয়েছে; আর 'হর' হল মানুষ। 'বীরহর' মানে 'জঙ্গলের মানুষ' আমরা যেমন সাধারণ কথায় বলি 'জংলি'।

স্ত্রীলোক বলতে কিন্তু 'কুঁরি', বাঙ্গালা ও সংস্কৃত 'কুমারী'রই সাঁওতালি রূপ। বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে 'মাইজু' বা 'ওইরা'। 'মাইজু,' হিন্দি 'মাই', 'মাইজির' রূপান্তর। 'ওইরা' কি 'উহারা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ? ভাবিবার বিষয়, কারণ সাঁওতাল বা কোল নিজের স্ত্রীর নাম লয় না।

ছেলেপিলাকে বলে 'গিদিরা' বা 'হপন'। গিদিরা কি 'ক্ষুদ্র' হইতে আসিয়াছে? কিন্তু পুত্র সন্তানকে বলে 'কোরা গিদিরা', 'কোরা' নিশ্চয়ই 'কুমারের' রূপান্তর। কন্যাকে সেইরূপ বলে 'কুরি গিদিরা'। 'হপন' কেবল শাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ভালুক ছানা, 'বনাহপন'।

সাঁওতালেরা বাসঘরকে বলে 'বাস'। গ্রামের নামের অন্তে সেইজন্য 'বাসা' প্রায়ই পাওয়া যায়। আমাদের নিকটেই ভালু 'বাসা' আপনারা জানেন। 'চাইবাসা'তে ওই 'বাসা'। রাখাল বা গোপালককে সাঁওতালেরা বলে 'গুপি'। হলচালনকারীকে বলে 'চাষা'। এর থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে আদিম অবস্থায়, এরা হলচালনা করত না, ঘর বেঁধে থাকত না, গোপালন করত না।

দেবদেবীর নাম বেশি নাই। দেবতা, ঠিক ঠিক বলতে গেলে অপদেবতা, মহাশয়দের সাধারণ নাম 'বোঙ্গা'। খুব বড়ো দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বরকে বুঝাইতে গেলে 'সিং বোঙ্গা'। 'সিং' সিংহ থেকে। সিংহ বনের প্রবল প্রতাপশালী, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। হিন্দুর নিকট ধার করা 'চণ্ডী' দেবতাকেও 'চণ্ডীবোঙ্গা' হতে হয়েছে।

সাঁওতালেরা বোধ হয়, সৃষ্টির আদি থেকেই নৃত্যগীত ও বিলাসপ্রিয় ও সৌন্দর্যের উপাসক। সেই জন্যই বোধ হয়, চন্দ্র তাদের প্রিয়। চন্দ্র ও সূর্যের নামকরণের সময়, আগে চন্দ্র হ'লেন 'চাঁদো'; সূর্য উষ্ণতর ও উজ্জ্বলতর, সুতরাং তিনি হলেন 'সিং চাঁদো'। মাসও 'চাঁদ' এক মাস, দু মাস হল, 'মিত চাঁদ' 'বারেয়া চাঁদ'। 'আগুন'কে বলে 'সেঙ্গেল'—অগ্নির ধ্বনি আছে। বাসগৃহকে বলে 'ওরা'—গৃহের ধ্বনি বর্তমান।

গৃহপালিত জীবজন্তুর মধ্যে তাহাদের প্রধান হচ্ছে মুরগি,—বলে 'সিম'। অনেক সাঁওতাল বলে 'কুকড়া' কুক্কুটের—হিন্দি সংস্করণ। আর সব প্রায়ই ধার করা, যেমন—

গাভি—গাই। গাধা—গাধা। উট—ঔট

পাখি—'চেড়ে'—হিন্দি উর্দুর চিড়িয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ।

ষণ্ড—'আন্ডিয়া'—এঁড়ে হইতে মনে হয়।

কুকুর—সেতা

ছাগল—মেরোম—ধ্বনিবাচক শব্দ। ম্যাড়া পাঁঠা বাংলায় চলিত আছে।

'হরিণ' কিন্তু 'জেল'—সিং এর নামে জন্তুর নাম।

অশ্ব—সাদম—আরবি থেকে কোন্ কালের ধার করা জানা যায় না।

সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের চিহ্ন এখন ধরা কঠিন। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে সাঁওতালরা আর্যগণের নিকট গণনা শিক্ষা করেন। এক হইতে দশ পর্যন্ত সংখ্যায়, বাংলা বা সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না। অন্য কোনো ভাষার প্রতিধ্বনি আছে কি না, অভিজ্ঞেরা বলতে পারেন।

এক—মি	পাঁচ—মোনে	নয়—আ-রে
দুই—বারেয়া	ছয়—তুরুই	দশ—গেল
তিন—পে-আ	সাত—এ-আ-এ	
চার—পোনে-আ	আট—ই-রা-ল	

তবে বিশ বা কুড়িকে বলে 'ইসি', বিশ বা বিংশ থেকে এসেছে বলা যায়। আবার কুড়ির ঊর্ধ সংখ্যাবাচক শব্দগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত। যেমন চল্লিশ 'বার ইসি', কিন্তু পঞ্চাশ হ'ল 'বার ইসি গেল' অর্থাৎ দুকুড়ি দশ। তেমনি একশত, 'মোনে ইসি' অর্থাৎ পাঁচ কুড়ি। সাধারণ সাঁওতালেরা কুড়ির বেশি গুণিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত সভ্য সাঁওতালেরা একশকে প্রদেশভেদে বলে 'শয়, শত, বা শ'—ওড়িয়া, হিন্দি ও বাংলার চলিত রূপ।

তারপর সর্বনাম দেখা যাক। 'আমি', সাঁওতালি 'ইঁঈএ'—অহং-এর স্পষ্ট ধ্বনি আছে। 'আমরা'—'আনে' বা 'আবানে'—'আবাম' পরিচয় দিচ্ছে। 'তোর' বা 'তোমার' বলিতে, 'তস' ত্বং-এর মূল। তোমাদের বলিতে 'তাবেন' সং তাভ্যাং-এর ধ্বনি আনে অর্থ না আনুক। 'আপনি' বলিতে 'আপে' তে ভবান বা আপনির চিহ্ন বর্তমান। আপনার বলিতে 'তাপে' তে 'তব' রহিয়াছে, খুঁজিতে হয় না। 'তিনি' বলিতে 'হুনি'—উনিরই প্রকারভেদ। তাহার বলিতে 'তায়' এতে তাহার বা তস্যর গন্ধ আছে।

দেহ ও অঙ্গবাচক শব্দে 'পা' অর্থে দেহের নিম্নদেশ। কোমরকে 'কটা', জঙ্ঘাকে 'জাঙ্গা' বলে। মূল সহজেই ধরা দেয়। নাসিকাই মুখমণ্ডলের প্রধান শ্রী ও অবয়ব। সেই জন্য 'নাক' বালিতে তারা 'মু' বলে। মুখগহ্বরকে বলে 'মোকা'; মুখ ধরা পড়ে। দাঁতকে বলে— 'ডাটা'—দন্তের ধ্বনি আছে। কেশকে বলে 'উপ্'। 'জিভ'কে বলে 'আলা'—তালুর অপভ্রংশ বলে বোধ হয়। পেটের মধ্যে নাভিই লক্ষ্য; পেটকে তাই সাঁওতালেরা বলে 'লাই'।

ধাতুর মধ্যে লৌহ, হল 'মেহেঁ'—মূল ধরতে পারিনি। সোনা হল 'সামানম' স্বর্ণের অপভ্রংশ রৌপ্য হল 'রূপা'—বাংলা শব্দ। আর কোনো ধাতু তারা জানত না।

সম্বন্ধবাচক শব্দে আগাগোড়া সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের আকৃতি বর্তমান— যেমন ঃ

বাংলা	সাঁওতালি
বাবা	বাবা বা আপু
মা	মায়ো, এঙ্গা
ভাই	দাদা বা ভাইয়া
দিদি	দাই

নিচে কতকগুলি শব্দের তালিকা দেওয়া গেল। এগুলিতে বাংলা ও সংস্কৃতের যেরূপ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, উচ্চারণ করিলেই তা বুঝতে পারা যায়।

সাঁওতালি	বাংলা	সংস্কৃত ধাতু বা শব্দ
সেন	যাওয়া	আস ধাতু
হিজু	এখানে এস	আগচ্ছ বা ইহা গচ্ছ
জম	খাওয়া	ভুজ ধাতু
ডাল	প্রহার করা	দণ্ড ধাতু
দুরুপ	বসা	উপ-বিশ ধাতু
তিঙ্গু	দাঁড়ানো	দণ্ড ধাতু
গুজু	মৃত্যু হওয়া	গতাসু বা গত
এম	দেওয়া	দা—মি
চেতন	উঁচু	উচ্চতম
থেঁরে	নিকটে	স্থা ধাতু,
ওকোএ	কে ও	কঃ অয়ং
চেৎ কো	কী?	কিম? চিৎ?
চাহ / চেদা	কেন	চিৎ কং?
আদো / আর	এবং / আর	এবং
মেনখান	কিন্তু	কিন্তু
ইদু	যদি	যদি
হুঁ, হো	হাঁ	
আড় বাং	না	মা
এহে ওহো	আহা!	
উশুন	উঁচু	উচ্চ
ক্রিং	কেনা	ক্রী ধাতু।

আরও উদ্ধার করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করা যাবে। তবে একটি কথা বলা দরকর মনে করছি। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় অনভিজ্ঞ—প্রধানত তাঁরাই সাঁওতালি ভাষায় অভিধান সংকলন করেছেন। ইংরাজি হরফে তা ছাপা হয়েছে। বাংলা সরল সাঁওতালি শিক্ষা যা দেখা যায় তার মূলও ইংরেজি। সাঁওতালি ভাষার কোনো অক্ষর নাই। মিশনারিগণ সাঁওতালি এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাষা মনে করে, সাঁওতালি শব্দের রূপ এমন পরিবর্তন করেছেন যে তা দেখলেই নূতন শিক্ষার্থী ভীত হবেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা, সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ, সাঁওতালি ও অন্যান্য কোলারীয় ভাষার আলোচনা করলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাবেন।*

ভারতবর্ষ মাঘ ১৩৩৩

---

* *জেমসেদপুর সাহিত্য সভার সাধারণ অধিবেশন পাঠিত।*

পরিমল হেমব্রম

বাংলা-সাঁওতালি শব্দের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ

...অতুল সুর তাঁর "বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন—"প্রাক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরাই বাংলার প্রকৃত অধিবাসী। তারা (প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) যে ভাষায় কথা বলত তাকে অস্ট্রিক ভাষা বলা হয়। অস্ট্রিক বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এই ভাষার বিস্তৃতি ছিল পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত।" তাই সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন ভাষার মধ্যে অস্ট্রিক ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য, সাঁওতালি হল এই অস্ট্রিক ভাষারই প্রতিভূ। সাঁওতালিকে কোল গোষ্ঠীর বা মুণ্ডারী গোষ্ঠীর ভাষাও বলা হয়। ইতিহাসে পাওয়া যায়, আর্যপূর্ব যুগে এই বাংলা দেশের সর্বত্র প্রায় দ্রাবিড় বা প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর ব্যাপক বসতি ছিল। ফলে অস্ট্রিক ভাষারও প্রচলন ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সারা ভারতব্যাপী এই অস্ট্রিক সভ্যতাই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন গ্রাম, জনপদের নাম বিশ্লেষণ করলে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়।

ড. নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন—"বাঙলার প্রাচীন জনপদ বিভাগের মধ্যে পুণ্ড্র-পৌণ্ড্র, তাম্রলিপি—তাম্রলিপ্তি—দানলিপ্তি এবং বোধহয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর অন্তত এই দুটি নদীর নামও কোল—দাবদাক্ এবং দাম-দাক্ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্-জল এবং দা দাক্ হইতেই সংস্কৃত উদক্। অস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, গ্রাম, জনপদ ইত্যাদির নামকরণ করিয়াছিল এ অনুমানই তো যুক্তি ও ইতিহাস সম্মত।"

সুতরাং সাঁওতালি যে প্রাচীন ভাষা ও বাংলা থেকে বহু প্রাচীন এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। সম্প্রতিকালের ভাষাবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সংস্কৃতজাত ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে দেশি শব্দের প্রায় ষাট শতাংশ শব্দই সাঁওতালি শব্দ থেকে গৃহীত বা উদ্ভুত। ধীরেন্দ্রনাথ বাস্‌কে তাঁর "সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—"ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের বিচারে অস্ট্রিক শব্দ ভাণ্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণে শব্দরাশি আর্যভাষাগুলি নিশ্চিন্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বাংলা ভাষার শতকরা ৪৫টি এবং সংস্কৃত ভাষার শতকরা ৪০টি শব্দই বোধহয় অস্ট্রিক ভাষা থেকেই গৃহীত।" গবেষক পরিমলচন্দ্র মিত্র তাঁর 'Santhali : The base of world language" দেখিয়েছেন (কোল) (সাঁওতালি) ভাষার শব্দ কীভাবে সংস্কৃত ও পালির মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে ঃ

ইংরেজী	কোল	সংস্কৃত	পালি	বাংলা
Arm	বাহি	বাহু	বাহা	বাহু
Urban place	পুরি	পুরো	পরো	পুরি
Womb	জাহুরায়ে	জরায়ু	জোলাবু	জরায়ু
Treatment	চিকিসা	চিকিৎসা	তিকিছা	চিকিৎসা
Image	পুত্রি	প্রোতিমা	পোতিমা	প্রতিমা

ইংরেজী	কোল	সংস্কৃত	পালি	বাংলা
Animal	পসু	পোসু	পসু	পশু
Thought	চিন্তা	চিন্তা	চিন্তা	চিন্তা
Worship	পুচান	পুজোন	পূজা	পূজা
One	একা	একম্	একো	এক
Two	দো, দু	দৌ	দ্বি	দুই
Three	তে / তি	ত্রি	তি	তিন
Four	চারি, চৌ, চো	চৌ	চোতু	চার
Five	পাঁচ	পঞ্চো	পানচা	পাঁচ
Six	ছোহা, চোহা	ষোষ্টো	ছা	ছয়
Seven	সাত	সপ্ত	সাত্তা	সাত
Eight	আট	অষ্ট	আস্থা	আট
Nine	লো	নবম্	নভ্	নয়
Ten	দোস	দশম	দোসো	দশ

"সামান্য ভাষা বিজ্ঞান" গ্রন্থে বি. আর. সাক্সেনা বলেছেন—"ভোজপুরী, মগহী আউর মৈথিলী ইন বিহারী বোলিয়ে যে ক্রিয়া কি জটিলতা মুণ্ডাকে হি প্রভাব কা পরিণাম ভ্যান পড়তি ভ্যান পড়তি হ্যায়।" মুণ্ডা অর্থে মুন্ডারী। সাঁওতালি মুন্ডারী গোষ্ঠীর প্রধান ভাষা। ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে আর্য ভাষা আগমনের পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা আস্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা ব্যবহার করত। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বাংলাদেশে, উড়িষ্যায় এবং মধ্য ভারতের অনেক অংশে অস্ট্রিকভাষী অস্ট্রালয়েডদের বসবাসই ছিল সমধিক। অস্ট্রিক ভাষী অস্ট্রালয়েডের সভ্যতা ছিল একান্তভাবে গ্রাম কেন্দ্রিক। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যে, বাংলা লৌকিক মানস প্রকৃতিতে অস্ট্রিক ভাষী অস্ট্রালয়েড অনার্য প্রভাবই ছিল সর্বাধিক।

আনুমানিক দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে চর্যাপদ লেখা হয়। "যে ভাষায় চর্যাগীতি-গুলি লেখা হয়েছিল তা পণ্ডিতেরা মোটামুটি সাব্যস্ত করেছেন যে তাতে বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরানো রূপ প্রতিফলিত আছে" (ড. সুকুমার সেন : পূর্ব ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ও সেগুলির আন্তঃ সম্পর্ক (প্রবন্ধ) [পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'পূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা' গ্রন্থ]

এই চর্যাগীতি গুলিতেও সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

"**ঘুন্তি** উপাড়ি মেলিনি কাছি
বাহত কামলি সদগুরু **পুচ্ছি**"

আবার :

"**তান্তি** বিকণত ডোম্বি আবরনা **চাংগেড়ে**
তোহর অন্তরে ছাড়ি নড় পেড়া।'

আদি মধ্যযুগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"। এই গ্রন্থেও সাঁওতালি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতেও সাঁওতালি শব্দের ব্যাপক ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন, মনসা মঙ্গল কাব্যে আছে :

"পাপ কর্মের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী
বিয়ার রাত্রে মৈল স্বামী, হিলাম কাঁচা **রাণ্ডী**"

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

"আশ্রম **পুখরি** আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈলুঁ কুমুদ প্রসূনে"

অন্যত্র রয়েছে :

"আমার **জোহার** ঘুড়ি কালি দিহ বাকি **কড়ি**
যাই অন্য বণিকের বাড়ি।"

চণ্ডীমঙ্গলের আর এক কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী :

"বুলন মণ্ডল সঙ্গে বাইশ হাজার
কান্দিতে কান্দিতে বীরে করিল **জোহার**।"

চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি মানিক দত্ত :

"আমারে বোল ভানরে বুড়িরে আমারে বোল ডান
কার খাইনু ভাতার পুত কার করিনু হান।"

ভারতচন্দ্র রায়ের "কালিকামঙ্গল"—

"গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ি কড়ে **রাঁড়ী** কথা কয় ছলে।।"

এবার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল যা থেকে বোঝা যাবে কীভাবে সাঁওতালি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা
আড্ডা	আড্ডা	ঠন্টা	ঠোঁট
উজাড়	উজাড়	ডাকাও	ডাকা
উসকাউ	উসকানো	ডগ্	ডগ্
কোন্দল	কোন্দল	ডামাডোল	ডামাডোল
কিলাউ	কিল	টিঙ্কি	ঢেঁকি
কিরিয়া	কিরা	তাগড়া	তাগড়া
কুলহি	কুলি	নিরেট	নিরেট
খামচাও	খামচানো	বাছাও	বাছা
খাঞ্চা	খাঁড়া	বিটি	বেটি
খাটো	খাটো	মচকাও	মচকানো
খাটালি	খাটুনি	দুড়কা	দুড়কা

সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা
ঘুন্টি	ঘুঁটি	দল	দল
গাঁ	গাঁ	ধমকাও	ধমকানো
গাদা	গাদা	ফারচা	ফর্সা
চালা	চালা	বাতা	বাতা
ছেঁদড়	ছেঁচড়	ভিটা	ভিটা
জাঁকজমক	জাঁকজমক	রগড়াও	রগড়ানো
ঝকমারিয়া	ঝকমারি	ঝাঁজর	ঝাঁজর
ঝাঁপ	ঝাঁপ	ঝিল	ঝিল
টুকরী	টুকরা	টাটি	টাটি

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে সাঁওতালির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সময় থেকে দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চৈতন্যদেব যখন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে প্রেমধর্ম প্রচার করেন তখন বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের ফল দ্রুত দেখা গেল। হরি নাম নিয়ে দলকে দল আদিবাসী বিচিত্র ভাবে হিন্দু সমাজের অঙ্গ হয়ে গেল। বহু সাঁওতাল, মুণ্ডা বৈষ্ণব হয়ে দাস উপাধিতে শেষে হিন্দুই হয়ে গেল। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব শব্দের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রেও দেখা গেল। হিন্দু হয়ে যাওয়া সাঁওতালদের মধ্যে বাংলা গ্রহণের প্রবণতা দেখা গেল। ফলে ধীরে ধীরে সাঁওতালির ব্রাত্য হওয়া শুরু হয়।

সুদীর্ঘ ইংরেজ শাসনে গ্রামীণ সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়। ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতির ধীর প্রবেশ ঘটতে থাকে। বাংলার মধ্যে পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। ফলে বাংলার কাছ থেকে সাঁওতালি ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকার আসার পরই তৈরি হয় আদম সুমারি। Scheduled Caste আর Scheduled Tribe-এর হিসেবে। তখনই হিন্দু আর আদিবাসী সমাজের মধ্যে গড়ে ওঠে সুউচ্চ প্রাচীর। বাংলা ও সাঁওতালির মধ্যে দীর্ঘ সহাবস্থানেও ঘটল দীর্ঘ বিচ্ছেদ। বাঙালি ধীর গতিতে পাশ্চাত্যকে আপন করতে শুরু করে এবং এর প্রভাব পড়ে বাংলার মধ্যে। বাংলা নিজস্ব গতি খুঁজে পায়। তরতর করে এগিয়ে যায়। সাঁওতালি পিছু হটতে থাকে। ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ থেমে গেলেও কোম্পানির শাসক সম্প্রদায় সাঁওতালদের উপর অমানবিক অত্যাচার থামায় নি। নেতৃত্বহীন দিশাহীন সাঁওতাল দলে দলে প্রাণ রক্ষার তাগিদে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যেদিকে পারে জনপদ থেকে দূরে পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। বহু সংখ্যক সাঁওতাল অন্য রাজ্যেও পালিয়ে যায়। ফলে আমরা দেখি, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, আসাম রাজ্যে সাঁওতালদের ঘনবসতি রয়েছে। এছাড়াও নেপাল ও বাংলাদেশে এদের সংখ্যা কম নয়। সাঁওতাল জীবনের এই টানাপোড়েনের প্রভাব তাদের ভাষার মধ্যেও পড়ে। ভাষা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পাহাড় জঙ্গলে আশ্রয় নেবার ফলে সাঁওতালি গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার অভাব থাকায় তাদের ভাষাও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

এই প্রবন্ধের লেখক তাঁর "সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে" গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীশ্চান মিশনারীগণ সাঁওতালি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। বাইবেল প্রচার তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও তারাই প্রথম অনুধাবন করে যে, সাঁওতালি ভাষার মধ্যে জীবন শক্তি রয়েছে। এই ভাষার মৌখিক সাহিত্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত ও বৈচিত্র্যময়। একটা জাতির মনঃচেতনার পরিচয় এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অনেক মিশনারী সাঁওতালি ভাষা শিখে এই ভাষা চর্চা ও উন্নয়নমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর বাস্তবায়নে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও সাঁওতালি ভাষার পুনঃজাগরণে এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর প্রায় ষাট-সত্তর দশক পর্যন্তও শিক্ষিত বাঙালি সমাজ সাঁওতালিকে 'যাঁর' বলে ব্যঙ্গ করতেন। 'যাঁর' অর্থে জন্তু জানোয়ার, পশু-পক্ষীর ভাষা। ফলে সাঁওতালরা হীনমন্যতার শিকার হত। বাঙালিদের সামনে সাঁওতালি ভাষায় কথা বলতে লজ্জা পেত। ফলে সাঁওতালদের মধ্যে বাংলা বলার প্রবণতা বাড়ে। সাঁওতালি ভাষায় বাংলা শব্দের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হয়। অপরদিকে, শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের শিক্ষার মাধ্যম হয়ে পড়ে বাংলা। ফলে ধীর গতিতে যাদের মাতৃভাষা সাঁওতালি তাদের কাছে দ্বিতীয় ভাষা হয়ে পড়ে। শিক্ষার তাগিদে ও কর্মজীবনের আশায় বাংলা হয়ে পড়ে তাদের প্রথম ভাষা। পরিণাম স্বরূপ, সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার হার যতই বাড়তে থাকে ততই তারা বাংলা ভাষার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে থাকে। ক্রমশ দেখা গেল, শিক্ষিত সাঁওতালরা নিজস্ব ভাবের প্রকাশে সাঁওতালি শব্দের পরিবর্তে বাংলা শব্দের ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এভাবে সাঁওতালির মধ্যে বাংলা প্রবেশ ঘটতে থাকে অনিবার্যভাবে। সংরক্ষণের কল্যাণে বহু সাঁওতাল শিক্ষা দীক্ষায় যেমন এগিয়েছে তেমনি কর্মক্ষেত্রেও তাদের ব্যাপক প্রবেশ ঘটেছে। জীবিকার স্বার্থে প্রচুর সাঁওতাল শহরবাসী হয়েছেন। অনেকে আবার নাগরিক সভ্যতায় স্থায়ী ভাবেও বসবাস করে। বিংশ শতাব্দীর আশি দশকের পর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যারা শহরে রয়েছে তাদের ছেলেমেয়েরা পরিবেশগত কারণে সাঁওতালি শেখা থেকে দূরে থাকছে বা রাখা হচ্ছে। এই সব শহুরে ছেলেমেয়েদের কাছে বাংলা ভাষাই মাতৃভাষা হয়ে উঠেছে। মাতৃভাষা সাঁওতালি তাদের কাছে অপাংক্তেয় ভাষা। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে সাঁওতালদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রবেশ ঘটেছে। স্বভাবতই সাঁওতালির মধ্যে বাংলা শব্দের অবাধ প্রবেশও ঘটতে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলা শব্দের ব্যবহার ছাড়া সাঁওতালরা এখন মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। সাঁওতালি শব্দ ক্রমশ অব্যবহারে হারিয়ে যেতে বসেছে এবং সেই জায়গায় স্থান করে নিয়েছে বাংলা শব্দ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি বাংলা শব্দের ব্যবহার হয়, কিছু ক্ষেত্রে উচ্চারণের দিক দিয়ে সাঁওতালিকরণ করা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে বাংলায় যেমন ইংরেজী শব্দের ব্যবহার হয় তেমনি সাঁওতালিদের ইংরেজী শব্দ বাংলার হাত ধরে প্রবেশ করেছে।

সাঁওতালি ভাষায় বাংলা শব্দের সরাসরি অনুপ্রবেশ ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে। একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা।

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
মন্ত্রী	মন্ত্রী	চুড়ি	চুড়ি
খবর	খবর	জামা	জামা
চিঠি	চিঠি	চা	চা
ছাতা	ছাতা	চিনি	চিনি
মাইল	মাইল	পান	পান
বস্তা	বস্তা	বিড়ি	বিড়ি
পাকা (বাড়ি অর্থে)	পাকা	রসগোল্লা	রসগোল্লা
শিশির	শিশির	সিঙ্গাড়া	সিঙ্গাড়া
ছাপা	ছাপা	চপ্	চপ্
গ্রাহক	গ্রাহক	আলু	আলু
খরচ	খরচ	পটল	পটল
পত্রিকা	পত্রিকা	পেঁয়াজ	পেঁয়াজ
চাপ	চাপ	দাদা	দাদা
ডাক (Post)	ডাক	দিদি	দিদি
টাকা	টাকা	মামা	মামা
সভাপতি	সভাপতি	কাকা	কাকা
পাণ্ডুলিপি	পাণ্ডুলিপি	বাবা	বাবা
দাবি	দাবি	রাজধানী	রাজধানী
সরকার (Govt.)	সরকার	রাজ্যপাল	রাজ্যপাল
দিন (Day)	দিন	রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রপতি
বিষয়	বিষয়	প্রস্তাব	প্রস্তাব
কালি	কালি	কলম	কলম
খাতা	খাতা	শাড়ি	শাড়ি
ধুতি	ধুতি	গামছা	গামছা
পূর্ব	পুব	অবশ্য	অবিশ্যি
পশ্চিম	পছিম	পূজা	পূর্জা
উত্তর	উতর	বদল	বাদাল
দক্ষিণ	দখিন	সাব্যস্ত	সাইবস্ত
ডাল	ডাল	রাজনীতি	রাজআরি
গাড়ি	গাড়ি	দোকান	দকান
রসুন	রাসুন	মিঠাই	মিঠাই
উপায়	উপায়	ঘড়ি (Watch)	ঘুড়ি
ক্ষতি	খতি	সাইকেল	সাইকিল
সুখ	সুক্	দুঃখ	দুক্
কুয়াশা	কুর্য়াশা	ব্যবহার	বেওয়ার

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
ঠিকানা	ঠিকানা	ছাড়	ছাড়
ব্যবস্থা	বেসসতা	পয়সা	পুইসা
আশা	আঁশ	পুরণ	পুরুণ
নজীর	লজীর	জেলা	জিলা
চালু	চালু	চর্চা	চারচা
জ্ঞান	গেয়ান	ভর্তি	ভরতি
বহাল	বাহাল	মর্ম	মরম
বেশি	বিশি	রেহায়	রিহাই
যুক্তি	যুকতি	পরামর্শ	পরামেশ
বিচার	বিচার	তাহলে	তাহালে
মন্দির	মন্দিল	জাত	জাত

ভাষা বহতা নদী মত। নদী যেমন তার চলার পথে অনেক অজানাকে আত্মীকরণ করে নেয়, সমৃদ্ধ হয় সে নিজে, একটি ভাষাও তেমনি সমৃদ্ধ হয় অন্য ভাষার ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ গ্রহণ করে। পৃথিবী সব ভাষারই পরিণত রূপ এইভাবে এসেছে। সাঁওতালি বা বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রমী নয়।

চন্দ্রগ্রহণ ২০০৭ শারদসংখ্যা

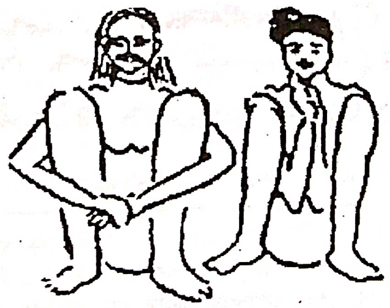

বাংলা হরফে সাঁওতালি ভাষা

॥ ১ ॥

উন্ যখাঃ আদো মেতায় কানাকিন্ কারাম গোঁশাঞি, আম্পাঞ্জা গেলিঞ হেচ্ আকানা। চালাঃ আসেম্ বাঙা। আদোয় মেন্ কেৎআ চালাঃ আইঞ, মিঃটাং হাড়াম্ লেকায়েনায়, আদো এই মেন্কেৎআ দেলা বোন। অনা জালাপুরী এটাঃ ঘাট্তেকো চালাওএন্ অণ্ডে দো লুগ্ড়িহঁ বাংকো লহৎলেনা, ঠিট্ড়াঃতে দাঃরেকো পারোম্ হেচ্ এনা, আদোকো হিজুঃকানা ; হর দোকো বারা বারি আকাৎআ, উন যখাঃ কারাম্ গোঁশাঞি এই মেন্কেৎআ ; ইঞদো লাচ্ হাসু ঞাম্ আকাদিঞা। আবিন্দো দুউ চালাঃবিন্, ফারিয়া লেনখান গেইঞ চালাঃআ। নওয়া দো আড়ি বাড়িচ্ রোগী কানা উঃচাড়া, উনযখাঃ কার্ম্মু আর ধার্ম্মু, কিন্মেন্ কেৎআ কারাম্ গোঁশাঞি, হর্রে হিজুঃ যখাঃ মিঃটাং খাঁণ্টাড় দারে এই মেতাৎ লিঞা ; তোপা আকাৎকো টাকা হরহো তেএই আড়িশ্ এনা, দুউ, অনা কোদো আবিনাঃগে হুয়ুআ। আর মিঃ টাং গাই কিষাড় এই মেতাৎ লিঞা, গাই গুপিতে গুরিচ্ গিড়িতে কো আড়িশ এনা ; উনিদো চেৎ লিঞ মেতায়া, উনিদো মেতায় বিন্ গাই, গোড়ারে, জোনঃ তেকো থাপাকোমা ; আর জাঙ্গাতেকো থাইয়া কোমা। দুউ

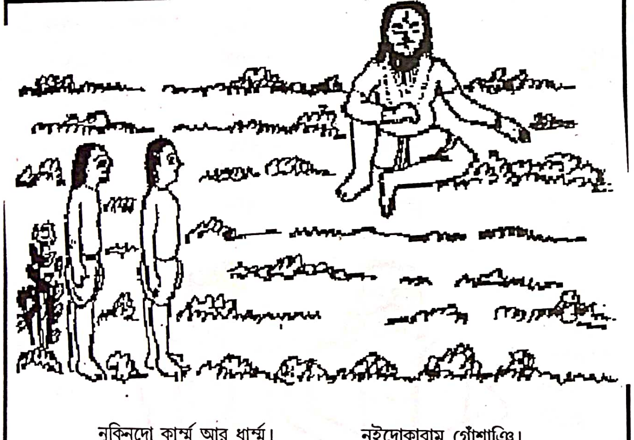

নুকিনদো কার্ম্মু আর ধার্ম্মু।   নুইদোকারাম গোঁশাঞি।

উন্কু গাই কোদো আবিন্-রিণ গেকো হুয়ঃতা। আর মিঃটাং হুড়ূচাওলেকিষাঁড় এই মেতাৎ লিঞা হুড়ু চাওলে দহোতে এই আড়িশ এনা; উনিদো চেৎলিঞ মেতায়া। উনিদো মেতায় বিন্, চুল্হা সেঙ্গেল্রে শাকড়ি কো জঃখাঞ্জয় মা; আর দাকা

চঁন্দাকাতে, জাঙ্গা বিন্ আবুক কাতে চুল্হা সেঙ্গেল্ জাঙ্গা তেকো উশকুরাঃমা। দুউ, অনা হুড়ুকোদো আবিনাঃগে হুয়ুঃ তাবিনা। আর মিঃটাং বওয়াড় হাকু এই মেতাৎ লিঞা, আড়ি হার্খেৎ আড়ি শাসেৎ হুয়ুঃ তিঞা মিৎ ঘাড়িক্রেইং গুজুঃমা। নওয়া কাথা এই মেতাৎ লিঞা উনিদো মেতায় বিন্, দুউ, আম্দো হাপেনঃ তালাটাণ্ডি রেগেম গুজুঃআ।

হার্খেতঃদো বাং হুয়ুঃ তামা নক্কা মেতায় বিন্। আর মিঃটাংতায়ান্ এই মেতাৎলিঞা, যাঁহান্ কোইঞশাপ্ লেকোখান পুচুজঃ গেয়াকো ; আর জালাপুরী এই পারোম্ কাৎলিঞা। উনিদো মেতায় বিন তেহেঞ খন্দো যাঁহানকোম শাপ্ লেকোখান বাংকো পচুইচ্ নাড়েবাআ ; আর মেতায় বিন্, কারাম গোঁশাঞি এই মেন আকাৎআ ; আম্দো জালাপুরীরিণীঃ রাজএম্ হুয়ুআ। নওয়া মেতায় বিন দুউ, উনযখাঃ অণ্ডেখন কার্ম্মু আর ধার্ম্মু আকিনাঃ অড়াঃ তেকিন-রুউওয়াড় হেচ্ এনা ; সেদায় লেকা গেকিন কিষাঁড় এনা।

॥ ২ ॥

নওয়াদো টুডু করা কিন্ রেয়াঃগ'ল্মারাও।

টুডুকড়া কিন রেয়াঃ অড়াঃদো মাণ্ডেয়ারে, উনযখাঃ আদো চায় আতুতে দিনহিলঃগে লাঁগ্ড়ে এনেচ্ কিন চালাঃআ চায়্রে অণ্ডে বেশেরা কুড়িকিন তাঁহেকানা, অনা আতুতে চালাঃ যখাঃদো মিঃটাংগাড়া পারোমঃহুয়ুঃআ ; আদো দিনগেকিন্ চালাঃআ, মিঃদিন্ দো চালাঃকান কিনতাঁহেঁকানা সেন্ কাতেকিন্ ঞেল্দো, গাড়া পেরেচ্ দাঃ চালাঃকানা; এনহিলঃদো সিংমার্শ্বাল যখাঃ এই দাঃলাঃআ অনাতে গাড়া বান্ আকানা। আদো বাংকিন পারোম্ দাড়েয়াৎআ। আদোকিন রুউওয়াড় হেচ্ এন তেকিন্ গিতিচ এনা, শেতা' যখাঃখান অন্তে গে গাইগুপি কিন্ ইদিকেৎ কোওয়া ; অদো অনা গাড়া ঘাট্কিন্ ঞেল বাড়া য়েৎআ, মিঃঠেন্ কিন্ ঞেলদো মিঃটাং বান্দোনাড়ি নওয়া শাহা খন হানা শাহা পারোম্ আকানা। অনানাড়ি রেদো গাড়া বান্ লেন্ খান্ পারোমঃ আড়িঃ ঠিকা, অনা কিন ঞেল চিয়া কেৎআ ; আদো যাঁহাঁ লেকা বান্ লেন্খান্ অণ্ডেগেকিন্ পারোমঃআ। অনা গাড়া রেয়াঃঞুতুম্দো শীরোম্ ঘাট্ উনকিন্ কড়া অনাগাড়া বানঃ রেঁহঁ পারোম্ চালাঃকাতে কিন্ এনেচ্ কোওয়া। মিৎহড় তেগে টামাক্, তুম্ দাঃ, কর্তাল কিন্, রুয়া, কর্তাল দো ঠিট্ ড়াঃরে তোলকাতে কিন রুয়া। উন যখাঃ চায়্রিণ কড়া কো মেনলাঃআ, নুকিন্ দো টুডু শাণ্ডি, শীরোম্ ঘাট গাড়া বানচেহঁ কিন্ উড়াউ পারোম্ হিজুঃ গেয়া। উন যখাঃ চায় আখাড়ারে দিন্ হিলঃ গে কিন্ এনেচ্ কোওয়া, উন্ যখাঃ কিন্ লাই লাঃ আ, আলিঞদো টুডুরেস্কা ; বাবা ঈশ্বর চান্দো বঙ্গা নওয়া মঞ্চপুরীতে এনেচ্ জং সেরেঞজং জিওয়ী শালম্খন এই ভেজা আকাৎ লিঞা; উনিগেলিঞ সেরেঞ আয়া উনি গেলিঞ অঁড়্হেঁ এয়া, উনি গেই শাখা আকাওআৎ লিঞা উনিগে দাড়ে এই এম্ আকাও আৎলিঞা।

॥ ৩ ॥

নওয়াদো লাঁগড়ে সেরেঞ ঃরেড।

বাবা ঈশ্বর এম বেনাও কেৎ লিঞ,
বাবা ঈশ্বর জিওয়ী এম্ এমাৎ লিঞ,
বাবা ঈশ্বর দাড়েম্ এমাৎ লিঞ ;
বাবা ঈশ্বর জিওয়ী শালমখন্;
বাবা ঈশ্বর এম্ ভেজা আকাৎলিঞ,
বাবা ঈশ্বর শীরোম্ ঘাট গাড়া,
বাবা ঈশ্বর বান্দোনাড়ি চেতান্‌তে,
বাবা ঈশ্বর লিঞ টুণ্ডান্ হেচ্ এন্,
বাবা ঈশ্বর বান্দোনাড়ি চেতান্‌তে,
বাবা ঈশ্বর লিঞ গেমেঞ হেচ্ এন।
বাবা ঈশ্বর চায় আখাড়ারে,
বাবা ঈশ্বর লিঞ এনেচ্ জংকান্।
বাবা ঈশ্বর আমাঃ দাড়েতে,
বাবা ঈশ্বর আমাঃ শাখাতে ;
বাবা ঈশ্বর মিৎহড় তেগে তুম্‌দাঃ, টামাক, করতাল,
বাবা ঈশ্বর লিঞ রুউ জংকান।
বাবা ঈশ্বর আমাঃ দায়াতে,
বাবা ঈশ্বর আমাঃ দাড়েতে,
বাবা ঈশ্বর নওয়া মঞ্চপুরীরে,
বাবা ঈশ্বর লিঞ এনেচ জংকান।

॥ ৪ ॥

নওয়াদো তুম্‌দাঃরুউ তোড়াও।

ধাতিঙ ধাতাঙ তিঙদা হেতাঙ তিঙ,
ধাতাঙ দাঙদা হেতাঙ তিঙ, দাঙদা হেতাঙ তিঙ।
(নওয়াদো লোহোরি এনেচ্ রুউ)
হেতাঙ দাঙ তিঙদাঙ হেতাঙ দিপিঙ দিপিঙ,
হেতাঙ দাঙ দাঙদা হেতাঙ দিপিঙ দিপিঙ,
হেতাঙ দাঙ ধাতিঙ ধাতাঙ তিঙদা হেতাঙ তিঙ,

ধাতাঙ দাঙদা হেতাঙ তিঙ।
দিপিঙ দিঙ দিপিঙ দিঙ দিপিঙ দিঙ দিপিঙ দিঙ,
দিপিঙ হেতাঙ হেতাঙ হেতাঙ দাঙ দিঙ দাঙদা, দাঙদা হেতাঙ
দাঙদা, তিঙদা হেতাঙ দাঙদা, দাঙদা হেতাঙ দাঙদা, দিঙদাঙদা।

॥ ৫ ॥

নওয়াদো ঝিকা রড় সেরেং।

বাবা ঈশ্বর আমগেদো সের্মাপুরী জিওয়ী শাল্খন্
নওয়া মঞ্চ পুরীতে দো,
বাবা ঈশ্বর এম্ ভেজা আকাৎলে!
বাবা ঈশ্বর আমাঃ দায়াতে,
বাবা ঈশ্বর আমাঃ দাড়েতে ;
নওয়া মঞ্চ পুরীরে দো,
আলে দোলে এনেচ জং কান।
বাবা ঈশ্বর আম গেদো, বাবা ঈশ্বর এম্ রাঃ হেচোলে,
বাবা ঈশ্বর আম্ গেদো, বাবা ঈশ্বর এম্ লান্দা হেচোলে।
বাবা ঈশ্বর চান্দো বঙা, আম বাড়ে রেস্কা হেচোলেম্,
বাবা ঈশ্বর চান্দো বঙ্গা, আম্‌ঠেনলে তাবেরঃকান,
আলো গোদোমারাঃহচোলে।
ঝিকা এনেচ্ রুদো ৪৫ সাকাম্‌রে মেনাঃআ।

॥ ৬ ॥

নওয়াদো পাতা রড় সেরেং।

শীরোম ঘাট গাড়া আলিঞাঃ দাড়েতে
আলিঞাঃ শাখাতে,
শীরোম্ ঘাট গাড়া পারোম কাতে পারোম হেচ্‌কাতে;
দান্‌গী মাই পুঁড়গী, দানগী মাই পুঁড়গী গো।
চায় ছাট্ কা চায় আখাড়ারে,
এনেচ জং সেরেঞ জং এনেচ জং সেরেঞ জং,
সিঙ্গে সিং সিঙ্গোঞিন্দা, (২) আলিঞগেদো এনেচ
লিঞ হেচ্ আকানা।
এনেচ লিঞহেচ্ আকান্ দোও।

॥ ৭ ॥

নওয়াদো উন যখাঃ কিন্ সেরেং লাঃদো অনারেয়াঃ গালমাড়া।

উন্‌যখাঃ অনাঃ সেরেং গেলবার্ দিন কিন্ সেরেং লাঃ খান্ বাবা ঈশ্বর এই এদ্রেয়েনা, আকিনাঃ দাড়ে আকিনাঃ শাখা কিন লাইকেৎতে এই আড়িশ এনা ; অনাতে এই দেয়াকেৎকিনা ; উন্ যখাঃ অনা বান্দোনাড়ি অকয় চকো মাঃ কেৎআ, আদো মিঃ দিন্ দো,

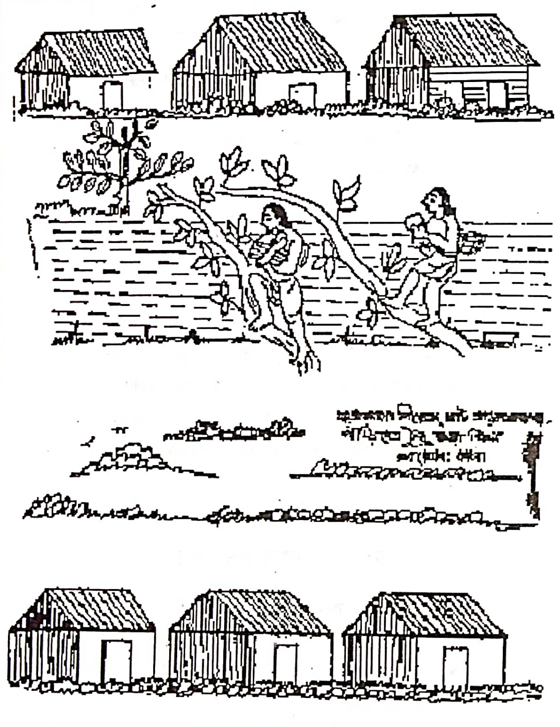

নওয়াদো মাণ্ডেয়া আতু

ঞিন্দা যখাঃ এনেচ্ কিন্ চালাঃকানা এন্ হিলঃ দো সিং মার্শাল যখাঃ এই দাঃ লাঃআ, সেন্ কাতে কিন্ ঞেল্‌দো গাড়া বান্ আকানা। আদো কিন্ মেন্ কেৎআ, দেলাং বান্দোনাড়ি তেলাং টুণ্ডাং পারোমঃআ, অনা বান্দোনাড়ি মাঃ আকাৎ আকো মেন্তেদো

বাংকিন্ বাড়ায়া, আদো কিন্ পারোমঃকান তাঁহে কানা, গাড়া তালাদাঃরে খান্‌কিন্ ঞুর হাড়্‌হুড়্ এনা, টামাক্ কো তুমুদাঃ কো গোঃকাতে গাড়াদাঃ রেকিন ঞুরেনা উনযখাঃ কিন্ রাঃলাঃ আ।

॥ ৮ ॥

নওয়াদো লাঁগড়ে রড় সেরেং।

বাবা ঈশ্বর শীরোম্ ঘাটগাড়া,
বাবা ঈশ্বর বান্দোনাড়ি চেতানতে ;
বাবা ঈশ্বর লিঞ পারোমঃ কানতাঁহেঁ কান,
বাবা ঈশ্বর তালাদাঃ তালা গাড়ারে,
বাবা ঈশ্বর লিঞ ঞুর হাড় হুড়েন্।
বাবা ঈশ্বর নওয়াদরয়া দাঃখন্
বাবা ঈশ্বর অকয় অওয়ার লিঞ
বাবা ঈশ্বর সের্মা আর মঞ্চপুরীরে ;
বাবা ঈশ্বর আম্‌গে মেনামা।
বাবা ঈশ্বর দাঃ তালারে,
বাবা ঈশ্বর দাঃ ভিত্‌রিরে ;
বাবা ঈশ্বর আম্‌গে মেনামা।
বাবা ঈশ্বর র্নিয়াবার্
বাবা ঈশ্বর নিয়াধাও,
বাবা ঈশ্বর নওয়াদড়য়া দাঃখম্,
বাবা ঈশ্বর অওয়ার কালিক্রমে।

॥ ৯ ॥

নওয়াদো বাবা ঈশ্বর এই দায়ায়েনা উন যখাঃ রেয়াঃ গালমারাও

উন যখাঃ অন্‌কা তালাদাঃরে, মিৎমনে তেকিন রাঃ লাঃখান ;বাবা ঈশ্বর এই দায়ায়েনা, আদো অনা শীরোম্ ঘাট্‌গাড়া বাড়া রেকিন দঃ এনা। বাংকিন গৈ লেনা, লুটুঃ লুটুঃ জিওয়ী তাঁহে কান তাকিনা। উন যখাঃ শেতাঃ এনা, অনা চায় আতুরিণ হড় অনা বাড়া ঘাট্‌রেয়াঃ দাঃ গেকো জোমা, উন যখাঃ বাবা ঈশ্বরা শাখাতে ভোরতে, উন কিন বেশেরা কুড়ি শেতাঃ যখাঃ দাঃলু কিন চালাওলেনা। ঞেল্‌কিন্ দোকিন্ টুডু কড়া, বাড়ারেকিন দাঃ আকানা। হারে ফারে উন কিন কুড়ি দাঃ ঠিলি দহো কাতে অনা গাড়া বাড়া খন উন কিন টুডু কড়া

অড়াঃতে হেঁও কাতেকিন ইদি কেৎকিনা, আদো অড়াঃরে সেঙ্গেল্ কিন জুল্ কেৎতেকিন শেকাও বাঞ্চাও কেৎকিনা। উন যখাঃ অনা টামাক্ তুম্ দাঃ কোদো অড়াঃরিণ হড়, কড়াকো যতো কো গোঃ ইদিকেৎআ। আরভাগী ভাগীয়াঃ জোমাঃকো এমাৎকিন্া, বার্সিং পেমাহা খান্ গেকিন ফারিয়ায়েনা। আদো বেশেরা কো অড়াঃরেগে কিন তাঁহেয়না, উন যখাঃ বেশেরা কুড়ি কিন সেরেং লাঃআ।

॥ ১০ ॥

নওয়াদো পাতা রড় সেরেং।

নুকিন দো দেশেরা কুড়ি

এ বাছা কারাম্ ডর,
এ বাছা গুলাছি বাহা ;
এ বাছা গুলাছি বাহা (২)

শীরোম্ ঘাট্গাড়া
শীরোম্ ঘাট্গাড়া বাড়ারে ;

আলিঞঃ দাড়েতে,
আলিঞঃ শাখাতে,
টুডু কড়া রুশীকা কড়া (২)

হায় হায়, এ বাছা আলিঞ লিঞ ঞাম্ আকাও আন্,
আলিঞ লিঞ ঞাম্ আকাও আন দোনা।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৮৫৫-১৮৫৬

কৃষিজীবী সাঁওতাল জাতির জমি ও মুক্তির জন্য যে বিরাট ও শক্তিশালী গণ-অভ্যুত্থান তাতে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল যোগদান করে।

বহু অ-সাঁওতালও বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কোনো কোনো হিসাবে তাদের মধ্যে অর্ধেক লোককে অর্থাৎ ১৫ থেকে ২৫ হাজার সাঁওতালকে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যা করে। এই গণহত্যা, গ্রামদাহ ও কারাদণ্ডের পরও বিদেশি শোষক শ্রেণির অনেক মুখপাত্র চেয়েছিল তামাম সাঁওতাল জাতিটাকেই আবার শাস্তি দিতে। এমনই রক্তলোলুপ নরপিশাচ এই শোষকের দল। তারাই ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ইংরেজ নায়ক জল্লাদ ডায়ারের পূর্বপুরুষ।

সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া
কৃষ্ণদাশ রায় (রাই), কুলকুড়ি

পলাশিযুদ্ধের দুবছর আগের ঘটনা। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১২৬৮ সন) জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় যে অভ্যুত্থান ঘটে, তা ইংরেজ শাসকদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী গ্রাম্য কবির বর্ণনায় আছে সেই বিদ্রোহের কথা। শিবরতন মিত্রের রতন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ছড়াটি এখানে মুদ্রিত হল।

অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা

যুন ভাই, বলি তাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর[১] হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুঁকেছে।
বেটারা কোক ছাড়িল—
বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হল, হাজারে হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হল ভার।
হল সব দুভ্যাবনা—
হল সব দুভ্যাবনা, রাড় কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়া ঘটি মাটিতে পোতে, কখন লিবে এসে।
বলে ভাই রাখিব কোথা—
বলে ভাই রাখিব কোথা, জেথা সেখা, এই কথা শুনি
রাখে ত মোলুক সলা ভাবতেছে কোম্পানী।
বেটাদের সক্তি শোনে—
বেটাদের সক্তি শোনে, প্রজাগণে কইছে ধীরে ধীরে
জিনিষ ছেড়ে পালাও না ভাই সভায় থেক ঘরে।
আমাদের আছে গোরা—
আমাদের আছে গোরা সাঙ্গিন চড়া, জামাজোড়া গায়
বিন্দুকেতে গোলি পোরা তুর্‌ক স্বয়ার[২] তায়।
বেটারা থাকে কোথা—
বেটারা থাকে কোথা, সর্ত কথা, সুধাই তোমাদের
কেহ বলে দেখে এলাম মোরাক্ষীয় ধারে।
আছে সব জড় হয়ে—
আছে সব জড় হয়ে পূর্ব মুয়ে তীর মারছি গাছে
শত শত কর্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তীরের ফলি বানাইতে-
তীরের ফলি বানাইতে, বরাত মতে, যখন যেমন কয়,
হাতে হাতে বানাইছে ফলি পাছে টানা হয়।

বেটাদের পোসাক চড়া—
বেটাদের পোসাক চড়া— কণ্ঠী পরা, লইতে[৩] বেড় বুকে
তীরের উপর পূজা করে, কোক ছাড়িয়ে মুখে।
আগেতে লাগড়া পিঠে—
আগেতে লাগড়া পিঠে, 'কাটে ছিটে, মদে মাসে ভরা
প্রথমে বাঁশকুলি দিয়ে পল্ল গাছে ডরা
দেখে সব লোক পালাইছে—
দেখে সব লোক পালাইছে, টোকা পেয়ে, লয়ে নটাই খান
কেহ বলে রাঁধা রইল, বড় মাছের খান।
বলে ভাই পালা পালা—
বলে ভাই পালা পালা, একি জালা, করে কলরব,
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্ত মুখ সব।
আর কি হাকিম মানে—
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেল সোজা,
সাদিপুর গিয়ে লুটল কাপড়ের বোঝা।
জথা উচিত বুচকা বাঁধে—
যথা উচিত বুচকা বাঁধে, নিল কান্ধে, জত মনে ছিল,
রাতারাতি হাতাহাতি কপিষ্ঠাকে গেল।
সকলি এমনি ধারা—
সকলি এমনি ধারা, দেয় লাগড়া, অহনিশি পিটে
খাবার সময় সাঁওতালদের মেয়েছেলে জুটে।
বলে ভাই রাজা হব—
বলে ভাই রাজা হব, টাকা পাব, করিয়া যন্ত্রণা
দুদিনবাদে পুড়াইল গিয়ে নাঙ্গুলের থানা।
ঐ কথা যুনে—
ঐ কথা যুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে,
দারোগা মুনসীর সঙ্গে দেখা হইল পথে।
মনেতে ভয় পেয়ে—
মনেতে ভয় পেয়ে, পশ্চিম মুখে, অগ্নি গেল ফিরে,
পাড়েরপুরে মোকাম লইল গয়ারামের ঘরে।
জতসব চেলের গোলা—
জতসব চেলের গোলা, ভাঙ্গি তালা, সকল বার করিল,
ঘড়া পেটে চড়া দিয়া খিটন যে লইল।
তখন সিফাই ঘেরা—
তখন সিফাই ঘেরা, সঙ্গিন চড়া, কাপ্তান সহিত
নদির উপান্তে আসি হইল উপনীত।
জত সব সিফাইগণে—
জত সব সিফাইগণে, ভাবে মনে, হয়ে স্যার স্যার

দেখেযুনে মৌরাক্ষী উভয়ে না হয় পার।
তির বর্ষা তরায় আছে—
তির বর্ষা তরায় আছে, আপন সাজে, রন নাইক বাজে,
নদির ধারে সাঁওতালরা নাগড়া বাজায়ে নাচে।
সেখানে সাদ্দ কার—
সেখানে সাদ্দকার, পারাপার, দুকুল বান,
হাতেতে কিরিচ ধরে দেখিছে কাপ্তান।
দেখিয়া বহুত সেনা—
দেখিয়া বহুত সেনা, কি যন্ত্রনা, করে দুইজনে,
বন্দুক তরায় রাখ, কহে সিফাই গণে।
দণ্ড চ্যার ছয় পরে—
দণ্ড চ্যার ছয় পরে, কয় হল্যাদারে দুফেদারের প্রিতি
লির্নয় করিতে দুরপীনে জান শিগ্রগতি।
বলে উঠল গর্জে—
বলে উঠিল গর্জে, হাউদা মাঝে নয়নে দুরপীন
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সাঁওতাল কোষ দুই তিন।
কিছুদূর পিছে হটে—
কিছুদূর পিছে হটে, বলে ঝাটে, সাহেব গেল চলে
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল, পালায় পালায় বলে।
করিয়া বহু দম্ফ,
করিয়া বহু দম্ফ, দিল ঝম্ফ, পড়িল লদির জলে
সাতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে।
বলে সব মার মার—
বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়া করে পরাভব।
জাব সব জেহালখানা—
জাব সব জেহালখানা, দিব থানা, মুক্ত করব চোরে
শুভবাবু রাজা হবে জ্যজ সাহেবকে মেরে।
আমরা ঘুচিব মাঝি—
আমরা ঘুচিব মাঝি, কাজের কাজি, মন্থুর করব বশ্যে
কৃষ্ণ শৌওর দোকান ভেঙ্গে সবার খাব কশে।
বলে শিঘ্রত্তর—
বলে শিঘ্রতর, আশু ধর, আর বিলম্ব কেনে,
কর্মপাকে পল্য সাঁওতাল সিফাএর মাঝখানে।
বেটারা তুচ্ছু জাতি—
বেটারা তুচ্ছু জাতি, নাইক বুদ্দি কিবা জানে টের
আচম্বিতে হুকুম হাঁকে বলিয়া ফয়ের।

আলি হুকুম পেয়ে—
আলি হুকুম পেয়ে, সিফাই যেয়ে, বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাশ পঞ্চাশ গোলি মারে এক এক কালে।
জেমন তারা খসে—
জেমন তারা খসে, আশে পাশে, তেমনি গোলি ছুটে
পিষ্টেতে বাজিয়া কারু পার হইল পেটে।
অন্য সাঁওতাল জত—
অন্য সাঁওতাল জত, কত শত, পলাইয়া গেল,
কুড়ি আট লয় সাঁওতাল তারা শেই দিনেতে মল।
তখন পালায় সাঁওতাল—
তখন পালায় সাঁওতাল, করিয়া বিকল, পিছে নাহি চায়
সলাখ পাহাড়ে জেয়ে শুভকে জানায়।
শুনে সব দুষ্ক মনে—
শুনে সব দুষ্ক মনে, পরদিনে, কৈল একাকার
জঙ্গি হইতে আনায় সাঁওতাল দ্বাদশ হাজার।
নাহিখ মৃত্যুভয়—
নাহিখ মৃত্যুভয়, সদা রয়, ধেনুকেতে চড়া
লগর[৫] বাজারে যেয়ে বাজায় নাগেরা।
শুনে সব পালাইল—
শুনে সব লোক পালাইল, বিসম হলে, তামলি পুদ্যার
সতগোপ গোওলা পালায় কান্দে লয়ে ভার।
পালায় সব বুড়াবুড়ি—
পালায় সব বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি,হাতে লয়ে লড়ি
মস্যলমান ফকির পালায় মুখে পাকা দাড়ি।
মুখেতে বলে আল্যা—
মুখেতে বলে আল্যা, বিষমল্যা, একি বেটাদের তির
এ বিপদে রক্ষা করহে সর্তপির।
বলে প্রাণ জায়—
বলে প্রাণ জায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল—
কালুসেখের যা কেন্দে বলে— আমার মরিগ কোথা গেল।
যতসব মাথায় ঝুড়ি—
যতসব মাথায় ঝুড়ি, কোথা ধুকুড়ি, উর্দ্ধমুখে ধায়
হুঁজট লেগে পোড়ে কেহ গড়াগড়ি যায়।
ঐ সাঁওতাল এল—
ঐ সাঁওতাল এল, ঐ সাওতাল এল, কাটিলের সাঁওতালে
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে।
তখন হরষ্য মনে—

তখন হরষ্য মনে, সাঁওতাল গণে, রাজবাড়ি সোন্দায়
মানুষ কাটা পড়িল সেদিন কুড়ি দুই হাজার।
পরে সাঁওতালগণ—
পরে সাঁওতালগণ, হ্রিষ্ট মন, দেয় টাঙ্গিতে সান
লাওজোড়ে নাড়া বেটাকে দিল বলিদান।
গেল কুমড়্যাবাদে—
গেল গুমড়্যাবাদে, সকল ফদে, হইল একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা কল্লো ছারখার।
পোড়াইলে ধানের গোলা—
পোড়াইলে ধানের গোলা, তিল তুল্যা, সরিসা আদি যত
গরু মহিষ ছাগড় ভেড়া পুড়িল কত শত।
পূর্ব্বে হনুমান—
পূর্ব্বে হনুমান, লংকাখান, জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়।
ঐ গ্রাম নিবাস—
ঐ গ্রাম নিবাস, সাধু দাশ, তার সঙ্গে জনাচারি
সিহড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছে বিনয় করি।
আর ত্য প্রাণ বাঁচে না—
আর ত্য প্রাণ বাঁচে না, কি মন্তনা, কচ্ছেন হুজুর বস্যে
ঘর কর্ণ্যা পুড়য়ে আমার ভাইকে কাটলে সেযে।
সিঘ্র উপায় কর—
সিঘ্র উপায় কর, সাঁওতাল মার, রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গির চোটে মোলুক কেটে পতিত কল্যে বোন।
সাহেব ওস্যামনে—
সাহেব ওস্যামনে, সিফাই গণে, বলয়ে বচন
অতি সিগ্র জাও তোমরা কর গিয়ে রণ।
কথা শুনে তখন—
কথা শুনে তখন, জত সিফাই গণ, বন্দুকহাতে নিল
রাতারাতি সিফাই গণ কুমড়্যাবাদকে গেল।
যুর্দ্ধ যেইমতে—
যুর্দ্ধ যেইমতে, বিস্তারিতে, হবে বহুত ক্ষণ
আকাশের চাঁদ কোথা ধরয়ে বামন।
বেটারা ধেনুক ধরে—
বেটারা ধেনুক ধরে, তির মারে, করে মার মার
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার।
সাহেব হুকুম দিলে—
সাহেব হুকুম দিয়ে ফায়ের বলে, যুনে সিফাই গণ

হাজারে হাজার সাঁওতাল ঘরে ততক্ষণ।
অমনি ভগড়্যা হয়ে—
অমনি ভগড়্যা হয়ে, পূর্ব্বমুয়ে, পালাইয়া যায়
পাটজোড় মোকামে আসি নাগড়া বাজায়।
নাগড়ার সব্দ শুনে—
নাগড়ার শব্দ শুনে, সর্বজনে, পালায় সর্তরে
জনা দষ বাগিরে গোওাল সেইদিনেতে মরে।
লোকের কি জন্তনা—
লোকের কি জন্তনা, কি লাঞ্জনা, কল্যেরে সাঁওতাল
কত গন্তবতি রাস্তায় পুসুবিল ছাওয়াল।
এমনি সর্বত্তরে—
এমনি সর্বত্তরে, লোক করে, বেড়ায় সাঁওতাল
মনিস্য কা কথা দেবতা পালান গোপাল।
ভাত্তিবোন ছেড়ে—
ভাত্তিবোন ছেড়ে, পালান দৌড়ে, পুজুরির মাথায়
বিরসিংহপুরের কালিমা এর বলিহারি জাই।
বারষ বাসষ্টি সাল—
বারষ বাসষ্টি সাল, বরসা কাল, বানের বড় বিদ্দি
আব্দারপুরে মানুষ কেটে কল্লো গাদাগাদি।
কাটিলে বিষ্ণুপুরে—
কাটিলে বিষ্ণুপুরে, হারা তাঁতিরে, প্রিয়েসুলার মাঠে
বিপিন গোপকে তিরিয়ে মাল্লে পখুরের ঘাটে।
লোটিলে কুলকুড়ি—
লোটিলে কুলকুলি, দৌড়াদৌড়ি, লাগরা দেয় সেযে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্যে আখবাড়িতে এশে।
পুঙ্গাতে[৬] দেয় বাড়ি—
পুঙ্গাতে দেয় বাড়ি, বস্ত উলঙ্গ করিয়ে
জাদুমাঝি চেনা ছিল তেরে দিল ছাড়িয়ে।
ধল্যে চন্যা মাঠে—
ধল্যে চন্যা মাঠে, পখুর কাটে, দাশী গোওালেনী
কাটের ভিতরে মাগি হারাল পরানি।
জত সব সাঁওতালগণে—
জত সবসাঁওতালগণে, কাটের মোনে যত মাটি ছিল
ওখারিয়া সবল মাটি চাপাইয়া দিল।
পরে ধেনুক ধরে—
পরে ধেনুক ধরে, তার উপরে নাচিতে লাগিল
ফুল্যাইপুরের ডাঙ্গালেতে সিফাই দেখিতে পেল।

অগ্নি কোক ছাড়িল—
অগ্নি কোক ছাড়িল, পছিম মুয়ে পালাইয়া গেল
আলান চকের নন্দ দাশের গরু ঘেরি লিল।
তখন নন্দ দাশ—
তখন নন্দ দাশ, করে হত্যায, মাথায় ঘা মারে
বলে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আসব ফিরে।
তখন বস্ত ছাড়ি—
তখন বস্ত ছাড়ি, কপ্নি পরি, সাঁওতাল সাজিল
চুন যুথান পাতে ভরি কচরে গোজিল।
হাথে ধনুর্বান—
হাথে ধর্নুবান, টাঙ্গিখান, কান্ধেতে লাগিয়ে
সাঁওতালের বুলি জানি এই সাহস করিয়ে।
সাঁওতালের সঙ্গে—
সাঁওতালের সঙ্গে, নানা রঙ্গে, কথায় ভুলিয়ে
জল খাওয়া ছলনা করি আনিল ছাড়িয়ে।
রাই কৃষ্ণদাশ ভনে—
রাই কৃষ্ণদাশ ভনে, সংক্ষেপনে, কিছু লেখা হল।
বিস্তার লিখিতে হল্যে অনেক বাহুল্য।
কাএস্ত কোলে জন্ম মোর রাই কৃষ্ণদাশ
কুলকুড়ি গ্রামে ঘোর হয় যে নিবাষ।
জেলা বিরভুম তাহে নোনি পরগণা
লাট রাম তাহে নাঙ্গুরের থানা।
আমি ভাবি মোনে—
আমি ভাবি মোনে, সাঁওতালগণে রাখিলে যে সুক্ষ্যতি
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি যে সত্তি।
কথা মিথ্যা নয়, সর্ত হয়, এই যে বিবরণ
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ।
বারষ বাষট্টি সাল—
বারষ বাষষ্টি সাল, এই গোলমাল বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হয় তেইশে স্বাবনে।

---

১. শুভোবাবু অর্থে এখানে সুবেদার অর্থাৎ সিধু, কানুকে বোঝান হয়েছে।
২. তুরক্ স্বয়ার অর্থে তুরকী ঘোড় সওয়ার।
৩. লইতে অর্থে হাতে বোনা ছোট কাপড়।
৪. কুড়ি আট লয় অর্থে আট নয় কুড়ি।
৫. লগর অর্থে রাজনগর।
৬. পুঙ্গা অর্থে পাছায়।

গৌরীহর মিত্র

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাঁওতাল জাতি

সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি বা তাহাদের বাসস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এই যাযাবর সাঁওতাল জাতির হাজারিবাগের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাময়িকভাবে বাস-স্থাপনের কথা অবগত হওয়া যায়। চতুর্দশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে তদানীন্তন দিল্লির সম্রাট মহম্মদ তোগলকের সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম আলির এতদঞ্চলের সাঁওতাল রাজা বা প্রধানগণকে পরাস্ত করিবার কথা বর্ণিত আছে। অন্তঃপর তাহারা ছোটনাগপুর এবং ক্রমে ঝালদা ও পাতকুম এবং পরে পঞ্চকোট অঞ্চলে আসিয়া উপনীত হয়। এখানে হইতে তাহারা সাওন্ত নামক স্থানে আগমন করে। প্রবাদ—এই 'সাওন্ত' নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া তাহারা "সাঁওতাল"-নামে পরিচিত হয়। তৎপূর্বে তাহারা 'হড়' (বা মানুষ) নামে পরিচিত ছিল। কালে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি দক্ষিণ মানভূম ও দামোদর তীরবর্তী হাজারিবাগ জেলায় আসিয়া বাস করিল ; কিন্তু অধিকাংশ সাঁওতালই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিয়া এখনকার দিনে পরিচিত সাঁওতাল পরগণা ও তৎসংলগ্ন জেলায় বসতি স্থাপন করিল।

সাঁওতালগণের আগমনের পূর্ব হইতে এখনকার সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে পাহাড়িয়া নামক একজাতি পাহাড়ে দুর্গম বন-জঙ্গলের মধ্যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই পাহাড়িয়াদিগের অধ্যুষিত অঞ্চলই সাঁওতাল পরগণার মধ্যে ৮৬০ বর্গমাইল পরিমিত উচ্চভূমি ও ৫০০বর্গমাইল পরিমিত নিম্নভূমি[২] বিশিষ্ট দামন-ই-কো[৩] বা (পাহাড়িয়াঅঞ্চল) বা সংক্ষেপে দামন্ নামে পরিচিত।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ সাদারল্যান্ড এই অঞ্চলের অধ্যুষিত জাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট প্রণয়ন করেন, তাহাতে স্বল্পসংখ্যক মাত্র সাঁওতাল থাকার কথা উল্লেখ আছে। ইহার ১০ বৎসর পরে মিঃ ওয়ার্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে দামনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বহু সাঁওতালের আবির্ভাব হইয়াছে।

ইহার চারি বৎসর পর, অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে দেখা গেল যে বহুসংখ্যক সাঁওতাল অপর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ দামন-সীমানার মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। পাহাড়িয়া জাতিরা উচ্চ পাহাড়িয়া জঙ্গলে থাকিতে ভালবাসে। তাহারা উর্বর নিম্নভূমিতে আসিয়া ভূমি কর্ষণের কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। সাঁওতালগণকে পরিশ্রমী ও কৃষিকার্যে অনুরক্ত দেখিয়া ইংরাজ সরকার তাহাদিগকে দামন-অঞ্চলের নিম্নভূমিতে অবস্থানে কোনরূপ আপত্য করিলেন না; পরন্তু ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালদের বসতি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য মিঃ পন্টেট (Mr.James Pontet) নামক একজন প্রবীণ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পরিদর্শক নিযুক্ত করিলেন। এইবার সাঁওতালগণের যাযাবর-বৃত্তির কতক পরিমাণে অবসান হইল।[৪] এখানে আসিয়া তাহারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিবার আশা করিয়াছিল। তাহাদের পরিবার বা সামাজিক জীবনের উপর অন্য কোন সুসভ্য জাতি অত্যাচার করিবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইল এবং মন-প্রাণ দিয়া কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে অদূরভবিষ্যতে তাহাদের প্রতি কিরূপ

অকথ্য অত্যাচারের নির্মম হস্ত তাহাদের উপর প্রচন্ড আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে।

দামন-অঞ্চল মূলত পাহাড়িয়া জাতির জন্য সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সাঁওতালগণ যদিও ইহার নিষিদ্ধ গন্ডীর মধ্যে প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়াছিল, কিন্তু পাহাড়িয়াগণের মত অন্যান্য কোন বিষয়েই তুল্যরূপ বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই।

ইহার ফলে তাহারা নিতান্তই নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। তখন সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত মহাজনগণ ও অন্যান্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিবার সুযোগ পাইল। ২০ বৎসরকাল দারুণ কষ্টে অতিবাহিত হইল, কিন্তু আর চলিল না। অত্যাচারের ফল ফলিল। এবম্বিধ দারুণ অত্যাচারের আশু ফলই —১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ।

সাঁওতাল ও মহাজন

দামনের সৃষ্টি হইতে ইহার জন্য পাহাড়িয়াদের সহিত কোনরূপ রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল না। সাঁওতালগণের আগমনের পর হইতে তাহাদের কর্ষিত ভূমির জন্য কোনরূপ পরিমাপাদি না করিয়াই কেবলমাত্র মৌজায় মৌজায় বিভক্ত করিয়া মিঃ পন্টেট (Nr.James Pontet) নামক একজন ইংরেজ কর্মচারী সাঁওতালগণের কর্ষিত জমির ওপর ৮০,০০০ টাকা খাজনা নির্ধারিত করিলেন। সাঁওতালগণের অবস্থার উন্নতি দেখিয়া গোলদার, মহাজন ও জমিদারগণের লোলুপ দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল। তাহারা তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া যেন কতকালের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। সরল সাঁওতাল প্রথমে তাহাদের ধূর্তামি বুঝিতে পারিল না। নিরক্ষর সাঁওতাল, হস্তাঙ্গুলের সংখ্যা ব্যতীত যাহাদের সংখ্যা বোধ নাই, ধূর্ত মহাজনগণের হিসাব-নিকাশের চাতুরি কি করিয়া বুঝিবে? তাহারা সরল প্রাণে তাহাদের বিশ্বাস করিল; কিন্তু গোলদার ও মহাজনগণের যত প্রকার অন্যায়-অত্যাচার-জাল-জুয়াচুরি প্রভৃতি কোন অপকর্ম করিতে বাধিল না।

সাঁওতালগণের প্রতি অত্যাচারের মর্মস্পর্শী পরিচয়

নিরীহ সরল প্রকৃতির সাঁওতালগণের শক্তি-সামর্থ্যের তুলনা নাই। তাহারা পার্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশ কাটিয়া তাহাকে উর্বরা ও শক্তিশালিনী করিয়া তুলিয়াছে—তাহাদের পরিশ্রমের ফলে এই পার্বত্য প্রদেশ হইতে আশাতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং তাহারা স্বচ্ছন্দভাবে ভবিষ্যতের জন্যও কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিল। কিছু কিছু উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রয় করিয়াও তাহারা ছেলেমেয়েদের জন্য কাঁসা-পিতলের গহনা ক্রয় করিল। গোহালে গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ সংগৃহীত হইল। সুতরাং, তাহাদের এতদঞ্চলের আগমনের প্রথম অংশে তাহারা বেশ সুখস্বচ্ছন্দেই দিনাতিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু অচিরেই সুখের সমুজ্জল দিনে কৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

হিন্দু বণিকগণ তাহাদের কষ্টোপার্জিত শস্য ভুলাইয়া হস্তগত করিবার জন্য তাহাদের বাসস্থানের নিকটে নিকটে গুদাম বা আড়ত খুলিয়া বসিল। নানারূপ প্রলোভনের দ্রব্যে আড়ত পরিপূর্ণ করিল। সাঁওতালগণ তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্য তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল। নিম্নশ্রেণির বণিক এবং ভোজপুরিয়া গোলদারগণ প্রতারণা-পূর্বক তাহাদের

কৃষিলব্ধ দ্রব্য হস্তগত করিতে লাগিল। শকটপূর্ণ শস্য ও কলসীপূর্ণ ঘৃতের পরিবর্তে সাঁওতালরা অতি অল্পমূল্যের লবণ ইত্যাদি দ্রব্য পাইল। এক জোড়া বলদের পরিবর্তে এক জোড়া কবুতর বা পায়রা পাইল। ছিদ্রতল পাত্রে ঘৃত মাপিয়া, গুরু ওজনের মণ সেরে চাল ধান ওজন করিয়া, বণিকেরা প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এই মহাজনদের মত সাঁওতালদের কুটিল বুদ্ধি ছিল না। তাহারা শিশুর ন্যায় সরল ছিল। এই সরল-হৃদয় সাঁওতালগণ মহাজনদের নিষ্ঠুরতা বুঝিতে পারিত না। ফলত, ব্যবসায়ীরা এইরূপ কুকার্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ না করিয়া নিষ্ঠুরতার মাত্রা দ্রুতগতি বাড়াইয়াই চলিল। এইরূপভাবে প্রতারণা করিয়াও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। অন্য উপায়ে সাঁওতালদের যথাসর্বস্ব হরণ করিবার চেষ্টা করিল। সরল প্রকৃতি সাঁওতালগণ এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের স্বোপার্জিত সমস্ত দ্রব্যই হারাইয়া বসিল। শেষে, ব্যবসায়িগণ তাহাদের এমন দুরবস্থা করিল যে সাঁওতালদের ঋণগ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় রহিল না। তাহারা সাঁওতালদিগকে অত্যধিক সুদে টাকা ধার দিতে লাগিল, টাকার দরকার না থাকিলেও গায়ে পড়িয়া টাকা ধার দিত। নির্বোধ সাঁওতাল তাহাই লইত। দশ টাকা ধার দিয়া মহাজন সুদসমেত পনের-বিশ টাকা লিখাইয়া লইত। এবং টাকা গ্রহণকালে ঐ সুদসমেত টাকা আসল বা মূল ধরিয়া পুনশ্চ তাহার সুদ আদায় করিত। না দিলে সুদূরবর্তী দেওঘর বা ভাগলপুরের আদালতের সাহায্যে পাকা ধান ক্রোক করিয়া আদায় করিত এবং টাকা লইবার সময় ভুল করিয়া বেশি গণিয়া লইতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। আদালতের আমলা- পেয়াদার উৎপাতেও তাহারা বিশেষরূপ উৎপীড়িত হইত।

এই সরলপ্রাণ সাঁওতালগণ সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিত না বলিয়া উত্তমর্ণেরা তাহাদের উর্বর ক্ষেত্র, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া থালা-বাটি সমস্তই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। পুলিসের বেশ ধরিয়া ঘরবাড়ি তল্লাস করিয়া সমস্তই লইয়া যাইতে লাগিল। এমনকি তাহাদের পরিবারবর্গের দেহ হইতে কাঁসার গাত্রাভরণও খুলিতে আরম্ভ করিল। এই ঋণই সাঁওতালদের কাল হইল। কেননা, একবার মহাজনের কবলে পতিত হইলে পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হইত—কোনরূপ মুক্তির সম্ভাবনা ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে একজন সাঁওতাল টাকা প্রতি ১২ আনা সুদে ২৫ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল! এই ঋণের মাত্রা অল্পকালের মধ্যে অত্যাধিক স্ফীত হইয়া উঠিল। সে সমগ্র জীবন মহাজনের দাসত্ব করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না—তাহার পুত্রও না—তাহার পৌত্রও না!

শান্তি ও প্রাচুর্যের দুশ্চিন্তা ও নিরাশাই তাহাদের জীবনের চিরসঙ্গী হইল। তাহারা আর আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিতে পাইল না! নিরাশ হৃদয়ে কতকগুলি সাঁওতাল ঘরবাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আবার অনেকেই চির দাসত্ব-শৃঙ্খলা আবদ্ধ হইল।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও তাহারা তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিল না; বরং ঋণ আরও বাড়িয়া উঠিল। এইরূপভাবের ঋণ কি সহজে পরিশোধ হয়? প্রচুর কাজ করিয়া অন্য কাজে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিলে, প্রভু সঙ্গে সঙ্গে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আদালতের আশ্রয় লইত। কি করিবে—মূর্খ, অজ্ঞ ও সরল প্রকৃতি সাঁওতালগণ পুনরায় দাসত্ব-শৃঙ্খলে ধরা দিল। সাঁওতালদের এইরূপ অসহনীয় কষ্টের কোনরূপ প্রতিবিধান হইল না। আদালতে হিন্দুদের সমর্থন হিন্দুরাই করিত। কে এই নীচ অসভ্য জাতিদের দয়া

দেখাইবে—কে তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে? তাহারা প্রত্যেকবার পরাজিত হইয়া ও তাহাদের পাথেয় যথাসর্বস্ব আমলা-পেয়াদারের দিয়া মলিন ও শুষ্কমুখে বাড়ি ফিরিত। সাঁওতালদের মাথা রাখিবার তিলমাত্র স্থান রহিল না। মহাজনেরা তাহাদিগকে পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষেরই ত শরীর। আর কত সহিবে বা সহিতে পারে! তাহাদের সরল প্রাণ বজ্রের মতো কঠিন হইয়া উঠিল।

তাহারা প্রচার করিল যে ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধে তাহাদের কোনরূপ অভিযোগ নাই। তাহাদের যত অভিযোগ—হিন্দু মহাজন, জমিদার ও গোলদারগণের বিরুদ্ধে।

বিদ্রোহ-চরণে প্রবৃত্ত হইবার অন্যান্য হেতু

যখন সাঁওতালগণ তাহাদের পাহাড়বেষ্টিত জঙ্গলময় ভূমির মধ্যে এইরূপভাবে নির্মম মহাজন ও জমিদারগণের অকথ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও তাহার প্রতিকার প্রচেষ্টায় কোনরূপ পন্থা অবলম্বন করে নাই। কিন্তু অবশেষে নিম্নলিখিত কারণ সমবায়ে তাহাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল—

সাঁওতালগণ যখন দাসত্বের নিগড়ে ও ঋণের কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ—মুক্তির কোনরূপই আশার আলো তাহাদের নেত্রগোচর হইতেছে না, সেই সময় দামনের বাহির হইতে যে সংবাদ আসিল, তাহাতেই তাহাদের অন্তর মধ্যে চির প্রধূমিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

দামনের অদূরবর্তী অঞ্চল হইয়া ই. আই. আর, লুপ-লাইনের রাস্তার মাটির কাজ আরম্ভ হইল। প্রায় ২০০ মাইল ব্যাপিয়া রেল-লাইনের মাটির কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সাঁওতালেরা শুনিল যে কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি শিশু, কি বৃদ্ধ সকলেই এই রাস্তার কাজে কোঁচড় ভরিয়া অল্পকাল মধ্যে টাকা লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে। তাহারা পরিশ্রমে কাতর নহে। প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও তাহারা তদনুপাতে অর্থ পাইলেই খুশি। এই নিমিত্ত এই "লোহার ঘোড়া চলিবার রাস্তা" নির্মাণের কার্যই তাহাদের ঋণ পরিশোধের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়াই মনে করিল। অনেক সাঁওতাল, যাহারা ভাগ্যক্রমে নিগড়বদ্ধ হয় নাই, তাহারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ লইয়া দেশে ফিরিল। তাহাদের স্ত্রীর গায়ে গহনা, আঁচলাদার লালপাড় তাঁতের নতুন শাড়ি—তাহাদের আনন্দ দেখে কে? কিন্তু যে সকল সাঁওতাল ঋণদায়ে আত্মবিক্রয় করিয়াছে তাহাদিগকে মহাজন ছাড়িয়া দিবে কেন? সুতরাং তাহাদের অর্থোপার্জনের আশা বৃথাই হইল।

এইরূপ "দাস সাঁওতালের" সংখ্যাই বেশি ছিল। অন্য সাঁওতাল রেলের কাজে চলিয়া গেলে দেশে মজুরের অভাব হইল ;সুতরাং মহাজনেরা তাহাদের এই ক্রীতদাস সাঁওতালগণকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না। এইরূপ বিষম সঙ্কটের সময় সাঁওতালগণের যুবক সম্প্রদায়ের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বৃদ্ধগণের নিশ্চেষ্টতায় তাহারা আর সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। তাহারা বুঝিল যে তাহাদের দুখঃকষ্টের প্রতিকার তাহাদিগকে নিজে নিজেই করিতে হইবে—অপর কেহ করিবে না।

১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সমগ্র শীতকাল ধরিয়া তাহাদের মনে বিদ্বেষভাবে প্রধূমিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা মহাজনদের অজ্ঞাতে অচিরেই বনে-জঙ্গলে, সাঁওতাল পল্লিতে পল্লিতে বহু বিস্তৃত লাভ করিয়া কেবলমাত্র সামান্য স্ফুলিঙ্গ সংযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময় "সংবাদ প্রভাকর" নামক স্বনামখ্যাত দৈনিক প্রত্রিকার ৫৩০০ সংখ্যায় ১২৬২ সাল মঙ্গলবার ১৬ ই শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত হইল—

> জিলা ভাগলপুর ও বীরভূমের অন্তঃপাতী পর্বত সকলে সাঁওতাল নামে অগণ্য বন্যজাতি বাস করে, অতি অল্প দিবস হইল রাস্তাবন্দির সাহেবরা রাজমহলের নিকট ঐ বন্যজাতিদেগের তিনজন স্ত্রীলোককে বলপূর্বক অপহরণ করাতে তাহারা কতগুলি লোক একত্র হইয়া উক্ত সাহেবদিগের প্রতি আক্রমণকরতঃ তিনজন সাহেবকে হত্যা করিয়া স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে। অন্য অন্য স্থানের রাস্তাবন্দির সাহেবরা ইহাতে ভীত হইয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগপূর্বক স্থানান্তরে পলায়ন করেন। এমত জনশ্রুতি যে ঐ সাঁওতালদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি নারকেলবেড়ের সরার অধ্যক্ষ তিতুমিয়ার ন্যায় বুজরুক হইয়া আপন শিষ্যদিগের প্রতি আদেশ করে যে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে আমারদিগের রাজ্য হইবেক। অতএব তোমরা সাহসপূর্বক অস্ত্রধারণ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কর্তার এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাঁওতালেরা নাগরার দ্বারা পর্বতস্থ সমস্ত জাতিদিগের মধ্যে এই আদেশ প্রচার করিবাতে তাহারা ক্রমে ২০/২৫ হাজার লোক দলবদ্ধ হইয়া জিলা বীরভূম আক্রমণ করিবার মানসে আগমন করিতেছে ইত্যাদি।
>
> [সিউড়ি রতন লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'সংবাদ প্রভাকরের' ফাইল]

সাঁওতালগণ তাহাদের জাতিগত প্রকৃতিবশত স্ত্রীহরণ ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তাহাদের পূর্ব-নিবাস হাজারিবাগ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আগমন করিবার ইহাই অন্যতম হেতু বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এখন তাহারা তাহাদের প্রতি যাবতীয় অত্যাচার প্রতিকারকল্পে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া এতদুদ্দেশে তাহাদের কর্মপন্থা নির্দেশ করিবার জন্য একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা করিল।

তাহাদের এই মানসিক প্রবল উত্তেজনার সময় তাহাদের মধ্যে জনরব হইল যে তাহাদের দেবতা "মারাং বুরু" তাহাদের মধ্যে আগমন করিয়াছে এবং তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে। পূর্বে সাঁওতালেরা অদৃশ্য দেবতার কখন দর্শন লাভের কল্পনাও করে নাই। এখন তাহাদের এই নিতান্ত দুঃসময়ে মারাং বুরুর আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহারা সংবাদ পাইল যে ভগ্নাডিহির চূণার নামক সাঁওতালের সিধু, কাহ্নু, চাঁদ এবং ভৈরব (বৈরাত)— এই চারিজন পুত্রের মধ্যে প্রথম দুইজনের নিকট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে মারাং বুরুর আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে—মেঘরূপে, তাহার পর অগ্নিরূপে, তাহার পর কুয়াসায় বদনাচ্ছন্ন টোপরবিশিষ্ট মানুষরূপে, প্রচন্ড সূর্যকিরণ মধ্যে ছায়ারূপে, পরে ভূগর্ভোত্থিত পর্বতরূপে, পরে শালবৃক্ষরূপে, এবং সর্বশেযে সাঁওতালদের মত ক্ষুদ্র ধৃতি পরিহিত সাঁওতালরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই শেষ আবির্ভাবের সময় দেবতা তাহাদিগকে একখানি পবিত্র গ্রন্থ দিয়াছেন যাহার পত্রে কোনরূপ লিপিচিহ্ন নাই এবং তিনি আদেশ দিয়াছেন যে এই অলিখিত পত্রগুলি সমগ্র সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রচারিত করিয়া দাও এবং বলিয়া দাও যে সকলেই আশু বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত হও, যে বিপর্যয়ের ফলে তাহাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হইবে এবং তাহারা তাহাদের পূর্ব স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। গ্রামে গ্রামে এই পত্র বিলি হইবামাত্র দেশের সমগ্র সাঁওতাল জাতি একলক্ষ্য হইয়া একস্থানে অচিরেই সমবেত হইতে লাগিল।

শালবৃক্ষের পল্লব লইয়া গ্রামে গ্রামে দূত প্রেরিত হইল। সাওতালগণকে আর কোনপ্রকার বাক্য দ্বারা উত্তেজিত করিবার আবশ্যক হইল না। শালপত্রের নিঃশব্দ আহ্বানই তাহাদের সমবেত হইতে উদ্বুদ্ধ করিল।

সাঁওতালগণের সম্মেলন

রাজমহলের অন্তর্ভুক্ত লুপ লাইনের বারহারওয়া স্টেশনের ১২ মাইল পশ্চিমস্থ বারহেট বাজার সমগ্র দামনের মধ্যে বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের অদূরবর্তী ভগ্নাডিহি নামক গ্রামে সিধু, কাহ্নুর নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে অসংখ্য সাঁওতাল প্রবল বন্যাস্রোতের ন্যায় সমবেত হইল। সমবেত সাঁওতালগণের অনেকেই প্রথমত জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই যে তাহারা কিজন্য সমবেত হইয়াছে—সুভাবাবুর (সিধু কাহ্নু) আহ্বানে আসিতে হয়, তাই আসিয়াছে। এখানে সমবেত হইয়া তাহারা তাহাদের দুখঃ-দুর্দশার ও মহাজনগণের অত্যাচারের কথা আলোচনা করিয়া দৃঢ়তরভাবে স্থির করিল যে আর নয়—সমগ্র মহাজন ও তাহার অনুচর এবং সহচরগণকে একেবারে নির্মূল করিতে হইবে। বলিষ্ঠ যুবক সম্প্রদায় উচ্চকণ্ঠে বলিল—এই দীর্ঘদিন ধরিয়া জমিদার, মহাজন, পুলিশ প্রভৃতি যাহারাই তাহাদের নির্যাতনে সহায়তা করিয়াছে তাহাদের সকলেরই জীবননাশ কর। ব্রিটিশরাজ বা তাহাদের কর্মচারীদের প্রতি তাহাদের কোনরূপ আক্রোশ নাই। এখানে তাহাদের প্রতিকারের কোনও উপায় হইতেছে না, সুতরাং তাহারা সমবেতভাবে কলিকাতায় গিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথমে সমবেত সাঁওতালগণের কোনরূপ অত্যাচার বা বিদ্রোহাচরণ করিবার অভিপ্রায় ছিল না।

সিধু, কাহ্নু স্বজাতীয়বর্গকে সমবেত করিয়া লাটসাহেবের নিকট এবং বীরভূম ও ভাগলপুরের ম্যাজিট্রেটের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিল। আবেদনের মর্ম এইরূপ ছিল—সুদের নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সাঁওতাল প্রদেশস্থ অত্যাচারী মহাজনদিগকে নির্মূল করিতে হইবে। আবেদনপত্রে আরও লিখিয়া দিল যে তাহারা আর অপেক্ষা করিবে না।

ইংরাজরাজ ইহাদের এইরূপ ব্যাপারের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না বলিয়া তাহাদের আবেদনপত্র বিফল হইল। পুনঃপুনঃ আবেদনের ফলে কিছুই প্রতিকার হইল না দেখিয়া তাহারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিল। সমবেত সাঁওতালগণ সকলেই অশিক্ষিত কোনরূপ শৃঙ্খলা জানে না। সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইলে কি প্রণালীতে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয় তাহারও কোন জ্ঞান নাই। এতগুলি সাঁওতালের দীর্ঘদিন একত্র বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতে গেলে তাহাদের আহার্য সংগ্রহেরই বা কী প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারও কোনও ব্যবস্থা নাই। অথচ অন্ধবিশ্বাসী সাঁওতালগণ সকলেই পরম উত্তেজনায় উত্তেজিত রহিয়াছে। দুই-একদিনের মত নিজ নিজ খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে; সঙ্গে তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বর্শা প্রভৃতি মাত্র সম্বল। দুই-চারিদিন গত হইলে তাহারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল, এবং তাহারা লুটপাট করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহারা তাহাদের সমবেত হইবার স্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দলে দলে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

প্রচন্ড ঝটিকাবর্তের সূচনা হইয়াছে; অথচ তাহার গতিরোধের কোন আশু সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জুন তারিখে নেতৃদ্বয় সাঁওতালবাহিনীকে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিল। শুধু নেতৃত্বদ্বয়ের শরীর রক্ষার জন্য ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) সাঁওতাল ছিল, সুতরাং ঐ প্রকান্ড দলে কতসংখ্যক সাঁওতাল ছিল তাহার ধারণা করা কঠিন হইবে না। সাঁওতালগণের প্রত্যেকের আহার্য ফুরাইয়া

গেলে তাহারা ক্ষুধার তাড়নায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা বনের গাছের পাতা খাইতে লাগিল।

ঐ বৎসরেরই ৭ জুলাই বরার (বর্তমান লুপ-লাইনের পিরপৈঁতি বারার স্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে) নিকট মহেশপুরের দারোগা সাহেব মহেশলাল (লাল কায়স্থ) শুনিলেন যে বহুসংখ্যক সাঁওতাল তীর ধনুক লইয়া তাহার সীমানার দিকে আসিতেছে। হিন্দু মহাজনেরা দারোগা সাহেবকে উৎকোচ দিয়া বলিল যে, তাহাদিগকে ধরিয়া যেন চুরির অপরাধে জেলে দেওয়া হয়। লোভে পড়িয়া দারোগা সাহেব সাঁওতাল ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। দারোগাসাহেব আসিলে সিধু, কাহ্নু, নেতৃদ্বয় বলিল যে তাহাদের লোকজনের খাদ্যভাব ঘটিয়াছে । দয়া করিয়া তুমি প্রত্যেক ধনবান লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা তুলিয়া সাহায্য কর। কিন্তু নেতৃদ্বয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল যে দারোগা সাহেব অন্যায় ভাবে তাহাদিগকে চুরির অপবাদ দিয়া ধরিতে আসিয়াছে। দারোগা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঐ কথা একেবারেই অস্বীকার করিয়া বলিলেন—আমি অন্য কাজে যাইতেছি। কিন্তু তাহারা তাহাকে পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি সমস্তই স্বীকার করিয়া ফেলেন যে হিন্দু মহাজনেরা তাহাকে উৎকোচ দিয়া এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে। নেতৃদ্বয় ধীর ও শান্তভাবে বলিল—যদি আমাদের কোনরূপ চুরির প্রমাণ পাও ত ধর। দারোগা সাহেব বুঝিলেন না যে সেই মুহূর্তে তাহার কি দশা হইবে। তিনি তাহার মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে ঐ বিশাল সাঁওতালবাহিনী আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। যে মুহূর্তে দারোগা সাহেবের মুখ হইতে এই আদেশবাণী বাহির হইল, তন্মুহূর্তেই সিধু নিজ হস্তধৃত বলুয়া অস্ত্রদ্বারা দারোগা সাহেবের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। এক আঘাতেই দারোগা সাহেবকে পাঁচ-কেঠের রাখশী-থানের বটবৃক্ষ তলায় (আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি এই বৃক্ষটি এখনও বর্তমান আছে) সূর্যের উদ্দেশে বলিদান দিল এবং অপরাপর সাঁওতালদের হাতে পুলিসের নয় জন লোকও প্রাণ হারাইল।

ইন্‌পেক্টর হত্যার পর, সাঁওতালগণ দলে দলে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে এক দলের সহিত পূর্বোল্লিখিত মিঃ পন্টেট সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। মিঃ পন্টেটকে সাঁওতালেরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত; সুতরাং তাহার প্রতি তাহার কোনরূপ অত্যাচার করিল না। পরন্তু তাহাকে পাহাড়ের মধ্যে এক নিরাপদ স্থানে বিদ্রোহের অবসান কাল পর্যন্ত লুকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিল। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে তাহাদের প্রথমে কোনরূপ দুষ্টু অভিপ্রায় ছিল না।

১. প্রত্যক্ষদর্শীর কথা[৫]

"এক পক্ষকাল কোনরূপ বাধা-বিপত্তি না পাইয়া মাঝিরা পথে লুট-পাট, খুন-জখম করিয়া সিমড়ার নিকট রাঙামেটেয়ার পাহাড়ের তলদেশস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া জমা হইল। তাহার পর তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইল—চতুর্দিকস্থ লোকের ঘর-বাড়ি লুটপাট করিতে লাগিল। তাহারা এই স্থান হইতে তিন মাইল দূরবর্তী গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত মাহাগামার রাজবাটি লুঠ করে। পরে লাহাটি গ্রামের (শিরপৈঁতি স্টেশনের ২৪ মাইল দক্ষিণে) এবং নিকটস্থ মহাদেববাথান গ্রামে করম গাছ (গ্রামের বাহিরে রাস্তার ধারে গাছটি এখনও বর্তমান থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তবে ইহার ভিতর অংশ ফাঁকা হইয়া

গিয়াছে) তলায় আসিয়া সমবেত হয়। পরে এখান হইতে দুই মাইল মধ্যে তাহারা গামরিয়া গ্রাম লুঠ করে। তৎপরে তাহারা চারি মাইল দূরবর্তী বারকূপ গ্রাম লুঠ করিতে যায়। এই স্থানের সাঁওতালেরা গর্ভিনী স্ত্রীলোকদের উদর চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত শিশু সন্তান বাহির করিয়া হত্যা করে। এখানে দারোগা সাহেবেরা আসিলে সিধু, কানু তাহাদিগকে এবং সাঁওতালদিগকে তাহাদের নিকট আসিতে বলে। সাঁওতালেরা আপন ভাষায় কথা কহিতে থাকিলে, দারোগা-সাহেবরা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে সিধু হুকুম দিল যে তাহাদিগকে ধরিয়া যেন অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা হয়। তখন বেলা অবসান—সকলে "দারোগাটিকে ত নিলাম—এবার ঐ দারোগার গাঁকে লুঠ করিব" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা চীৎকার করিতে করিতে বারার নিকট পয়লাপুরে আসিল। ইহার পর তাহারা পাথরগাঁওয়া লুট করিতে যায়। এদিকে সিধু, কাহ্নু স্বগ্রাম ভগ্নাডিহিতে ফিরিয়া আইসে। পাথরগাঁওয়ার ধামসাই থানার (এখন থানা নাই) দারোগা সাহেব তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা তাহাকে ধরিয়া কাটিয়া ফেলে (এই স্থানে লীলানাথ মহাদেব বর্তমান)। ইহার পর, তাহারা সুন্দরা নদীর তীরবর্তী পূর্বোক্ত পালারপুরে ফিরিয়া আইসে। ইতিমধ্যে ভাগলপুর হইতে পিরপৈঁতি হইয়া এক সহস্র সৈন্যের এক পল্টন আইসে। পয়লাপুরে লড়াই হয়। বন্দুকে ভালরূপ আওয়াজ হইল না। ইহাতে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া গেল। পূর্বেকার বন্দুক এখনকার মত ছিল না। বারুদ জলে ভিজিয়া গিয়াছিল বলিয়া বন্দুকে ভালরূপ কাজ হয় নাই। এই জন্য সাঁওতালেরা অনেক সিপাহি মারিবার সুবিধা পাইয়াছিল। একজন সাহেব আহত হইয়া ভাগলপুরে পলাইয়া গেলে, তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া উঠে এবং উন্মত্ত হইয়া তাহারা মহাদেববাথানে আইসে।

সাঁওতালেরা পল্টন দেখিয়া সুন্দরা নদী পার হইয়াই লাহাটি গ্রামে আসিল। পল্টন বেলা ১১টার সময় এই গ্রামের ধারে সুন্দরা নদীর উত্তর তীরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং করমগাছ সন্নিহিত উত্তর-পশ্চিম প্রান্তরে তাঁবু ফেলে। সাঁওতালেরা নদীর অপর তীরে বসিয়া পল্টনের কার্যকলাপ দেখিতে থাকে। আমি (চাঁদ পাহাড়িয়া) ক্যাপ্টেন কোপি (Captain copy) সাহেবের আদেশে অপর তীরে দাঁড়াইয়া চীৎকারপূর্বক তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম—"কেন তুই লড়ছে? কেন তুই হুলমাল (হাঙ্গামা) করছে? আপনার বুরুত বাতরা (ছেলেমেয়ে) নিয়ে ঘরে থাক।" কিন্তু তাহারা এই চিৎকারে কর্ণপাত না করিয়া কেবল তরবারি ঘুরাইয়া দেখাইয়াছিল। ইহার পর সাহেব সিপাহিদিগকে রসি দুই পশ্চিমে ভাগারডাঙায় লইয়া যায়। তখন বেলা দুইটা। সাঁওতালেরা নদীর তীরে তীরে পল্টনের সঙ্গে গিয়াছিল। সাঁওতালদিগকে আবার বোঝানো হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শুনে নাই; বরং বলিয়াছিল—"পুড়খানা (সাদা, সাহেবদের শ্বেতবর্ণ উদ্দেশ করিয়া) সব কাট।" সাঁওতাল সর্দার একহস্তে ঢাল লইয়া ও অপর হস্তে তরবারি ঘুরাইয়া অপর সাঁওতালদের সহিত সমস্বরে বলিয়াছিল "পুড়খানাকে সব কাটব নদীর গর্তে।"

এই কথা শুনিয়া সাহেব গুলি চালাইতে অদেশ দেন। ইহাতে ১৬/১৭ জন সাঁওতালের প্রাণ বিনাশ হয়। সাঁওতালেরা "সাতরা", "নাগরা" বাজাইতে বাজাইতে ৪ মাইল দক্ষিণে চুণাখলিতে পলাইয়া যায়। তৎপরে পল্টন পালারপুরের তাঁবুতে ফিরিয়া আইসে।

ইতিমধ্যে সাঁওতালেরা চুণাখালিতে লুটপাট করিয়া পাথরুলের বাজারে ১০ টি হাতি

লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখে। পালারপুরের ২দিন অবস্থান করিলে পর পল্টন তৃতীয় দিবসে এক গোয়ালার নিকট চুনাখালির লুটের সংবাদ পাইয়া বেলা ১২ টার সময় সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হয় এবং নিকটস্থ পাহাড়ের নিকট বন্দুকে বারুদ পুরিয়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি (চাঁদ সিপাহি) তাহাদিগকে অনেক প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই হয় নাই। তখন ক্যাপ্টেনের আদেশমত তাহাদের উপর গুলি নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে প্রায় দেড় সহস্র সাঁওতাল মারা পড়ে। বেলা তিনটা পর্যন্ত এইরূপ ভীষণ কান্ড চলিয়াছিল। পরে অবশিষ্ট সাঁওতালেরা প্রাণভয়ে এই স্থানের ১৬ মাইল পশ্চিমে সংগ্রামপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সিপাহিরা চুনাখালির উত্তরে পাঁচগাছিতে ফিরিয়া আইসে। সংগ্রামপুরে সাঁওতালদের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় সিপাহিরা সেখানে গিয়া, তীর-ধনুকধারী সাঁওতালদিগকে গোলাকারভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে। ক্যাপ্টেন যখন দেখিলেন যে, সাঁওতালেরা কিছুই বুঝিতেছে না, তখন তিনি তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দেন। এই স্থানে বহুসংখ্যক সাঁওতালের মৃত্যু হয়। মাত্র ৪০/৫০ জন জীবিত সাঁওতাল প্রাণভয়ে অন্যত্র পলাইয়া গিয়াছিল। চুনাখালির ব্যাপারের তিনদিন পরে সংগ্রামপুরের এই ভীষণ যুদ্ধ হয়। এইস্থলে পল্টন তিনদিন অবস্থানের পর ক্যাপ্টেনের আদেশমত ভাগলপুরে ফিরিয়া যায়।"

২. প্রত্যক্ষদর্শীর কথা[৬]

"সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদ—ইহাদের ছেলেপিলে এখনও আছে। আর ভাইদের একজন এখনও বর্তমান। জাতি মুর্মু ঠাকুর (রাজা গোষ্ঠী)। সাঁওতালেরা আনাগোনা করে ও খবর পাঠায় এবং বলে আমি রাজা হইয়াছি। তোমাদিগকে হালপিছু মোটেই দুই আনা করিয়া লইয়া জমি বন্দোবস্ত করিব। পরগণাইতকে ৪/৫ বার চিঠি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। শেষে লিখিল যে আমার নিকট কাঁড়, ধনুক ও হাতিয়ার লইয়া উপস্থিত হও।

মহেশপুরের দারোগা পাঁচকেঠেয় আসিয়াছিল। সাঁওতলেরা শুনিল যে দারোগা ও ভাল ভাল মহাজনেরা আসিয়াছে। উহারা ঠাকুর পূজা করিতে লাগিল এবং সিধু সকল সাঁওতালদিগকে ও দারোগাদিগকে নিকটে আসিতে বলিল। সকলে আসিল। এখানে সাঁওতালেরা নিজ ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। অগত্যাই দারোগা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে সিধু হুকুম দিল যে উহাদিগকে ঘিরিয়া কাটিয়া ফেল। তখন বৈকাল বেলা। পরে বলিল যে, দারোগাটিকে ত নিলাম, এবার ওই দারোগার গাঁকে লুট করিব। এই বলিয়া তাহারা বারার নিকট পয়লাপুরে আসিল। বর্ষার জন্য সিপাহিদের বন্দুকের ভাল কাজ হইল না বলিয়া সাঁওতালেরা অনেকে সিপাহি মারিয়াছিল। ইহাতে সাঁওতালেরা অত্যন্ত সাহসী হইল এবং উন্মত্ত হইয়া মহাদেববাথানে আসিয়া সমবেত হইল। বৈদ্যনাথপুরের নিকট টেঙ্গরের ক্ষেতরীবাবু ঘাটোয়ালকে কাটিল।

সিধু, কানু মালখান পরগণাইতকে পরওয়ানা দিল—"পরগণাৎ বারে বারে তোমাকে যে হুকুম দিয়াছি সে সমস্ত শেষ করিয়া অবিলম্বে হাজির হও। তুমি কিছুতেই শুনিতেছ না কেন? আমি অগ্রে গিয়া তোমাকে কাটিব, পরে অন্য কথা। আমি (নবীন দাস) নিজে কেড়তে এই পরওয়ানা প্রথমে পাঠ করিয়া পরগণাইতকে শুনাইয়াছিলাম। আমার বাবা

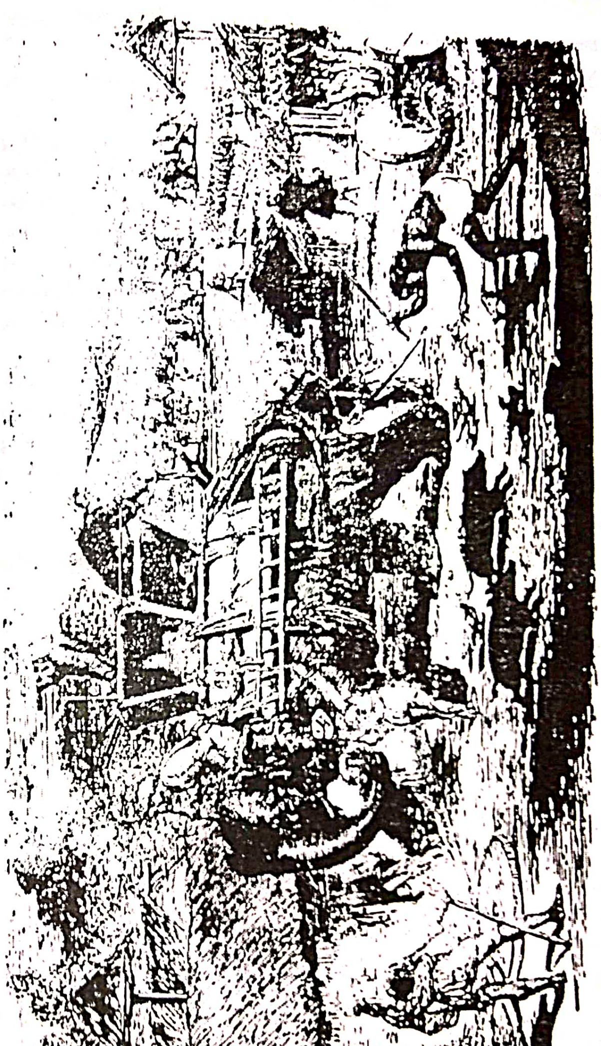

হাতির সাহায্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের দৃশ্য

পরগণাইতকে যাইতে উপদেশ দিলেন। পরগণাইত নিজে না গিয়া নিজের ভাই ও অন্যান্য প্রজাদিগকে সুভবাবুর (সিধু,কানু) নিকট পাঠাইয়া দিল।

পাঁচকেঠের পলায়িত লোক আসিলে আমারও দুই ক্রোশ পশ্চিমে বিসনপুরে ৫ দিন থাকিলাম।

সাঁওতালেরা পরে পাথরগাঁওয়ায় যায়। বাবা বারণ করা সত্বেও আমি বিসনপুরে হইতে কেড় দেখিতে আসিলাম যে তথায় কি হইয়াছে। আসিয়া দেখিলাম যে পরগণাইত আছে। পরগণাইত আমাকে আসার জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং বলিল যে সে নিজেও এখন নিরাপদ নহে। আমি বলিলাম—তবে দাদা, আমি কি উপায় করি? এদিকে সাঁওতালেরা বানের মত ছুটিয়া চলিতেছে। তখন পরগণাইত আপনার ভাগিনয়কে, সাঁওতালেরা চলিয়া গেলে, ধীরে ধীরে পার করিয়া দিতে বলিল (ঐ ব্যক্তি এখনও জীবিত)। ফারাকে ফারাকে গ্রামের বাহিরে বাহিরে আমাকে পার করিয়া দিল। বলিয়া দিল যে হাকিম আসিলে পর আসিবে। আর আসিও না।

আমরা পাঞ্জয়ারার নিকট একটি গ্রামে আসিয়া শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় লইলাম। কারণ এদিকে শুনিলাম যে পূর্ব ভাগলপুরের পল্টনে হইবে না—পশ্চিম হইতে পল্টন আসিলে পর সাঁওতালদের সহিত লড়াই হইবে। এদিকে গোড্ডার নিকট সাহেবগঞ্জে সাঁওতালেরা জমা হইল। এইখানে পাঞ্জয়রার রাজার সিপাহির সহিত লড়াই হইল। হাতি প্রভৃতি পলাইয়া গেল। কিন্তু শেষে রাজা মারা পড়িল। সাঁওতালদের সহিত আঁটিতে পারিল না। বাকি সিপাহি পলাইয়া গেল।

পরে, আমরা আমাদের আদি বাসস্থান সারেট সারজল পার হইয়া ভাগবান্দে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে জামতাড়ার নিকট বেউড়া গ্রামে পল্টনের সহিত লড়াই হইল। ভয়ে জামতাড়ার রাজা প্রভৃতি সকলে পলাইয়া গিয়াছিল। সাঁওতালেরা বড়াকর পার হয় নাই বলিয়া পাড়রার রাজা পলাইয়া যায় নাই। করোর (কর্ণপুর) বর্গী রাজা পলাইয়া গিয়াছিল। এখানে লড়াই হইয়াছিল। সাপচালায় যত মুলুকের সাঁওতাল জড় হইয়াছিল। এই লড়াই বড় জবর লড়াই। অত বড় পাহাড়কে হাতাহাতি পল্টনেরা ঘিরিয়াছিল। সাঁওতালদের মেয়েদিকে ছাড়িয়া দিয়াছিল—ছেলেদিগকে রেহাই দেয় নাই।

কানু সাপচালায় ধরা পড়ে। সিধু পূর্বেই ধরা পড়িয়াছিল”—ইত্যাদি।

৩. প্রত্যক্ষদর্শীর কথা[১]

এক বৃদ্ধ সাঁওতাল বলিয়াছিল—“ হুলমালের কারণ ইয়াদ নাই সিধু কানু ভগ্নাডিহি গ্রামে জন্মাইয়াছিল। ইহারা সুভা ঠাকুর হইল। কারণ রাতেই লোক বড় হয়, রাতেই লোক ছোট হয়। সেইজন্য সিধু কানু দেবতা। যথা—কেউ হাকিম, কেউ কোট বাবু—যদিও সেই একই লোক। আমাদের ২ গাড়ি চাউল ও ৩। ৪ কুড়ি মহিষ ও গরু কোন দিকে কি হইয়া গিয়াছিল। আমার বয়স ১৪।১৫ বছর।”

বনয়ারী সাঁও বলিয়াছিলেন—“ব্রাহ্মণ সূর্যের পাঠা; আর সূর্য সাঁওতালদের উপাস্য দেবতা। ডোম, কলু, নাপিত, কামার, গোয়ালা, কাহাল ইত্যাদিকে সাঁওতালেরা রেহাই দিত, কাটিত না। কারণ ইহাদের দ্বারা সাঁওতালদের উপকার হইত। সাঁওতালেরা বলিত—বন্দুকের ধুমাকে জল করিয়া দিব। জমি বাড়ুক তবে জমা বাড়িবে, বাপ দাদা বন কাটিয়া জমি তৈয়ারি করিয়াছে ইত্যাদি। তাহারা মহাজনদিগকে পায়ে হইতে কাটিতে কাটিতে বলিত এই জাড়ুই, রোদাড়ী ইত্যাদি নেও। দেশে এক বৎসর ধরিয়া মনুষ্য ছিল না—দেশ জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছিল। তখন রেল হয় নাই, পরেই রেলের শুরু হয়।

পাঁচকাঠিয়ার মহেশলাল দারগা হাঙ্গামা থামাতেই চেষ্টা করে। বলে—তোরা হাকিম। তোদের বাসনা পূর্ণ করিব; কিন্তু তারা বলে তা নয়, রাজ্য দাও। কিন্তু দারগা বলে—আমি তোদের জন্য হাকিমের নিকট লড়িব, কিন্তু কি হয় বলিতে পারি না। সাঁওতালেরা ইহা শুনিল না—তাহাকে রাখশী-থানে বলি দিল।

লীলাতড়ের সাঁওতালেরা মহাজনীর জন্য তিলিদের বিরুদ্ধে সুভাবাবুর নিকট (সিধু কানু) নালিশ করে। ধনী মাঝি সুভাবাবুকে বুঝাইয়া বলিবে বলিয়া সাহস দিয়াছিল। মহাজন ধনী মাঝির সহিত গেল। সুভা স্নান করিয়া কাছারী করিল। ধনী মাঝি ও ডেহুয়ার দেশ মাঝি মহাজনকে মাঝে করিয়া সুভার নিকট উপস্থিত হইল। সুভা উক্ত মহাজনকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। মহাজন বলিল যে হুজুর খাতক যাহা বলিবে তাই আমার মঞ্জুর, কারণ আমার কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না। সাঁওতালেরা বলিল যে আমরা ইচ্ছায় দিয়াছি জোর করিয়া লয় নাই। এইজন্য সুভা বিচার করিয়া তাহাকে ছুটি দিলেন এবং তাহাকে চাউল, ডাল, বাসন ইত্যাদি দিয়াছিলেন। তখন আষাঢ় মাস।

ডাকেতা হইতেই লুটপাট আরম্ভ। পরে লহড়িয়া বাজার, মহাগামা, পাথরগাঁওয়া, বারকূপ এবং শেষে চতুর্দিকে লুটপাট আরম্ভ হয়। পরে দেশ মাঝি পরগণাইত, সর্দার ইত্যাদি হাকিমকে খবর দিল।

পালারপুরের উত্তরে মহাদেববাথানে সিপাহিরা তাবু খাটাইল। ভাগার মাঠে লড়াই হইল। পশ্চিমে সাহেব, পূর্বে সাঁওতাল। সাহেব বলিল—আমাদের সহিত পারিবি না, ঘর যাও। সাঁওতালেরা বলিল আমরা পারিব —আমরাই রাজা। ইহার পরই যুদ্ধ হইল। ইহাতে বহু সাঁওতাল নিহত হয় ও অনেকে বনে-জঙ্গলে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে। অনেক সাঁওতাল সারেট বামন-গাওয়ায় আসিল। এখানেও লড়াই হইলে অনেক সাঁওতাল মরিল। ইহার পর বাঁশকুলী ইত্যাদি লুঠ করিয়া তাহারা গোরতপুর পাহাড়ে বা সাপচালা পাহাড়ে ছেলেমেয়ে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। পরে ইহাদের গতি জানিতে পারিয়া 7 Camp পল্টন ইহাদিগকে তিন দিক দিয়া আক্রমণ করিল। অনেক সাঁওতাল পলাইয়া গেল, কতক লড়াই করিয়া প্রাণ হারাইল।”

নয়না দাস স্বচক্ষে সাত গাড়ি সাঁওতালের মুন্ড লইয়া যাইতে দেখিয়াছিল। সাঁওতালেরা মহাজনদের এক একটি করিয়া আঙুল কাটিয়া বলিত যে এমনি করিয়া টাকা বাজাস্। পরে গলা কাটিয়া ফেলিত। দাঁড়িওয়ালা লোককে ভাল পাঁঠা বলিয়া কাটিয়া দেবতাকে মুন্ড উপহার দিত। হাঙ্গামার শেষে সাঁওতালদের সাওয়া ঘাস খাইতে হইয়াছিল। তাহারা ২। ৪টি ধান খুঁটিয়া বাহির করিয়া ১ হাঁড়ি জলে ফেলিয়া অন্নের জল প্রস্তুত করিয়া খাইয়াছিল। এক টাকার দামের কুঠার /১এক সের চাউলে বিত্রাক হইয়াছিল। পেটের জ্বালায় ওলের গাছ খাইত। ৪ মাদরিবিয়া লবণ পাওয়া যায় নাই। অনেক লোক অন্নাভাবে মরিয়া গিয়াছিল। এই জন্য পর পর দুই বৎসর জমি আবাদ হয় নাই। লোকের ভীতি অনেক কাল যায় নাই ইত্যাদি।

বিদ্রোহী সাঁওতালগণের অগ্রগতি—বর্তমান বীরভূম অভিমুখে—

এইভাবে দারুণ অত্যাচার করিতে করিতে সিরু মাঝি এক সুবৃহৎ বিদ্রোহী সাঁওতাল দল হইয়া বীরভূমের সদর সিউড়ির দিকে অগ্রসর হইল। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া সকলেই ঘরবাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইয়া গেল। ডাক বন্ধ হইয়া গেল। দেওঘর হইতে সিউড়ির ডাক লুট হইল। ডাকবাহক অর্ধমৃত অবস্থায় একটি শালবৃক্ষের শাখা লইয়া ফিরিয়া আসিল। সাঁওতালেরা গ্রামকে গ্রাম পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিল। প্রায় ৩০টি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। একদল সাঁওতাল প্রথমত চন্দ্রপুরে আসিয়া রামধন মন্ডল ও তাহার পুত্রকে ধর্মরাজ ঠাকুরের খুটায় পরাইয়া বলিদান করিল। পরে পার্শ্ববর্তী স্থানে লুক্কায়িত লোকদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিল। জমিদার মহাজনদের প্রাণ ত গেলই, উপরন্তু তাহাদের জন্য ছোট ছোট দুগ্ধপোষ্য শিশুও রেহাই পাইল না। এই সঙ্গে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ ও নারীর প্রাণ বিনষ্ট হইল! এতদঞ্চলে তখন সাহেবদের নীল, রেশম ইত্যাদির অনেক ফ্যাক্টরী বা কুঠী ছিল। সেখান হইতে সাহেবরা প্রাণভয়ে নৌকাযোগে পলাইয়া কোনরূপে আত্মরক্ষা করিল। জমিদার প্রাণভয়ে পলাইয়া জল মধ্যে আশ্রয় লইলেও তাহার সর্বশরীরে তীর বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। পরে জল হইতে তাহার মৃতদেহ উঠাইয়া পাথরে রাখিয়া চারিখন্ডে কাটিয়া ফেলিল। কাটিবার সময় বলিল—এই জাড়ুই (জাড় বা শীতকালে দেয় সুদ)। এই রোদাড়ী (রৌদ্র বা গ্রীষ্মকালে দেয় সুদ)। হতভাগ্য নারায়ণপুরের জমিদারকে বরাকর নদীতে খন্ড খন্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথমে তাহার হাঁটু হইতে পা দুইটি কাটিয়া কাটিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া ছিল—"এই আট আনা" "বার আনা" অর্থাৎ অর্ধেক সুদ দেওয়া হইল। শেষে দেহ হইতে মস্তক বিছিন্ন করিয়া বলিয়াছিল "ফরকতি" অর্থাৎ ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হইল। কুটিল মহাজনের কৃতকর্মের উত্তেজনায় সাঁওতালগণ কর্তৃক যে ভীষণ নরহত্যার অভিনয় হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

সিউড়ি আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

সাঁওতালগণ বর্তমান বীরভূম জেলার প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ব্যাপিয়া দলে দলে প্রবল বন্যার ন্যায় নিরীহ দেশবাসীর প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে সিউড়ির অদূরে ময়ূরাক্ষী নদী তীরবর্তী স্থানে আসিয়া বহু দল সমবেত হইল। এইবার তাহারা ঠিক যেন তদানীন্তন কালের সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের রাজধানী সিউড়ি আক্রমণ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য উদ্যত হইল। সিউড়ি যেন সাঁওতালগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইবার মত হইল। এইজন্য তাড়াতাড়ি উপযুক্ত প্রহরীর দ্বারা জেলখানা সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হইল।

প্রথমে এই সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহ দমন করা কোনরূপ কষ্টসাধ্য বলিয়া ইংরাজ গবর্নমেন্ট মনে করে নাই। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের Final Minute -এ এই হাঙ্গামাকে " A local outbreak and little looked for" বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহারা প্রথমেই তাহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করেন নাই। তদুপরি সে সময়ে এই সামান্য কার্যের জন্য সৈনিক নিযুক্ত সম্ভবপর হয় নাই। কেন না, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সুশিক্ষিত সৈন্য অন্যত্র নিযুক্ত ছিল। এখন

কিন্তু সিউড়ির অদূরবর্তী স্থানে এবং নগর, মহম্মদবাজার প্রভৃতি স্থানে সাঁওতালগণ তাহাদের দুর্বৃত্তাচরণে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। সুতরাং আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলিল না। সে সময়ে কর্মব্যতীত দেশরক্ষার ভারও কালেক্টারগণের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহাতে সৈন্যাধ্যক্ষগণের বিদ্রোহ দমনে স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে তাহাদের একটু অসুবিধা হইত।

সাঁওতালগণের কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তীর-ধনুক ব্যতীত কোন অস্ত্র ছিল না। এখন ইংরাজ সেনা দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে তাহাদের সুশিক্ষিত সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করা আদৌ সম্ভব নহে। তাই তাহারা ঝোপে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে, আত্মগোপন করিয়া সুযোগমত ইংরাজ সেনাদিগকে আক্রমণ করিত। দুই-এক ক্ষেত্রের কৃতকার্যতাই তাহাদের সর্বনাশের কারণ হইল। তাহারা মনে করিল—সমগ্র ব্রিটিশ সৈন্যকে এইভাবে তাহারা ধ্বংস করিতে পারিবে।

সাঁওতালগণের দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া গবর্নমেন্ট আর চুপ করিয়া থাকিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে মেজর ভিন্‌সেন্ট জারভিসের অধীনে একদল সৈন্য নব-চালিত রেলপথে বর্ধমান পর্যন্ত প্রেরিত হইল। পরে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সৈন্যদল সিউড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রাবণ মাসের প্রথমেই গবর্নমেন্ট অত্যাচারীর প্রবল প্রতাপের কথা শুনিয়া Major General LIoyd G. B র সহিত আরও সৈন্য প্রেরণ করেন। হিন্দু মহাজনেরা ইংরাজদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সহযোগী কর্মচারীরূপে কাজ করিতে লাগিল এবং সৈন্যদের রসদ বা খোরাকী যোগাইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদের মহারাজ একদল শিক্ষিত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ষাকালে সৈন্য যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছিল। সাঁওতালগণ শিক্ষিত সৈন্যদের সম্মুখীন হইতে পারিল না। ময়ূরাক্ষী নদীর অপর পারে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইল। সে সময় বর্ষাকাল—নদীতে প্রখর স্রোত বহিতেছিল। ইংরাজেরা প্রথমত বন্দুকের শব্দ করিল। সাঁওতালেরা তাহাতে সাহস পাইয়া তির ছুঁড়িল; কিন্তু তির বেশিদূর আসিল না। পরে যখন তাহারা নদী পার হইয়া আসিবার জন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাহাদের উপর প্রচন্ড গুলি-বৃষ্টি করা হইল। তাহাতে বহুসংখ্যক সাঁওতাল প্রাণ হারাইয়া নদীর বন্যায় ভাসিয়া গেল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহাদের মধ্যে কতক পলাইয়া গিয়া নিজদের প্রাণ রক্ষা করিল, আর কতক ইংরাজের হাতে ধরা পড়িল। প্রথমে কানুর ফাঁসি হয়। পরে, সিধুকে তাহারা স্বগ্রামে ধরিয়া লইয়া গিয়া বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও অপরাপর জাতির সম্মুখে মিঃ পোটেন্ট (Mr. Potent) সাহেব তাহার ফাঁসি দেন। অপরাপর সাঁওতালদিগকে সিউড়ির দক্ষিণে উন্মুক্ত ময়দানে সর্বজনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হয়।

সিউড়ি অঞ্চলের কথা বর্ণনা করিতে হইলে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাহাদের অত্যাচার, উৎপাত ও নির্যাতনের কথা পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। আমরা এই স্থলে একজন প্রত্যক্ষদর্শী গ্রাম্য কবির স্বহস্ত লিখিত সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি কবিতা মুদ্রিত করিলাম। (কবিতাটি প্রথমেই ছাপা হয়েছে।) কবি মহম্মদবাজার অঞ্চলের লোক। মহম্মদবাজার ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরাংশে অবস্থিত। সুতরাং সাঁওতালগণ নদী নালার দ্বারা কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া সোজাসুজিভাবে পাটজোড়, কুমড়াবাদ, পরিহারপুর প্রভৃতি ময়ূরাক্ষীর উত্তর তীরবর্তী অঞ্চলে বিশেষভাবে উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল—মহম্মদবাজার হইতে লবণ ইত্যাদি দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া লইবে। এই সময় Sergeant Gillon মহম্মদবাজার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১২

সেপ্টেম্বর তারিখের বীরভূমের তদানীন্তন কালেক্টর Mr. R.I. Richardson সাহেবের দৈনিক-লিপিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে— Sergent Gillon reports from Muhammad Bazar that all is quite there. I have directed him to keep a white flag flying as a signal that "all is well," a signal which a sepoy from the top of my house can see distinctly, should the flag be lowered, a detachment of sepoys can be ready for a start by the time a messenger may arrive." "Should unfavourable news continue to be received from the Nugger direction, 100 men under Major Nemhard will be de spached to Dubrajpur to hold that place."

এই সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন সংক্রান্ত ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২ আগষ্ট তদানীন্তন কালেক্টর Mr. R.I. Richardson সাহেব মহোদয় বর্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন এই স্থলে তাহার মর্মানুবাদ প্রদান করিলাম। পাঠকগণ ইহাতেই সঠিক বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

বিদ্রোহ দমনে রিচার্ডসনের রিপোর্ট

আমি ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই হইতে ৩০ জুলাই পর্যন্ত বীরভূমে বিদ্রোহী সাঁওতালগণের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার ভার প্রাপ্ত হই। ২০ জুলাই প্রাতে ৫৬ এন, আই দলের একজন সিপাহি Mr. Ensign Morris-এর অধীনে সিউড়ির ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমাংশে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী নাঙ্গুলিয়া গ্রামে প্রেরণ করা হয়। আমি Mr. Ensign Morris-কে বিদ্রোহী সাঁওতালদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে এবং সম্ভব হইলে, যাহাতে তাহারা ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া আসিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক রহিতে উপদেশ প্রদান করিলাম।

নগর—নগররাজ, সাঁওতালগণ কর্তৃক নগর আক্রান্ত হইবার কথা লিখিলে ২১ প্রাতে আমি নিজে Lieutenant Rikes এবং পূর্বোক্ত দলের কতক সিপাহি লইয়া সিউড়ির চৌদ্দ মাইল দূরবর্তী নগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা সেখানে বেলা ২ টার সময় পৌঁছেছিলাম। সেখানে মধ্যরাত্রে শুনিলাম যে আমাদের অনুপস্থিতকালে সাঁওতালেরা নগর আক্রমণ করিবে। ঠিক সেই সময়েই নাঙ্গুলিয়া হইতে মরিস সাহেব সংবাদ দিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে একদল সিপাহি দিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি না করিলে তিনি সিউড়ি ফিরিয়া যাইবেন। আমি বাধ্য হইয়াই সিউড়ি ফিরিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে Ensing Morris কেবল আমাকেই সৈন্য চাহিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তিনি আমার উর্ধ্বতন কর্মচারীকেও অতিরিক্ত সিপাহি পাঠাইতে লিখিয়াছেন। তিনি উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সিউড়ি অভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে Lieutenant Dilumain অতিরিক্ত সৈন্য লইয়া মিঃ মরিসের সহিত মিলিত হইলেন এবং উভয়েই নাঙ্গুলিয়া যাত্রা করিলেন। নগর হইতে আসিবার সময় আমি লেঃ রাইকসকে উপদেশ দিয়াছিলাম যে বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ করিলে সাহায্যকারী সৈন্য না পৌছান পর্যন্ত তিনি কেবল আত্মরক্ষা বা প্রতিরোধ করিবেন—বিদ্রোহীদিগকে কোনমতেই আক্রমণ করিবেন না। কিন্তু তিনি আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নগরের তিন-চারি মাইল পূর্বে-পশ্চিমে সমবেত বিদ্রোহী সাঁওতালগণকে

মাত্র ৩৫ জন সিপাহি লইয়া আক্রমণ করিলেন। তাহারা পলাইয়া গেল; কিন্তু তখন তাহারা দুইটি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া দিল। তিনি প্রত্যাগমণ করিয়া দেখিলেন যে প্রায় ২/৩ হাজার সাঁওতাল সমবেত হইয়া নগরের অন্তবর্তী গাঙ্গমুড়ী নামক স্থানে লুট করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার গুলিবর্ষণে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইল—তিনি নগরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে তাহার অনুপস্থিতকালে নগর আক্রান্ত হইয়াছে এবং তাহার সুবাদারকে পশ্চাদগামী করিয়াছে। লেঃ রাইকস রাজবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহীরা যথেচ্ছ নগর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ২২ জুলাই তারিখ বেলা ৩টার সময় মেজর নিম্‌রড লেঃ টুলমিনের অধীন ২৫ জন সিপাহি নগর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সিউড়ি হইতে ৪ মাইল মাত্র গিয়া তাহারা পর্যুদস্ত দলকে সিউড়ি প্রত্যাগত হইতে দেখিতে পাইল। এইজন্য লেঃ টুলমিন সাহেব আরও সিপাহি লইবার জন্য সিউড়ি প্রত্যাগমন করিলেন। সার্জেন্ট মেজরের সহিত আরও ৪০ জন সিপাহি প্রেরিত হইল। এই সমবেত সিপাহি দল ২ তারিখ প্রাতঃকালে লেঃ রাইকসকে উদ্ধার করেন।

নাঙ্গুলিয়া—এদিকে ২০ তারিখ দুই প্রহরের সময় প্রায় ২০০০ হাজার সাঁওতালের সহিত একটি যুদ্ধ হইয়া গেল। সাঁওতালগণ ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া অগ্রসর হইল এবং লেঃ ডিলুমেনের শিবিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। লেঃ ডিলুমেন সেই সময় তাহার ৩৫ জন বাছা বাছা সিপাহি লইয়া সম্মুখীন হইলেন এবং অতিরিক্ত সিপাহি দল উপস্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মরিসকে তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন। প্রথমে মাত্র ১০০০ সহস্র বিদ্রোহী দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু নাকড়া বাজাইবা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আরও ৮০০ শত সশস্ত্র বিদ্রোহী সাঁওতাল তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল। তাহাদের দুই দল একত্রীভূত হইয়া তরবারি সঞ্চালন করিতে ও তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লেঃ ডিলুমেন তাহার সৈন্যদিগকে 'প্রস্তুত' হইতে এবং গুলি করিতে আদেশ দিলেন। ১০ মিনিটের মধ্যেই বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া নদীতীর অভিমুখে পলায়ন করিল। এদিকে, তাহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া যে পর্যন্ত না তাহারা নদীর অপর তীরে উপনীত হইয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রমাগতই গুলিবর্ষণ করিল। বিদ্রোহিগণের মধ্যে প্রায় ২০০ শত লোক হত বা জলমগ্ন হইয়া গেল। রণক্ষেত্রে মাত্র ৬১ জন মৃতদেহ দৃষ্ট হইয়াছিল।

বিদ্রোহিগণ পলাইয়া গেল। এইজন্য নাঙ্গুলিয়া হইতে লেঃ ডিলুমেনকে সসৈন্যে সিউড়ি ফিরিতে আদেশ দেওয়া গেল। কেননা, সেই সময় নগরে সিপাহি সৈন্য পাঠাইতে হইয়াছিল বলিয়া সিউড়ি শহর রক্ষা করিবার জন্য মাত্র ২৭ জনের অধিক সিপাহি ছিল না। ২৬ তারিখ লেঃ টুলমিন শুনিলেন যে নগরের ৮ মাইল উত্তরে বাঁশকুলী ও বিন্দাবনী নামক দুইটি গ্রামে বিদ্রোহীগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছে। এই শুনিয়া তিনি খয়রাশোল হইতে লেঃ টুক্‌সকে তাহার সহিত বামদিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য মিলিত হইবার আদেশ দিলেন এবং নিজে দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করিবেন জানাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ২৭ তারিখ ৬ মাইল দূরবর্তী স্থানে লেঃ টুলমিন ও লেঃ রাইকস ১০৬ জন সিপাহিসহ যাত্রা করিলেন। এখানে আসিয়া তাহারা দেখিলেন যে একটা নালার নিকট উচ্চভূমিতে ৮০০০ সাঁওতাল সমবেত হইয়াছে। এই নালা অতিক্রম করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কেননা, গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই বন্যাস্রোতের মতো ৮০০০ বিদ্রোহী তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন তাহাদের আর কোন

উপায় রহিল না। কিন্তু গভীর জঙ্গলে, বর্ষার কর্দমে পলায়ন করা সুবিধাজনক হইল না। ফলে লেঃ টুলমিন ১৩ জন সিপাহিসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অবশিষ্ট সিপাহিগণ জঙ্গলের নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লেঃ রাইকস্ সহ নগর এবং তথা হইতে সিউড়িতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই যুদ্ধে ৩০০ শত সাঁওতাল নিহত হইয়াছিল।

এই বিপর্যয়ের পর, নগরে আরও কিছু সৈন্য প্রেরণ করা উচিত ছিল; কিন্তু কার্যত তাহা হয় নাই। কেননা, মাত্র ১০০ সিপাহি সিউড়ি সংরক্ষণের জন্য নিযুক্ত ছিল। সিউড়ি সে সময় প্রতি মুহূর্তেই আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। নগরের এই আক্রমণের সময় নগরের তদানীন্তন রাজা, সৈন্য বা রসদাদির দ্বারা কোন প্রকারের কোন সাহায্য করেন নাই। লেঃ টুলমিনের মৃত্যু শোচনীয়।

Sd. R. I. Richardson. (offg. Collector) 2.8.55.

বিদ্রোহীগণ এইভাবে পরাস্ত হইয়াও যুদ্ধ করিতে বা দেশব্যাপী লুণ্ঠন কার্য করিতে বিরত হইল না। তখন দেশে সামরিক আইন প্রচলন করিবার কথা Sir Fransis Halliday প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু Sir Barnes ও Sir J. p. Grant সাহেবদ্বয়ের অভিপ্রায়মত ভারত গভর্নমেন্টকে বিদ্রোহী সাঁওতালগণের প্রতি একটি নোটিশ জারি করিয়া তাহাদিগকে ১০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করিবার নির্দেশ দেন। ফলে, ১৫ আগস্ট তারিখে নোটিশ জারি করা হয় এবং তাহাতে আশ্বাস দেন যে, যে সকল বিদ্রোহী প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ নরহত্যা করে নাই বা দলপতির কার্য করে নাই তাহাদিগকে গবর্ণমেন্ট ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে কর্ণপাত করিল না—অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল ও প্রায় ১মাস ধরিয়া অত্যাচার করিল। এখন বিদ্রোহারম্ভের প্রায় ৫মাস পরে ১০ নভেম্বর তারিখ সামরিক আইন জারি করিবার অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত হইল—

"Whereas certain persons of the tribe of Santhal and others inhabitants of the Rajmahal. Hills of the Damin-i-koh and of certain Parganas in the district of Bhagalpur, Murshidabad and Birbhum and owing allegiance to the British Government are and for sometime past have been in open rebellion against the authority of Government and whereas soon after the Ist outbreak of the said rebellion a proclamation was issued offering a free pardon to all who should come in and submit within a period of 10 days except ringleaders and persons convicted of murder, notwithstanding which act of celmency the great body of the rebels have not availed themselves of the offer of merecy thus held out but continue in rebellion; wherefore it has become necessary for the speedy and effectual suppression of this rebellion that advantage should be taken of the season to commence systematic military operations against the rebels for which purpose it is expedent that Martial Law should be declared and that the functions of the ordinary Criminal Courts of judicature should be partially suspended in the said districts.

"It is hereby proclaimed and notified that the L.G.of Bengal in the exercise of the authority given to him by Reg. x of 1804 and with the assent and concurrence of the President in Council does hereby establish martial law in the following Districts, that is to say, so much of the District

বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল আদিবাসী

of Bhagalpur as lies in the right bank of the river Ganges, so much of the District of Murshidabad as lies on yhe right bank of the river Bhagirathi; the District of Birbhum: And that the said L.G. does also suspend functions of the ordinary Criminal Courts of Judicature within the districts above described with respect to all persons Santhals and others owing, allegience to the British Government in consequance of their either having been born or being residents within its territories and under its protection who after the date of this proclamation and within the districts above described shall be taken in arms in open hostility to said Government or shall be taken in the act of oppossing by force of arms the authority of the same or shall be taken in actual commission of any overt act of rebellion against the state;

" And that the same Lieutenant Governor does also hereby direct that all person, Santhals and others owing allegiance to the British Government, who after the date of this proclamation, shall be taken as aforesaid shall be tried by Court Martial; and it is hereby notified that any person convicted of any of the said crimes by the sentence of such Court will be liable under see 3 Rg.x of 1804 to the immediate punishment of death."[10]

বেড়াজালে বিদ্রোহী সাঁওতাল

পূর্বেই বলিয়াছি যে গবর্ণমেন্ট প্রথমত এই বিদ্রোহে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই; কিন্তু এখন ৫ মাস কাল অতিবাহিত হইলেও যখন তাহা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইল না এবং আহ্বানমত তাহার বশ্যতাও স্বীকার করিল না, তখন গবর্ণমেন্ট আর নিশ্চেষ্ট না রহিয়া বর্ষান্তে General Lloyd and Brigadier General Bird-এর অধীনে চতুর্দশ সহস্র সৈন্য দ্বারা এক প্রকান্ড বেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া ক্রমে তাহা স্বল্পায়ত করিতে করিতে যাবতীয় সাঁওতালগণকে একত্র করিয়া যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল সাঁওতাল Grand Trunk Road বা দামোদর নদী অতিক্রম করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদিগকেও এই বেষ্টনী মধ্যে আবদ্ধ করা হইল। ফলে, সমগ্র সাঁওতাল এখন পরাস্ত হইয়া পর্যুদস্ত হইয়া গেল। এই সাঁওতালদের নেতাগণের মৃত্যুদন্ডের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই বিদ্রোহে অন্যূন ১০,০০০ সাঁওতাল নিহত হয়। এখন হইতে তাহারা আর কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবার সাহস করে নাই। এখানে তাহারা তাহাদের যে দুখঃ-দুর্দশা ও অত্যাচারের প্রতিকার জন্য বিদ্রোহাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহারই প্রতিকারের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল।[১১]

সাঁওতাল পরগণা গঠন

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সরকারিভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহের সম্পূর্ণ শান্তির কথা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। অতঃপর, Major General Lloyd C.B.and Brigadier-General Bird কে গবর্ণমেন্ট তাহাদের কর্মতৎপরতা ও সফলতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া সমবেত সৈন্যদলকে বিদায় প্রদান করেন। General Lloyd বর্বর ও বিপথগামী সাঁওতালগণের দমনকালে যথেষ্ট বিচারণা, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ জানুয়ারি হইতে সামরিক আইন তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার পর আবার সামান্য আকারে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু শীতকালের অবসান হইতে না হইতেই তাহা নির্বাপিত হইয়াছিল। অতঃপর Hon Mr. (Sir A.) Eden C.s.তাহাদের অভিযান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত হন। ফলে, Non-Regulation District সাঁওতাল পরগণা গঠিত হয় (Act 37of 1855 and 10 of 1857)। এখন হইতে সাঁওতাল পরগণা বা দুমকা জেলা ভাগলপুরের কমিসনরে অধীনে একজন ডেপুটি কমিসনর দ্বারা শাসিত হইতে আরম্ভ হয়।

দামন-ই-কো নামে যে পৃথক জেলা ছিল তাহাও উঠিয়া গেল। এই সময়ে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে XXXVIII আইন পাশ হইয়া তিন বৎসর বলবৎ ছিল। ইহাতে যে যে অঞ্চলে সামরিক আইন প্রচলিত ছিল, সেই সেই অঞ্চলের অপরাধিগণকে জঘন্য অপরাধের জন্য আশু বিচার করিয়া দন্ড বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।[১১]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের অগ্রগতি ও অত্যাচার—আমরা বিদ্রোহী সাঁওতালগণের অগ্রগতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, বিদ্রোহী সাঁওতালগণ কলিকাতায় গিয়া লাটসাহেবের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার জন্য বীরভূম অভিমুখে অগ্রসর হয়।

বিদ্রোহিগণ কিন্তু, আরও দুইটি বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহার মধ্যে একদল—স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগাদি জানাইবার জন্য ভাগলপুর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তৃতীয় দল—বর্তমান লুপ-লাইনের মুরারই স্টেশনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত মহেশপুর হইতে পাকুড়, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল এবং পূর্বাংশে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথপুর, জঙ্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া দারুণ অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচার বা লুণ্ঠন-ক্রিয়ার প্রণালী পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালীরই অনুরূপ। সুতরাং, ঐ সকল কথায় পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক।

এই সময়, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত দৈনিকপত্র "সংবাদ প্রভাকরে"[১২] অতি তৎপরতা সহিত, বিশেষভাবে এতদঞ্চলের অত্যাচারের বিবরণই দিনের পর দিন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমরা সেই সময়কার "সংবাদ প্রভাকর" হইতে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ অবিকাল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা হইতে পাঠকগণ এতদঞ্চলের সাঁওতালগণের গতিবিধি ও অত্যাচারাদির বিবরণ ইত্যাদির কথা অবগত হইতে পারিবেন। এই উদ্ধৃত অংশসমূহ পাঠ করিয়া কৌতূহলী পাঠকগণ তৎকালের প্রচলিত গদ্য-রচনার আদর্শও লক্ষ করিতে পারিবেন।

সংবাদ প্রভাকর

১

৫২৮৯ সংখ্যা বুধবার, ৩ শ্রাবণ, ১২৬২ সাল, ইং ১৮ জুলাই ১৮৫৫, শকাব্দঃ ১৭৭৭।। দানিশাব্দা ১০৫—

রাজমহল, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা গত দুই দিবস যে সমস্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে পার্বতীয় বিদ্রোহিগণের ভয়ানক অত্যাচার ব্যতীত আর কোন কথাই লিখিত নাই। প্রজারা কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছে, ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রস্থান করিয়াছেন;আমলা লোক কে কোথায় আছে তাহার কিছুই নিরূপণ নাই, অনেকেই আপনাপন যথাসর্বস্ব পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থানকরণে বাধ্য হইতেছে....... আমরা নিম্নভাগে অরঙ্গাবাদ ও জঙ্গীপুরের সংবাদদাতাদিগের পত্র প্রকাশ করিলাম—

(ক) অরঙ্গাবাদ, ১১ জুলাই ১৮৫৫—

অদ্যকার সংবাদ অতি ভয়ানক, রাজ বিদ্রোহিগণ অরঙ্গাবাদের পশ্চিম ৫/৬ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে আসিয়া গোঁদাইপুর, শাহাবাজপুর, কালিকাপুর, ঝিকরহাটি, নস্করপুর ইত্যাদি গ্রাম সকল লুট করিতেছে, প্রজাদিগের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছে। এরূপ অত্যাচার কুত্রাপি হয় নাই, আমড়ার মহারাজের জামাতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ পাঁড়ে মহাশয় রাজধানী হইতে ঝিকরহাটি নামক গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, দুরাত্মারা তথায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া গুরুতররূপে আঘাতি করিয়াছে ও বহু অর্থ এবং দ্রব্যাদি লুট করিয়া লইয়াছে, রাজ জামাতা অতি সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোক, তাহার যখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে তখন প্রজার দুঃখ বিবরণ কি বর্ণনা করিব! এই বিষয় লিখিতে কাষ্ঠের লেখনীও ক্রন্দন করিতেছে।

অদ্য ৫০০ পদাতিক সিপাহি ৫০ টা হস্তি এবং ৪০ জন অশ্বারোহী সৈন্য মুরশিদাবাদ হইতে মোং অরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময়ে ঘটনা স্থানে গমন করিয়াছে, এই সেনারা যদ্যপি বিদ্রোহকারিদিগকে দমন করিতে পারে তবে মঙ্গল নচেৎ দুরাত্মাদিগের অত্যাচার মুরশিদাবাদ পর্যন্তের প্রজাদিগকে মহা ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক, অত্যাচারের সীমা থাকিবেক না, অনেকের প্রাণ বিয়োগ ও বহু লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইবেক।......

(খ) জঙ্গীপুরের পত্র, ১২ই জুলাই ১৮৫৫—

রাজমহলের পাহাড় হইতে সাঁওতাল নামক জাতীয় বহু লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গীপুরের অন্তঃপাতী পোকর নামক গ্রামের ৮ ক্রোশ পশ্চিমে আগমনপূর্ব্বক কয়েক গ্রামের প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুট করিতে করিতে অদ্য পলাসির (পল্সা) নিকটে আসিয়া রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারী সাহেবদিগের গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে এবং একজন দারোগা, ১৫ জন বরকন্দাজ ও কয়েকজন প্রজাকে হত করিয়াছে, কত ব্যক্তি আঘাতিত হইয়াছে তাহার নিরূপণ হয় নাই। এমত জনরব যে দুরাত্মারা অদ্য এখানে আগমন করিবেক এতদ্বার্তা অবগত হইয়া অরঙ্গাবাদের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সৈন্যের নিমিত্ত বহরমপুরে পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্য সৈন্য উপস্থিত হইয়াছে বোধহয় আমারদিগের নিকটেই এক ভয়ানক যুদ্ধ হইবেক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারিগণ পলাসি হইতে প্রাণভয়ে প্রস্থান করিয়া জঙ্গীপুরে আসিয়াছেন কিন্তু এখানকার প্রজারাও পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।.....

৫৬ গণিত দেশীয় পদাতিক সেনারা এখান হইতে বাষ্পীয় শকট যোগে বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছে, তাহারা তথা হইতে অরঙ্গাবাদে যাইবেক। সেনার নিমিত্ত দানাপুরেও পত্র গিয়াছে। বিদ্রোহ ব্যাপার ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়াছে। আমরা গত দিবস সন্ধ্যার সময়ে একেবারে সাতখানা পত্র পাইলাম সকল পত্রই এই বিষয়ে পরিপূর্ণ। একজন পত্রপ্রেরক লেখেন রেইলওয়ে সংক্রান্ত কোন সাহেব কর্মচারী সেন্টল জাতীয় কোন স্ত্রীকে হরণ করাতে এই ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অপর পত্রপ্রেরক লেখেন যে মেং পোনেট (Mr. James Pontet) সাহেব রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত কঠিন নিয়ম করাতে এই ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, দুরাত্মারা কালী স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে দারোগা প্রভৃতিকে বলিদান দিয়াছে এবং তাহার চক্ষু খুলিয়া লইয়াছে তাহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে আমারদিগের রাজপুরুষেরাও বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন, রথের দিবসে মিলেটরী সংক্রান্ত কার্যালয় বন্ধ হয় নাই।

২

(ক) ৪ শ্রাবণ ১২৬২ সাল—ভাগলপুর ১১ জুলাই—

বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতিভয়ানক বলিতে হইবেক সম্পাদক মহাশয় আমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া ছিন্ন বসন পরিধান পূর্ব্বক এক কর্মকারের গৃহে বসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।

(খ) আমড়া, ১৩ জুলাই—

সম্পাদক প্রবর! পর্বতবাসিদিগের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে; তাহারা ঝিকরহাটিতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না, অনলদ্বারা গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।......

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা যদ্যপি পর্বতের উপর নাগরা ধ্বনি করে তবে এক ঘন্টার মধ্যে ৪/৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতি মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।...... কি কারণে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই, কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় দুইজন যবন বুজরুক ব্রিটিশ অধিকার অপহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপূজা করিয়া তাহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল। যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।

৩

৫২৯৩ সংখ্যা, ৮ শ্রাবণ ১২৬২ সাল; ২৩ জুলাই ১৮৫৫

(ক) মুরশিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মেং টুম্ভড সাহেব লেপ্টেনান্ট গবরনর সাহেবের নিকটে যে পত্র লেখেন তাহা ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে ....“তিনি ১৪ জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়া পল্সায় উপস্থিত হয়েন সেখানে রাজবিরোধিদিগকে দেখিতে পান নাই, তাহার গমন করিবার পূর্বেই সাঁওতালেরা ঐ গ্রামে লুট করিয়া মহেশপুরাভিমুখে যাত্রা করে, সেনারা ধান্যক্ষেত্রে দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায়; কিন্তু পল্সাতে তাহারা বিশ্রাম করে নাই; একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায় ৪/৫ হাজার সাঁওতালকে আক্রমণ করে, ঐ দলের অধ্যক্ষ সিদু ও কানু তাহারদিগের আদেশক্রমে সাঁওতালেরা তীর ছুঁড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫ জন সেপাই অল্পাঘাতী হইয়াছে, বিপক্ষদিগের একশত হত ও একশত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি বেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্তী হইতে পারে নাই।”.....

(খ) জঙ্গীপুর, ৩ শ্রাবণ

সম্পাদক মহাশয়, সাঁওতাল জাতিরা বেলিয়া ও পল্‌সা ও পুকুড় ও মহেশপুর ইত্যাদি কতিপয় গ্রাম দগ্ধ ও লুট করিয়া বহু প্রজার প্রাণ বিনাশ ও অর্থ এবং দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্বক জঙ্গীপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকে ছেদন করিতেছে, লোক সকল নিজ নিজ গ্রামাদি হইতে পলাইয়া আসিতেছে, এখানকার লোকেরাও সুস্থ নহেন কখন কি হয় এই চিন্তায় তাহারা একপ্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, বহরমপুর হইতে ৫০০ সিপাহি মহেশপুরে গিয়া ২/৩ শত সাঁওতালকে হত করিয়াছে, অধুনা তাহাদিগের দলে কত লোক আছে এ পর্যন্ত তাহা নিশ্চয় নাই; এই প্রকার অত্যাচার ব্যাপার কোনকালে শ্রুত হই নাই, দৃষ্টিও করি নাই, যে সকল লোক এখানে আসিয়াছে তাহাদিগের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়।

৪

৫২৯৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার ৯ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ২৪ জুলাই ১৮৫৫

মহেশপুরের যুদ্ধ

আমরা রাজমহল হইতে গত দিবস যে কয়েকখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্তাবতেই মহেশপুরের ১৬ তারিখের যুদ্ধ বিবরণ লিখিত আছে, সাঁওতাল লোকেরা টাঙ্গি, ঢাল, তির, বরছা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্রাদি ফেলিয়া গিয়াছিল তাহা চারি পাঁচ গাড়ি হইবেক তাহারদিগের প্রায় তিন শত ব্যক্তি আঘাত হইয়াছে, আমরা সাহাবাজপুরের পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

সাহাবাজপুর, ১৮ জুলাই

সম্পাদক প্রবর, সাঁওতালদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে দুস্তর দুঃখ পারাবারে নিমগ্ন হইয়াছি; প্রাণভয়ে কাতর আছি গতদিবস মেং সেন্ট জর্জ সাহেব কতকগুলি লোক লইয়া এখানে আসিয়া সাঁওতাল লোকদিগকে আক্রমণ করেন, তাহাতে এক একপ্রকার সংগ্রাম হয়, বিপক্ষেরা শ্রাবণের ধারার ন্যায় তির বর্ষণ করিতে থাকে, তদ্দৃষ্টে আমরা কম্পান্বিত হইয়াছিলাম কিন্তু সেই তির উক্ত সাহেবের অধীনস্থ লোকদিগের বিশেষ হানি কিছুই হয় নাই একটা তির একজন সাহেবের ললাটে পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহা টুপির উপর পতিত হওয়াতে টুপিই উড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা বন্দুক ধরিয়া সাহসিকরূপে যুদ্ধ করাতে বিপক্ষেরা এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। ফলতঃ জঙ্গলের পথ দিয়া অন্যদিকে বাহির হইয়া প্রজাদিগের সর্বনাশ করিবেক তাহারা জঙ্গলাপথ সকল বিলক্ষণ জ্ঞাত আছে, ইংরাজ সেনাদিগের কি সাধ্য যে সেই জঙ্গলে প্রবেশপূর্বক তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্তী হয়, এক্ষণে ঐ জঙ্গলে যাইলে একপ্রকার জ্বর হয়, বিপক্ষেরা যখন রাজসেনাদিগকে দৃষ্টি করিয়াও ভীত হয় নাই সাহসিকরূপে অত্যাচার করিতেছে, যুদ্ধ সময়ে তিরাদি অস্ত্র চালনা করে তখন এই বিদ্রোহ শীঘ্র নিবারণ হয় এমত বোধ হয় না।

৫

৫২৯৮ সংখ্যা, শনিবার ১৩ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ২৮ জুলাই ১৮৫৫

৫৬ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক সেনারা বীরভূমের অন্তঃপাতী সুরুই নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া সাঁওতালদিগের দমনার্থ ইতস্ততঃ স্থানে গমন করিয়াছে, কেবল ৯০ জন সিপাহি সুরুইয়ে আছে, পুলিশের লোকেরা পরাক্রম প্রকাশ নিমিত্ত সাঁওতাল বলিয়া প্রায় কয়েকজন দুঃখী প্রজাকে কারাবদ্ধ করিয়াছে, তাহারা কেহই সাঁওতাল নহে, বিপক্ষেরা কোন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিবেক না; কেবল লুট করিয়া বেড়াইবেক, একারণ তাহাদিগকে দমন করা ভার হইয়াছে সেনারা যে দিকে যায় তাহারা সেইদিকে থাকে না অন্যদিকে গিয়া প্রজার প্রাণনাশ ও দ্রব্যাদি অপহরণ করে, ক্ষেত্রের কার্য একেবারে রহিত হইয়াছে, হস্তি অশ্ব ও সেনারা ধান্যক্ষেত্র সকল দলন করিতেছে অতএব দুর্ভিক্ষ হইবেক অন্নভাবে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিবেক, রাজমহল, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, বৈদ্যনাথপুর, বীরভূম, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, পাবনা এবং বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যখন বিদ্রোহোপস্থিত হইয়াছে, তখন প্রজাদিগের অল্প অনিষ্ট হইবেক না।..... বীরভূম হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে কালেক্টরসাহেব জমিদারদিগের বিদিতার্থ এরূপ পরয়ানা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার সেনাদিগের নিমিত্ত আহারাদি প্রস্তুত করিবেন, এই পরয়ানা পাইয়া জমিদারেরা অতিশয় ভীত হইয়াছেন, সাঁওতালেরা দেশসকল ভস্মসাৎ করিয়াছে কোনও গ্রামেই হাট বাজার ও প্রজালোক নাই, তাহারা কোথায় হইতে সেনাদিগের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবেন। গবর্ণমেন্ট মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই উত্তম হয়, নচেৎ জমিদারদিগের সাধ্য নাই যে তাহার রসদ দিতে পারেন ২১ জুলাই তারিখে বিপক্ষেরা বীরভূমের ১১ খানা গ্রাম লুট করিযাছে তাহাতে বিস্তর প্রজা হত ও আহত হইয়াছে।

দেওঘর হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিযাছেন যে সাঁওতাল জাতিরা তিনটা থানা লুট করিয়া ডেপিউটি ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিল যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেক তাহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়া মহকুমা পরিত্যাগ করণে বাধা হইয়াছেন।

৬

৫৩০০ সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৬ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৩১ জুলাই ১৮৫৫

রাজসেনারা দুই এক স্থানে যুদ্ধ করিয়া দুই চারি শত সাঁওতালের প্রাণসংহার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহারদিগের অত্যাচার নিবারণ না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে, কালিকাপুর হইতে আমারদিগের সম্ভ্রান্ত সংবাদদাতা মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

......এই হেঙ্গামায় এ অঞ্চলের নীলকর, রাস্তাবন্দির সাহেবেরা প্রায় তাবতেই আপন আপন বিবিদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া আপনারা আশঙ্কিতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং এতদ্দেশের বাঙালিরা সাহেবদিগের এইরূপ ভয় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্ত্রীপুত্র পরিবারদিগকে লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছে। জিলা বীরভূম প্রায় মনুষ্য নাই বলিলেই

হয়, তথাকার রাজকর্মচারি ও আমলাগণ আপন আপন পরিবারদিগকে বাটি পাঠাইয়া দিয়াছেন, বাসেন্দা লোক সকল আপন২ আপন গৃহ পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিয়াছে, গবর্ণমেন্টের স্কুল বন্ধ হইয়াছে এবং রাজকার্য প্রায় স্থগিত হইয়াছে কালেক্টর সাহেব কাছারি হইতে সরকারি টাকার সিন্দুক স্থানান্তরে রাখিয়াছেন। সাঁওতাল জাতিরা যদ্যপি অত্যাচারী সাহেবদিগের অত্যাচারের প্রতিফল দিয়া ক্ষান্ত হইত তবে ক্ষতি ছিল না, কারণ যাহারা বলপূর্বক স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব নষ্ট বরে তাহাদিগের প্রাণবধ করিলেও ক্রোধানল শীতল হয় না, কিন্তু অসভ্যজাতিরা প্রজাপুঞ্জের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিতেছে, তাহারা যে যে গ্রাম দিয়া আসিতেছে সেই গ্রাম লুট ও অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, শত শত মনুষ্যেরপ্রাণ নষ্ট করিতেছে, এই ভয়ানক ব্যাপার এখানকার রাজকর্মচারিরা রাজধানীতে লিখিয়া পাঠাইলে পর ৭/৮ দিবসে ক্রমে ক্রমে পাঁচশত সিপাহি এখানে আসিয়াছে এবং এ ডিবিজনের কমিশনর সাহেব ঐ সৈন্যের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন, কিন্তু সাহেবের এমত সাহস হইতেছে না যে সৈন্য লইয়া যে স্থানে সাঁওতালেরা আছে তথায় যাইয়া প্রজাদিগের রক্ষা করেন। আমারদিগের বীরভূমের মোক্তার ৫ তারিখে যে পত্র লিখেন তদবিকল নিম্নভাগে সংক্ষেপে লিখিতেছি কমিসনর সাহেব বিকরূপ ভীত হইয়াছেন তাহা ইহার দ্বারা প্রকাশ হইবেক।

"নমস্কারা নিবেদন মিদং। পূর্ব পত্রে সাঁওতালদিগের হেঙ্গামার বিষয় মহাশয়দিগকে লিখিয়াছি, আমি আর এখানে তিষ্টিতে পারি না, দুই এক দিবসের মধ্যে প্রস্থান করিব, ৪ তারিখে সাঁওতালেরা সিউড়ির উত্তর তিন ক্রোশ বিষ্ণুপুরের নিকট পল্সা গ্রাম লুট করিয়াছে, এবং অদ্য বৈদ্যনাথপুর নামক গ্রাম লুট করিয়া ঐ গ্রামের ৮ জন লোককে কাটিয়াছে ঐ গ্রাম সকলের প্রজারা অদ্য, এখানে আসিয়া জজ ও কমিসনর সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে সাহেবেরা কহিলেন যে আমাদিগের যে ৫০০শত সিপাহি এখানে আছে তাহারা বীরভূম রক্ষা করিবেক, আমরা এইক্ষণে তোমারদিগের কোন সাহায্য করিতে পারি না পুনরায় ফৌজ আসিলে তোমাদিগের জন্য পাঠাইতে পারি ইতি তাং ৫ শ্রাবণ।"

৭

৫৩০১ সংখ্যা, বুধবার ১৭ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ১ আগষ্ট ১৮৫৫

......মুরশিদাবাদ হইতে ২৩ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহা আমরা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"সাঁওতালজাতিরা অস্ত্র ধরিয়া মুরশিদাবাদের অতি নিকটে আসিয়াছে তাহারা শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জমিদারি বেলে ও মৃত্যুঞ্জয়পুর লুট করিয়াছে তাহাতে তাহারা অল্প সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ৫০ জন প্রজা হত হইয়াছে তাহারা উক্ত রাজাদিগের লাট ঝুরি নামক তালুক আক্রমণার্থ আগমন করিতেছে এমত জনরব যে দুরাত্মারা রাজাদিগের কান্দিস্থ রাজবাটি আক্রমণ করিবেক। এই কথা যদ্যপি সত্য হয় তবেই সর্বনাশ, প্রজাদিগের মহানিষ্ট হইবেক। রাজাদিগের কেবল ঠাকুর বাটিতে স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত তৈজসে হীরামুক্তাদি খচিত দেবাভরণ স্বর্ণ খাট পালঙ্ক ইত্যাদি প্রায় ৭ / ৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আছে......

৮

৫৩০৩ সংখ্যা, শুক্রবার ১৯ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৩ আগষ্ট ১৮৫৫

(ক) সুরুই (সিউড়ি?) হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে সাঁওতালেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থান লুট করাতে চারিদিকেই সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, সিপাহি লোকেরা অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে আবার রাস্তা সকল কর্দমে পরিপূর্ণ খানা খন্দক ইত্যাদি সকল স্থানেই জল এ স্থান হইতে ৭ ক্রোশ অন্তরে প্রায় ১০,০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচার করিতেছিল, কিন্তু সিপাহিদিগের আগমন সংবাদ অবগত হইয়াই তাহারা অন্যদিকে প্রস্থান করিয়াছে, সিপাহিরা তাহাদিগের প্রতি গুলি করাতে কয়েকজন হত ও আহত হইয়াছে ৩০০ সাঁওতাল একদল সিপাহিকে আক্রমন করিয়াছিল তাহাতে অত্যাচারিদিগের ৬০ জন হত হওয়াতে তাহারা আর সংগ্রামস্থলে দন্ডায়মান হইতে পারে নাই সেনারা এইক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়াছে সুরুইয়ে কেবল ৫০ / ৬০ জন সিপাহি আছে, এই সময়ে দুরাচারিরা যদ্যপি দলবদ্ধ হইয়া আগমন করে তবে আমারদিগের অত্যন্ত বিপদ বৃদ্ধি হয় সাঁওতালেদের দৃশ্য অতি ভয়ানক তাহারা কেবল কৌপীন পরে, গলায় লাল মালা আছে তাহাদের দেহ প্রকান্ড ও শ্যামবর্ণ সকল প্রকার পশুই আহার করে অল্প দিবস হইল একটা ব্যাঘ্র কাটিয়া রন্ধন করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ ঐক্য আছে, তাহারা দলবদ্ধ না হইয়া কোন স্থানে যায় না, শ্রুত হইল যেখানে যত সাঁওতাল আছে সকলেই ঐক্য হইয়াছে তাহারদিগের দূত সকল পর্বতে পর্বতে ভ্রমণ করিতেছে।

(খ) আমারদিগের জঙ্গীপুরস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

জঙ্গীপুর, ২৮ জুলাই

সম্পাদক মহাশয় ৪। ৫ দিবস হইল মুরশিদাবাদের এবং মহাকুমা অরঙ্গাবাদের শ্রীযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবেরা ১৯ জন সাঁওতালকে ধৃত করিয়া জঙ্গীপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন আমরা চাক্ষুস দেখিয়াছি তাহারদিগের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ও সর্বাঙ্গ শোণিতাবৃত হইয়াছিল তাহারদিগের মধ্যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও বালক ও বালিকা ছিল তাহারা মনুষ্যের সহিত বাক্যলাপ করে না তাহারদিগকে দৃষ্টি করিয়া এরূপ বোধ হইল যে তাহারদিগের দ্বারা এই ভয়ানক ঘটনা হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু তাহারদিগের এমত আশ্চর্য ক্ষমতা শ্রুত হইলাম যে তাহারা পদদ্বারা ধনুক ধরিয়া একেবারে দুই হস্তে ১০ তীর নিক্ষেপ করিতে পারে, দুরাত্মারা ভাগলপুর অবধি বীরভূম পর্যন্ত এইরূপ দৌরাত্ম্য করিতেছে।

রাজমহলের নিকট সীতা পাহাড় হইতে রেইলওয়ের একজন কেরাণী ২৬ জুলাই তারিখে আমারদিগের নিকট আইসেন তাহার প্রমুখাৎ দুরাত্মাদিগের নিষ্ঠুরতা অবগত হইয়া মহাশয়কে লিখিতেছি, সম্পাদক মহাশয় উপরোক্ত সীতাপাহাড়ে রেইলওয়ে সংক্রান্ত একজন ইংরাজ তাহার পরিবার সহিত ছিলেন, সাহেবের বিবি অন্তঃস্বত্বা ছিলেন সাঁওতালদের বিদ্রোহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রাণ সংশয় দেখিয়া অনেকে সাহেবকে তথা হইতে তাহাকে স্থানান্তকরণ জন্য পুনঃপুন কহেন কিন্তু সাহেব এ বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া অগ্রাহ্য করিয়া কহেন যে সাঁওতালদিগের দ্বারা আমারদিগের কোন অনিষ্ট হইবার

সম্ভবনা নাই যেহেতু তাহারা অস্ত্রবিদ্যায় অশিক্ষিত, আমারদিগের কি করিতে পারিবেক, পরন্তু সে দিবস শ্রুত হইলেন যে দুরাত্মারা নিকটস্থ হইয়াছে সেই দিবস সাহেব ৪ খানা গাড়ি করিয়া বিবিকে ও বিবির ভগ্নীকে এবং নগদ ১৮০০০টাকা ও বিবির অলঙ্কার জহরত ও মোহর ইত্যাদি গাড়িতে এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি অপর তিন গাড়িতে বোঝাই করিয়া বিবিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছিলেন, পথিমধ্যে অনুমান ৫০ জন সাঁওতাল আসিয়া বিবিকে হত করিতে উদ্যত হইবাতে বিবি তাহারদিগকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কহিলেন যে তোমারদিগের প্রত্যেক মনুষ্যকে আমি চার আনা করিয়া বকসিস দিব তোমরা আমাকে হত্যা করিও না তাহাতে দুরাত্মারা কহিলেক যে এক টাকা করিয়া দেও তাহাও বিবি স্বীকার করিয়া সিন্দুক খুলিয়া টাকা দিতে দেখিয়া তাহারা সিন্দুক লইয়া পলায়ন করে এবং বিবি তথা হইতে গমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে আর একজন আসিয়া বিবিকে আক্রমণ করায় তাহারদিগকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কহিলেন যে আমার যথাসর্বস্ব লইয়া যাও , কিন্তু আমাকে হত্যা করিও না, কারণ আমি অন্তঃস্বত্ত্বা একটি জীব হত্যা করিলে ২ জীবের হানি হইবেক, তাহারা তাহা না শ্রবণ করিয়া বিবির গলদেশে অস্ত্রাঘাত করে এবং একপদ কাটিয়া ফেলে তাহাতে বিবির প্রাণবিয়োগ হয় পরে তাহার নিকট জহরত ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা এবং বিবিকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্রাদি লয়, পরে মিসের মস্তকে এক অস্ত্রাঘাত করিবাতে তিনি নিকটস্থ রেইলওয়ে সংক্রান্ত এক বাঙ্গলায় পলায়ন করেন পরে দুরাত্মারা গাড়োয়ানদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে তাহারা কহিলেক যে আমারদিগকে অর্থাৎ প্রজাকে মারিলে কাহাকে লইয়া রাজ্য করিবা, এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা কহিলেক যে তোমরা এইক্ষণে কাহার প্রজা গাড়োয়ানেরা কহিল যে এক্ষণে তোমারদিগের প্রজা, এই কথা শ্রুতিমাত্র গাড়োয়ানদিগকে পলায়ন করিতে কহিল এবং মিস যে বাঙলায় গিয়াছিল সেইখানে গিয়া তাহাকে হত না করিয়া তাহাদিগের রাজার নিকট পাঠাইয়াছে, গাড়োয়ানেরা গাড়ি ইত্যাদি তথায় ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত সাহেবকে জ্ঞাত করিলে তিনি কতকগুলিন মনুষ্য এবং বন্দুক সহিত অশ্বারোহণে তাহারদিগের নিকট আসিবায় দুরাত্মারা তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করায় তিনি তৎকালীন পলায়ন করিয়া পুনরায় অনেক লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া দেখিলেন যে তাহারা উপরোক্ত বাঙলায় মদ্য মাংসাদি আহার করিতেছে, এমত সময় সাহেব তাহারদিগের ৪০/৫০ জনকে ধৃত এবং কতকগুলিনকে হত করেন এবং কতকগুলিন পলায়ন করিয়াছে তাহারদিগকে ধৃত করিতে পারেন নাই।

(গ) অদ্য বর্ধমানের কমিস্যনর শ্রীযুত এলিয়ার্ট সাহেব নদীয়া ডিবিজনের কমিস্যনের শ্রীযুত এ সি বি জে এল সাহেবকে পত্র লেখেন উক্ত পত্রবাহকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম জঙ্গীপুরের ১০ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম মলটিম সরাইয়ে অনুমান ৩ সহস্র সাঁওতাল একত্রিত হইয়া উক্ত গ্রামে অগ্নিপ্রদান করিলে উক্ত কমিস্যনর সাহেব নিকটস্থ রামপুরহাট নামক গ্রাম হইতে অগ্নির ধূম দৃষ্টিকরতঃ থানা খড়বোনার ৫ জন চাপরাসিকে ঘটনা স্থানের সংবাদ জ্ঞাত জন্য প্রেরণ করেন চাপবাসিরা তথায় গিয়া তাহারদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তলবারদ্বারা ৩০ জনকে হত করে এবং সাঁওতালেরা তিনজন বরকন্দাজকে তীর একজনকে উরুতে গুলি এবং একজনকে অস্ত্রাঘাত এইরূপ ৫ জনকে আহত করে এই সংবাদ বর্ধমানের কমিস্যনর এবং বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জ্ঞাত হইয়া কতকগুলি লোক সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে একগৃহে অনুমান ৬০/৭০ জন

প্রবেশ করিয়া লুট করিতেছে সাহেবেরা উক্ত গৃহের দ্বারা রুদ্ধকরতঃ প্রাচীরে এক ছিদ্র করিয়া গুলির দ্বারা ৬০ জনকে হত করেন এবং ৭ জনকে ধৃত করিয়া লইয়া যান, অপর সকলে পলায়ন করিয়াছে।

৯

৫৩০৪ সংখ্যা, শনিবার ২০ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ৪ আগষ্ট ১৮৫৫

আমরা অবগত হইলাম যে অত্যাচারী সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায় তিনচারিশত লোক ধৃত হইয়াছে অনেকে হত ও আহত হইয়াছে মেং পনেট সাহেব একদল সৈন্য সহিত পর্বতে উঠিয়া অত্যাচারিদিগের ঠাকুরবাটি ভাঙিয়া দিয়াছেন, ইহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে প্রায় ৮০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া ভাগলপুর আক্রমণার্থ গমন করিয়াছিল কিন্তু সম্মুখে এক নদীতে তাহার গভীর জল দেখিয়া ভাগলপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ঐ নদীতে নৌকাদি কিছুই ছিল না, একারণ তাহারা বীরভূমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

এতদ্দেশীয় কারাগার সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মেং লচ সাহেব রাণীগঞ্জে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে ও পশ্চিম গমনের প্রশস্ত রাস্তায় সাঁওতালদিগের অত্যাচার নিবারণের ভার গ্রহণ করিয়া গরুর গাড়ি ও মজুর লোকদিগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ পন্ডিতের জামাতা আপনার অধীনস্থ গাড়ি সকলের চাকা খুলিয়া স্থানে স্থানে রক্ষাকরতঃ গো ও গাড়োয়ানদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন এই বিষয় মেং লচ সাহেব অবগত হইয়া তাহাকে বিধিমতে ভয় প্রদর্শন করাইবাতে তিনি সাহায্য করণে সম্মত হইয়াছেন।

১০

৫৩০৫ সংখ্যা, সোমবার ২২ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৬ আগষ্ট ১৮৫৫

(ক)..........এক ব্যক্তি সাঁওতালদিগের সুবার নিকটে ছদ্মবেশে গিয়াছিল ঐ ব্যক্তি তিন দিবস আহার করে নাই, সুবার বাটির নিকট উপস্থিত হইয়া সুবার দোহাই দেয় ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একটি টাকা দেন এবং কোন সাঁওতাল তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে এই অভিপ্রায় তাহার সমভিব্যাহারে লোক দিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি কমিশনর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইযা ব্যক্ত করিয়াছে যে সুবা খেরুয়া বস্ত্রে পাদ্রীর ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুতকরতঃ পরিধারণ করিয়াছেন, তিনি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, তাহার সম্মুখে রাশিকৃত টাকা, আধুলি ও পয়সা আছে, বোধ হয় ঐ সকল টাকা লুটের টাকা.........

(খ).......... দুরাত্মারা দুইটা নীলকুঠীর সমুদয় দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে তাহারা প্রজাদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা বর্ণনা হয় না, অত্যাচারিদিগের সংখ্যা ৪০ / ৫০ হাজার হইবেক; ....চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিযাছে।

১১

৫৩০৭ সংখ্যা, বুধবার ২৪ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৮ আগষ্ট ১৮৫৫

বীরভূম হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

এখানকার সমাচার প্রায় ৪০,০০০ ধাঙ্গড় লোক অস্ত্র ধরিয়া বীরভূম বেষ্টন করিয়াছে তাহারা যদ্যপি একত্র হইয়া তীর লইয়া আক্রমণ করে, তবে এখানে যে কতিপয় সেপাই সৈন্য আছে তাহাদিগের দ্বারা বীরভূম রক্ষা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রজাদিগের ভয়ের কথা দূরে থাকুক সাহেবরাই ভীত হইয়া আপনাপন পরিবারদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছেন। আক্ষেপের কথা কি কহিব, অত্যাচারিরা আমারদিগের নিকটস্থ দুই গ্রাম দগ্ধ করিয়া প্রজাদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণপূর্বক প্রস্থান করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কয়েকজন সেপাই ও বরকন্দাজদিগকে ঐ গ্রামদ্বয় রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহারা সাঁওতালদিগের তিরের সম্মুখে দন্ডায়মান হইতে পারে নাই। দুরাচারিরা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতে আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে জননীর ক্রোড় হইতে শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে, কোন দেশে এই প্রকার অত্যাচার শ্রবণ বা দর্শন করা যায় নাই।

......প্রজারা বিষয় কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে কৃষকেরাও ক্ষেত্রের কার্য করে নাই। যে সকল শস্য জন্মিয়াছিল তত্তাবৎ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

সাঁওতালেরা জঙ্গলের নিকটেই থাকে সময়ে সময়ে এক এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া অত্যাচার করে। ......কয়েকটা রেজিমেন্ট ও তোপ না পাঠাইলে বীরভূম রক্ষা হইবার উপায় নাই। বীরভূম ৩১ জুলাই।

১২

৫৩০৮ সংখ্যা, গুরুবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬২, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৫

মেং টুব্‌ড সাহেবের পত্র

(ক) .... কাপ্তেন মিডেলটন মেং এবং আমি কিছু নিজামতের সৈন্য লইয়া বেলা দেড়টার সময়ে ভগ্নাডিহিতে উত্তীর্ণ হইলাম সেখানেও লোক নাই। আমি কানুর বাটিতে প্রবেশপূর্বক সাঁওতালদিগের ঠাকুর পাইয়াছি, ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকা নির্মিত চাকার ন্যায়, তাহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে। দুগ্ধ উর্ধে গমন করে, ঐ ঠাকুরের আরও অনেক আশ্চর্য কথা নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগের মুখে শ্রবণ করিলাম। ঐ ঠাকুরের নিকট কয়েকটা ছাগ মুন্ড ও দুইটা ষন্ডের মুন্ডা ছিল। কানু পূজান্তে তাহা বলিদান করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল।

(খ) রামপুরহাট হইতে 'ইংলিসম্যান' পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিন স্থানে সাঁওতালদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছে। জিনিপুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে লেপ্টেনান্ট লার্ড সাহেব ৫ জনকে হত করেন, নালহাটির যুদ্ধে কাপ্তেন জেরিস সাহেব ৫ জনকে হত করিয়াছেন; কিন্তু তাহার অধীনস্থ চারিজন সেপাহি আহত হইয়াছে। বামনীখালের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রামে অপর যে যুদ্ধ হয় তাহাতে কতিপয় সাহেব ও চাপরাসি বন্দুক এবং শূকর শিকারের বরছা ধরিয়া যুদ্ধকরতঃ দুইজনকে হত করিয়াছে; কিন্তু বিপক্ষেরা গ্রাম লুট করিয়া অনেক দ্রব্যাদি গ্রহণপূর্বক পলায়ন পরায়ন হইয়াছে।

এ অঞ্চলের কোন স্থানেই লোক নাই সকলেই প্রাণভয়ে প্রস্থান করিয়াছে এবং যাহারা ছিল তাহারা হত হইয়াছে। নারায়ণপুর নামক গ্রামে ১০০০০প্রজা ছিল তাহাদিগের

অধিকাংশ ধনাঢ্য, তাহারা কেহ নাই, স্থানে স্থানে মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে গৃহাদি সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে.......

সাঁওতালেরা প্রায় প্রতিদিবস দুই এক গ্রাম লুঠ করিতেছে। সাঁওতালেরা নির্দয়রূপে প্রজাদিগকে সংহার করিতেছে........

১৩

৫৩০৯ সংখ্যা, শুক্রবার ২৬ শ্রাবণ ১২৬২সাল, ইং ১০ আগষ্ট

১৮৫৫ বীরভূমের সংবাদদাতার পত্র

সম্পাদক মহাশয়। পার্বতীয় দুরাত্মা সাঁওতালগণের দৌরাত্ম্যে এতদঞ্চলের অনেক গ্রাম লুট ও বহু প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছে অবশেষে গৃহাদি ভস্মসাৎ হওয়ায় একেবারে হত জ্ঞান হইয়াছি এরূপ অত্যাচার কখন দৃষ্টি করা থাকুক শ্রবণগোচরও হয় নাই। তদ্বিস্তারিত বর্ণনে কাষ্ঠের লেখনীও অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইতেছে। কথিত ঘটনা যে যে স্থানে হইতেছে তাহার পূর্ব ও দক্ষিণ ৭ / ৮ ক্রোশ পর্যন্ত গ্রাম সকলের মনুষ্য গৃহাদির মমতা পরিত্যাগানন্তর প্রাণরক্ষার্থে সপরিবারে দিগ্বিদিক ধাবমান হইতেছে। পলায়িত ব্যক্তিদিগের ব্যাকুলতা দৃষ্টে পাষাণতুল্য হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়....... আমরা কথিত ঘটনার স্থান হইতে ১০ / ১২ ক্রোশ দুরস্থে বাস করিয়াও কখন পলাইতে হইবেক ও কোথায় বা অবস্থিতি করিব এই ভাবনায় প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি........

১৪

২ আশ্বিন ১২৬২ সাল, ইং ১৮৫৫ (১৪-১৬পৃঃ)

ভাদ্র মাসের ঘটনায় সংক্ষেপ বিবরণ.......সাঁওতালদিগের অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহারা জননীর ক্রোড় হইতে শিশুসন্তান লইয়া তাহার সম্মুখেই তাহাকে কাটিয়া রক্ত, গর্ভধারিণীকে বল দ্বারা পান করায় এবং ঐ হতভাগিনীকে অল্পাগ্নিতে দগ্ধকরতঃ বধ করে। সিপাহি সেনারা একদল সাঁওতালকে পরাজয় করে।........কুমড়াবাদ নামক স্থানে সাঁওতালেরা রাজসেনাদিগের সহিত সাহসিকরূপে যুদ্ধ করে।........ সাঁওতালদিগের একজন অধ্যক্ষ ধৃত হয়।.....সাঁওতালেরা একজন বিবিকে অল্প অনলে দগ্ধকরতঃ নির্দয়রূপে নিধন করে।.......সাঁওতালীয় অত্যাচার ক্রমে ভয়ানক হইয়া উঠে। দুই লক্ষ সাঁওতাল আপনাদিগের আবাস পরিত্যাগপূর্বক পর্বতীয় পথ দিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করণের উদ্যোগ করে। সাঁওতালদিগের বিদিতার্থ কমিস্যনর বিডোএল সাহেব এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন যে ১০ দিনের মধ্যে যাহার অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক আপন আপন দোষ স্বীকার করিবেক গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কেবল কুচক্রকারিগণের প্রতিই বিহিত দন্ডবিধান হইবেক।.......... সাঁওতালদিগের অত্যাচার ক্রমে নিবারণ না হইয়া বৃদ্ধি হইতেছে। তাহারা বর্ধমান রাজধানী আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবরণর সাহেব তথাকার পুলিস প্রহরিদিগের নিমিত্ত ১০০ পুরাতন বন্দুক প্রেরণ করিয়াছেন।.......৭ হাজার সাঁওতাল অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের পদানত হয়।

রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সংঘর্ষ

বিদ্রোহী সাঁওতালদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

পুনরায় বিদ্রোহ প্রচেষ্টা—১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ

পূর্বে বলিয়াছি যে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনান্তে Hon. Ashely Edenপরবর্তীকালেSir Ashely Eden- Lieutenant Governor of Bengal নবসৃষ্ট জেলা সাঁওতাল পরগণার প্রথম ডেপুটি কমিসনর নিযুক্ত হন। তিনি অতি দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত ইহার গঠন ও শাসনকার্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পর মহাজন ও জমিদারগণ সাঁওতালগণের প্রতি আবার অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের জমিজমাও উচ্ছেদ করিতে চেষ্টান্বিত হইল—তাহাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য মহুল বৃক্ষসকলও নির্মুল করিতে লাগিল। এই সকল কারণবশতঃ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে বহু সংখ্যক সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া দুমকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাদের বিদ্রোহের প্রধান স্থান বীরভূম মধ্যে মুরারই ও মহেশপুর অঞ্চল। এবার কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ অতি তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে বুঝাইয়া বিদ্রোহাচরণ করিতে নিরস্ত করিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাহাদের সহিত যে জমাজমি বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার কর বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধেই তাহাদের প্রধান আপত্তি। Sir George Camphbell ছোট লাট হইবার পর এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। ফলে, আর এই বিদ্রোহের বহ্নি প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। মধ্যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে লোকগণনার জন্য সাঁওতালগণ আপত্য করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষেত্রেও সাঁওতাল পরগণার কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া নিরস্ত করেন।[১৩]

'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে

তথ্যসূত্র ঃ

১. সাঁওতাল জাতি ও তাহাদের সামাজিক প্রথা ইত্যাদি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ "জাতি প্রসঙ্গে" প্রদত্ত হইয়াছে—গ্রন্থগার।

২. The Story of an Indian Upland–F.B. Bradley Birt B.A. I. C. S.P.159

৩. The skirts of the hills অথবা—পাহাড়িয়া অঞ্চল।

৪. The Story of an Indian Upland–F.B. Bradley Birt B.A. I.C. S Ch. VI
পাঠকগণকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি যে তখন সমগ্র সাঁওতাল পরগণা বীরভূমের অন্তর্গত ছিল এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের পরই সাঁওতাল পরগণা নামক নূতন জেলার সৃষ্টি হয়।

৫. যাবতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ইংরেজরাজ পাহাড়িয়াগণকে যুদ্ধকার্যে সহায়তা করিবার জন্য Captain Fagan -এর অধীনে ভাগলপুর Hill Rangers নামে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করেন। গোড্ডা সাবডিভিসনের কুসুমঘাটি নিবাসী চাঁদ পাহাড়িয়া ইংরাজের পক্ষে এই বাহিনীতে সৈনিকের ও গুদাম প্রহরীর কার্য করিয়াছিল। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে, সেই ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ চাঁদ পাহাড়িয়া পরম-উৎসাহের সহিত মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট এই বিদ্রোহের কথা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলিয়াই তাহাই যথাযথভাবে এইস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল—গ্রন্থকার।

৬. গোড্ডা মহকুমার অন্তর্গত লাহাটি গ্রামের ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে মদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে সাঁওতাল বিদ্রোহের চাক্ষুস ঘটনার কথা যেভাবে বর্ণনা করেন, তাহাই এই স্থলে প্রদত্ত হইল—গ্রন্থকার

৭. প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে লাহাটি নিবাসী বৃদ্ধ বনয়ারী সাঁও ও নয়ান দাস এবং ডেও গ্রামের ৬০ বৎসরের জনৈক সাঁওতালের নিকট তাহাদের চাক্ষুস ঘটনার কথা শুনিয়া, মদীয় পিতৃদেব যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাও এই স্থলে প্রদত্ত হইল—গ্রন্থকার।

৮. ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কবি স্বয়ং এই কবিতাটি নদীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়কে স্বহস্তে লিখিয়া তাঁহার স্বগ্রামবাসী উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দ্বারা পাঠাইয়া দেন। পিতৃদেব ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৫ মার্চ তারিখে ইহা প্রাপ্ত হন। এই কবিতাটি আমাদের রতন-লাইব্রেরির ২০৯৬ সংখ্যক পুঁথি শ্রেণিভুক্ত হইয়াছে—গ্রন্থকার।

৯. পিতৃদেবের স্মারকলিপি—গ্রন্থকার।

১০. Calcutta Review Vol. XXV and XXXV. p 11-16

১১. Calcutta Review Vol. XXV and XXXV p 11-16

১২. বীরভূম রতন লাইব্রেরিতে রক্ষিত ফাইল—গ্রন্থকার।

১৩. (a) Calcutta Review Vol. XXVI and XXXV
(b) Bengal Under the Lt.Governors–C.R. Buckland I.C.S.
(c) Story of an Indian Upland–F.B. Bradley Birt I.C.S.

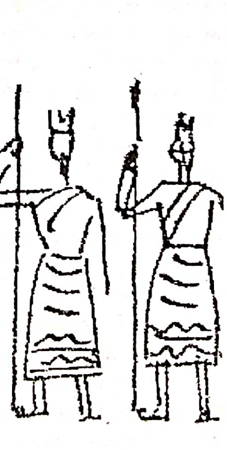

নীলরতন মুখোপাধ্যায়
সাঁওতাল বিদ্রোহ

বীরভূম আজি শান্তির সুখময় ক্রোড়ে শায়িত। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে স্থান প্রচণ্ড দস্যুগণের ভীষণ রণকোলাহলে অহরহ কম্পিত হইতেছিল, আজি সে স্থান আনন্দের মধুর সঙ্গীতে পরিপ্লাবিত। যে-সকল ক্ষেত্র এক সময়ে রণোন্মত্ত যোধৃগণের চরণদলিত হইয়া মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল, আজি সেই সকল ক্ষেত্র শ্যামল শস্য পরিপূর্ণ হইয়া নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কাননচর স্বাধীন প্রকৃতির সাঁওতালগণ প্রতীচ্য পর্বতোপত্যকায় স্বাধীন ভাবে মৃগয়া করিতেছে এবং প্রকৃতির প্রিয় দুহিতা সাঁওতাল রমণীগণ নির্ঝরণীর সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতেছে। কেহ কেহবা পর্বতের শানুদেশে প্রশস্ত ভূখণ্ডে গৃহ-নির্মাণ করিয়া প্রতিবাসী হিন্দুগণের অনুকরণে কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। ফলত বীরভূমি এখন শান্তিভূমি বলিয়া সর্বতোভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। সহসা শান্তির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, পর্বতগহ্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া বীরভূমিবাসিগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া, গম্ভীর নিনাদে সাঁওতালের "আড়াইকাটি" বাজিল। পর্বতে পর্বতে, গ্রামে গ্রামে, সাঁওতালগণের এই জাতীয় মহাবাদ্য তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। ধনুর্বাণ, ভল্ল, পরশু হস্তে অগণ্য সাঁওতাল সমরসাজে সজ্জিত হইয়া হিন্দুগণের বাসস্থান অভিমুখে ধাবিত হইল।

কিন্তু কেন এমন হইল? এই সকল সরলস্বভাব, শ্রমশীল অরণ্যচরগণ তুঙ্গগিরিচ্যুত নদের ন্যায় কেন সহসা বীরভূমি প্লাবিত করিতে উদ্যত হইল? মৃগয়া-লুণ্ঠনলব্ধ যৎসামান্য দ্রব্যজাত লইয়া ত আর তাহাদিগকে অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতে হয় না। তাহাদের স্বহস্তকৃষ্ট ক্ষেত্র সকল, তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ প্রতিবৎসরই তাহাদিগকে প্রচুর শস্য প্রদান করিতেছে—দয়াপরায়ণ ইংরাজরাজ তাহাদের বাসস্থান ত স্তম্ভ বেষ্টিত করিয়া দিয়াছেন; এদিকে ইংরাজের কল্যাণে বীরভূমি প্রদেশে লৌহবর্ত্ম নির্মিত হওয়ায় সাঁওতালগণের অর্থোপার্জনের দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক কৌপিন মাত্র সম্বল সাঁওতাল রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইয়া মলিন মুখে কর্মপ্রার্থী হইতেছে। আবার কিছুদিন পরে আশাতীত অর্থোপার্জন করিয়া স্মিতমুখে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মহোল্লাসে জাতীয় উৎসবে মাতিয়া নৃত্য করিতেছে।

স্তম্ভ বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রে যে সকল সাঁওতাল কার্য অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিল, অচিরাৎ সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। তাহাদের গৃহ ধান্য প্রভৃতি নানা শস্যে পরিপূর্ণ হইল। সুযোগ বুঝিয়া অর্থগৃধ্নু, অধার্মিক হিন্দু বণিকগণ সাঁওতাল পল্লির সন্নিকটে আড়ত স্থাপন করিতে লাগিল, সাঁওতালগণ সেই সকল আড়তে কৃষিলব্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিতে লাগিল। নিচ শ্রেণির হিন্দুবণিকগণের ন্যায় অধার্মিক লোক জগতে নাই। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত তাহারা ন্যায় ও ধর্মের মস্তকে সহস্র পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ব্যবসায়ী বেশে অপরের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। এই সকল নরপিশাচ প্রতারণার মায়ায় সাঁওতালগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের সর্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। সাঁওতালগণ কলসীপূর্ণ ঘৃত বিক্রয়ার্থ

উপস্থিত করিল, হিন্দু বণিকগণ ছিদ্রতল পাত্রে তাহা মাপ করিয়া প্রতারণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বিনিময়ে লবণ পাইবার আশায় সাঁওতালগণ শকট পূর্ণ ধান্য লইয়া আসিল, বণিকগণ গুরু ওজনে তাহা ক্রয় করিয়া, লঘুতর ওজনে লবণ দিতে লাগিল। এইরূপ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রতারিত হইয়া সরল প্রকৃতির সাঁওতালগণ মলিন মুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। ব্যবসায় ব্যপদেশে এইরূপে সাঁওতালগণের শোণিত পান করিয়াও বণিকগণের অর্থ পিপাসার শান্তি হইল না। তাহারা অন্য উপায়েও সাঁওতালদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল। কৃষিকার্যের নিমিত্ত সাঁওতালের অর্থের প্রয়োজন হইত। অর্থের প্রয়োজন যত হউক, আর নাই হউক, আরণ্যপ্রদেশ, কর্ষণোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিতে যে সময় লাগিত, সেই সময়ের জন্য তাহাদের খাদ্যের অভাব হইত। ধান্যের জন্য তাহারা বণিকগণের শরণাপন্ন হইত। বণিকগণ তাহাদিগকে সামান্য কিছু শস্য দিত।

এই ঋণ হতভাগ্য সাঁওতালের কাল হইল। সুদ, সুদের সুদ, ক্রমে এই সামান্য ঋণকে বর্ধিত করিতে লাগিল। শেষে যখন উত্তমর্ণ দেখিল যে, তাহার অধমর্ণের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিবিড় অরণ্য শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তখন আদালতের ডিক্রি লইয়া সেই জমি অধিকার করিয়া লইল। কোন সাঁওতাল হয়ত অতিথি সৎকারের নিমিত্ত, অথবা কোন মহোৎসবের জন্যে গৃহসঞ্চিত যাবতীয় শস্য ব্যয় করিয়া ফেলিল। পর দিন কি খাইবে, তাহাও থাকিল না। বাধ্য হইয়া তাহাকে যুক্ত করে হিন্দুবণিকের নিকট শস্য প্রার্থনা করিতে হইল। দয়ার অবতার হিন্দুবণিক স্মিতমুখে তাহাকে প্রচুর শস্য প্রদান করিল। কৃতজ্ঞ বনচর শতমুখে আহারদাতার দয়ার প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেল। আহা! হতভাগ্য জানিত না যে, দয়াপরায়ণ ধার্মিক হিন্দু তাহাকে যে দুশ্ছেদ্য পাশে বদ্ধ করিল, তাহার জীবনান্তেও তাহা ছিন্ন হইবার নহে। এই সামান্য ঋণ মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্ধিতায়তন হইয়া যাবতীয় সম্পত্তি সহিত হতভাগ্য সাঁওতালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইত। এই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত সাঁওতাল যতই পরিশ্রম করুক না কেন, তাহার পরিবারবর্গ অনশনে, বা অর্ধাশনে থাকিয়া যতই সঞ্চয়ের চেষ্টা করুক না কেন, যে মুহূর্তে সে তাহার বহু শ্রমার্জিত শস্যরাজি সংগ্রহ করিয়া গৃহে আনিল, অমনি হিন্দু উত্তমর্ণ আদালতের আদেশে তাহার সমস্ত শস্য অধিকার করিয়া লইল। তাহাতেও ঋণ পরিশোধ হইল না। কতক অংশ অবশিষ্ট থাকিল। জমি, শস্য, তৈজসপত্র প্রভৃতি কিছুই তাহার করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইল না। পাঠক শুনিলে স্তম্ভিত হইবেন, সাঁওতাল রমণীগণের একমাত্র আভরণ, কাঁসার অলঙ্কার, হিন্দুবণিকগণ জোর করিয়া শরীর হইতে কাড়িয়া লইতে লাগিল। মানুষের প্রাণে আর কত সহে? কৃষিজীবী অনেক সাঁওতাল জমি ছাড়িয়া পর্বতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। যাহারা পলাইল না, তাহারা ঋণ পরিশোধের জন্য হিন্দুদিগের গৃহে দাসরূপে কার্য করিতে লাগিল। দাস অক্লান্তভাবে প্রভুর গৃহে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। তথাপি ঋণ শোধের কোন উপায় হয় না। ঋণের যদি সুদ, সুদের সুদ চলে, তবে কি সে ঋণ কেহ পরিশোধ করিতে পারে? দাস যদি প্রভুর কার্য করিয়া অপর কোন কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইল; সহৃদয় প্রভু অমনি তাহার আহার বন্ধ করিয়া দিলেন। যদি সে পলাইয়া গেল, প্রভু অমনি আদালতের পিয়াদা দ্বারা তাহাকে ধৃত করাইয়া আনিয়া জেলে দিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। অজ্ঞ সাঁওতাল নীরবে আবার দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিল।

বীরভূমির কালেক্টর সাঁওতালগণের এই কষ্টের কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। এসকল অত্যাচার কাহিনি প্রায়ই তাহার গোচরে আসিত না। যদি আসিত, তথাপি তিনি রাজস্ব-সংগ্রহ কার্যে এরূপ ব্যস্ত থাকিতেন যে, অপর কার্যে মনোনিবেশ করিবার সময় তাঁহার থাকিত না। আদালতেও ইহার কোন প্রতীকার হইত না। আদালতের কর্মচারিগণ সকলেই হিন্দু, তাহারা সকলেই সাঁওতালদিগের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগের পক্ষে সমর্থন করিত। সাঁওতালদিগের আর মাথা রাখিবার স্থান থাকিল না। নৈরাশ্য কাতর কণ্ঠে সাঁওতাল বলিয়া উঠিল, "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, কিন্তু তিনি বহুদূরে আছেন, আমাদের ক্রন্দন তিনি শুনিতে পাইতেছেন না।"

রেলওয়ে লাইনে যে সকল সাঁওতাল কার্য করিত, তাহারা বেশ অর্থোপার্জন করিত। তাহারা গৃহে আসিয়া নানা উৎসব করিত ও স্ত্রীলোকদিগকে রৌপ্যালঙ্কারে বিভূষিত করিত। অত্যাচার পীড়িত সাঁওতালগণ উহাদের অবস্থার সহিত আপনাদের অবস্থার তুলনা করিয়া মর্মাহত হইল। ১৮৫৪ ও ৫৫ সালের শীতকালে সাঁওতালগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। যদিও সে বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছিল, যদিও শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় প্রভূত অর্থ সাঁওতালের হস্তগত হইয়াছিল, যদিও রেলওয়ে লাইনে কর্ম কবিয়া তাহারা সে বৎসর বেশ লাভবান হইয়াছিল, তথাপি অগ্নিনির্গমের পূর্বে ভূকম্পনের ন্যায় সমগ্র সাঁওতাল জাতির মধ্যে চাঞ্চল্য অনুভূত হইল। বীরভূমির ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিন্তু এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিলেন না। জানিবার প্রবৃত্তি বা অবকাশ তাঁহাদের ছিল না। সাঁওতালগণ প্রতিজ্ঞা করিল, আর তাহারা হিন্দুগণ কর্তৃক প্রতারিত হইবে না; হিন্দুদিগের দাসত্ব তাহারা আর করিবে না।

সমগ্র সাঁওতাল জাতির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আর তাহাদের নেতার অভাব হইল না। বাঘনাডিহি নিবাসী সিধু ও কানু নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রচার করিয়া দিল যে, সাঁওতালগণের দেবতা উপর্যুপরি সাতদিন তাহাদিগকে দেখা দিয়াছেন। ঐ দেবতা তাহাদিগকে একখানি পবিত্র পুস্তক দিয়াছেন; ও আকাশ হইতে বহুখণ্ড কাগজ বৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল কাগজ তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরণ করিল। এইরূপে সাঁওতালগণের মধ্যে একতাবন্ধন করিয়া নেতৃদ্বয় মনে করিল যে, ইংরাজরাজ তাহাদের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু কিছুই হইল না। তাহার পর তাহারা কমিশনর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিল। দরখাস্তে ইহাও লিখিত থাকিল যে, "আমাদের দেবতা বলিয়া দিয়াছেন, আমরা আর অপেক্ষা করিব না।" সাহেব তাহাদের বিষয় কিছুই জানিতেন না। তাহাদের কোন কথাই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পুনঃ পুনঃ আবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া, সাঁওতালগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইল। শাল শাখা লইয়া গ্রামে গ্রামে দূত প্রেরিত হইল। অল্প দিন মধ্যেই ধনুর্বাণধারী বহুসংখ্যক সাঁওতাল সিধু ও কানুর নিকট সমবেত হইল। সমবেত সাঁওতালগণ জানিল না যে, কিজন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। এইরূপে স্বজাতীয়গণকে একত্র করিয়া সিধু ও কানু লাট সাহেবের নিকট এবং বীরভূম ও ভাগলপুরের মাজিস্ট্ররের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিল। সেই সকল আবেদনের মর্ম এইরূপ ছিল,—সুদের নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে; খাজানার নূতন হার করিতে হইবে ও সাঁওতাল প্রদেশস্থ অত্যাচারী হিন্দুদিগকে দূরীকৃত বা নিহত করিতে হইবে।

এইরূপ দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া নেতৃদ্বয় দেখিল, তাহারা যে ঝটিকা উৎপাদন করিয়াছে, তাহা সংযত করা তাহাদের সাধ্য নাই। অতএব ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন, তাহারা সেই প্রকাণ্ড সাঁওতাল বাহিনীকে কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ ছিল। নেতৃদ্বয়ের শরীররক্ষী সৈন্যেরই সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। সুতরাং তাহাদের অধীনে কত সাঁওতাল একত্র হইয়াছিল, সহজেই বুঝা যায়। সাঁওতালগণ গৃহ হইতে যে শস্য আনিয়াছিল, যত দিন তাহা ছিল, তত দিন তাহারা বেশ শান্ত ভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু শস্য ফুরাইয়া গেলে আহার্যের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইল। বর্বর লোকে ক্ষুধিত হইলে যাহা করে, ইহারাও তাহাই করিতে লাগিল। নেতৃদ্বয়ের লুণ্ঠন কার্যে ইচ্ছা ছিল না। তাহারা স্থির করিয়াছিল যে, ধনবান হিন্দুগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া পাথেয় সংস্থান করিবে। কিন্তু "কার্যতঃ তাহা হইয়া উঠিল না।" সাঁওতালগণ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

৭ জুলাই, একজন বাঙালি পুলিশ ইনস্পেক্টর শুনিল যে সিধু ও কানু একদল সাঁওতাল লইয়া তাহার এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে। পাপীর মনে আগে ভয় হয়। হিন্দু বণিকগণ দারোগাকে উৎকোচ দিয়া তাহাকে অনুরোধ করিল যে, সাঁওতালগণের নামে চুরির চার্জ দিয়া তাহাদের গ্রেফতার করা হউক। পয়সা পাইলে পুলিশ সব করিতে পারে। দারোগা সদল বেষ্টিত হইয়া সাঁওতালদিগকে ধরিতে চলিল। পথে দেখিল সিধু ও কানুর নিকট হইতে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিতেছে। দারোগা আসিলে সিধু ও নিধু তাহাকে বলিল, "আমার লোক খাইতে পাইতেছে না। তুমি প্রত্যেক ধনবান হিন্দু অধিবাসীর নিকট হতেই ৫ টাকা করিয়া চাঁদা আদায় করিয়া আমাকে দাও", এই বলিয়া তাহারা দারোগাকে প্রতিগমনের অনুমতি দিল। এমন সময় এক জন সাঁওতাল জানিতে পারিল যে, দারোগা মিথ্যা চার্জ আনিয়া তাহাদের বাঁধিতে আসিয়াছে। দারোগা প্রথমে সে কথা অস্বীকার করিল। বলিল, সে একজন সর্পদষ্ট রোগীর মৃত্যুর তদন্ত করিবার জন্য যাইতেছিল; কিন্তু শেষে ঠিক রাখিতে পারিল না। স্বীকার করিল, হিন্দু বণিকগণ উৎকোচ দিয়া তাহাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। সিধু ও নিধু শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। ধীরভাবে বলিল "যদি আমাদের বিরুদ্ধে চুরির কোন প্রমাণ থাকে, তবে আমাদের বাঁধিতে পার।" মুর্খ কাপুরুষ দারোগা এই শান্তিপ্রিয়তাকে ভীরুতা বিবেচনা করিয়া সিধু ও কানুকে বাঁধিবার জন্য তাহার অনুচরগণকে আদেশ দিল। এই কথা যেমন তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে, অমনি সাঁওতালগণ তাহাকে ও অনুচরগণকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। শীঘ্রই একটা বিচার হইয়া গেল। সিধু স্বহস্তে দারোগার প্রাণবধ করিল। পুলিশের নয় জন লোকের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল।

সংসঙ্গ, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫

২

এই দিন অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাই সাঁওতাল বিদ্রোহের আরম্ভের তারিখ বলিতে হইবে। এই দিনই সাঁওতালগণ প্রথম রক্তপাত করে; এই দিনই সাঁওতাল নেতৃদ্বয় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, তাহারা কলিকাতা গিয়া বড়লাটের নিকট দরখাস্ত করিবে এবং এই দিন হইতেই সাঁওতালগণ স্বাভাবিক শান্তমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া "আড়াইকাটির" বাদ্যে রণরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া, নরহত্যা, গ্রামদাহ, প্রভৃতি নৃশংস কার্যে ব্রতী হইল। প্রথমে

হিন্দুবণিকগণ যদি সাঁওতালগণকে প্রতারিত ও পীড়িত না করিত, তাহা হইলে এই ঝটিকা উঠিত না। আর যদি তাহারা সাঁওতাল নেতৃদ্বয়কে ধৃত করিবার চেষ্টা না করিত, তাবে বোধ হয়, এই ঝটিকা সংহারময়ী মূর্তি ধারণ করিত না। যাহা হউক, এত উত্তেজিত হইয়াও সাঁওতালগণ কিয়ৎ পরিমাণে ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। তাহারা ঘোষণা করিয়াছিল, "যত হিন্দু কুসীদজীবী আছে, সকলকেই হত্যা কর। আর কাহারও কেশ স্পর্শ করিও না। কলিকাতাস্থ ইংরাজরাজ আমাদের এই সকল কার্য নিশ্চয় অনুমোদন করিবেন।"

প্রায় প্রত্যহ গ্রামদাহ ও লুণ্ঠনের সংবাদ আসিতে লাগিল; তথাপি বীরভূমির ম্যাজিস্ট্রেট বুঝিতে পারিলেন না, বা বুঝিলেন না যে, তাহার জেলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এসমস্ত ডাকাইতি বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে বিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেন্টও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। একপক্ষ ব্যাপিয়া সাঁওতালগণ অবাধে লুন্ঠন, হত্যা ও গৃহদাহ করিতে লাগিল। জুলাই মাসের শেষে শত শত গ্রাম ভস্মীভূত, সহস্র সহস্র গোধন অপহৃত, বহু সহস্র মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং বহুসংখ্যক ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা নিহত হইল। আর গোপন করিলে চলে না, বাধ্য হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃত ব্যাপার গবর্ণমেন্টের গোচরে আনিলেন। গবর্ণমেন্ট বারাকপুর হইতে মেজর ভিনসেন্ট জার্ভিসের অধীনে এক রেজিমেন্ট সিপাহি প্রেরণ করিলেন। ঐ সৈন্যদল বর্ধমানে উপস্থিত হইলে বর্ধমানের কমিশনর তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে সিউড়ি যাত্রা করিতে বলিলেন, কেন না সিউড়ি তখন বিদ্রোহিদিগের হস্তগত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বর্ষার অবিরল বারিপাতে সিক্ত হইয়া সিপাহিগণ অনাহারে যাত্রা করিল। তাহারা সিউড়ির নিকটবর্তী হইলে দেখিল, সকল গ্রামেরই লোকে মহা ভীত হইয়াছে। পথ পার্শ্বে দলে দলে হিন্দু নরনারী কাতার দিয়ে দাঁড়াইয়া, সিপাহিগণকে সাশ্রুনয়নে মিষ্টান্ন ও মুড়ি দিতে লাগিল। সৈন্যগণ সিউড়ি পঁহুছিল। কিন্তু তাহাদের কাপ্তেনের স্বাধীনভাবে কার্য করিবার শক্তি ছিল না। গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে রাখিয়া দিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিন্তু যুদ্ধের কিছুই জানিতেন ন। কীটিং সাহেবের ন্যায় তাহার যুদ্ধজ্ঞান কিছুই ছিল না। তাহার বন্দোবস্ত দেখিয়া সৈনিকগণ হাস্য করিতে লাগিল। কোন কার্যই সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল না। বিদ্রোহিগণ অবাধে লুন্ঠন ও হত্যা করিতে লাগিল।

ব্যাপার গুরুতর আবার ধারণ করিল দেখিয়া, গবর্নমেন্ট জেনারেল লায়ড নামক একজন দক্ষ সেনানীকে বিদ্রোহ দমনের ভার দিলেন। কিন্তু তাহাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল না। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুসারে তাহাকেও কার্য করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ দেওয়া হইল। যাহা হউক, এত অসুবিধা স্বত্বেও লায়ড্ বিদ্রোহ দমনের সুবন্দোবস্ত করিলেন। দলে দলে বীরভূমির পশ্চিমদিকে সৈন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। বীরভূমির জমিদার বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী নিজের লাঠিয়ালদিগকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন; ইংরাজ কুঠিওয়ালগণ অর্থ দিয়ে সৈন্যগণের সাহায্য করিতে লাগিলেন ; মুর্শিদাবাদের নবাব একদল উৎকৃষ্ট হাতি পাঠাইয়া দিলেন, ও তাহাদের সমুদয় ব্যয় নিজে নির্বাহ করিবেন বলিলেন। গবর্নমেন্ট বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত একজন স্পেশিয়াল কমিশনর নিযুক্ত করিলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা যুদ্ধই নহে। সাঁওতাল যুদ্ধের কিছুই জানিত না। পলায়ন কাহাকে বলে, তাহাও তাহারা জানিত না। একদিন একদল সাঁওতাল একখানি মাটির ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল। নচেৎ গুলি চালাইবে বলিল। সাঁওতালগণ ঘরের কবাট অর্ধ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তির ছুড়িল। সিপাহিগণ দেওয়ালে একটা ছিদ্র করিয়া বন্দুক চালাইল। আবার সাঁওতালগদিগকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান; আবার তির বর্ষণ। কিছুক্ষণ এইরূপ হইল। অবশেষে গৃহমধ্য হইতে আর শর বৃষ্টি হয় না দেখিয়া সিপাহিগণ গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল একজন মাত্র-রক্তাক্ত কলেবর বৃদ্ধ শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া আছে। একজন সিপাহি তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিল। সাঁওতাল ভীষণ কুঠার প্রহারে সিপাহিকে ধরাশায়ী করিল। যুদ্ধ এইরূপই হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত আড়াইকাটি বাজিত, ততক্ষণ সাঁওতালগণ ইংরাজ সৈন্যের সমক্ষে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। এরূপভাবে মনুষ্য হত্যা করিতে সিপাহিগণ বড়ই লজ্জিত হইত। সাঁওতাল বন্দিগণ ইংরাজদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিত "আমরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব মনে করি নাই; আমাদের যুদ্ধ বাঙালিদের সঙ্গে। তোমরা কেন আমাদিগকে বধ করিতেছ? যদি একজন ইংরাজ যুদ্ধের পূর্বে আমাদের মধ্যে আসিয়া আমাদের কথা শুনিত, তবে যুদ্ধ হইত না।" যাহা হউক, আগস্ট মাসের মধ্যভাগে সাঁওতালগণ সমতলক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইয়া পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; বোধ হইল যেন অনল নির্বাপিত হইয়াছে, বিদ্রোহ শান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইল না। ঠিক এক মাস পরে বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন যে, গত পনের দিনের মধ্যে বিদ্রোহিগণ ৮০ খানি গ্রাম ভস্মীভূত, ও ডাক লুন্ঠন করিয়াছে। বীরভূমির উত্তর পশ্চিম অংশের সমুদয় বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল। এইবার সাঁওতালগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত উপরবাধ থানার অধীন রক্ষাডাঙাল নামক স্থানে সমবেত হইল। অপর দল সিউড়ির তিন ক্রোশ পশ্চিমে তিলবুনি নামক স্থানে ছাউনি করিয়া রহিল। গড়ে তাহাদের সংখ্যা ১২০০০ হইতে ১৪০০০ পর্যন্ত হইবে। দলে দলে সাঁওতাল, আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। রক্ষাডাঙালে যে সকল সাঁওতাল ছিল, তাহার মধ্যে ৩০০ সাঁওতাল, মুচিয়া কসন জোলা, রাম ও সুন্দর মাঝি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া উপরবাঁধে যাত্রা করে। ১৬ সেপ্টেম্বর তাহারা থানা ও গ্রাম লুন্ঠন করে। হলদিগড় পাহাড়ে রামমাঝি ২০০ সাঁওতাল লইয়া ছাউনি করিল, এবং পথ দিয়া যে যাইত তাহার সর্বস্বাপহরণ করিতে লাগিল। তিলবুনিতে ৭০০০ সাঁওতাল সিরু মাঝির কর্তত্বাধীনে থাকিয়া একটি দুর্গ নির্মাণ করে। দুর্গা পূজা করিবার জন্য তাহারা একজন ব্রাহ্মণ ধরিয়া লইয়া যায়। ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, অনেক নিচ শ্রেণির হিন্দুও সাঁওতালদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। একজন ডাকহরকরা একদিন ডাক লইয়া যাইতেছিল। তিলবুনির সাঁওতালগণ তাহাকে ধরিয়া তাহার হাতে একটি শালের ডাল দিয়া তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ফেরৎ পাঠায়। ঐ শাল শাখার তিনটি পাতা ছিল। তাহা দ্বারা তাহারা এই জানায় যে, তিন দিন পরে তাহারা সিউড়ি আক্রমণ করিবে।

এইরূপ বিপন্ন হইয়াও ম্যাজিস্ট্রেট ও ইংরাজ সেনাপতি বিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। সেনাপতিকে ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে কার্য করিতে হইত। ম্যাজিস্ট্রেট যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না। সুতরাং বিবাদ হইবারই ত কথা। অবশেষে নভেম্বর মাসের প্রথমে গবর্ণমেন্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামরিক আইন প্রচার করিলেন। সমগ্র বীরভূমি এখন সেনাপতির অধীনে আসিল।

সৈন্যগণ শ্রেণিবদ্ধ হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাঁওতালগণ ক্রমশঃই দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। ছয় সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কার্য শেষ হইল। বিদ্রোহিগণ পর্বতে ও বনে আশ্রয় হইল। ১৮৫৫। ৫৬ সালের শীত কালের প্রারম্ভে অনেক সাঁওতাল আত্মসমর্পণ করিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের শেষ হইল।

গবর্ণমেন্ট যদি প্রথমে সাঁওতালগণের অবস্থা জানিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এত অর্থনাশ ও রক্তপাত হইত না। প্রজার মনের অবস্থা জানা রাজার অবশ্য কর্তব্য। আবার প্রজার মনের ভাব জানিবার উপায় বন্ধ করা রাজনৈতিক মহাভ্রান্তি।

—সৎসঙ্গ, পৌষ, ১৩০৫

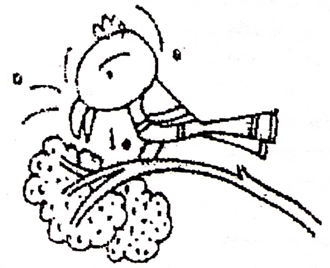

মহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল
সাঁওতাল বিদ্রোহ

ইংরেজ রাজত্বের দুশো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বহু কৃষক বিদ্রোহ হয়ে গেছে। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে কৃষকরাই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধে তুলে ধরেছিল। বাংলা দেশে কৃষকদের বিদ্রোহগুলি এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ২৪ পরগণা জেলায় তিতুমিরের বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলায় দুদুমিয়ার নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ, নীল চাষিদের বিদ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ার রায়তদের বিদ্রোহ—এমনই যেসব বড়ো বড়ো সংগ্রাম হয়েছিল তার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব সমধিক।

সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ ঘটেছিল একবার নয়, বারবার—১৮১১, ১৮২০, ১৮৩২ এবং ১৮৫৫-৫৬ সনে; পরে আবার ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫, এবং ১৮৮০-৮১ সনের বিদ্রোহ। এইসমস্ত বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও ব্যাপক ছিল ১৮৫৫-৫৬ সনের বিদ্রোহ।

কেন এই বিদ্রোহ?

নিরীহ, সরল-প্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয় সাঁওতাল কৃষকরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? সাঁওতাল চাষিরা যখন জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করত এবং সেই জমিতে গতরের মেহনত ঢেলে প্রচুর ফসল ফলাত, অমনি জমিদারদের জিভে জল সরত সেই জমি কেড়ে নেবার জন্য। ব্যাপারীরা তাদের নানাভাবে ঠকাত এবং নামমাত্র দাম দিয়ে তাদের সমস্ত ফসল আত্মসাৎ করে নিত। মহাজনরা অতিরিক্ত হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে কর্জ দিয়ে তা আদায়ের নামে তাদের ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করত ও শেষে একেবারে সারা জীবনের জন্য তাদের গোলাম বানিয়ে রাখত। জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ঘুষে পুষ্ট হয়ে পুলিশ ও আমলারা তাদের অযথা হয়রান ও পীড়ন করত। এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুঁজিবাদী বানিয়া সরকার, তদের উপর যে অকথ্য জুলুম ও পীড়ন চালাত, তার কোনোরকম প্রতিকার করত না, সমস্ত অবস্থা জেনেশুনেও কেবল মোটা রাজস্ব আদায় করে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির তালে থাকত।

এই শোষণ, পীড়ন ও প্রতারণার ব্যবস্থা ক্রমে নিরীহ সাঁওতাল কৃষকদেরও সঙ্গে সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন তারা বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয়।

বিদ্রোহের আসল কারণ ছিল সাঁওতালদের নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের জমি বজায় রাখাবার ও চাষ করবার এবং চাষের ফসল ভোগ করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং সেজন্য সমস্ত অন্যায় শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল জমি চাই, অত্যাচারী ও ঠগবাজ মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণ থেকে এবং বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি চাই। জমিদারি-মহাজনি ও বিদেশি ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা এই উভয়েরই বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল, দুইয়েরই অবসানের জন্য তারা হাজার হাজার কৃষকের রক্ত ও জীবন দিয়ে লড়েছিল।

পুরোনো পরিচয়

বাংলা, বিহার ও ওড়িশার, অর্থাৎ এককালের সুবে বাংলার সাঁওতালরা একটা বড়ো উপজাতি। সংখ্যার দিক থেকে ভারতের মধ্যে এটি বৃহত্তম। ১৯৫১ সনের আদমশুমারির হিসাবে পশ্চিমবাংলায় তাদের সংখ্যা ছিল লাখ ৪৫ হাজার। সাঁওতালি ভাষা যাদের মাতৃভাষা এমন লোকের সংখ্যা ছিল সারা ভারতে ২৮ লাখ; তার মধ্যে বিহারে ১৭ লাখ, পশ্চিমবাংলায় ৬ লাখ ৬৪ হাজার, ওড়িশায় ৩ লাখ ৩৬ হাজার এবং আসামে ৯৩ হাজার। পশ্চিমবাংলায় যে জেলাগুলিতে বেশি-সাঁওতালের বাস-সেখানে তাদের সংখ্যা এই : বীরভূমে ৭৮ হাজার, বাঁকুড়ায় ১ লাখ ৩৭ হাজার, মেদিনীপুরে ২ লাখ ২ হাজার, বর্ধমানে ১ লাখ ২৭ হাজার, মালদহে ৭২ হাজার, পশ্চিম দিনাজপুরে ৯৪ হাজার এবং হুগলিতে ৪৮ হাজার। পূর্ববঙ্গেও (বর্তমান বাংলাদেশ) কিছু সাঁওতাল আছে।

১৯৭১ সনের সেন্সাস অনুসারে সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা : সারা ভারতে ৩৬,৩৩,৪৫৯; পশ্চিমবাংলায় ১৩,৭৬,৯৮০; ওড়িশায় ৪,৫২,৯৫৩; বিহারে ১৮,০১,৩০৪। পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি জেলায় : মেদিনীপুরে ২,৮৬,০১০; পুরুলিয়ায় ১,৯৬,৬৩২; বর্ধমানে ১,৮০,২৮০, বাঁকুড়ায় ১,৫৭,৮০৬ পশ্চিম দিনাজপুরে ১,৩০,৪৭৩; বীরভূমে ১,০৪,৭২২; মালদায় ৯০,২৮৫; হুগলিতে ৭৫,১৩২।

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষা তার প্রকৃতির দিক থেকে বাংলা বা হিন্দি ভাষার সঙ্গে মেলে না। এতকাল এই ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা ছিল না। তাই বাংলা, হিন্দি, রোমান প্রভৃতি বর্ণমালার সাহায্যেই এর ভাষা লেখা হত। পঞ্চাশের দশকেও সাঁওতালি ভাবায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। এখন (১৯৮০) অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। একটা নতুন বর্ণমালা, 'অলচিকি' রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট গভর্নমেন্ট এই অলচিকি বর্ণমালাকে সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা বলে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

তাদের সমাজব্যবস্থা, রীতি রেওয়াজ অসাঁওতাল বাঙালি বা বিহারিদের সমাজব্যবস্থা থেকে অনেক বিষয়ে ভিন্ন। তাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তামাম সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে সাতটি গণ বা গোষ্ঠী আছে, সামাজিক দিক দিয়ে তারা সকলেই সমান। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব নাম বা পদবি আছে। পদবিগুলি এই : কাসদা, মুর্মু, সরন (সরেন), হাসদি (হাসদা), মারডি (মারডি), কেস্কু (কিস্কু) ও টাড়ু (টুডু)। অন্য মতে পদবিগুলি এই : জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ—হাঁসদা, মুর্মু, কিসকু, হেমব্রম, মারডি, সরেন ও টুডু। মানডি বা মারানডি মারডিরই ভিন্ন রূপ। মারাং বুরু (বৃহৎ পর্বত) তাদের সকলের জাতীয় দেবতা। শিবকেও অনেকে দেবতা বলে মানে।

সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম প্রবাদ ও কাহিনি প্রচলিত আছে। মারাং বরুর ইচ্ছা অনুসারে এই জাতির আদি পিতা ও মাতার সাত পুত্র ও সাত কন্যা হতে এই সাত গণ বা সংকুলান না হওয়ায় তারা চাই চম্পায় চলে যায়। পরে যায় সিলদায়, সেখান থেকে সিকারে, সেখান থেকে ছোটোনাগপুরে, তার পর উত্তরে ওসিরে পর্যন্ত। এইভাবে এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে তারা চাষের জন্য জমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেত না এবং জঙ্গলে পাহাড়েও তাদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সংস্থান হত না।

সপ্তদশ শতক নাগাদ তারা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ঢোকে। সেখানে জমির ষোলোআনা মালিক না হওয়ায় তাদের খাজনা দিতে হত এবং মোড়লের মারফত এজমালিতে সে খাজনা দিত।

দামনে কোহ এলাকায়

জঙ্গল সাফ করার কাজে ও চাষের কাজে সাঁওতালদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাই জমিদাররা নিজ নিজ জঙ্গলে চাষাবাদ করবার জন্য তাদের উৎসাহ দিত। এই উপায়ে জমিদাররা তাদের মেহনত দিয়ে নিজেদের আয় বাড়িয়ে নিত।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে তারা দামনে কোহ (রাজমহল পাহাড়তলি) এলাকায় আসতে থাকে। সেখানে বিস্তর উর্বর জমি পতিত বা জঙ্গলে ঢাকা পড়ে ছিল। তারা এখানে এসেছিল জমি পাবার জন্য এবং তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল বন কেটে জমি হাসিল করবার জন্য। পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রায় এক লাখ সাঁওতাল এসে প্রায় পাঁচ লাখ বিঘা জমি হাসিল ও আবাদ করে। তারা ভাবত সে জমি তাদের নিজেদের; কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তা জমিদার মহাজনদের হাতে চলে যেতে থাকে। জমিহারা হয়ে তখন তারা তাদের পরগণাইত বা মোড়লদের সহিত আলোচনা করে কী উপায় জমি ফেরত পাওয়া যায়।

সেকালে রাজমহলের পাহাড় এলাকায় যে পাহাড়িয়ারা বাস করত তারা পাহাড়তলির জমি চাষ করবার জন্য নিচে আসত না। সমতলের অ-সাঁওতাল বাঙালি কৃষকরাও এগিয়ে গিয়ে সে জমি চাষ করতে ভরসা পেত না। সেখানে প্রচুর উর্বর জমি ছিল, অথচ নিজেদের এলাকায় থেকে সাঁওতালরা জমি পাচ্ছিল না। ১৭৯০ সনে ইংরেজ কোম্পানির সরকার ঘোষণা করে যে হাসিল করা জমির উপর আর কর ধার্য করা হবে না। ঘোষণায় আরও বলা হয় যে কোনো কৃষক যত খুশি জমি চাষ করতে পারে।

দামনে কোহ বা বর্তমান রাজমহলের পাহাড়তলি অঞ্চলকে ১৮৩২ সনে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। এই অঞ্চল পড়ে তখনকার ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে। দামনে কোহের আয়তন ছিল ১৩৬৩ বর্গমাইল। তার মধ্যে ৫০০ বর্গমাইলে পাহাড় ছিল না। ১৮৫০ সনে এই ৫০০ বর্গমাইল এলাকায় প্রায় অর্ধেক অংশে জঙ্গল ছিল, বাকি অর্ধেক হাসিল করা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, কটক, মানভূম, ছোটোনাগপুর, হাজারিবাগ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে দামনে কোহ এলাকায় এসে সাঁওতালরা বসবাস করতে থাকে। ১৮৩৬ সন পর্যন্ত সেখানে সাঁওতাল ও ভুঁইয়ারা, প্রধানত সাঁওতালরা, ৪২৭ খানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে জানা যায়। তার পর তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায় এবং ১৮৫১ সন নাগাদ প্রায় ১৫০০ গ্রামে তাদের সংখ্যা হয় ৮৩ হাজার।

ব্যাপারী ও মহাজনের হামলা

দামনে কোহ এলাকায় এসে চাষবাস করে সাঁওতালরা প্রথমে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদের এই অবস্থায় নতুন উৎপাত দেখা দিল। অনেক বাঙালি, ভোজপুরি ও ভাটিয়া ব্যাপারী ও মহাজন দামনে কোহ এলাকায় এসে তাদের কারবার শুরু করল।

তখন সাঁওতালদের মধ্যে আধুনিক মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন বিশেষ হয়নি, টাকাপয়সার লেনদেন তেমন ছিল না। তাদের সমাজে স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থার প্রভাবই ছিল বেশি। তারা জমি চাষ করত তার ফসল নিজেরা ভোগ করবে বলে, এবং কিছু অংশ বিনিময় করে কাপড় চোপড়, তেল-নুন ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাবে বলে।

ব্যাপারীরা এসে কেনাবেচার কারবার শুরু করে। তারা সরলচিত্ত সাঁওতাল কৃষকদের ফসল মাটির দরে কিনে নিয়ে বাইরে চালান করে আর সেই সঙ্গে বাইরে থেকে আমদানি করা লবণ ও অন্যান্য পণ্য চড়া দরে তাদের মধ্যে বিক্রি করে। অনেক মহাজনও এ কারবার করত। দর কম বা বেশি ছাড়া তাদের আরও ঠকিয়ে কেনবার ও বেচবার জন্য তারা দু-রকম বাটখারা বা পাথর রাখত। কেনবার সময় ব্যবহার করত বড়ো বাটখারা, তার নাম ছিল কেনারাম বা বড়োবউ। আর বেচবার সময় ব্যবহার করত ছোটো বাটখারা, তার নাম ছিল বেচারাম বা ছোটোবউ।

ব্যাপারীরা তাদের ফসল কিনে ও অন্যান্য পণ্য তাদের নিকট বিক্রি করে অত্যাধিক মুনাফা লুটত। সেই মুনাফাকে আরও ফাঁফিয়ে তুলত সুদের কারবার করে। কোনো সাঁওতাল কৃষক পরিবার নতুন এসে জমি হাসিল করবার সময় খোরাকির জন্য ব্যাপারীর নিকট কিছু ধান চাইলে সে ধার দিত, কিন্তু জমি হাসিল করা ও ফসল বোনা হলেই সেই জমি দখল করত।

আবার, কোনো পরিবার তাদের খোরাকির ধান ফুরিয়ে যাবার পর সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যদি ব্যাপারীর নিকট কাজ চাইত, সে তাদের উপবাস থেকে বাঁচবার মতো সামান্য পরিমাণে ধান কর্জ দিত। কিন্তু কর্জ ধানের ভাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মহাজনের গোলাম হয়ে থাকতে হত। তারা দেনা শোধ করবার জন্য যতই খাটুক না কেন, যতই টানাটানি করে ও সঞ্চয় রেখে সংসার চালাক না কেন, ব্যাপারী তাদের সমস্ত ফসল দখল করে নিত এবং বাকি দেনার জন্য পরের বছরের ফসলের উপর দাবি রাখত। এমনিভাবে বছরের পর বছর সমস্ত রক্ত নিংড়ে দিয়েও খাতক তার দেনার দায় থেকে কখনও রেহাই পেত না।

এই অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করতে না পেরে যদি কোনো খাতক জঙ্গলে চলে যাবার কথা বলত, তা হলে মহাজন তাকে কোনো কথা জানতে না দিয়ে গোপনে আদালতে যেত এবং ঘুষের সাহায্যে তার উপর ডিক্রি জারি করাত। খাতক হঠাৎ দেখত তার গোরু, মোষ, তৈজসপত্র, হাঁড়িথালা পর্যন্ত নিলাম হয়ে গেল। স্ত্রীর সম্মানের চিহ্ন যে সামান্য লোহার বালাটুকু, তাও বাদ যেত না, ছিনিয়ে নেওয়া হত।

এই এলাকার জন্য যে ইংরেজ জজ নিযুক্ত হয়েছিল, সে সরকারের রাজস্ব আদায় নিয়ে ব্যস্ত থাকত, জনগণের ছোটোখাটো নালিশ শোনবার তার অবসর ছিল না। অধস্তন দেশি কর্মচারীরা প্রত্যেকেই অত্যাচারীদের পয়সা খেত, পুলিশও ছিল তার শরিক। এসবের খবর গবর্নমেন্টও রাখা দরকার মনে করত না অথবা জেনেও জানত না। একজন মাত্র ইংরেজ অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল সাঁওতালদের দেখাশোনা করতে। দেখাশোনা কিছু হত না, কিন্তু কোনো অত্যাচার না হলেও সেই অফিসারের ব্যবস্থাপনায় চাষের খেত বাড়ানো হত, তাতে রাজস্বও বাড়ত; রাজস্ব বেড়ে হয়েছিল ১৮৩৮ সনে ৬৬৮ পাউন্ড থেকে ১৮৫৪ সনে ৬৮০৩ পাউন্ড।

মহাজন ও ব্যাপারীদের বর্বর অত্যাচারের কোনো প্রতিকার ছিল না। আদালত ছিল বহু দূরে। নির্যাতিত গরিব কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবীরা কেঁদে মরত, কেউই তাদের সাহায্য করত না। নিরাশ হয়ে সাঁওতালরা বলত, ভগবান মহৎ, কিন্তু বড়ো দূরে আছে।

মহাজনের হিংস্রথাবা

জমিদারেরও শকুন দৃষ্টি তাদের জমির উপর পড়েছিল। আর মহাজনের দেনা দশ গুণ শোধ করা হলেও তার জের কোনদিন মিটত না। যখন ফসল ও গোরুবাছুর দিয়েও দেনা শোধ করা যেত না, তখন মহাজনের ঘরে তাদের সপরিবারে গোলাম হয়ে বাঁধা পড়ে থাকতে হত অথবা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে অনাহারে মরতে হত। মহাজনের এই অমানুষিক অত্যাচার তাদের পক্ষে ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় অসম্ভব জুলুম ও পীড়নের মধ্যে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত সাঁওতালদের থাকতে হয়। মহাজনের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে ১৮৪৮ সনে তিনটি এলাকার সমস্ত সাঁওতাল বাসিন্দা জমি-জায়গা ফেলে হতাশ মনে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তামাম এলাকার অধিকংশ লোকই পেটের দায়ে মহাজনের দাস হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়।

অনেক সাঁওতাল কৃষকের সামান্য দেনার জন্যও বাঁধা দেবার মতো জমি বা ফসল কিছুই থাকত না। এই ধরনের লোকদের মধ্যে কারও বাপ মারা গেলে সৎকারের জন্য দু চার টাকা ধার করতে তাকে মহাজনের দুয়ারে যেতে হত। সেজন্য বন্ধক রাখবার কিছু না থাকায় সৎকারের পর থেকে দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সপরিবারে মহাজনের গোলামি করতে হত। মহাজন অবশ্য চাইত না এই দেনা শোধ হোক। তাই অন্য জায়গায় কাজ করে যাতে সে শোধ দিতে না পারে, সেজন্য তাকে দিনরাত নিজের কাজে খাটিয়ে আটক রাখত। এই খাতক মরে গেলে ছেলেদের জন্য কেবল দেনার বোঝাই রেখে যেত। দেনা ও তার আনুষঙ্গিক গোলামি চলত পুরুষানুক্রমে। দেনা প্রথমে সামান্য দু চার টাকা হলেও অল্পকালের মধ্যেই শতকরা ৩৩ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে ফুলেফেঁপে উঠত। শতকরা ৫০০ টাকা হারেও সুদ আদায়ের সংবাদ পাওয়া যায়। মহাজন খাতককে চাষের ও ফসলের মরশুমে সকল সময় কাজে নিযুক্ত রাখত। তা অসহ্য হলে খাতক যদি কাজ করতে না চাইত, মহাজন তার আহার বন্ধ করে দিত। সে যদি অপরের কাজ করতে যেত, মহাজন আদালতের ডিক্রি আনিয়ে এবং জেলের ভয় দেখিয়ে তাকে ঠান্ডা করত।

সরকারি আমলাদের নির্যাতন

সাঁওতাল কৃষকদের উপর যখন এই নিদারুণ শোষণ ও পীড়ন চলছিল, সেই সময়ে (১৮৫৪) এক সরকারি মুখপত্রেই স্বীকার করা হয়েছিল যে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা পেয়াদা, পুলিশ, আমলা, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই মিলে নিরীহ গরিব সাঁওতাল কৃষকদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। বার্ষিক শতকরা ৫০ থেকে ৫০০ টাকা হারে সুদ আদায়, বেআইনি আদায়, জোর করে জমি দখল, মারধর—তাদের উপর সবই চলে।

দামনে কোহের মাটিতে দেহের সমস্ত শ্রম দিয়ে সোনা ফলিয়ে এত সম্পদ পয়দা করছিল যে সাঁওতাল কৃষকরা, তাদের উপর এই বর্বর আক্রমণ চলছিল অবাধে, বিদেশি পুঁজিবাদী শোষকদের 'সুসভ্য' নাকের ডগার উপর। সরকারি কাগজপত্রেও সে কথা বারবার

প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু অত্যাচারী জমিদার-ব্যাপারী শ্রেণির উৎপাত বন্ধ করবার দিকে বিদেশি কোম্পানির সরকারের আগ্রহ দেখা যায়নি কোনো দিন।

এই অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের উপর আরও এক জুলুমের পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই এলাকা দিয়ে রেললাইন তৈরির কাজ তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই কাজে যে-সমস্ত ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল তারা সাঁওতালদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় খাসি, মুরগি ইত্যাদি কেড়ে নিত, অন্যায়ভাবে তাদের উপর জুলুম চালাত। তারা দু-জন সাঁওতাল মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে এবং একজন পুরুষকে খুন করে।

গণ-জাগরণের সূত্রপাত

সাঁওতাল কৃষকরা বহু কষ্টে ও পরিশ্রমে যে জমি জঙ্গল কেটে হাসিল করেছিল সে জমি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে জমিদার-মহাজনদের হাতে চলে যেতে লাগল। মেহনত করে যে ফসল তারা ফলাচ্ছিল তা ব্যাপারী ও মহাজনরা অন্যায়ভাবে জোর করে এবং ঠকিয়ে দখল করে নিচ্ছিল। সামান্য দেনার দরুন অন্যায় ও মিথ্যা সুদের দায়ে জঙ্গলের মুক্ত ও সরল এই মানুষগুলি মহাজনদের নিকট মাথা বিক্রি করে তাদের গোলামি করতে বাধ্য হচ্ছিল।

এই সমস্ত ঠগবাজ অত্যাচারীদের নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইন-আদালত থেকে তারা কোনোই সাহায্য পেত না, বরং শোষক শ্রেণিদের স্বার্থে আদালত ও পুলিশ অযথা তাদেরই হয়রান ও পীড়ন করত, সর্বস্বান্ত করে দিত। যেমন এখনও অনেক পরিমাণে চলে কৃষকদের উপর পুলিশের জুলুম ও পীড়ন। আর কোম্পানির সরকার তাদের রক্ষা করার কথা চিন্তা না করে নিজের মুনাফার টাকা গুনতে ব্যস্ত থাকত।

এই অবস্থা ক্রমে যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন ধোঁয়াতে শুরু করল। তারা ছিল নিরীহ ও সরল প্রকৃতির মেহনতকারী মানুষ। শোষণ ও অত্যাচার যে হচ্ছিল তা তারা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিল। কিন্তু কেন যে মানুষ এইভাবে জুলুম করে তা বুঝছিল না, শোষক শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ শোষকদের যে কতখানি পৈশাচিক ও অমানুষিক করে তোলে তা ছিল তাদের বোঝার বাইরে। তারা শুধু এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছিল যে অত্যাচারী লোকগুলো খারাপ, এবং সরকার ও তার পুলিশও যখন এই খারাপ লোকগুলোর পক্ষে থেকে তাদেরই উপর অন্যায়ভাবে জুলুম পীড়ন চালায়; তখন তারাও খারাপ। এই ছিল সাঁওতাল কৃষকদের জীবনের বাস্তব ও জীবন্ত অভিজ্ঞতা ঃ মহাজন ও ব্যাপারীরা তাদের শত্রু, সরকারও শত্রু।

এমনই সময়ে নিকটের রেললাইন তৈরির কাজে বহু সাঁওতাল মজুর হিসাবে যোগ দেয় গ্রামে মহাজনের গোলামি করে যা পেত তার চেয়ে ভালো মজুরিতে তারা রেললাইনে কাজ করত। মজুরিও পেত নগদ পয়সায়। কাজও সেখানে করত অনেক লোক একসঙ্গে। লাইনের কাজ করে তারা বুঝল মজুর হিসাবে মহাজনের দাসত্ব ছাড়াও তাদের বাঁচবার একটা পথ হতে পারে।

বিক্ষোভ ও গোপন আলোচনা

তখন থেকে সাঁওতালদের মনে এক নতুন চিন্তা ও চেতনা জাগল। কৃষকদের মধ্যে কানাঘুসা শুরু হল। গোপনে রাত্রে নানা স্থানে বৈঠক চলতে লাগল মহাজনদের জুলুম

কেমন করে বন্ধ করা যায় তার আলোচনার জন্য। ১৮৫৪ সানের প্রথম দিকে লক্ষ্মীপুরে সাসানের পরগণাইতে বীর সিং-এর নেতৃত্বে একটা বড়ো দল তৈরি হল। এই দলের মাতব্বর ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বোরিয়োর বীর সিং মাঝি, সিন্দ্রির কাওলা পরামানিক, এবং হাতবাঁধার ডোমন মাঝি।

ধনী শোষকের দল গরিবদের উপর জুলুম করত বলে জ্ঞানপাপী হিসাবে সব সময়েই তারা দুর্ভাবনার মধ্যে থাকত। সাঁওতাল কৃষকদের এই নতুন ও গোপন কার্যকলাপের সংবাদ তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলল। তারা পুলিশে ও পাকুড় রাজ এস্টেটে খবর দিল। পাকুড় রাজের দেওয়ান জগবন্ধু রায় ছিল অত্যন্ত অসৎ ও শয়তান লোক। সকল সময়েই সে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে মহাজনদের মদত দিত : সেটা ছিল তার শ্রেণিস্বার্থ। সেই ঘৃণিত দেওয়ান বীর সিং- কে জমিদারি কাছারিতে ডাকিয়ে এনে মোটা জরিমানা করল এবং তখনই জরিমানার টাকা দিতে বলল। বীর সিং যখন বললেন তিনি নির্দোষ এবং জরিমানার টাকা দেবার ক্ষমতা তাঁর নাই, তখন তাঁর অনুগামীদের সামনেই দেওয়ান তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে জুতাপেটা করল।

পীড়নের জবাব

এই অপমানের ফলে বীর সিং ও তাঁর অনুগামী সাঁওতালদের মনে ভীষণ আগুন জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ নেবার আগ্রহ প্রবল হয়ে দেখা দিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক প্রতিশোধ হিসাবে অত্যাচারী ধনী মহাজনদের বাড়ি ডাকাতি আরম্ভ করল। এই ঘটনাকে সেই সময়কার এক সরকারি মুখপত্রে বলা হয় এ হল মহাজনদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ।

গোলযোগ শুরু হলে এক রাত্রে তারা বারহাইতের নিকট কুসমা গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়ি লুঠ করে; বারহাইত তখন ওই এলাকার প্রশাসন কেন্দ্র। মহাজন পরদিন থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের নিকট খবর পাঠায়। সেখানে ভজা পরগণাইতের ভাই গোঁচো বাস করতেন। গোচো ছিলেন ধনী সাঁওতাল। তাঁর টাকার উপর মহাজনের বিশেষ লোভ ছিল। তারা দারোগার নিকট গোচোর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলে। দারোগা গোচোকে মারপিট করায় তিনি বললেন, শয়তান দারোগা যে সমস্ত শান্তিপ্রিয় সাঁওতালকে চালান দিতে চায়, তাদের বাঁধবার জন্য কত দড়ি জোগাড় করতে পারে দেখব।

দারোগা অবশ্য গেচ্চো বা তাঁর দলের কাউকেই তখন গ্রেফতার করতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরের বছরে মহাজনদের প্ররোচনায় ও নির্দেশে মহেশ দারোগা গোচ্চো ও তর দলের অনেক সাঁওতালকে গ্রেফতার করে ও কঠোর সাজা দেয়।

এর কয়েক মাস পরে যে প্রচণ্ড ঝড় আসছিল, এই সকল ঘটনার মধ্যে তারই বীজ বোনা হচ্ছিল।

কুখ্যাত মহেশ দারোগা ছিল মহাজনদের হাতের লোক। তাদের ঘুষের টাকায় তার পেট মোটা হল। ডাকাতি ও গোলযোগ দমনের নামে সে সাঁওতাল কৃষকদের উপর যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছিল এবং যেভাবে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা করছিল, তা আর তারা বরদাস্ত করতে পারছিল না। জমিদার, মহাজন ও পুলিশের এই জুলুম পীড়নের কাহিনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সারা সাঁওতাল সমাজের মধ্যেই প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। সকল

এলাকাতেই তাদের মনে প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা জাগছিল। সেই সঙ্গে তারা উদ্ধারের পথ সম্বন্ধেও চিন্তা করছিল।

প্রতিরোধের পথ

তাই ১৮৫৫ সনের গোড়ার দিকে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর ও হাজারিবাগ থেকে ছ সাত হাজার সাঁওতাল এসে দামনে কোহে জমায়েত হয়। তাদের আসার উদ্দেশ্য ছিল আগের বছরে তাদের সাথিদের উপর যে পীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং বীর সিং-কে যেভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া। তারা তাদের সরল যুক্তি দেখিয়ে বলে ডাকাতি হয়েছে ধনী মহাজনদের বাড়ি। মহাজনরা আগে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পীড়ন করেছে। কিন্তু ডাকাতির জন্য তাদের সাজা দেওয়া হল, অথচ যে মহাজনদের শোষণ ও জুলুমের কারণে তারা আইন ভঙ্গ করেছে তাদের শাস্তি হল না কেন? যে সমাজব্যবস্থায় শোষক শ্রেণিদের শোষণের অবাধ সুযোগকে রাখাই তাদের শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য, সেখানে তাদের এই সহজ ও সরল যুক্তি যে অচল, তা তারা বোঝেনি। তাই এই অবিচার তাদের সহ্য হল না।

পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা অপমান সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এই অবস্থা কেউই বরদাস্ত করতে পারছিল না। সকলেই ভাবছিল এখনই একটা বিহিত ব্যবস্থা দরকার। সেজন্য পথ খুলতেও বেশি দেরি হল না। সেই পথই ছিল গৌরবময় বিদ্রোহের পথ।

ওই এলাকার তখনকার শাসনকেন্দ্র বারহেট বা বারহাইত-এর নিকটবর্তী ভগনাডিহি গ্রামে বাস করতেন দুই ভাই সিধু ও কানু (সিদু বা সিদে এবং কানহু) নামে দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। তাদের আরও দুই ভাই ছিলেন চাঁদ ও ভৈরব। সকলেই ভূমিহীন সাঁওতাল কৃষক। পূর্বে তাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল কিন্তু একবার ফসল না হওয়ায় মহাজনের দুয়ারে যাবার পর দেনার দায়ে তাদের পরিবার অর্থনীতির দিক থেকে ধ্বংস হয়েছিল। তাদের গ্রামের ও অন্যান্য গ্রামের লোকদের অবস্থাও ছিল তাই।

সিধু ও কানু অন্য অনেক সাঁওতালের মতো উদ্‌বেগের সঙ্গে সমস্ত অবস্থা লক্ষ করছিলেন। বীর সিং ও গোচ্চোর অপমান ও পীড়ন তাঁদের মনে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। তার পরও সাঁওতালদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগ আনা হচ্ছিল। একদিন সাতকাঠিয়া (সাতখেতিয়া) গ্রামে গিয়ে মহেশ দারোগা এলোপাথাড়ি সাঁওতালদের গ্রেফতার করলে। একরার করাবার জন্য তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চাবুক মারা হল।

ভগনাডিহির সিদ্ধান্ত

তখন সিধু ও কানুর গ্রামে জমায়েত হবার জন্য সাঁওতালদের ঐতিহ্য অনুসারে পাতাসমেত ছোটো শালের ডাল পাঠিয়ে চারদিকে তাদের ডাক দেওয়া হল। ১৮৫৫ সনের ৩০ জুন (১২৬২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের মাঝামাঝি) রাত্রে ভগনাডিহি গ্রামে ৪০০ গ্রামের প্রতিনিধি ১০ হাজার সাঁওতাল কৃষকের বিরাট জমায়েত হল। জনগণের বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভায় সিদ্ধান্ত হল যে অত্যাচারী শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সকলকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে।

সভা থেকে এই ফরমান জারি করা হল যে, এখন থেকে কেউ জমির জন্য কোনোরকম খাজনা দেবে না, প্রত্যেকেরই যত খুশি জমি চাষ করবার স্বাধীনতা থাকবে, আর সাঁওতালদের সমস্ত ঋণ বাতিল হবে।

সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে তারা জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য সংকল্প করেছেন এবং আরও সংকল্প করেছেন যে তারা মুলুক দখল করে নিজেদের সরকার কায়েম করবেন। আসলে এই স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল শোষণ ও পীড়ন থেকে মুক্তি, নিজেদের উৎপাদন কর্ম করবার ও মেহনতের ফসল ভোগ করবার অবাধ অধিকার। এই গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করাবার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা।

এইসকল বক্তব্য জানাবার জন্য সভার নির্দেশ মোতাবেক কির্তা, ভাদু, সন্নো ও সিধু গভর্নমেন্টকে, কমিশনারকে, ভাগলপুরের ও বীরভূমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের; দিঘি ও রাজমহল থানার দারোগাদের এবং কয়েকজন জমিদারকে ও অন্যান্যকে চিঠি লিখলেন। জমিদারদের নামের চিঠিগুলি ছিল চরমপত্র। তাতে লেখা হল ১৫ দিনের মধ্যে জবাব চাই। কিন্তু কেউই চিঠির উত্তর দেওয়া দরকার মনে করেনি। (এ চিঠি সরকারি নথিতে পাওয়া যায়নি বলে প্রকাশ।)

ভগনাডিহির সভার এই সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত। বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল জমি চাই; মুক্তি চাই। জমিদার, মহাজন ও গভর্নমেন্টের শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্ত হয়ে শান্তির সহিত উৎপাদনের কাজ ও জীবনধারণ করবার সংকল্প নিয়ে সাঁওতাল কৃষকরা তাদের বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়।

বিদ্রোহের কারণ বলে যা ঘোষণা করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল এই অভিযোগগুলি—মিথ্যার প্রাধান্য, কর্তৃপক্ষের অবহেলা, মহাজনদের শোষণ ও প্রতারণা, আমলাদের দুর্নীতি এবং পুলিশের জুলুম।

বিদ্রোহের নেতারা ধারণা করেছিলেন ইংরেজ শাসকরা সমস্ত অবস্থা তদন্ত করে দেখবে। কিন্তু শাসকদের সময় কোথায় তদন্ত করবার? প্রশাসন জনগণের কথা চিন্তা না করে কেবল রাজস্বের কথাই ভাবতে পারে। সাঁওতাল এলাকার প্রশাসনে সেই কাজই হয়েছিল। জনগণের অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজদের শাসনপদ্ধতির অজ্ঞতা যখন তাদের উপর বিদ্রোহের মতো ভয়ংকর শাস্তি ডেকে এনেছিল, তার জন্য সেই পদ্ধতিই ছিল দায়ী।

বিদ্রোহে গরিব হিন্দু-মুসলমান

বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল কি শুধু কৃষকরাই? না, সাঁওতাল ছাড়া স্থানীয় অ-সাঁওতাল বাঙালি ও বিহারি ও মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগররাও অনেকেই তাতে যোগদান করে। তাদের মধ্যে ছিল কামার বা লোহার, কুমোর, তেলি, গোয়ালা, চামার, ভুঁইয়া, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতি বা বর্ণের হিন্দুরা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে মোমিনরা। তাদের যোগ দেবার কারণ ছিল এই যে শ্রেণিস্বার্থের দিক দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের থেকে তাদের তেমন কোনো তফাত ছিল না। জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণ ও জুলুম সাঁওতালদের মতো কমবেশি তাদের উপরও চলত, পুলিশ ও আইন আদালতের নির্যাতন তাদেরও ভোগ করতে হত। ধনী ও গরিবের এই লড়াইয়ে এবং ধনীদের শোষণ ও পীড়নের সমর্থক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের স্বার্থ ও সাঁওতালদের স্বার্থ ছিল মূলত অভিন্ন।

বিদ্রোহে যে সকল অ-সাঁওতাল বাঙালি বা বিহারি ছিল তারা সাধারণত সাঁওতালদের মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধের যোগ দেয়নি। কিন্তু তারা যুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রেখেছিল। তাদের কাজ ছিল প্রধানত শত্রুপক্ষের খবর সংগ্রহ করে আনা, পথ দেখানো, যুদ্ধের নাগরা বাজানো, কাজের ধারা ঠিক করে দেওয়া ইত্যাদি। তা ছাড়া কামারদের কাজ ছিল যুদ্ধের জন্য তির, টাঙ্গি, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র তৈরি করে দেওয়া। এইসকল বিষয়ে সাহায্য করে অ-সাঁওতাল বাঙালি বিহারী হিন্দু-মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগররা বিদ্রোহী সাঁওতালদের যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছিল। যুদ্ধের জন্য তাদের এই সাহায্য ছিল শুধু মূল্যবান নয়, অপরিহার্য। সমস্ত অত্যাচারী ধনীর বিরুদ্ধে তামাম শোষিত গরিব এক হয়েছিল।

ভগনাডিহির উদাত্ত আহ্বানে সাঁওতাল অ-সাঁওতাল সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের জমাট বিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। জমি চাই, মুক্তি চাই— এই আওয়াজ সমস্ত সাঁওতাল ও অন্যান্য গরিবদের মাতিয়ে তুলল। এই নতুন প্রেরণা তাদের মন থেকে সব বাধা ও সংকোচ দূর করে দিলে। এখনকার মতো স্থায়ী আন্দোলন ও সংগঠন তখন ছিল না। কিন্তু জমি ও শোষণ মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা শ্রমজীবী ও শোষিত শ্রেণি হিসাবে তাদের মনে গভীর সংগ্রামী চেতনা এনে দিল।

অত্যাচারীদের খতম করার ডাক

বিদ্রোহীদের প্রথম আঘাত পড়ল শয়তান মহেশ দারোগার উপর, যখন সে জুলাই দলবল-সহ বিদ্রোহীদের নিকট গিয়ে জমিদারদের খাজনা দেবার জন্য তাদের শান্তভাবে চাষবাস করতে উপদেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলে। এই লোকটাকে সাঁওতালরা মনে-প্রাণে ঘৃণা করত, কারণ তাদের উপর সে দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে অন্যায় জোরজুলুম ও পীড়ন চালিয়েছিল।

দারোগার মুখে তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ শুনে বিদ্রোহীরা বলল, যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকে তা হলে আমাদের বেঁধে নিয়ে যাও। তাদের জেরার মুখে দারোগা স্বীকার করল যে সে মহাজনদের ঘুষ খেয়ে এই অভিযোগ এনেছে।

তৎসত্ত্বেও কোনো প্রমাণ না দেখিয়েও সে বিদ্রোহীদের বাঁধতে হুকুম দেয়। অমনি বিদ্রোহী জনতা তাকে আর তার সঙ্গী মহাজন, চৌকিদার ও বরকন্দাজদের বেঁধে ফেলে এবং দারোগা সমেত মোট ১৯ জনের মাথা কেটে ফেলে। পাঁচকেঠিয়া (পাঁচখেতিয়া) বাজারেও পাঁচ জন অত্যাচারী মহাজনকে হত্যা করা হয়। এই মহাজনদের নাম : মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত। বিদ্রোহের নেতাদের নির্দেশ ছিল যে কেবল সুদখোর ধনী মহাজনদের হত্যা করতে হবে এবং অন্য সকল শ্রেণির লোককে রক্ষা করতে হবে।

বিদ্রোহের প্রসার

বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে লাগল। গোচ্চা কয়েক হাজার লোক নিয়ে খাঁপুর-বাহাদুরপুরের দিকে যান এবং সিধু, কানু ও তাঁদের অন্য দু-ভাই বিশাল বিদ্রোহী বাহিনী নিয়ে সুলতানাবাদ দখলের জন্য মহেশপুরের দিকে অগ্রসর হন।

বিদ্রোহীদের এই শক্তি দেখে জমিদার, মহাজন ও ঠগবাজ ব্যাপারীর দল ঘরবাড়ি ফেলে পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা অল্প সময়ের মধ্যে বোরিয়ো থেকে কোহলগাঁও পর্যন্ত তামাম এলাকা নিজেদের দখলে এনে ভাগলপুর ও রাজমহলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমে এই দুই শহরের মধ্যেকার এলাকাও তারা দখল করে। ডাক ও রেল বন্ধ হয়ে যায়। পিরপাঁইতি থেকে সকরিগলি পর্যত সড়কও তাদের হাতে এসে পড়ে।

শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ যতখানি এলাকায় বিস্তৃত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল বীরভূম জেলা, ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশ। এই এলাকার উত্তরে ছিল গঙ্গানদী, পূর্বে গঙ্গা ও ভাগীরথীনদী ও দক্ষিণে অজয় ও বরাকর নদী, এবং পশ্চিমে হাজারীবাগ ও মুঙ্গের জেলা। বর্তমানে এই এলাকার মধ্যে আছে সমগ্র সাঁওতাল পরগণা জেলা এবং বীরভুম ও ভাগলপুর জেলার অনেক অংশ। এর উত্তর-পূর্ব অংশ, তবে অন্যান্য অংশেও তার যথেষ্ট জোর ছিল।

কোনরকম সামরিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ব থেকে কোনরকম সংগঠন না থাকলেও হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক সমস্ত কাজ ফেলে, চাষের মরশুমে চাষের কাজ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় বিদ্রোহ যোগদান করেছিল। জীবন-মরণ সমস্যা না হলে কৃষক কখনও এমন কাজ করতে পারে না। তারা ছিল সত্যিকার গণবাহিনী এবং গণবাহিনীর উপযুক্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা লড়েছিল। তারা সাধারণত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ঘোরাফেরা করত। কিন্তু যুদ্ধের নাগরা বাজলে সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা জায়গায় দশ হাজার লোকের জমায়েত হত, তেমনই শৃঙ্খলার সঙ্গে সরেও যেত। যুদ্ধে তাদের অস্ত্র ছিল তিরধনুক, টাঙ্গি কুঠার ও তলোয়ার। বিষাক্ত তির তারা ব্যবহার করেনি। অনেক সময় তারা গেরিলা কায়দায়ও যুদ্ধ করেছিল।

সরকারি দমনব্যবস্থা

ইংরেজ কোম্পানির সরকার অবশ্য বিদ্রোহ শুরু হবার পর চুপ করে বসে থাকেনি। যত বেশি সম্ভব সৈন্য একত্র করে গবর্নমেন্ট বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছিল এবং এই কাজের জন্য একজন বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত করেছিল। ধনী-জমিদার-মহাজনরা এবং বিদেশি নীলকররা এই-কাজে গবর্নমেন্টকে সাধ্যমতো সাহায্য করলে। মর্শিদাবাদের নবাব নিজ খরচে ত্রিশটা হাতি পাঠিয়ে দিলেন। দলে দলে সরকারি সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হল।

কিন্তু জুলাই মাসে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে সরকারি সেনা পরাস্ত হল। ১৬ জুলাই পিরপাঁইতির নিকট মেজর বারোজের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হল। তারা হটে গিয়ে পিরপাঁইতি পৌঁছল এবং পরে নৌকাযোগে কোহলগাঁও পালাল। সুন্দরা নদীর তীরে পালারপুরে এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর অনেক সিপাই বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়ে এবং তাদের নায়ক পালিয়ে যায়। ২৭ জুলাই খয়রাসোল থেকে ছ-মাইল দূরে বিদ্রোহীদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সরকারি বাহিনী পালিয়ে যায় এবং লেফটেনান্ট টোলমেন ও ১৩ জন সিপাই নিহত হয়।

জুলাই মাসে বিদ্রোহীরা গঙ্গার দক্ষিণ তীর বরাবর কোহলগাঁও থেকে রাজমহল পর্যন্ত দামনে কোহের উত্তরে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে সক্রিয় ছিল। রেলের ইঞ্জিনিয়ার ভিগর্স তখন

ছিলেন রাজমহলের শাহ সুজার প্রাসাদ সঙ্গী দালানে এবং স্থানটি তিনি সুরক্ষিত করেন। তাই রাজমহল বিদ্রোহীদের দখলে যায়নি।

মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক টুগুডের নেতৃত্বে বহরমপুর থেকে সৈন্যদল এসে গেলে ১৫ জুলাই মহেশপুরে যে সংঘর্ষ হয় তাতে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষে সিধু ও তার অন্য দু-ভাই কানু ও ভৈরব আহত হন। আরও ২০০ বিদ্রোহী হতাহত হয়। ২৪ জুলাই সরকারি সেনা সাঁওতালদের প্রধান ঘাঁটি বারাহাইত পৌঁছোয় ও দখল করে। রঘুনাথপুরের যুদ্ধেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়।

বিদ্রোহ দমনে এত বেশি সরকারি আড়ম্বর সত্ত্বেও তা ছড়িয়ে পড়ে গোড্ডা, পাকুড়, মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে। বিদ্রোহে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল কৃষক অস্ত্র ধারণ করেছিল। এ ছাড়া বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান অ-সাঁওতাল বাঙালি ছিল। সরকার পক্ষে একটা স্তরে কামান বন্দুক নিয়ে ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধে নেমেছিল।

বিদ্রোহীরা অগ্রসর হতে হতে লিটিপারুর তিন জন অতি কুখ্যাত মহাজনকে ধরে ফেলে ও খতম করে। বহু 'দিকু' বা অ-সাঁওতালের সাহায্য তারা পেতে থাকে। ক্রমে এই বিদ্রোহের মধ্যে সাঁওতাল ও অ-সাঁওতালদের মধ্যেকার জাতি ও ধর্মের তফাত দূর হতে থাকে। সকলের মূলত অভিন্ন শ্রেণিস্বার্থই প্রকট হয়ে ওঠে।

সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে সাঁওতাল বাহিনী তিন দিন ঘেরাও করে রাখার পর পাকুড় দখল করে। জমিদাররা পূর্বেই সরে পড়েছিল। কিন্তু সেখানকার সবচেয়ে ধনী ও নিষ্ঠুর মহাজন দীনদয়াল রায় বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে। বিদ্রোহী বাহিনীর আগে আগে যেসকল গরিব হিন্দু ও মুসলমান পথ দেখিয়ে চলছিল তারা সেই ঘৃণিত মহাজনের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেয়। দীনদয়াল তার চাকর জগন্নাথ সরদারকে কেনা গোলামের মতো পীড়ন করত। সেই তাকে বিদ্রোহীদের নিকট ধরে নিয়ে যায়।

দীনদয়াল ও তার অনুচররা সাঁওতালদের উপর সকলরকম অত্যাচার চালিয়েছিল। মায়ের কোল থেকে তাদের শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা পর্যন্ত করেছিল। বহু অত্যাচার সইবার পর এখন সুযোগ পেয়ে জগন্নাথ টাঙ্গি দিয়ে তার এক-একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে আর বলতে থাকে, এইসব আঙুল দিয়ে তুই সুদের টাকা গুনতিস। এই হাত দিয়ে ভুখা গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতিস।

বিদ্রোহ দমনের নামে সরকারি সৈন্যদল গণহত্যা করত এবং সাঁওতাল গ্রামগুলি আগুন দিয়ে ধ্বংস করতে থাকে। কাপ্তেন শেরবিল ১২ খানা ও মেজর শাকবরা ১৫ খানা সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে। বিশেষভাবে সামরিক হুকুম দিয়ে এমনই বহু গ্রাম ধ্বংস করা হয়। ভগনাডিহি গ্রামও সরকার-পক্ষ জ্বালিয়ে দেয়। সরকারি গোলাগুলির আঘাতে যে সকল সাঁওতাল কৃষক নিহত হন, তাদের রক্তে রাজমহল পাহাড়ের মাটি লাল হয়ে যায়। হাজার হাজার বিদ্রোহী শহিদের রক্তের স্রোত বর্ষার ভরা গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে গিয়ে মিশতে থাকে। কিন্তু নিজেদের ঘরবাড়ি, জমি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের দুর্জয় সাহস তাদের এক পা-ও পিছু হটতে দেয়নি। পাহাড়ের মতো অটল থেকে তারা বীর বিক্রমে লড়েছিল। তারা পালাতে বা মাথা নত করতে জানত না।

প্রায় এক মাস ধরে লড়াই ব্যাপকভাবে চলবার পর খাদ্যাভাব ও রোগব্যাধির কারণে

বিদ্রোহের তেজ কিছু কমে যায়। তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গভর্নমেন্ট বিস্তর সৈন্য আনিয়ে গণহত্যা ও গ্রামদাহ ইত্যাদি চালাতে থাকে।

১৭ আগস্ট সরকার এক ঘোষণা প্রচার করে। তাতে সমস্ত বিদ্রোহীকে দশ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় ও প্রচার করা হয় যে আত্মসমর্পণ করলে নেতাদের ও যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আছে তাদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে ক্ষমা করা হবে। বিদ্রোহীরা এই ঘোষণাকে ঘৃণার সহিত বর্জন করে।

মাসখানেক নরম থাকবার পর বিদ্রোহীরা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আবার পুরোদমে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে আসে। বীরভূম জেলার মধ্যে যেসব বাহিনীর অভিযান করতে থাকে তার মধ্যে একটিতে ছিল তিন হাজার এবং আর একটিতে সাত হাজার বিদ্রোহী। সরকারি আমলারা অবস্থা দেখে পালিয়ে যায়। ব্যাপক এলাকা জুড়ে লড়াই চলতে থাকে। আবার হাজার হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল কৃষককে হত্যা করা হতে থাকে। বীরভূমের পালাপুরে এক দিনে কাপ্তেন কোণির আদেশ প্রয় দেড় হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহের নেতাদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সরকার ঘোষণা করে ; সিধুর জন্য ধার্য করে ১০ হাজার টাকা, অন্যদের জন্য ৫ হাজার ও ১ হাজার করে।

আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়

সরকারি সৈন্যদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সরে গিয়ে একবার ৪৫ জন বিদ্রোহী একটা মাটির ঘরে আশ্রয় নেয়। তখন সৈন্যরা তাদের ঘেরাও করে আত্মসমর্পণ করতে বললে ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুড়ে তার জবাব দিতে থাকে। সিপাইরা গুলি চালাতে থাকে। ক্রমে যখন দেখা গেল আর তির আসে না, তখন একজন সিপাই ভিতরে ঢুকে দেখে এক বৃদ্ধ সাঁওতাল ছাড়া বাকি সকলে শহিদ হয়েছেন। বৃদ্ধকে সে আত্মসমর্পন করতে বললে বৃদ্ধ তাঁর টাঙ্গি দিয়ে তাকে হত্যা করেণ।

সৈন্যদের এই ধরনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পরে মেজর জারভিস নামে এক সেনাপতি বলেছিলেন, 'একে যুদ্ধ বলে না, এ ছিল গণহত্যার ব্যাপার। তারা আত্মসমর্পণ করতে জানত না। যতক্ষণ তাদের নাগরা বাজবে, তারা সকলেই দাঁড়িয়ে পড়বে এবং নিজেদের গুলি করে হত্যা করতে দেবে। তাদের তিরে প্রায়ই সরকারি সৈন্যরাও মারা যেত। এই যুদ্ধে এমন সিপাই ছিল না যে নিজের কাজে নিজে লজ্জিত বোধ না করত। বন্দিরা প্রায়ই ছিল আহত লোক। এমন সাহসী ও সত্যবাদী মানুষ আমি আর দেখিনি।'

সরকারি আইন জারি

বিদ্রোহ দমনের এত ঘটা, বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়োগ, আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষণা ইত্যাদি সত্ত্বেও যখন মাসের পর মাস বিদ্রোহের আগুন জ্বলতেই লাগল, তখন গভর্নমেন্ট ১০ নভেম্বর সামরিক আইন জারি করলে। সামরিক আইন জারি হল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ভাগলপুর জেলার সমগ্র এলাকায়, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র এলাকায় এবং সারা বীরভূম জেলায়।

তার পর জেনারেল লয়েড ও জেনারেল বার্ডের নেতৃত্বে চোদ্দো হাজার সৈন্য সারা

বিদ্রোহ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সাঁওতালদের ঘেরাও করতে থাকে। অন্তত ১০ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর সরকার ঘোষণা করে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তিন মাস পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি এলাকায় বিদ্রোহের জের চলতে থাকে।

ধৃত বিদ্রোহীদের হত্যা ও জেল

নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে জামতাড়া এলাকায় ওপরবাঁধার নিকট কয়েকজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কানুকে ধরে ফেলা হয়। সিধু তার পূর্বেই ধরা পড়েন ঘাটিয়ারিতে। তাকে ভগনাডিহি নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। (অন্য তথ্য—ফাঁসি দেওয়া হয়।) কানুর বিচার হয় আদালতে। তার পূর্বে ২০ ডিসেম্বর তার বিবৃতি নেওয়া হয়। বিচারের পর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্য অনেক বিদ্রোহীকে ধরে জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে সিউড়ি শহরের কেন্দুয়ার ডাঙায় সকলের সামনে খোলা ময়দানে ফাঁসি দেওয়া হয়।

কানুর বিবৃতি গ্রহণ করেন অ্যাশলে ইডেন (সরকারি বিশেষ কমিশনার)। বিবৃতিতে কানু বলেন, 'মহাজনরা বড়ো দারোগার নিকট নালিশ করে যে সিধু ও কানু ডাকাতির জন্য লোক জমা করেছে, এবং সেজন্য তাকে ১০০ টাকা দিয়ে আমাদের ধরতে বলে। .....দারোগা তাদের ধরতে এলে তিনি বলেন, আমি ডাকাতি করেছি প্রমাণ করতে পারলে আমাকে জেলে দিন। মহাজন বলে হাজার টাকা খরচ হলেও তোমাকে জেলে পাঠাব। মহাজনরা ও দারোগা খুব রেগে যায় এবং আমাকে বাঁধতে হুকুম দেয়। মহাজনরা আমার ভাই সিধুকে বাঁধতে শুরু করলে আমি তলোয়ার বের করি। তখন আমার ভাইকে তারা ছেড়ে দেয়। আমি মানিক মুদির মাথা কেটে ফেলি এবং সিধু দারোগাকে হত্যা করেন। আর আমার সিপাইরা অন্য পাঁচ জনকে খুন করে; তাদের নাম জানি না। পরে আমরা ভগনাডিহি ফিরে আসি।'

দীর্ঘ আট মাস ধরে ইংরেজ কোম্পানির পুঁজিবাদী সরকার হাজার হাজার উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত সৈন্য দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের উপর গণহত্যা চালাবার এবং তাদের গ্রামগুলি জ্বালাবার ও ধ্বংস করবার পর যখন এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে থেমে গেল, তখনও এই শোষিত ও নির্যাতিত কৃষকদের উপর সরকার প্রতিহিংসা নিতে দ্বিধা করলে না। বন্দি হিসাবে ৫২ খানা গ্রামের ২৫১ জনের বিচার হল। তাদের মধ্যে ছিল সাঁওতাল ১৯১, ন্যাস ৩৪, ডোম ৫, ধাঙ্গড় ৬, কোল ৭, গোয়ালা ১, ভুঁইয়া ৬ ও রাজোয়ার ১।

এই ২৫১ জনের মধ্যে তিন জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ২৪৮ জনকে 'লুটের' অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ৪৬ জন ছিল ৯/১০ বছরের বালক। তাদের বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি সকলকে সাত থেকে ১৪ বছরের মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।

সংখ্যালঘু জাতি বলে স্বীকৃতি

বিদ্রোহ দমনের পর সাঁওতালদের দাবিদাওয়া ও অভিযোগের প্রতিকার সম্বন্ধে সরকারি তদন্ত হয়। তদন্ত করেন অ্যাশলে ইডেন (পরে বাংলার ছোটোলাট)। তদন্তের ফলে দামনে কোহ ও পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামে একটা পৃথক নন-রেগুলেটেড জেলা করা হয় ও তার শাসনব্যবস্থা থাকে ভাগলপুর কমিশনারের অধীন এক জন ডেপুটি কমিশনারের উপর। সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন (১৮৫৫ সনের ৩৭ নং ও ১৮৫৭ সনের ১০ নং আইন) তৈরি হয়। বিদ্রোহীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তির জন্য ১৮৫৫ সনের ডিসেম্বরে ৩৮ নং আইনও পাশ করা হয়।

কৃষিজীবী সাঁওতাল উপজাতির জমি ও মুক্তির জন্য এই যে বিরাট ও শক্তিশালী গণ অভ্যুত্থান তাতে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল যোগদান করে। তাছাড়া বহু অ-সাঁওতালও বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কোন কোন হিসাবে তাদের মধ্যে অর্ধেক লোককে অর্থাৎ ১৫ থেকে ২৫ হাজার সাঁওতালকে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যা করে। এই গণহত্যা, গ্রামদাহ ও কারাদণ্ডের পরও বিদেশি শোষকশ্রেণির অনেক মুখপাত্র চেয়েছিল তামাম সাঁওতাল জাতিটাকেই আবার শাস্তি দিতে। এমনই রক্তলোলুপ নরপিশাচ এই শোষকের দল। তারাই ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ইংরেজ নায়ক জল্লাদ ডায়ারের পূর্বপুরুষ।

বিদ্রোহ তার দাবি সরাসরি ও পুরোপুরি আদায় করতে পারেনি, এ কথা ঠিক। বীর সাঁওতাল কৃষকরা প্রাণপণে সংগ্রাম করে এবং হাজার হাজার জীবন বিসর্জন দিয়ে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা সাময়িকভাবে দখল করে নিলেও বিদ্রোহ স্থায়ীভাবে বিজয়ী হতে পারেনি। কিন্তু এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েও যায়নি।

সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহীদের সংগ্রাম সরাসরি বিজয়ী না হলেও এই সংগ্রাম বাংলার ও ভারতের কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত করেছে, বিদ্রোহীদের বীরত্বের কাহিনি পরবর্তী কৃষক সংগ্রামে ও তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহকে প্রেরণা জুগিয়েছে, সারা দেশের ইতিহাসে সংগ্রামী জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর শহিদদের নাম আজও আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, আজও তাদের উদ্দেশ্য লাল সালাম জানাই।

বিদ্রোহ বিজয়ী না হলেও ব্যর্থ হয়ে যায়নি। সাঁওতালদের দাবির অনেকটা অংশ গবর্নমেন্টকে মেনে নিতে হয়েছিল। বিদ্রোহের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে তারা জমি ও খাদ্যের অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এখন একটা নির্দিষ্ট বাসভূমির ব্যবস্থা হল।

বিদ্রোহের পর গবর্নমেন্টকে তাদের একটা জাতীয় মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু জাতি বলে স্বীকৃতি দিতে হল। সাঁওতালদের বাসের জন্য রাজমহল ও দামনে কোহ এলাকা সমেত বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তৃত অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগণা নাম দিয়ে একটা নতুন জেলা গঠন করা হল। সেখানে কৃষকরা অনেকে জমিও পেলে।

বিভেদের চেষ্টা ব্যর্থ

এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে গবর্নমেন্ট অ-সাঁওতাল বাঙালি ও অন্যান্য জাতি থেকে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেয়েছিল। সেজন্য তাদের অঞ্চলে অ-সাঁওতাল বাঙালিদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করলে। কিন্তু বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য কোন বাধা তো, থাকলই না, বরং তাদের মিশনারিদের প্রভাবে আনবার জন্য গবর্নমেন্ট সমস্ত সুযোগসুবিধা দিতে লাগল, যাতে অ-সাঁওতাল বাঙালি ও সাঁওতালদের মধ্যে স্থায়ী ও গভীর বিভেদ সৃষ্টি করা যায়।

কিন্তু সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের সময় যে একই শ্রেণিস্বার্থের উপর ঘনিষ্ঠ সংগ্রামী একতা কায়েম হয়েছিল, এস বিভেদ নীতির সাহায্যে সরকার তা নষ্ট করতে পারেনি। প্রথম থেকেই অ-সাঁওতালরাও সাঁওতাল পরগণা জেলায় বসবাস করে আসছে। ১৮৭২ সনের সেন্সাস অনুসারে এই জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৯, ২৩, ৫৩২। তার মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা ছিল ৪, ৫৫, ৫১৩।

বর্তমান কৃষক আন্দোলন সাঁওতাল ও অ-সাঁওতাল সকল কৃষকরাই একই অধিকারের ভিত্তিতে সমানভাবে টানছে। সকলেই আগ্রহের সহিত সভায় ডাকে সাড়া দিচ্ছে। সাঁওতালদের জাতিসত্তা সম্বন্ধেও কৃষক সভা সচেতন আছে।

গবর্নমেন্ট মিশনারি পাঠিয়ে সাঁওতালদের সভ্য করবার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার জন্য কিছু কিছু পৃথক স্কুল তৈরি করেছিল। কিন্তু সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করেনি।

শহিদের প্রতি সালাম

জমি, খাজনা, সুদ, ট্যাক্স, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সাঁওতাল উপজাতির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা না দিয়ে তার পরিবর্তে শোষণ ও পীড়ন চলতে দেওয়ার ফলে এই বিদ্রোহের পরও তাদের মধ্যে কয়েকবার ব্যাপক গণ বিদ্রোহ ঘটে গেছে। বিদেশি সরকার যা করেছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। তাদের জমি যাতে জমিদার মহাজনরা কেড়ে নিতে না পারে, সেজন্য পরে উপজাতি হিসাবে তাদের রক্ষার জন্য সামান্য আইনগত ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আবার যেটুকু আইন হয়েছিল তাকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর না করায় তার বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না।

দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসি শাসনেও সাঁওতাল কৃষকদের অবস্থার উন্নতির বা নতুন কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি। যে সরকারি সাংগঠনিক ব্যবস্থা হয়েছিল তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি কমিশন মারফত, বাস্তব জীবনে তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেখা যায়নি; তাদের জন্য জমির প্রয়োজন মোটানো এবং সমস্ত শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করা কোন বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির শাসন চলতে থাকলে সম্ভব হবে না। দেশের সংবিধানও সেজন্য বড়ো অন্তরায়।

উপজাতি হিসাবে সাঁওতালদের জমি হস্তান্তর সম্বন্ধে যেটুকু আইনগত বাধা আছে, তাকে কার্যকর করার জন্য ইংরেজ শাসকদের মতো কগ্রেস সরকারও কিছুই করেনি। তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার এবং ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতির বিকাশের পথেও কংগ্রেস সরকারের কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নাই। সাঁওতালরা জানে কংগ্রেসের স্বদেশি সরকারও শোষক শ্রেণিদেরই সরকার। তাই বিদ্রোহের আগে তাদের বাপদাদাদের যেজন্য লড়তে হয়েছিল, আজ তাদেরও সেইজন্য লড়তে হবে! শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া তারা কিছুই আদায় করতে পারবে না। তাই লড়বার জন্য তারা কৃষক হিসাবে অন্যান্য কৃষকদের মতো দলে দলে কৃষক সভায় যোগ দিচ্ছে। গোটা দেশে কৃষক সভার নেতৃত্বে যে ব্যাপক ও সংগ্রামী কৃষক জাগরণ দেখা দিচ্ছে সেই জাগরণের পথ কেউই রোধ করতে পারবে না।

বিদ্রোহের পূর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের কৃষক শহিদরা যে সংগ্রামের আগুন জ্বেলে গিয়েছিলেন, সে আগুনের শিখা সারা ভারতে বহু এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫৭-৫৮ সনের ভারতীয় সেনা বিদ্রোহ থেকে শুরু করে তার শিখা দেখা গিয়েছিল বাংলার নীল চাষিদের বিদ্রোহে (১৮৬০-৬১)। পাবনা ও বগুড়ার (এখন বাংলাদেশে) রায়ত অভ্যুত্থানে (১৮৭২) দাক্ষিণাত্যের মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থানে (১৮৭৫-৭৬), বাংলার তেভাগা আন্দোলনেও (১৯৪৬-৪৭) তা জ্বলেছিল। সেই একই আগুন বারবার জ্বলেছিল মালাবারের (কেরালা) মোপলা কৃষকদের বিদ্রোহের মধ্যেও। সে আগুন আজও নিভে যায়নি; আজও তা শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের বুকের মধ্যে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ শিখা বিস্তার করছে।

উৎস : সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫৪

স্বপন বসু

সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কানু

'ছবছরের মধ্যে আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব'—আজ থেকে প্রায় একশো চল্লিশ বছর আগে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভীক কণ্ঠে এ-কথা উচ্চারণ করেছিলেন ৩৫ বছরের এক সাঁওতাল যুবক—কানু।

কানুর জন্ম ১৯২০-র কাছাকাছি কোনও সময়ে, ভাগনাদিহির নারান ঝির বড় ছেলে তিনি। ছোট তিনটি ভাই ছিল তাঁর—সিধু, ভৈরব আর চাঁদ। অল্প বয়সেই পিতৃহীন এই তরুণটি মা-ভাইদের নিয়ে কোনরকমে দিন কাটাতেন। অভাব ছিল তাদের পরিবারের নিত্যসঙ্গী। জ্ঞান হবার পর থেকে তিনি দেখেন, সাঁওতালরা কীভাবে দিনরাত পরিশ্রম করে জঙ্গল হাসিল করছে, পতিত জমি ভরিয়ে তুলছে সোনার ফসলে। কিন্তু সে ফসলের অধিকাংশই গিয়ে উঠছে জমিদার আর মহাজনের গোলায়। অথচ এমন তো হবার কথা ছিল না।

দামিন-কোতে বসতি করার সময় সরকার সাঁওতালদের কত না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—বলেছিল, প্রথম তিন বছর কোনও খাজনাই দিতে হবে না, পরেও খাজনা ধার্য করা হবে নামমাত্র। কিন্তু এই অঞ্চল মানুষের বাসের উপযোগী ও আবাদযোগ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকার কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে খাজনা বাড়িয়ে চলল। ১৮৩৭-৩৮ সালে দামিন-কো থেকে খাজনা সংগ্রহের পরিমাণ যেখানে ছিল ৬,৬৮২, টাকা, ১৮৫৪-৫৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৫৮,০৩৩ টাকায়। অর্থাৎ ১৮ বছরের মধ্যে সাঁওতালদের খাজনা বেশ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেল।

শুধু বাড়তি খাজনা দিয়েই সাঁওতালরা রেহাই পেত না। খাজনা আদায়কারী নায়েব-সুজোয়ালরা সাঁওতালদের কাছ থেকে নানারকম সেস দাবি করত। প্রতি বছর গরিব সাঁওতালদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা সেস হিসাবে আদায় করত এইসব নায়েব-সুজোয়ালরা।

বাড়তি খাজনা সেসের বোঝা নীরবে বহন করেও সাঁওতালরা নিষ্কৃতি পেল না। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দামিন-কো যখন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, তখন আশপাশের বাঙালি জমিদারদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল এই জনপদটির ওপর। অঞ্চলটির সমৃদ্ধি দেখে বর্ধমান ও বীরভূম থেকে কয়েকজন বাঙালি ও বেশ কিছু ভোজপুরী আর ভাটিয়া এসে এই অঞ্চলে বাসা বাঁধল। বাঁধার পর তারা শুরু করল মহাজনি কারবার। অল্প দিনের মধ্যে তাদের জালে আটকে পড়ল অসংখ্য নিরীহ সাঁওতাল পরিবার। দেখতে দেখতে এই অঞ্চলে থানা-আদালত বসল, সঙ্গে এল আমলা আর পুলিশ।

দামিন-কোর এই সব পরিবর্তন কানুর চোখের সামনে ঘটছিল। জমিদার-মহাজন-পুলিশ-আমলা—এই সকলের মিলিত চক্রান্তে একের পর এক সাঁওতাল পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়ার বা দেশত্যাগের ঘটনা তিনি প্রায় প্রতিদিনই দেখতে বা শুনতে পেতেন। ১৮৪৮ সালে মহাজনদের জ্বালায় দামিন-কোর তিনটি গ্রামের সমস্ত সাঁওতালদের দেশত্যাগের ঘটনাও তার অজানা ছিল না। অন্য সব অত্যাচার সাঁওতালদের গা-সহ্য হয়ে উঠলেও, মহাজনের অত্যাচার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল।

সাঁওতালদের সংকটের সময় বিশেষ করে বর্ষাকালে মহাজনরা তাদের কিছু অর্থ বা শস্য ঋণ হিসাবে দিয়ে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসত। শুধু সুদটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট না হয়ে ওজনে ঠকানো, নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে জাল খত তৈরি করা, প্রতিবাদ জানালে মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে সর্বস্বান্ত করা—এসব হয়ে উঠল মহাজনদের নিত্যকর্মপদ্ধতি। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক সিধু মহাজনের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে জানান, এই মহাজনগুলো এক টাকা ধার দিয়ে পাঁচ টাকা আদায় করে এবং যা খুশি দামে আমাদের ফসল কেনে। কেউ যদি তা দিতে না চায়, তার কান মুলে দেয়, মারধোর করে। মহাজনরা সাঁওতালদের ওপর কী রকম অত্যাচার করত তা পরিষ্কার বোঝা যাবে নরসিং মাঝি ও কুদরু মাঝির লেখা একটি আবেদনপত্রে চোখ বোলালে। মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে বিভাগীয় কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৮৫৪-র আগস্ট মাসে তারা লেখেন : দামিনে বসবাসকারী মহাজনরা নিজেদের লাভের জন্য সাঁওতালদের দু-চার টাকা ধার দেয়। এর জন্য তারা চড়া হারে সুদ নেয় এবং বলপ্রয়োগ ও অত্যাচার করে তা আদায় করে। ফসলের মাধ্যমে যখন এই ঋণ পরিশোধ করা হয়, তখন তারা নিজেরাই তা ওজন করে এবং আমাদের মতো জংলীরা হিসাবপত্র ও তাদের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায়, যা খুশি তাই করে। শুধু তাই নয়, ঋণ আদায়ের ছুতোয় মহাজন যখন তখন আমাদের ঘরে ঢোকে এবং মুরগি, ছাগল যা পায়, জোর করে নিয়ে যায়। ৪০/৫০ টাকা ঋণের জাল খত তৈরি করে তারা সাঁওতালদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে, মিথ্যা চুরি-ডাকতির অভিযোগ এনে আমাদের নাস্তানাবুদ করে। এ-ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর, সুপারিন্টেডেন্ট সবার কাছে অভিযোগ করেও কোনও ফল হয়নি। মহাজনের অত্যাচারে অনেক সাঁওতাল তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে, অন্যরাও যাবার জন্য প্রস্তুত। আমরা যখন প্রথম এদেশে আসি, জঙ্গল কেটে আবাদযোগ্য করি, সরকারি কোষে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা করি, তখন সরকার আমাদের ভালো চোখে দেখত। এই সময় আমাদের সুরক্ষার জন্য তারা ১৮২৭ সালের ১নং রেগুলেশন পাশ করে। এখন সরকারি আইনকে গ্রাহ্য না করে মহাজনরা যদি এইভাবে অত্যাচার করে এবং সরকার যদি আমাদের রক্ষার কোনও ব্যবস্থা না করে, তা হলে আমরা কীই বা করতে পারি? যদি এর কোনও প্রতিবিধান না হয়, তা হলে আমরা জঙ্গলভূমি ত্যাগ করে চলে যাব এবং গোটা এলাকাটি আবার জঙ্গলপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমাদের প্রার্থনা, এ-বিষয়ে সুপারের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হোক এবং মহাজনের অত্যাচার বন্ধের ব্যবস্থা করা হোক। সরকার ছাড়া আমাদের রক্ষার কোনও উপায় নেই, তাই আমাদের নিবেদন, এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করা হোক, মহাজনদের দামিন থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক, যাতে তাদের কবল থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

(জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং ১৫৭. ১৪-২-১৮৫৬)

এই আবেদন পাবার পরও কিন্তু সরকার মহাজনদের গ্রাস থেকে সাঁওতালদের রক্ষার তেমন কোনও ব্যবস্থা করেনি। আবেদন-নিবেদনে ফল না হওয়ায় একদল সাঁওতাল অন্য পথ ধরল। মহাজনের অত্যাচারের বদলা নেবার জন্য তারা তাদের বাড়িতে ডাকাতি শুরু করল। ১৮৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে দামিন-কোর ছজন মহাজনের বাড়িতে পর পর ডাকাতি হল। ভাগলপুরের সেশন জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনারকে এ-বিষয়ে রিপোর্ট করার সময় মন্তব্য করলেন, সাঁওতালদের মতো শান্ত এবং নিরীহ মানুষরা এইসব ডাকাতি

করেছে—এটা গভীর চিন্তার বিষয়-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, বাঙালি মহাজনরা তাদের পথের ভিখারিতে পরিণত করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, এই ধরনের মনোভাব যদি সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমান থাকে, তা হলে কিছুদিনের মধ্যে এ অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার কোনও অস্তিত্বই থাকবে না।

মহাজনরা যে বাড়াবাড়ি করছে, সরকারি কর্তৃপক্ষও তা বুঝতে পারে। তাদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকাররের পক্ষ থেকে কিছু কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যবস্থাই রয়ে গেল কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ। ফলে সাঁওতালদের অবস্থা থেকে গেল অপরিবর্তিত।

সাঁওতালদের অবস্থা কীভাবে উন্নত করা যায়, কীভাবে মহাজন ও অন্যান্য অত্যাচারীর কবল থেকে তাদের রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই ভাবনাচিন্তা করছিলেন কানু আর তার ভাই সিধু। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তারা বুঝতে পারলেন, সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, সাঁওতালদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। সশস্ত্র বিদ্রোহের

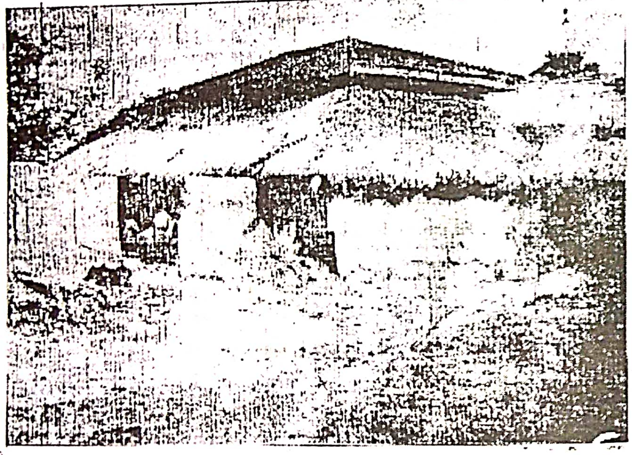

সিধু মুর্মর বাড়ি। ভগ্নাডিহি

মধ্য দিয়েই এই সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তাও তারা বুঝতে পারলেন। এই কর্মকাণ্ডে গোটা সাঁওতাল সমাজকে সামিল করতে না পারলে যে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তাও তারা উপলব্ধি করলেন। তবে একেবারে সরাসরি বিদ্রোহের ডাক না দিয়ে কানু-সিধু একটু কৌশলের সাহায্য নিলেন। তারা প্রচার করলেন যে ঠাকুর স্বয়ং তাদের দেখা দিয়েছেন। কানু জানালেন, একদিন তিনি বাড়িতে বসে জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার নিয়ে সিধুর সঙ্গে কথা বলছেন, এমন সময়ে তাদের সামনে ঠাকুর আবির্ভূত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ঠাকুর, তুমি আমাদের মতো গরিবকে দেখা দিলে কেন?' ঠাকুর জানালেন, সাঁওতালদের ভালো করার জন্যই তার এই আবির্ভাব। তিনি কানু আর

সিধুকে সাঁওতালদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরাসরি সরকারকে জমা দিতে বললেন। বলদের লাঙলের জন্য দুআনা আর মোষের লাঙলের জন্য চার আনা খাজনা ধার্য করে দিলেন তিনি। বললেন, দামিনের জমি সমস্ত সাঁওতালদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করতে হবে, মহাজনদের এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে হবে এবং জমিদারদের বসতবাড়ি ছাড়া অন্য সব সম্পত্তি কেড়ে নিতে হবে। সাঁওতালদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চারের জন্য কানু-সিধু ঘোষণা করলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে তারা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছেন। সাঁওতালদের বিদ্রোহে সামিল হবার আহ্বান জানিয়ে কানু আর সিধু ১২৬২ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকে একটি পরোয়ানা প্রচার করলেন। এতে তারা জানালেন, সাঁওতালদের জন্য ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবেন, তিনি নিজের হাতে সব সাহেবকে বধ করবেন। তার আশীর্বাদে সাহেবদের বন্দুকের গুলি সাঁওতালদের আঘাত করবে না। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হবে মৃত্যু। মহাজনেরা ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধী। সবাই অযৌক্তিক আচরণ করছে, আমলারা সব খারাপ নিয়মকানুন করেছে—এর জন্য দায়ী সাহেবরা। ঠাকুর বলছেন, এ দেশে সাহেবদের নয়। তিনি নিজে সাঁওতালদের হাতে যুদ্ধের অস্ত্র তুলে দেবেন।

(জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং ২২১, ২৩-৮-১৯৫৫)

ঈশ্বরের আবির্ভাবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কানু-সিধু ঠাকুরের এক মূর্তি নির্মাণ করে বাড়িতে বসালেন। মহা সমারোহে ঠাকুরের পূজার আয়োজন করা হল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা দলে দলে ঠাকুর দর্শনে আসতে লাগল।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। নিপীড়িত, ক্ষুব্ধ সাঁওতালদের সরাসরি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আহ্বান না জানিয়ে কানু-সিধু গোটা ব্যাপারটা কেন ঠাকুরের আদেশ বলে প্রচার করলেন? আমাদের মতে এটি তাদের একটি কূটনৈতিক চাল। অন্যান্য আরও অনেক আদিম জনগোষ্ঠীর মতো সাঁওতালরাও ধর্মভীরু একটি সম্প্রদায়। দৈববাণী ও অন্যান্য অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। মানুষের আহ্বানে সাড়া দিতে ইতস্তত করলেও, দেবতার আদেশকে তারা মনে করত অলঙ্ঘনীয়। কানু-সিধু সাঁওতাল চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতা জানতেন বলেই ঘোষণা করেন, বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত তাদের নয়, এ সিদ্ধান্ত স্বয়ং ঠাকুরের। ঠাকুর স্বয়ং সাঁওতালদের জন্য যুদ্ধ করবেন। যে-সব সাঁওতাল এই যুদ্ধে অংশ নেবে তারা হবে ঠাকুরের কৃপাধন্য, শত্রুর গুলি তাদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। ব্যাপারটা আরও বিশ্বাস্য করে তোলার জন্য কানু-সিধু শুধু ঠাকুরের আবির্ভাবের কথাই প্রচার করলেন না। তারা জানালেন যে বিদ্রোহ করার জন্য ঠাকুর তাদের লিখিত নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে গেছেন। কানু-সিধুর কাছে যখন সাঁওতালরা শুনল, স্বয়ং ঠাকুর তাদের যুদ্ধ করতে বলছেন, তখন সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত হল বিদ্রোহের জন্য। ঠাকুরের আদেশ ব্যাপারটা যে কানু-সিধুর রণকৌশলের অঙ্গ তা সেকালের কোনও কোনও আমলার কাছে ধরা পড়েছিল। বন্দি হবার পর সিধুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, যে কেন তিনি বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন, তখন প্রথমে তিনি বলেন, সবকিছুই তিনি করেছেন ঠাকুরের আদেশে। এ-কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই তিনি জানান, মহাজনদের অত্যাচার সম্পর্কে পনেটের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও প্রতিকার না পাওয়ায় তারা এই পথ নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই সময় তাকে প্রশ্ন

করা হয়, আপনি প্রথমে বলেছেন, ঠাকুরের আদেশে যুদ্ধ করেছেন, এখন আবার বলছেন, পনেটের কাছ থেকে প্রতিকার না পাওয়াতেই তা করেছেন—ব্যাপারটা কী?

(জুসিডিয়াল প্রসিডিংস নং- ১৬, ৮-১১-১৮৫৫)

আসলে শক্তিশালী শোষক গোষ্ঠীর অত্যাচারের মোকাবিলা করার মতো মানসিক বল সাঁওতালদের ছিল না। কিন্তু স্বয়ং ঠাকুর তাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসছেন—এ কথা শোনার পরই তারা বিদ্রোহে অংশ নেবার মতো মানসিক বল সঞ্চয় করে।

আর একটা বিষয়ও এখানে বলে নেওয়া ভাল। দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যুদ্ধ করার কথা শুধু কানু-সিধুই বলেননি, এই ধরনের গণ-অসন্তোষের নায়করা প্রায় সবাই সহযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য দৈব আদেশ পাওয়ার কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত আমাদের মনে পড়বে তিতুমীরের কথা। কোম্পানির ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আগে তিনি তার সহযোদ্ধাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, সাহেবদের গুলি তাদের স্পর্শ করবে না, সব গোলা তিনি খেয়ে নেবেন। বীরসা মুণ্ডাও তার অনুগামীদের বলেন, সৈন্যদের গোলা তাদের গায়ে আঘাত করবে না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তা পরিণত হবে জলে।

যাই হোক, কানু-সিধুর পরোয়ানা পাবার পর সাঁওতালদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কর্মপদ্ধতি ঠিক করার জন্য বেশকিছু সাঁওতাল ভাগনাডিহিতে সমবেত হল। সেখানে তারা যখন বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন পথে এগোনো উচিত তা নিয়ে আলোচনা করছে, এমন সময় থানা থেকে এক সিপাই হালচাল বোঝার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত। সাঁওতালরা তার হাতে একটি পরোয়ানা ধরিয়ে দিয়ে সেটি দারোগাবাবুকে দিতে বলে। সিপাইটি রেগে স্থানত্যাগ করে। ওই দিনই ঠিক হয়, পরদিন সকালে সাঁওতালরা সবাই শিকারে বোরোবে।

পরদিন সকালে কানু-সিধু ও আরো ৪০-৫০ জন সাঁওতাল অস্ত্রসজ্জিত হয়ে শিকারে যাবার পথে দারোগা মহেশ দত্ত, দুজন সিপাই ও কয়েকজন মহাজনের মুখে পড়ে। দারোগার সঙ্গে দুটি দড়ি বোঝাই গাড়িও ছিল। দারোগা তাদের দেখে থামতে বলে এবং কর্কশ কণ্ঠে জানতে চায়, তারা কোথায় যাচ্ছে। জবাবে তারা জানায়, শিকারে।

দারোগা বলে, 'মোটেই নয়, আসলে তোরা যাচ্ছিস ডাকাতি করতে। মহাজনরা আমার কাছে তোদের নামে অভিযোগ করেছে।'

সাঁওতালরা সমস্বরে এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং দারোগাকে তার কথার প্রমাণ দিতে বলে। তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, তারা দাবি করে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য মহাজনদের পাঁচ টাকা হারে জরিমানা করতে হবে। দারোগার সঙ্গে দড়ি বোঝাই গাড়ি দেখে তারা বুঝতে পারে, দারোগা মহাজনদের পক্ষ নিয়ে তাদের ধরতে এসেছে। এই কথা দারোগাকে বললে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় প্রচণ্ড বাদানুবাদ। ঘটনাস্থলেই কানু মানিকরাম মহাজনকে হত্যা করেন। দারোগা মহেশলাল সিধুর হাতে প্রাণ দেয়। কয়েকজন বরকন্দাজও নিহত হয়।

ঘটনাপ্রবাহ এখানেই থামল না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সাঁওতালরা। মহাজন, নায়েব-সুজোয়াল, রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর, নীলকর প্রভৃতি অত্যাচারীরা হল তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। কানুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা বারহাইত আক্রমণ করে। এখানে

জনাপঞ্চাশ মহাজন থাকত। তাদের বেশ কয়েকজন এই আক্রমণে প্রাণ হারায়। সিধুর নেতৃত্বে সাঁওতালরা রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের আবাসভূমি শ্রীকুণ্ড আক্রমণ করে, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়াররা কোন মতে পালিয়ে বাঁচে। রেলওয়ে কন্ট্রাক্টরদের প্রধান ঘাঁটি পলসা লুঠ করে বাংলোগুলিতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পলসা আক্রমণের নেতৃত্ব দেন কানু। ঔরঙ্গবাদ এবং রাজমহলের নীলকুঠিগুলিও আক্রান্ত হল। পাকুড়ের রাজবাড়িতেও হানা দিল বিদ্রোহীরা, ঘোড়ার পিঠে চড়ে কানু-সিধু এখানে সাঁওতালবাহিনী পরিচালনা করেন। লুঠপাট শেষে রাজবাড়িতে বসে কানু বেশ মৌজ করে বিলাতি মদ খান। রাজমহল ও ভাগলপুরের মধ্যে ডাক চলাচলও বিদ্রোহীরা বন্ধ করে দেয়। বিদ্রোহীদের এইসব কার্যকলাপ চলাকালীনই কানু ঘোষণা করলেন ঃ পাপের রাজত্বের অবসান হয়ে পূণ্য-রাজত্বের সুত্রপাত হয়েছে। ঈশ্বর আমাকে রাজ্যদান করেছেন, এখন থেকে আমিই পাপ-পুণ্যের বিচার করব। ন্যায়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি আরও ঘোষণা করলেন; সাঁওতাল রাজ্য থেকে ভবিষ্যতে খাজনা সংগ্রহ করবে কেবল সিধু আর কানু। বসতবাড়ি ছাড়া জমিদার অন্য সব জমি এবং অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি আরও জানালেন যে দেশের রাজা এখন তারাই এবং সাহেবদের এদেশ থেকে তাড়ানোই তাদের লক্ষ্য।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহের খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য সরকার সেনা তলব করতে বাধ্য হয়েছে। ১৮৫৫ সালের ১২ জুলাই থেকে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনের কাজে নেমে পড়ে। ১৫ জুলাই মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট বেশ কিছু হাতি ও দুশোর মতো সিপাই নিয়ে মহেশপুরে অভিযান চালালেন। একদিকে তির-ধনুক-টাঙ্গি, আর একদিকে কামান-বন্দুক। তবু সাঁওতালরা চট করে হার মানল না। লাল পোষাক পরে কানু রণাঙ্গনে আবিভূর্ত হলেন, সাঁওতালদের উজ্জীবিত করার জন্য খোলা তলোয়ার হাতে তিনি শুরু করলেন রণনৃত্য। প্রায় ঘণ্টা আড়াই সামনে সামনে যুদ্ধ চলল। প্রায় একশো জনের মতো সাঁওতাল প্রাণ হারাল, আহত হয় আরও বহুজন। তবুও তারা যুদ্ধ করে চলল। এইসময় হঠাৎ একটি গুলি এসে সিধুর ডান হাতের কব্জিতে লাগল। ভৈরবও তলপেটে আঘাত পেলেন। নেতাদের এই অবস্থা দেখে সাঁওতালরা রণে ভঙ্গ দিল। মহেশপুর থেকে ভাগনাডিহি প্রায় চল্লিশ মাইল পথ। আহত সিধুকে একটি চারপাই করে সঙ্গীরা ভাগনা-ডিহিতে নিয়ে গেল। কানু-সিধু-ভৈরব-চাঁদ এই চার ভাই-ই ভাগনাদিহিতে আশ্রয় নিয়েছেন শুনে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট টগুড বারহাইত অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি আসছেন খবর পেয়ে বিরাট সংখ্যক সাঁওতাল তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হল। লড়াইয়ে সাঁওতালদের উৎসাহিত করার জন্য নেতারা ঘোষণা করলেন, মহেশপুরের যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে, ঠাকুর তাদের বাঁচিয়ে দেবেন, আজকের আঘাতও যাবে সেরে। সিধু আহত। কাজেই যুদ্ধ পরিচালনায় সমস্ত দায়িত্ব এবার এসে পড়ল কানুর ওপর। কিন্তু তিনিও পারলেন না টগুডের গতিরোধ করতে। কানুর পরাজয়ের সংবাদ ভাগনাদিহিতে এসে পৌছলে সিধু তার অনুগামীদের নিয়ে স্থানত্যাগ করলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে সেনাবাহিনী ভাগনাদিহি গ্রামটি ধ্বংস করে দেয়। কানু-সিধুর বাড়িটিও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এরপর সাঁওতাল গ্রামগুলিতে সেনাবাহিনীর তাণ্ডব শুরু হল। সেনাবাহিনীর অত্যাচারে সাঁওতাল গ্রামগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল—কোথাও আগুন লাগিয়ে, কোথাও-বা হাতির সাহায্যে তারা এই ধ্বংসলীলা চালাল। সাঁওতালদের গবাদি পশু ও খাদ্যশস্য আটক করা

হল। আগুন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করে দেওয়ার ফলে সাঁওতালদের আত্মগোপনের স্থানের অভাব দেখা দিল, সর্বত্র সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করতে লাগল। এসবের ফলে বিদ্রোহীরা ক্রমেই মনোবল হারাতে লাগল। নুন ও মাটির পাত্রের অভাব তাদের মধ্যে প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করল, কাঁচা খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ার ফলে অনেকেই কলেরায় আক্রান্ত হল। প্রচুর সংখ্যক সাঁওতাল সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ল। সাঁওতালদের এইরকম অসহায় অবস্থায় ১৭ আগস্ট, ১৮৫৫ সালে সরকারের তরফ থেকে একটি পরোয়ানা প্রচার করে তাদের আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হল। বিদ্রোহীরা ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। এইকালেই কয়েকজন সাঁওতালের বিশ্বাসঘাতকতায় সিধু সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়লেন। এ খবর শোনামাত্র কানু ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং বিশ্বাসঘাতককে যে করে হোক ধরে আনার হুকুম দেন। তার আদেশ অবিলম্বে পালিত হয়। বিশ্বাসঘাতক মেঝিয়া (মুনিয়া?) মাঝিকে কানুর কাছে ধরে নিয়ে এলে তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তিল তিল করে বিদ্রোহীরা বিশ্বাসঘাতককে তার প্রাপ্য শাস্তি দেয়।

এই সময় বিদ্রোহী নেতা কানু কিন্তু মোটেই স্বস্তিতে ছিলেন না। সৈন্যবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কায় তাকে প্রায় যাযাবরের মতো এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছিল ইতস্তত লড়াই। একসময়ে তিনি শঙ্কর পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ইতিমধ্যে উপদ্রুত অঞ্চলে মার্শাল ল জারি হয়েছে, অগাধ ক্ষমতার অধিকারী সেনাবাহিনী সারা অঞ্চল ছেয়ে ফেলেছে। শঙ্কর পাহাড়ও আর নিরাপদ নয়, বিবেচনা করে সঙ্গীদের নিয়ে পরেশনাথের পথে পা বাড়ালেন কানু। জঙ্গলের মধ্যে চাঁদ ও ভৈরব—এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা, পথে আরও জনা দশ-বারো সাঁওতাল তার সঙ্গ নেয়। তারা তাঁকে দামোদর পার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে। সঙ্গীদের সঙ্গে হাজারিবাগ অভিমুখে পালাবার সময় ১৮৫৫ সালের ৩০ নভেম্বর জারোয়ার সিং নামক এক ব্যক্তির তৎপরতায় তারা ধরা পড়েন। তাদের প্রথমে ওপরবাঁধে, তারপর রানিগঞ্জে এবং সেখান থেকে সিউড়িতে পাঠানো হয়। ১ ডিসেম্বর তারযোগে চারিদিকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়—সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক কানু ধরা পড়েছেন। খবর পেয়ে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর হ্যালিডে পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ওপরবাঁধে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার বার্ড কানুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বার্ডের কাছে তিনি একটি বিবৃতি দেন। কেন তিনি বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন তা জানতে চাইলে কানু বলেন, জমিদার আর মহাজনের শোষণ আর অত্যাচারই তাঁদের এই পথ নিতে বাধ্য করেছে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কানু বলেন, মহাজন এক পয়সা দিয়ে আমাদের কাছ থেকে কুড়ি পয়সা আদায় করে। জমিদার বিঘা প্রতি খাজনা চার-পাঁচ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। দারোগা ছাড়া সাঁওতালরা কার কাছে অভিযোগ জানাবে—কিন্তু দারোগা সে তো জমিদার-মহাজনের হাতের পুতুল।

ওপরবাঁধ থেকে কানুকে পাঠানো হল রানিগঞ্জে। রানিগঞ্জে আসার পর কানু কেমন ছিলেন, তার চমৎকার বিবরণ মেলে সমকালীন একটি প্রতিকায়। বিবরণটি থেকে উন্নতশির অনমনীয় এক বিদ্রোহীর ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে :

"Kanoo, one of the rebel Sonthal Chiefs has been brought into Raneeguenge, having been caught and given up by some natives; his arms

are pinioned and bound with strong ropes, he is said to be a better looking fellow than most of the Sonthals are and has a bold and very independent manner; when he was informed that his brother had been hanged and there was every probability of his sharing the same fate he appeared quite indifferent and said that "he did not care about it."

(The Bengal Harkaru, 5-12-1855)

কয়েকদিন রানিগঞ্জে রেখে কানুকে সিউড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট ৬ ডিসেম্বর তাকে তুলে দেন মেজর জেনারেল লয়েডের হাতে। সামরিক আইনের শর্ত অনুযায়ী বিদ্রোহী এই নেতাকে মেজর জেনারেল লয়েড ইডেনের কাছে সমর্পণ করেন। ইডেনের কাছে কানু আবার একটি বিবৃতি দেন। আবারও তিনি জমিদার আর মহাজনের অত্যাচারের কথা বলেন। ইডেনকে তিনি জানান, এইসব অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান বারবার আবেদন করেও তারা পাননি।

(জুডিসিয়াল প্রসিডিংস নং ১৩২, ২০-১২-২৮৫৫)

কানুর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ, লুণ্ঠন-অত্যাচার ও মানিকরাম মহাজনকে হত্যার অভিযোগ আনা হয়। ১৮৫৬ সালের ১৪, ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি স্পেশাল কমিশনার এলিয়টের এজলাসে তার বিচার হয়।

বিচারের যা প্রত্যাশিত ফল তাই ফলল। কানুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। বাংলার লেফটেন্ট গভর্নর হ্যালিডের আদেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা। জন্য কড়া পাহারায় কানুকে ভাগনাডিহিতে নিয়ে যাওয়া হল। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সেখানে প্রচুর সৈন্য মোতায়ন করা হয়। কানু-সিধুর যে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা, সেখানেই ফাঁসির মঞ্চপ্রস্তুত করা হল। কড়া পাহারায় কানুকে ভাগনাডিহি নিয়ে গিয়ে ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা পৌনে দুটো নাগাদ ফাঁসির মঞ্চে তোলা হয়। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তার দৃঢ়তা ও মানসিক প্রশান্তি অক্ষুন্ন ছিল। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক বিদেশি সাংবা দিক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কানুর অবিচল মূর্তি দেখে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন : ফাঁসির পূর্বমুহূর্তেও তার মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের সামান্যতম চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ল না। (*বেঙ্গল হরকরা, ১-৩-১৮৫৬*)। পঁয়তাল্লিশ মিনিট তার দেহটি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে রা খার পর, সেটিকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সুসভ্য ইংরেজ সরকার কানুর মৃতদে হটি তার আত্মীয়দের হাতে তুলে দেবার সৌজন্য পর্যন্ত বোধ করেনি!

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছ-বছরের মধ্যে ফিরে আসার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি হত, তাহলে তিনি দেখতে পেতেন, শোষণ থেকে সাঁওতালদের মুক্ত করার যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন, যে জন্য তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই শোষনের কবল থেকে তার মৃত্যুর পরও সাঁওতালরা মুক্তি পায়নি। উনিশ শতকের একেবারে শেষ প্রান্তেও মহাজনী শোষণের জাঁতকলে সাঁওতালরা কীভাবে পিষ্ট হচ্ছিল তা জানার জন্য আমরা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কিছুটা বিবরণ উদ্ধার করছি। প্রত্যক্ষদর্শীটির নাম জেমস এম ম্যাকফিল। উনিশ শতকের নব্বইয়ের বছরগুলিতে মাস তিনেক তিনি সাঁওতালদের মধ্যে কাটান। এইসময় তিনি নিয়মিত ডাইরি লিখতেন। সাঁওতাল সমাজে মহজনী শোষনের যে বীভৎস রূপ তার চোখে পড়েছিল তা তিনি তার ডাইরিতে লিখে যান। সে রূপ এইরকম :

"Friday, 25 November, 1892 visited 4 villages and held meetings in two of them. In the first my blood boil to find Brahmin money lenders reaping the poor people's rice—whole fields of it, payment of debt. In the hard and hungry time, before harvest, the money lenders make advances to be repaid by their getting so much of the crop. The people in this village told me they had got a loan for three months at the rateof 50% interest, or 200 per cent per annum, but I have known cases where 300 per cent was regularly charged. The money lender is the curse of the country. The simple minded ignorant Santhals fall an easy prey to his clutches and however extortionate the rate of interest may be, the pound of flesh is exacted with merciless severity, with the aid, if need be, of a British Court of Justic ! In a great many cases, the principal is but a trifle compared with the accumulated interest, the former may be hundreds, the latter thousands," (Three months in camp—being the Daily journal of a Medical Missionary on Tour among the Santhals, James M. Macphail, 1893, p. 28)

কানু কি মৃত্যুমুহূর্তে ভবিষ্যতের এই ছবি দেখতে পেয়েছিলেন? বুঝতে পেরেছিলেন, মহাজনের কবল মুক্ত হবার জন্য আর একটি বিদ্রোহের প্রয়োজনীয়তা? আর পেরেছিলেন বলেই কি তিনি ঘোষণা করেছিলেন—আবার আমি আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব।

সেই আগুন—যে আগুনে পুড়ে মরবে অত্যাচারীর দল।

(পশ্চিমবঙ্গ—সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা ১৪০২)

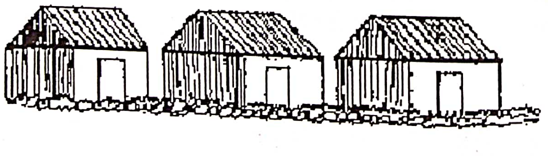

THE SANTHAL REBELLION

An interesting account of the Santhal Tribe, and of the immigrants of that race to the Damun-i-koh and Rajmahal hills, exists in the VII. No. of the Asiatic Society's Journal for 1851, from the pen of that invaluable officer, Capt. Walter S. Sherwill lately employed in the Govt. Revenue Survey of the Behar province. From that account we are about to furnish a brief description of the Santhal, of his person. character and peculiaritie; but to it we would refer such a wish to find a more extended notic of the subject :

"The hills are inhabited by two distinct races the mountainers, or a race living on the Summits of the hills and who are with rare exceptions never found residing in the valleys, and the Santhals who reside in the valleys. Both these races have distinct languages neither of which are understood by the Hindustani man, nor are the two languages understood by the two races. The Santhals are interlopers. the hillmen are the original inhabitants."

The History of the hillmen. from A.D. 1764 is then detailed, including an accounts of their constant depredations on the people of the plains, their customary levy of blackmail, their successful resistance to the troops of the old Mahamedan Government and afterwords of the British, who were unable to assail the hills, and their eventual submission to kind and conciliatory measures under the submission to kind conduct first of Captains Brooke and Browne; and then of Mr. Cleveland a Bengal civilian, who lived for years among them; and whose memory, when he died at Bhaugulpore in 1784, was cherished by a grateful Government, and perpetuated by the monument, in which the Governor General, Warren Hastings recorded their sense of his services. His name is still remembered with of affection 235 "by the hillmen." "They despise the Santhal. of these men the British Government in 1792 formed in militia corps, the Bhaugulpore Hill Rangers :

In 1832 a boundary, defined by masonry pillars, was marked off under the authority of Government to distinguish the lands ocupaied by the hillmen from those belonging to the Zeminders and ryots of the lowlands. at the foot of the hills. But within the pillars and outside of the hills. properly so called and actually inhabited by the mountainers, was an extensive tract of level country and valley, called the Damun Koh, or skirt of the hills, which the hillmen refused to

cultivate or occupy. The Santhals who it is probable were one of the numerous braches of the ancient Gonds of the vast Gondwana, tract of Central India were then scattered over a large extent of country including Cuttack, Singbhoom, Dhulbhoom, Midnapore, Bancoorah, Maubhoom, Barabhoom, Pachete, Chota Nagpore, Palamow, Ramgurh, Beerbhoom, and parts of Bhaugulpore. It was the wise policy of the Government of the day (Lord Wm. Bentinck, G.G) to encourage these simple agriculturists to clear away gradually the vast Jungles of the Damun to cultivate its rich fertile soil, and settle themselves and their families upon the lands, Many immigrant Santhals from different quarters followed the first settlers, and imitated their example :—

"The Santhal or lowlander. is a short. well made and active man, quiet, inoffesive and cheerful; he has the thick lips, high cheekbones and spread nose of the Bheel, Kole and other hill tribes of Southern. and Central India; he is beardless or nearly so; he is an intelligent; obliging, but timid creature; very cowardly towards mankind, but brave when confronted with wild animals; the Santhal is an industrious cultivator of the soil, and as he is unfellered with caste, he enjoys existence in a far greater degree than does his nighbour, the priest ridden and caste crushed Hindoo. They swear by the tiger skin, but swearing them at all is unpardonable; for truth to by a Santhal held sacred, offering in this respect .. bright example to their lying neighbours the Bengalees. When the substantial good things of life as meat and paultry, are scarce, he does not refuse to eat snakes, ants, frogs, and field rats; as well as all animals whether slain, or that have died a natrual death. or have been torn by wild animals. He is a larger and taller man than the hiliman. In every village there is a small thatched roof, supported upon one or more wooden posts : the roof gives cover to a small earthen platform raised a foot above the ground : this spot is termed the "Mangi" at which is buried the memory of some former "Mangi" or village governor who for his good conduct, abilities, or their good quality. has been with the unanimous consent of the villagers, cannonized; and the spot named after him. At these spots the headmen of the village meet, talk over the affairs of the village, threaten the unruly, punish the guilty, collect the rents, and make small votive offerings to the defenct Mangi. The religion of the Santhals consists in prayers sacrifies. and dances the whole of which are generally performed by the votaries whilst in a state of intoxica-

tion. The only prayer I have heard of amongst the people is a supplication to an invisible and powerful sipirit for protection from famine and sickness; from disease amongst their cattle, for defence against wild animals especially the tiger and that their children may be defended from all dangers; amongst which are enumerated the attacks of wild beasts, snake bites, scorpion sting. and all kinds of accidents.

"This simple prayer" adds capt. Sherwill, "points out in forcible manner the condition of the Salthal" and his wants, and he goes on to shew how reasobable are their sentiments and wishes in the above particulars; their crops being their only only stay and dependence; their cattle ncessary for their husbandry, their persons. and like-wise their cultivation much exposed to the various denizens of the forest; and their children being their pride, as well as useful in the field and as housekeepers at home. Their domiciles are usually well stocked with poultry, pigeons, pigs, goats, and the produce of the dairy generally. They drink a spirit distilled from rice which they term "Pachui" and likewise that obtained from the Mahua tree. Like most nations, but unlike the Hindoos, they believe blood must be shed for the propitialion of sins; a sacrifice is followed by a feast.

"Invariably more or less a scene of debauchery, terminating in a wild and most extraordinary dance. The only rite which the Santhal appears to have borrowd from the Hindoos is that of the Churruk or swing pooja. The religion of the Hillmen is simple; they invoke an invisible spirit, Bedo Gosain, but through the medium of various gods, as wooden images, stones, trees, boues, and shulls, The Santhals are governed by pergunnaits and by manghees chosen by themselves; the pergunnait has charge of perhaps 12 village from which he "collects" the Government revenue, and makes it over to the Government officers; the Manghi has immediate charge of his own village."

If circumstances compel a Santhal to leave his settlement he finds little trouble in taking to another. clearing a patch of grounds for his crops, and erecting his log hut.

"As he never manures his land and generally occupies an indifferent soil; a constant charge in his abode is necessary."

"The Santhals are very expert with the bow and arrow; I have seen the bear fall an easy prey to their well planted arrows; also a hare knocked over at full speed; birds on the wing I have seen killed, but

with blunt or knobbed arrows."

In the Damun-i-Koh; there are not a few autique remains of the Jain and other Hindoo sects, consisting of ruins of temples. carved stones, sculptures and representations of Shiva. A harvest rejoicing further on in described attended with the sacrifice of a goat to the invisible deity.

"Two men with dishevelled hair and heads hanging down sat under a small shed a few hundred yards from the village; a drummer beat furiously upon kettledrum, who gave an extra thump on his instrument as occasional offerings of grain in small calf bowls were presented by various Santhals from the village to a small stone erected in front of the shed. "Presently" the two men under the shed, now shaking as if possessed with a violent ague commenced shrieking in a horrid manner; several Santhals rushed forward, and asked questions, answered by words, but oftener by sereams; at last both the men springing up from the ground with most demoniacal yells and fearful bodily contortions. led out a small black kid, whose head at one stroke of a sword one of the mad or possessed men severed from its. body; before the body could fall to the ground, the second screamer, who held the string tied round the kids neck, rushed forward and cought it in his arms; he grasped the neck with the right hand to cheek the flow of blood from the arteries; then walking to the small leaf dishes containing the offerings, withdrew his hand; and from the spouting arteries filled the cups, the body and limbs of the kid writhing and kicking convulsiovely. A question was them put by the Manghei of the village to the sacrificer, as to whether the deity was pleased and ready for the dance; the answer was in the affermative; one of the possessed men raised a green bamboo high in the air over his head; and the word being given by the Manghi, to go and call the villagers to drink and dance in honour of their deity, the man tore away at a furious pace his hands over his head screaming in a most horrid manner. The dance took place at the place of sacrifice. I ascertained that the shaking fits betokened excessive thought and contemplation; that men fast for two, three, even ten days to bring themselves into a state of half wildness during which they are supposd to answer questions through the power of the deity possessing them which in this case appearrs to have been the spirit of Bora Manghi, a deceased and canonized. Manghi and formerly a chief amongst them."

"Burhait. the capital town to of the hills is a substantial Santhal village with a large population, and about fifty families of Bengali traders (1851) there is a good bazar, and two markets are held during the week."

The Santhals appear to have a great respect and preference for their wooden solid wheeled cart, in the construction of which, and their mode of loading it. They are described as shewing an "utter contempt of all rules of mechanics", the wheels are solid; and placed paralled to each other at one extremity of a couple of bamboo poles which are pegged to the axle, and ameeting in a point at their other extremity, rest upon the yoke which crosses the buffalo's neck, and in this way "15 feet of unsupported length receive the enormous burden usually imposed upon the bamboos." They do not seem inclined, however, to exchange their reverated vehicles for others of a more scientific description.

The Damum 1 koh, whose inhabitants we have described comprises 1366-01 square miles of which the space not occupied by the hills is 500 square miles of the latter 246 square miles were in the survey of 1850 still covered with Jungle the rest or 254 square miles being cleared.

"A Santhal, although he does clear away. the forest in a most masterly style has the good laste to spare all the useful and ornamental trees when of decent size; this always imparts a parklike appearance to the Santhal clearances."

The tract was not included in the decennial settlement with the Zeminders of the country. The Santhals were first admitted to the lands in 1830; in 1838. when the Superintendent of the tract was appointed by Government their number is stated to have been about 3000 souls only, located in (40) forty villages; in 1851 they numbered 82,795 inhabiting 1473 villages. The policy of the Government, wise and beneficial as it was benevolent, allowed a Santhal to lease a new patch for three years rent free, after which the assessment for the next three years was hardly more than nominal an entire village paying from 3 Rs. to 18 Rs per annum as revenue; while at the end of that further period a five year settlement was made at such rate as the Santhals themselves agreed to conclude it being in no case higher than 8 As. and usually not more than 2 As. per Bigha. The conequence has been that from 1837 to the last year there has been year by year

: a steady and large increase of revenue from Rs. 6682, in 1837-38 to Rs. 58,033. But of late years greedy Zemindars living near the borders of the Damun, have often cast a wishful eye towards these pleasant lands. Bengalee Muhajuns also, the most rapacious and unscrupulous of traders have one by one gradually. settled down in the towns and villages for purposes of trade. From the time that these merchants from the outside have taken up their abode in the hills, the condition has undergone a gradual but serious change. There are causes at work to which it will be necessary to revert, not only impeding his future progress, but undermining his material happiness. Durga Momin was once a contented if not a happy man; the four or five loghouses which stood in his humble enclosure, overshadowed by "the pungent Sahajna the favourite tree of the Santhals" contained a thriving family–and industry and honesty had met their usual reward. While his wife and his daughters took care of his home by turns tending his dovecot, his poultry and his pigeons, expressing, his mustard seed oil, or husking his rice and his junera, he marched forth with a light heart with the stronger members of his household to hunt the deer in the brake, or till his distant plot of ground. As evening come he shouldered his plough while his sons herded the buffaloes and winded home to meet his friends in quiet intercourse at the village. Manghi or it may be enjoy a jovial carouse. In his father's days and in the days of his youth he had never seen a Mahajun;' probably had never known such a thing as a debt. But in an evil hour came one and then another commercial adventurer from the neighbouring districts of Bengal. until perhaps in the course of a few short years he found some fifty Mahajuns and baniahs located in his own and the neighbouring villages. In command of money. they presently monopolized the trade of several descriptions of goods and encouraged the rude and ignorant cultivators to accept their proffered loans. One day Doorga Momen was in a despending mood ; the harvest was near, promising a plentiful income but he wanted ready money for some urgent purposes; or it was a season of scarcity, and his field was his sole dependence; or some domestic calamity had be fallen him and for a time clouded or seemed to cloud his prospects. or there was some want of foreth ought from Buldeo Singh trader, he is constrained to receive 4 Rupees; he feels that he well soon be able to

repay it. with 4 As. in the Rupee. or 25 per cent. interest which he is willing to do; and his intentions are honest in that respect as Buldeo knows full well; but when the day of payment arrives Buldeo demands and receives 8 rupees and than offers no receipt. Haladhur Chowdhri also advanced him 6 rupees, but on consideration only of a bond for thirteen and this in fact is the genera mode of repayment which the mahajun has adopted, using short weight and taking many times more grain than amount to the value of the debt, and thus forestalling the Santhal labourers harvest prospects. Where the Santhal had not the requird sum to pay, an equivalent for the deficiency is taken in his grain, fruit, cattle, and other stores. Jutto Manghi has collected from the forest at the foot of the hill a basket of the 'peeal' fruit, he has dried and prepared them.

"They are considered by the rich natives as a great delicay and sell in Behar and Bhaugulpore for 8 annas per seer; but the buniahs give the Santhal weight for weight in rice for thus expensive luxury. A seer of peeal is worth 8 As; a seer of rice is worth one piece ; Jultoo Rai recieves for his basket of fruit one thirty second portion of its true value."

Manick Chowdhri has a marriage or a furneral to celebrate; but is anxious not to spend his own money for the expenses; in place of which therefore he levies from the nearest village a "Salaamee"or so called voluntary offering of 100 rupees. One wealthy individual has occasion for the use of a few carts to convey some stores to a distant mart; and desieres some coolies or porters to carry some personal baggage or level some inequalities or smooth some difficulties of the road. But to hire the carts and pay for their use never enters into his thoughts; nor does he care to remember that the Santhal is especially averse to service. Wherefore he causes a conscreption of carts and coolies from the Manghi and headmen. Another oppressor wishes to purchase of a Santhal villager a quantity of rice; but because the latter is unwilling to part with it at the sum his customer would fix upon it. His cars are pulled and the coveted good forcibly seized for no price in return whatever.

But these and sveral other similar species of tyranny are not confined to the muhajun alone. Gangadhur is an influential Zeminder. The border of his tuppeh touches the baundary pillars; within the

pillars Manick Santhal has a lovely spot of corn land, which he has nourished with frugal care; he has paid his rent for it for five years; Gangadhur can by no means claim it. for even his own ancestor has "signed that plot away." As however Manick has paid six annas per mensem for the ground, he or his gomasta thinks no harm of levying from him the lenient sum of 6 Rupees in consideration of the fact that he will henceforth be relieved of his further exactions for that year. There are base corrupt police ; the higher grades as well as the lower, with a few bright and honorable exceptions, preying upon the people ; if a Santhal die in a village, one or other of their number well attempt to cook up a case of unnatural death or some worse suspicion against the deceaseds friends. unless satisfied with a customary douceur; if a mahajun entertain a special grudge against some indivual Sonthal a bride to the police can at once effect his arrest on some groundless accusation. In the Judicial courts are amlah not less given to illicit gains of a like nature. In the Revenue department of the public offices are the Suzawals who collect the rents from the pergunnaits the Manghis, or the villagers generally and where authorized to receive some six ruppees on behalf of the sircar, (Government) they will lay some six other rupees for their private benefit; ot where a rent of 4 as. for a plot and all it contained was fixed in the settlement, they take a rupee more for a sapling bamboo clump or a solitary fruit tree growing thereon. Thus Zemindars or more properly speaking Zeminderee retainers as gomasta, surbarakar, peons and others Mahajuns and their 'mustajirs' or agents, the police—the revenue and court amlah have exercised a combined system of extortion, oppressive exactions, forcible dispassession of property, abuse and personal violence and a variety of petty tyrannies upon the limid and yielding Sonthal usurious interest on loans of money ranging from 50 to 500 per cent, false measures at the haut and market ; witful and uncharitable trespass by the rich by means of their untethered cattle, tattoes ponies, and even elephants on the growing crops of the poorer race ; and such like illegalities have been prevalent. Even a demand by individuals from the Santhal of security for good conduct is a thing not unknown; embarrassing pledges for debt also formed another mode of oppression. The non-payment of a debt, be it a just or an unjust demand is followed by a petition by the claiment in the nearest Moonshiff's court, the issue of a notice to the defauther of which

probably the prosecutor takes care he shall not be aware at all, or not till too late to take the necessary measures for his clearance, and by a writ of attachment on his moveable property, which may be executed and the victim reduced to beggary and ruin, ere he has any idea of the impending calamity, unless he turn and satisfy the rapacily of his enemy. If a civil sunit ensue, chcanery and legal difficulties defraud the illiterate Santhal of his just rights. In 1848 the Santhals of three entire villages suddenly absconded and never. returned in consequence of the fradulent, false. or exaggerated suits of the muhajuns in the civil courts. Legal forms, and all the processes of a complete civil organization came on a sudden as it were upon a rude and semi-barbarous race, as yet unfit to receive them.

The several modes above detailed of a systematic oppression of the Santhals and chiefly-in respect of exactions by all the native classes around them and the muhajun's debts are illustrated by facts already recorded, and known to many, as well private individuals as the authorities. That obstacles to redress and just relief of their distresses existed, cannot reasonably be doubted, and though whatever they may have been, their nature and degree are matters at presnt out of our enquiry, there can be as little doubt that the requirements of the people and the country were inadequately met in the manifesto issued by the Santhals in the kythee Hindi tongue and published in Bhangulpore, and by some means also in purneah under date the 10th of Sravon, 1262, B.S. or 25th July 1855, it is set forth that the sin of the Muhajun, and of the amlah is great. and that the Sahebs delegate the duty of investigation to subordinate officers. who oppress them. and have produced their change of character and action. There was a solitary case of alleged forcible abduction of two Santhal woman, and even of murder and some minor acts of opprassion, as taking kids fowls 8c. without payment on the part of Europeans employed on the line of Railrood.

It is easy to imagine how many a Doorga, and a Manick Santhal brooded whether in patient silence or in stifled murmurs, over in human wrongs such as these; nor can any feel surprise that their displeasure was visibly demonstrated in the short series of nightly attacks on Mahajun's houses in the early half of 1854. which according to legal definition designated dacoities, were well merited reprisals on their unprovoked cruelties. The dacoits so called were at

length detected, tried, and punishd, but to quote their language their oppressors were not even rebuked; and argument and petition, ominous of the future, then followed.

In this state of things, it was, that the pergunnaits, the Manghees and heads of villages seem to have begun in earnest to cogitate what might be the proper course for them to pursue. The capital of all the Santhal towns and villages as well as of the hills generally is Burhait; one half mile distant from which to the South West to the village of Bhagnadihi, whose inhabitants were most probably grievously oppressed; and here lived the noted leaders of the late rebellion, Seedo and Kanoo, and their less forward brothers Chand and Bhyrub. Though there was discontent among the Santhals of the Damum-i-koh it seems to have been shared, though doubtless in a less degree, and from less violent causes by their brethren to the West and South of that tract; and mysterious allusions are occasionally thrown out to one Margo Rajah, as a Santhal chief residing near the Parisnath mountain, whose self charged mission as well as that of his disciples, is said to be the union into an independent kingdom of the south country meaning the original country of the Sonthal tribe. Equally mythical was the ignoble course imputed to Meer Abbass Ali, an Ex-Ameer of Seinde, residing at Hazaribagh. His servant Urjoon was a Santhal of ChamarKoh near the Paresnath mountain, who for some purpose invited two Santhals to Hazaribagh in April 1855, and persuaded. them to fetch a number of their fellow huntsmen to beat game in the jungles for his Highness's sport. A large body accordingly went, it is said and attended the Ameer's hunting expeditions for one and half months. It is probable enough that during this time they made known to their friends possibly to the Ameer himself, the burthens they had to endure. He buried, it is stated in their sight a single rupee in the ground and some grains of Dhan or Paddy-wheat. The seeds presently produced a crop, but not the coin, whereupon he admoneshed them, when they borrowed hard cash from the Mahajuns to pay no interest but when they borrowed than from them, an interest equivalent to 4 As. per rupee upon the value of the grain ought to be paid. The return of those Santhals to the Bhaugulpore district was soon followed by the out break of the revolt. It was alleged also by the chief witness to the above matters that the four brothers were among them. The proper inference deducible from these facts, if indeed true, seems to

be not that the Ameer advised or lent his countenance to schemes which could in no way affect his interests, unless indeed to give way to a latent animosity towards the British Government, which has not hitherto been suspected; but that these unhappy men hoped to find some valuable assistance in their intended measures from their brethern south of the Grand Trunk Road. The story however touching the Ameer appears in truth to have arisen from some yet unexplained and secret discontent of Urjoon himself.

It can scarcely be doubted and by Seedoo is expressly confessed, that the Manghees and others of the Santhal villagers in the Damun had for some. time bfeore the insurrection and perhaps as there is resson to suppose in meetings expressly comened for the purpose. begun to agitate their grievances among each other. Their endurance had reached its maximum; and while the spirits of the people were in this condition it needed but a spark to kindly the fire. As to Seedoo and Kanoo there is evidence to show that their personal caharacters were at least bold, original and persevering. They were too, it seems personally and deeply concerned in the common misfortunes of their race, and as they meditated in their private dwellings and talked over their own and their people's wrongs the right and effectual way of lighting that flame; may readily have suggested itself to their minds. on other occasions of the world's and of India's history as well be mentioned. it has been seen how the fanatical spirit of religious superstition may by a small excitement be swayed to strengthen and help forward a quarrel already ready to burst, and based on other grounds; and the Santhal we know on the authority of the intelligent observer bfeore quoted is an eminently religious man. The strong drink and wild dance also, to which the Santhal is so much attached, were other elements of excitement, fully sufficient to fan the lurking flame.

At last then, the blow was struck, Seedo and Kanoo were at night seated in their home, revolving many things; their brothers, Chand and Bhyrub were ten miles away at Simulchup; a bit a paper fell on Seedoo's head and suddenly the Thakoor (god) appeared before the astonished gaze of Seedoo and Kanoo he was like a white man though dressed in the native style; on each hand he had ten fingers; he held a white book and wrote therein; the book, and with it 20 pieces of paper, in 5 batches, four in each batch, he presented to the brothers

ascended up wards. and disappeared. Another bit of paper fell on Seedoo's head and then came two men, each having six fingers on each hand; hinted to them the purport of Thankoor's order and they likewise vanished. But there was not merely one apparition of subline Thakoor; each day in the week for some short period did he make known his presence to his favored apostles; at one time it was in a flame of fire; with a book, some white paper and a knife ! at another in the figure of,—what has before been mentioned as a subject of the Santhals special admiration, a solid cart wheel! In the silvery pages of the book, and upon the white leaves of the single scraps of paper were words written; these were afterwards deciphered by literate Santhals, able to read and interpret; but their meaning had already been sufficiently indicated to the two leaders. Such were the mysterious revelations which the brothers announced to their wondering neighbour; possibly their own imagination may have represented them to themselves as real, no doubt they succeeded to a certain extent in inducing a belief of their truth. For more than a month previous to these occurrences the Manghees of various villages had consulted upon the proher measures towards the Muhajuns. and now forth with tursty messengers bore away to Chand and Bhyrub, and other Manjhees in different rirections, the the Sal tree branch, a symbol which like the fiery torch in old Highland gatherings, appears to have had either by a general ancient custom, or more probably a preconcerted recognition a secret attached meaning. Mean while in the garden enclosure of the leaders home was duly ereted the proper figure of their Thakoor; this was a small curcular mound of mud, two feet in daimeter, and raised some three inches from the curcumjacent earth; upon the centre of which was another very small circle, a knob of mud, raised also some three inches and about two inches in diameter. This figure was a cart wheel. At first it was sheltered beneath a spread Chatta or umbrella but soon a nobler canopy was constructed of wicker work. Before this figure the villagers were instructed to present their offerings of grain and milk and to sacrifice the kid and buffalo. As the milk stood in their cups upon the pinda, or earthen alter, or they poured it into the fissures of the mound; a gently spouting a feeble hiss, or a stronger fire and other similar phenomena were, by some amount of Jugglery or more probably a stretch of an excited and imagination caused or supposed to take place and to

indicate the spirits hidden presence. Where some unhappy villager's sacrificial milk would not act in the prescribed manner, it was denounced as too blue in color, unpleasant to the deity, or attributed to some wickedness in the offerer. The heaven sent book, and the sky showered paper were produced, the credentials of Thakoor's accredited apostles. In these the Thakoor's purwana. (writhen order) the mandate of heaven was inscribed, addressed to the Santhals of the Damum-i-Kob. A day was fixed when the tribe should meet at the Thakoor bari, (god's house) of Seedoo and Kanoo, and hear the command of the deity.

It is a singular and very remarkable thing, that this book was verily and indeed a heaven sent revelation. It contained a writing in and oriental tongue; but it was none other than the Chrisian's Gospel according to St. John!

The Sal branch and the fame of Seedoo's wonder's did their designed work. In the appointed day, June 30th. (full moon) 10.000 Santhals are supposed to have met at Bhagnadihi. The Thakoor's order was announced : and in accordance there with letters were written by Kirta, Bhadoo and Sunnoo. Manjhees at Seedoo's direction addressed to Government, to the Commissioner Collector and Magistrate of Bhagulpore, the collector and Magistrate of Beerbhoom, to the Daragaho of Thannahs Dighee and Tikree. (Rajmahal), and to several Zemindars and others; from the Darogahs and Zemindars replies were called for within 15 days.

The order of the Thakoor was remarkable; it expressly disclaimed all intentions against the Government; and specially directed the revenue to be collected by themselves and paid as heretofore to the state. Its rate was to be 2 As. on every buffalo-plaugh. Anna on each bullock plough, a half Anna an each cow-plough per annum, and the rate of interest upon money to be 1 pice in the Rupee yearly. It enjoined the instant slaughter of all the Muhajans, of the Darogahs; and likewise as Seedoo alone stated uncoroborrated by his comrades, of the Supperintendent of the Damun ; utterly to banish the traders and Zemindars and all rich Bengalees from their country, and sever their connection in toto with the Damun-i-Kh; and to fight all an resistance ; for water only should issue from their guns.

The Darogah of Thanna Dighee or Burio Bazar heard of a large assembly and sent a burkundaz to learn their numbers; he proceeded

on his way not only to make enquiry. But also it would seem at the instigation and by the bribery of some Muhajuns to seize the four brothers and others on a false charge of dacoity; he halted at Rukshee; early the next morning a loud discord of drums announced the arrival of a Santhal embassy to escort the unfortuantc police officer to the presence of the rebel army. and their renowned Soubahs. at Baboopore; they charged him to levy and pay to them 5 Rupees on every Bengali family in the neighbourhood; in vain he bid them dis-perse. On being questioned as to the reason of his coming it is said that he at first replied to investigate a case of snake bite and then to equire into their alleged intentions of committing dacoity; that the Mahajuns declared their intention of expending any amount of money however large to effect the capture and arrangement of the four brothers; and that rope had been brought on purpose to bind them. They bid him to arrest them as dacoits, if he had proofs it not to give them in future the justice they had in vain before sought at his hands. The Darogah in anger ordered them to be tied. but on the contrary the Manghees tied him; Seedoo with his own hand despatched him with a sword and Kanoo slaw Manik Chowdri one of the foremost of the moodees, (Shop keepers) present. Their followers attacked some burkundazes and other moodees. nine men in all were killed and the rest of the Darogah's party fled precipitately (July. 7th, Saturday), of the four leaders Chand only was absent at this time.

Blood having once been shed and the temper of the insurgents excited, the rebellion at once extended with many frightful atrocities. For some unknown reason, it was a part of then plan as they proceeded. to bathe in the Ganges at Baniagram near Rajmahal, but this was not effected; and likewise to carry about in a palkee some alleged avatar or incarnation of the deity which was at one time a child god, born of a woman at Katjundbe, which suddenly grew a man, to be the Soubah of the Santhals and for whom a man, a woman and a virgin cut a certain grass of which a bundle was transformed into a fortress of gold containing a well of silver, for his residence, At another it was a goddess, a Thakuroni descended at Kumulpore, a female of ancient age, who condescended to be so far mortal as to imbibe milk while at another, it was impersonated by ordinary individuals; who had entered into communions with the Tkakoor. But all these absurdities were no doubt devised to keep up the courage of the mumerous rabble. And as among our Sicilian slaves a few Bangalee fraternities were compelled or more probably easily induced to join the gathering including the Lohar. (blacksmith) the Kumbar (potter) the Telee (oilmen) the Gowala (cowherd) the Carpenter (kuhar); for these were useful to the Santhal commissariat.

The progress of the insurgents from the time of the Dorogah's murder is generally known; their arms were the bow and arrow, axes, swords, and a few guns ; as they retraced their steps from Baboopore to Panchkotea. they wreaked their vengeance on the khan Saheb. a naib sezawal of revenue, whom Kanoo cut down with his own hand; they fired the house of the Raja of Ambar at Kudamsa ; but at this place, as they also fell upon an European. Indigo factory early in the morning they were astonished. to meet the resistance of the planter. Mr C. Maseyk, who with two other gentlemen, armed with fowling pieces, and stationed on a boat in middle of a nullah which commander the approach to the premises, kept at bay the whole Santhal army wounded some and captured one prisone.: At the same time 160 police burkundozes, rapidly sent by the civil power for the immediate protection of Kudamsa safely hid themselves in the high grass and reeds that lined the nullah's banks. Unable to effect their purpose in the face of the long guns the Santhal rebels moved in the plundered. Aklai and Sricond at which place the bungalow of a gentleman employed on the Railways was burnt down; several Railw y works were similarly destroyed. Thakoor was devastated. including the palace of the Ranee. The Zemindar of Mohespore was then attacked, and the Raja of Lukhunpore did not escape their fury. Pulsa shared the fate of other places and here the insurgents were recompensed for their toils by the capture of some buckets of wine, a booty which their, habits and inclination would lead them to prize not the least; but it was perhaps not at the most favourable hour; for as they returned to Mahespore they sustained a signal defeat on the morning of July 15th, (Sunday) by the Government troops; the water which the Thakoor had promised should issue from the muskets was changed into bullets by reason of the private wickedness of individual rebels; Seedoo, Kanoo and Bhyrub were themselves short, though not mortally, and 200 other Santhals killed and wounded ; above Rs. 7000 in cash and 4000 Rs. worth of goods all plundered property were recovered. At Rogonathpore, Chand and Kanoo with their followers afterwords met

another similar but less extensive reverse; and with their learders wandered; about the Luchnpore and Dhuldulee hills; a portion of them however attempted to oppose the approach of the troops to their capital, Barhait (July 24th) they were quickly dispersed; but their stores of plundered valuables were no where to be found at Barhait or Bhagnadihi. Soon after this Seedoo was given up to the Bhaugulpore troops through the treachery of Toolsee Santhal and a few others, who were immediately cut to pieces. During those events one party of insurgents near Paharpore, under the conduct of Tribabun Santhal, met two infortunate English ladies, Mrs. Thomas and Miss Pell in their flight, as well as three European gentlemen Mr. Henshowe and his two sons, who were barbarously murdered. Every where the insurgents course was marked by scenses of inhuman and atrocious cruelties murders, burnings, pillage and devastation. By the 20th of July the revolt had spread and was in activity from Taldunga at the south-west of Beerbhoom; on the Grand Trank Road, and Synthea at the south-east on the Adjye river. to Bhaugulpore and Rajmahal on the Ganges at the north-west and north-east of the Bhaugulpore district. The insurgents were carrying on operations not only as we have seen along the moorshedabad border, but at Nulhalti, Rampore Haut, Nagpore, Nungolea, Gurjari and various other places in Beerbhoom, – about Barkhop Goddah and elsewhere in the heart of Bhaugulpore, and most of all parhaps at that time on the north of the Damun-i-koh, and along the south bank of the Ganges from Colgong on thye west to Rajmahal on the east. Rajmahal itself was saved by the resolute and vigorous resistance of Mr. Vigors and other gentle men of the Railroad, who had fortified and barricaded the residence of the former gentlemen. To the west of Rajmahal the Santhals were laying waste the country in the face of a large body of Government troops the cause of whose inaction, however. is a matter under enquiry. It was in this vicinity that 317 years ago the emperor Humayoon had marched after his siege and capture of Churnar, to oppose the pretensions of Shir Khan the claimant of the principality of Gour and beat back his forces in the defile of Sicrigulli.

During these events in the disturbed districts, the military protection of the country afforded employment to a large number of troops, scattered at long distances from each other, and in several directions. To prevent the passage of the Santhals to the country south of the

Damooda river and of the Grand Trunk Road. as well as to protect the adjacent country to the north of the road and in Beerbhoom, the Ramghur Irregular light house, the Governor Generals body guard, portions of the 2cd Grenadiers of the 50th, 56th, and 37th Regiments and 200 Nizanmt sepoys from the guard of the Nawab of Moorshedabad with 30 of his elephants, beside 32 horse, and at a later period the 63d N. I. were put in motion; on the Moorshedabad border the 7th and 31st N.I. and in Bhaugulpore, the Hill Rangers and parts of the 40th, 42d and 13th Regiments N.I. from Dinapore, were employed. Some of their operation we have already glanced at ; a more detailed view of their nature and order may be useful to connect the parts of the history. The first move against the insurgents was made by a party of 400 men of the 7th N.I. stationed at Berhampore in concert with the Magistrate of Moorshedabad. On the afternoon of the 11th of July they marched for Aurungabad, the head quarters of a sub-division and near Rajmohal. Information received on the road prolonged their march to the factory of Mr. H. Maseyk, at Doollean whence 160 police burkundazes were started by the civil authorities to the protection of his brother at Kudamsa; but the extent of their usefulness has been already stated. The troops followed them but arrived at Kudamsa (July 13th), shortly after the departure of the rebels; they pursued the later to Pulsa (July 14th) again too late, but tracked them the same night to Moheshpore where on the following morning the first engagement ensued; with what results we have dreadly seen. On the 20th July they moved on towards sricond along the line of Railways; but diverged westwords to Jambad or Burtollah; waded through swamp and paddy fields; crossed the Gambria or Gumani river; and on the 24th entered the first pass they had met into the hills; and overcoming a faint and useless attempt on the part of Kanoo to stop their progress. reached Burhait on that date. The affair at Rogonathpore soon after followed; and at Moheshpore the garrison of the 7th N.I. were attacked by the Santhals in a vain attempt to take possession of the Zemindar's were taken to plant garrison posts of the 7th and 31st N.I. and the Nizamut troops Nulhatti. Pakowr, Palee, Pulsa, Aurungabad, Shumseergung. Jungypore, Foodhipore, and elsewhere protecting the country on either side of the Moorshedabad border from the Beerbhoom boundary to the Ganges river; and in this quarter we hear of no further violence on the part of the Santhals.

The first intimation of a large gathering was received at Bhaugulpore on the 4th of July. On the 6th the Magistrate of the district and the Superintendent of the Damun-i-koh were at Rajmahal but unaware of the nature of the rising, the numbers of the assembled men, or the extent of their ill feeling. The news of the Darogah's murder was brought to the sudder station by two of his servants and a burkundaz, who had escaped from the scene of that day's tragedy. On the 8th July the Hill Rangers were called out, and soon after their outpost detachments employed at Purneah were required to join them 160 rank and file of this corps marched on the 10th July, and next day they were at Pialapore whence they advanced to Cologang. On the 16th July accompanied by their brave European Sergents Major and a gentleman, Mr. Braddon an Indigo Planter they encountered a body of the insurgents. Their muskets were damp, from this or some other cause they hung fire, and the attack signally failed; Mr Braddon was killed, the Sergeant Major after a gallant resistance was cut to pieces, 25 men of the corps were killed and wounded and the rest obliged to fall back on some boats and retire to Colgong. By the 21st July they had been reinforced by 42 of their own corps and 250 men of the 40th N.I. of whom 250 others had been retained at Bhaugulpore. At Pialapore 2000 Santhals were ready to give battle; but in expectation it is supposed of the arrival of the remainder of the 40th Regiment, no active operations were undertaken; and meanwhile the Santhals pursued, East, South, and West of Colgong, their work of plunder and destruction. Major Shuckburgh with half of the 40th Regt. presently arrived; and by a few successful engagements in which the Santhals were said to have been more than once the attacking party, changed the state of affairs in the North-Eastern direction. On the West and the interior of the Bhugulpore district separte expeditions had the effect of clearning the country from further depredation and driving the insurgents further south. Kishen Singh, a Zemindar with his retainers attacked a body of the insurgents in one place. but was defeated; at Chouckote, on other party were met by capt. Fancise, Commanding a detachment of the 13th N.I. and retreated with loss; nevertheless a force of 800 Santhals immediately after fell upon his camp, then guarded by 40 sepoys, who bravely repulsed them, while from the 27th of July to the 22nd of August a portion of the 40th regiment accompanied by their able and experienced guide, capt, Sherwill,

accomplished a long and circuitous diversion in the heart of the district, without indeed encountering an enemy, who fled before them southwards, but recovering large quantities of plundered property, stores of grain, c. Bhaugulpore was now for a time quiet, excepting the Southern purgunnahs on the Beerbhoom border, at Hendweh and Belputta, at Rajshadang, Telabonnee and other places within and near the chains of hills. In Monghyr the peace was maintained by a large standing body of armed Ghatwals, whose expenses were paid by the Zmindars, Joy Mungul sing, and Mohendronarain; a noble example to their countrymen.

The Beerbhoom side of the disturbed couuntry was in greater disorder and for a longer time. By the 20th July Mithijanpore and Narainpore had been sacked at the latter place Gholam Ali Khan, the Darogah of Thanna Afzulpore, won laurels, sword and shawls by his gallant and successful defence of a large-pucka house belonging to the Zeminder. On the 21st a body of the insurgents were met at Katmah by the Sirdar Ghtwal of Kajoorea and a few inferior Ghatwals, and strange to say a handful of Bengalees also; the son of the Sirdar was killed; and Katmah fell into the Sonthals possession; by the 23rd, the large town of Gunpore and many other villages had been distroyed. At the same time parties of the 2nd, 56th and 37th regiments were engaged at various points with sever loss to the insurgents; the small detachments separately located were unequal to the work prepared for them; the rebels obtained passession of the town of Nagore; Lieut Toulmin was killed in an unadvised attack upon a superior force posted on the opposite side of a nullah; but with these partial reverses the troops were successful especially in a gallant affair by Lieut. Delamaine of the 56th N.I. at Mungolea; the insurgents were soon compelled to evacuate their important positions at Afzulpore, Nagore, and the Moluncha Hill (a Trigonometrical survey station), and they retired in a large force to Koomerabad after a series of brutal and ferocious cruelties, authenticated examples of which we have not the present means of recording, but which imagination can hardly conceive. By the 17th of August quiet was for a time restored to this part of the country though the numbers in open arms were still estimated to exceed 30,000 men.

But these various military operations, affording but a very brief immediate relief to particular localities and driving the insurgents

each time into the Jungles, had of themselves but little practical effect in checking the progress of the insurrection. They were too few.

The rebels, says the friend of India, for weeks met no practical resistance at all. The season and the distance delayed the soldiers; and even when they arrived, the vast range of territory covered by the insurgents compelled the officers to sanction an infinite sub-division of the force. The rebels, therefore were allowed to glut themselves with plunder."

A westward movement of some bodies of Santhals with a view to a permanent and peaceable settlement on the unoccupied lands on the banks of the Barakur river, and near parisnath mountain was at this time reported, but apparently it rested on slender and insufficient grounds. The revolt was merely slumbering. A proclamation issued by the local Government in August, after the Supreme Government had negatived the proposition of Martial law, inviting all the well and peaceably disposed to tender their submission within ten days, and promising on that condition free pardon to all but their most active ringleaders; and those proved to have committed murder was not merely declined and rejected this no doubt was done by many among them through fear and discredit of the humane intentions of their rulers, but the paper was in some places despised. spurned and burnt in centempt. Late in september, under the auidance of Ram Manghee. Sham Soubahg, Phoodunneawla Anoo, and other magnates of their army; the Santhals were again on the move in the north-western parts of Beerbhoom; and at Jyepore, Kendra, Noni and other places in southern Bhaugulpore; they were compelled to activity even though in a possibly unwilling opposition to Government by the serious want of food, and partial desertion of those artisan eastes of Bengalees on whom their commissariat in some measure depended in cansequence a few military expeditions marches and countermarches, and skirmishes were again rendered nceessary.

The unhealthy season of the year was a serious obstacle to military movements as yet Martial law had not been proclaimed; the conduct of the entire operations against the Santhals was by the supreme authority vertually placed in the hands of the military power unhampered by the smallest restriction of the civil laws, though without proclamation of Martial law ; the arrangement was then modified so as to include the co-operation of the civil power; and as a necessary

cousequence, the civil law was still the law of the disturbed country, and the tactics of the military subjected to civil control. The urgent and pressing character. however of the events which were occuring, explained the positive necessity of arbitrary servere though not irresponsible measures; and accordingly on the 10th of November, Martial law was at length proclaimed and capture in arms in open hostility to Government or in the act of opposing by farce of arms the troops, or in any overt act of rebellion against the authority of the state was made an offence punishable by sentence of Court Martial. Suboequently the use of particular weapons, and of the Santhal durm was prohibited. The effect was soon apparant ; combined movement in the Lukhmpore and Seebehulla Hills, and in various quarters both in Bhaugullore and Beerbhoom, accompanied with the instant slaughter of all resisting Santhals, and all appearing in arms who would not submit themselves, the execution of a few ring leaders and the capture of Kanoo near Operabunda by the Sirdar Ghatwal of Konjra, restored quiet to the country. At the some time a large number of Santhal prisoners under went their trial at Baugutpore and Sooree and upwards of 130 men were condemned on various counts to different punisments. The appearance of restored peace was such that on the representation of district officers, civil and military and of the local Government, the Government of India suspended the further operation of Martial law, which was accordingly withdrawn on the 3rd of January 1856 after a duration of not quite two months. This bold measure was followed almost within a fortnight by fresh outrages in the neighbourhood of Jyepore and the Mongnyr border, committed by fugitive Santhals from the south starved into renewed exertion; they have obstained. however, for their own interest from violence to human life and limb, but before the Hill Rangers have presented front and a steady and unyielding resistance; and whilst we write, the manifestos of their new Soubah Seeb Shah, have come before us dated the 29th and 30th of pous, 1262, B.S. corresponding plunder and destruction of the European factories at Sungrampore; which has since been effected.

Such is a general account of the progress of the Santhal insurrection; a rebellion with which we find it and easy to find a parallel in the annals of Indian or any other nations. The old Mohomedan empire in India had frequent experience of the disaffection of its subjects, but

they were for the most part; like the revolt of the Affghan settlers in Akbars days struggles for power by factions nobles and their partisans. That of the Satuaramis recorded at the head of our chapter was but a very temporary religious outbreak of idel and profligate fanatics. At Bariilly in Rohilcund, A.D. 1816 a people but recently subject to no law under the anarchical condition of Oude, and now swayed by British law and held to order were suddenly excited by a new petty assessment for the support of their chokidars. The administration of this tax, odiously mismanaged by the native officials, gave offence to a part of the townsmen; the spirit was contagious, and their example was imitated with and without any conscious reason by others; a skirmish ensued between the mob and Government sepoys; a Mussul man of high rank was wounded; and at once a religious character was given to the rebellion, to strengthen the interests of those who had provoked it among a rabble crew of bigoted Mahomedans; until experience taught them that they were not a match for united and disciplined soldiers. The Ferazee disturbances at Baraset, in 1841, under the conduct of Syed Ahmud, and his disciple, Meer Niser Ali or Tittoo Meer, were the results of a religious frenzy excited by the craft of these pseudo-reformers of Mahomedan corruptions, who designed merely to fill their purses by the willing offerings of their deluded followers; and so likewise at a later period in Furreedpore, A.D. 1847. when their descendant, Deedoo meer, again became a leader in the sect. The extortions of these reformers presently shewed their three characters, and worked the ruin of their cause; and this of itself, but more when aided by the presence of a few troops, was sufficient to put down the vain attempt to oppose a strong Government; and an end was put to the rebellion. In Chota Nagpore and Palamow one petty and short lived rebellion once occurred ; occasioned by little beside the wild state of the inhabitants averse to the restraints of law. Some years after in 1832 another broke out in the same line of country among the Cole population; but here the event was traced to circumstances, not dissimilar from the Santhal grievances, A family quarrel existed in the house of Gobind Singh, the Raja of Dhulbhoom; one member Madhhub Singh, disappointed of the Ra; but dangerous in his personal character spent his money in certain trades, which among the poor people of the province he soon monopolized; he lent out large sums to numerous Ghatwals, ryots and

others, at usurious interest and reducced them to great extremities; till they joined in a close connection with another member of the same family. Gunga Narain Singh, whose little to maintenance, and other allowed privgileges according to Hindu civil law in the family inheritance, had been ignored and who was besides the personal inveterate and talented enemy of Madhub Sing. The latter was murdered and Gunganarain led forth his obedient followers to a general pitlage of the country, till he met his death from the troops of Govenment. In olden days, when the power of Persia was dominant in Syria; B.C. 360 it was "the insolence and exactions of Persian satraps" that roused the Phoenicians of Sidon and Cyprus against their masters. In Asia Minor it was the arbitrary exactions of corrupt Magestrates, and greedy officers that provoked the conquered provincials, subjet to Rome whose government was an instrument of oppression, to massacre the Romans in Asia at the outbreak of the Mithridatie war (B.C. 88) "who does not know," Cicero asks, "that the Achocans pay a large sum yearly to L. Piso?" In France. A.D. 1358 during a period of general and unusual calamity. it was the insolence and luxury of their lords playing at dice upon the oppressive taxes of the poor", that produced the deadful insrurrection of the peasantry, known by "the name of the Jacquerie, and marked by all the circumstances of harror incident to the rising of an exasperated and unenlightened populace." In England perhaps their was never any movement which in its origin can be likened to the Santhal revolt; even cade's rebellion, which more than any other seems to present similar features, was based upon no real ground whatever, but the general want of unity in the kingdom and the distracted state of the popular mind amid the quarrels of rival nobles, which disturbed the reign of king, Henry VI. But in its terrible progress. in its diabolical and atrocious scenes of crulty the slow roasting of men, even the aged the toture of children. the repping of women, the hacking of limbs, the quaffing of blood; the burnings and the robberics, which marked the Sonthal movement, it may compare with the tumultuous proceeding of the demoralized mob in the days of Walpole and George II. (1736 A.D.) or the insurrectionary seenes of Carlow and Wexford (A.D. 1798) in Ireland; but with this difference that crimes might have been counted by thousands instead of hundreds in Beerbhoom and Bhougulpore. It is but too easy to Judge of an event after its

occurrence, and it would be as unjust as ungenerous to attribute a failure, either of duty or of foresight to the local Government, in not providing against the occurrence of a disaster so utterly unexpected by them and the public alike.

An impartial enquirer, however. might pause in according to his unqualified admiration to the measures pursued before the out break, to pacify a previously known discontent of the Santhal race or to those which followed the full burst of their fury. For example, he might deem it a strange thing that the Santhal should turn dacoit. The Santhals were a separate race; they were quite distict from Bengalees, and without distinction of caste; they were unacquainted with the conventionalities and trickeries, the modes of crime belonging to a few predatory fraternities of bengal, they were noted for probity, for their peaceful lives for their quiet demeanor and their steadiness of character. In short a full and credited account of them had been officially known to Government, and that account was highly creditable to the tribe. How then was it that such a people. among whom not only was dacoity an unknown thing, but theft was an unknown crime. Suddenly changed' character and committed not a solitary example, but a long series of so called dacoities, or gang robberies. by open violence? The printed decisions of the Zillah Judge, and of the Sudder Court pointed plainly to the exactions of Muhajuns as the sole bone of contention and there can be no manner of doubt that the distinctive complexion of their crime ought to have been recognized in the decisions and in the punishment of the offenders. The same thing was reported expressly by the Magistrate to the Commissioner and by the letter to Government. The first natural and obvious questions that it would seem would arise in such a case is what is the meaning of this quarrel with the muhajuns? If the submissive Santhal cultivator has adopted a new system of so serious a character, what is the character of the new influence which has been brought to bear upon a peaceful but yet an ignorant and semi-savage race? Such questions might possibly to some minds have suggested a full and complete investigative of the altered circumstances of the Santhals and the more as it was by the sufferance of Government alone, that Muhajuns were ever allowed either to enter or remain in the Rajmohal hills. The superintendent however. of the Damun-i-koh was entrusted with the powers of the Civil Judge to arbitrate between the Santhal

and the Muhajun; this now appears and might then have appared an undigested measure, because it was applying a supposed remedy to a disease, before the disease was comprehended; and also that the tract of the Damun being under the ordinary Regulation law, a civil suit would be necessarily hampered with an infinity of forms, processes, and technicalities quite unsuited to the unsophisticated Santhal, and in which he would be certainly over reached by his wily and litigious adversary. The orders actually passed were through the fault of the local officers not carried out for several months. and had scarcely been in operation before the revolt commenced.

When however the revolt had begun the signs of an approaching storm of no ordinary potency were visible. It was unlikely that several European living many miles apart in diffierent occupations, and filling varied positions in society, some unknown also to the rest, should at the sometime have written as they did letters of serious import, gravely announcing an extensive rising of a numerous and armed population had they not possessed strong and sufficient reason for their fears and forebodings. Europeans in general are not want to be alarmed at a common event. But three days after such communications had been received and indubitably confirmed; after one Regiment had been ordered out of Berhampore, to be relieved by another from Calcutta, and after a felt and acknowledged necessity existed of despatching further troops to the protection of Beerbhoom and the Grand Trunk Road, it was considered that one company of sepoys at Raneegunge, and one at Sooree would suffice for all the purposes required. It proved to be and it might parhaps have been forseen a very insufficient force. But, as the friend of India has stated there were at this time not 1200 troops within 80 miles of the scene of disorder. The fear entertained by some for safety of the Bhougulpore station were conceived to be groundless. Looking calmly back at the current of events and the progress made by the insurgents in that direction that fear is seen to have been for a time fully warranted. Not only the rumours and the alarams spread abroad in various directions, but the reports of district officers of the state of affairs were considered. highly exaggerated, So again, as if past experience had not sufficiently chided such temerity, were the reports of the recent recommencement of the revolt in January, 1856 pronounced exaggerated; facts have amply shown that there neither was nor scarcely could

be, exaggeration on the subject. And in real truth if, where real or reasonable grounds for alarm exist, the powers in authority were to act at once fully up to emergency, and as though the exaggerations were indeed and honestly true, how much it is reasonable to suppose, of impending anxiety, toil and disaster would be abviated and avoided.

It was an important object to shut up the passage of the Grand Trunk Road so as to arrest and prevent any contigious spirit from infecting the wild inhabitants of the Pergunnahs south of that highway. Latterly; perhaps from fear of their gaining no work, food. or employment on the northen side large bodies even thousands of Santhals, have permited to cross the geat road.

But these and such like errors are in a broad view of the questions trivial and unimportant; and ought to be compared with the anomaly which we have already observed in regard of the delay in declaring Martial Law. It is seldom that a danger like that we have viewed is or can be properly estimated in the present; and in nearly all cases of the like nature large and small has it happened that resort was had in the first instance to inadequate and insufficient means. But the primary delay in the declaration of Martial Law was like an utterance that the civil regulations, the law of the land were sufficient for this as for other occasions of violence against constituted authority; that it was beneath the dignity of the Government of the great Indian Empire to have recourse to such unusual weapons within its own manageable sphere, and upon an antagonist of such small dimensions. that the civil power was, if fairly wielded of itself fully able to meet the danger, an utterance refuted by the resort to military force; and soon followed by an unwilling confession of the actual and urgent necessity of the measure.

What may be the future of the disturbed territory it is not for us to prediect, whether famine now wisely met, will distress the remnant of its people or pestilence still further decimate their numbers (for dead bodies are strewn over the face of the earth) whether the depopulation will be soon replenished, or the waste country consume years for its regeneration, are problems yet to be solved. The tracts have been formed into on extra Regulation province, subject to the rules of common sense and equity, instead of the Indian Code and Procedure, and unreasonable precedents; the police are to be changed for a body of military police, horse and foot scarcely more expensive and for more efficient, on the footing of the various civil militia corps of the country; and roads and other public works are to be extensively opened throughout, by means of the involuntary labour of its late occupants so averse to all service, whether hired or unremunerated.

But the state of the law as regards usury, and the relation of the Santhal to the classes around him might likewise seem to demand attention. On Attic soil we are told the small proprietors, impoverished by outward causes, borrowed money at high interest, and mortgaged their lands to the rich and settled in them again as tenants The laws made by and for the nobles enabled a creditor to seize an insolvent debtor, and sell him as a slave—a right frequently exercised; numbers were thus torn from their houses. Stone-posts marked the many acres pledged for debt and no longer the property of the unfortunate debtor. Solon met these evils B.C. 594 by "a disburdening ordinance", reducing the rate of interest, retrospectively and prospectively and lowering the standard of the silver coinage by which the debtor saved above a quarter of his debt in the payment. He released the pledged lands from their pledges; and the slave law was utterly abolished, thus emancipating entirely every slave debtor. His schemes were submitted to because the people had installed him as their arbitrator to decide not as a lawyer would now decide a private contract, but on the best view of the public interests. The state of the debtor's law in ancient Rome is a matter of interesting enquity. In the time of Sevius Tullius their goods only, and not their persons, were made liable for their debts and the odious and cruel custom of the nexum and debtor slavery were banished for a time ; when the regal government ceased, the aristoeracy revived the law; and debts incurred through extreme poverty on the one hand and loans offered at exorbitant interest on the other, brought on the plebeian and patrician quarrel. More than two centuries afterwards the Lex Papiria restored to the debtor his civil freedom; and subsequently foreigners and Roman atizens lent and borrowed money on equal terms. The extortions of state officers also were made recoverable by a rigorous law; generally the rate of interest did not exceed 12 per cent, by the law of the Twelve Tables it was 8 $\frac{1}{3}$rd per cent. for the old year of ten months or 10 per cent. for the common civil year; and this was fixed as the maximam. The state opened a bank to lend money to the indigent or security; debtors might be legally paid in kind, as by land,

cattle &c. usury was punished by a mulet of four times the amount of the loan; but the law was of course evaded and though a legal rate of interst was still continued for all legal purposes, exactions could not be prevented by any enactment. Some reasonably small rate might be recognised, which should not swallow the harvest profits of the cultivators and afford in equitable adjudication of the differences between them and their suitors; and the blend or fraudulent lending of money upon a palpably impossible or bubious security be legally forbidden.

There are many parts of the Bengal Presidency where a sudden emergency like the Santhal revolt but of a more formidable character might at any time burst forth, and find fewer troops in the vicinity to cheek its progress. On the Chittagong borders there are many races wild and savage, who might inflict as much mischief as the santhals have done; and the force at present located in that quarter would hardly be sufficient even to offer a successful resistance, while we write we have just heard of a recent massacre by hill tribes in that very quarter. The neighbourhood of Tipperah swarms with multitredes of barbarians and there is no defence Many fair districts on the north there is no defence. Many for districts on the north of the Ganges are peculiarly exposed to danger without a soldier within a weeks call. Twice in sixteen years have the Ferazees given trouble to the Government; a third instance of their religious propensities is not even an improbability. On the South and west of the Cuttack province are tribes familiar with crimes of violence and rapine; the protecting force is not probably too small, if more distributed over the surface of the country. Westward of the Jungle Mehals are most plentifully scattered the elements of rebellion, and hordes of men to whom an excitement of such a nature would be acceptable; the protection is very feeble; while throughout Behar is an ignorant, bigoted. proud and high spirited population ever alive to some new idea, quick to conceive and as ready to resent a suppased injury we are therefore not only willing to agree with the Friend of India that "Sooree, Rajmahal, and Bhaugulpore should be turned into military posts" ; but would be glad to see military posts multiplied throughout these provinces; and this in addition to the new regime of police control about to be established. It is easy indeed to scheme without reckoning the cost. But the cost, it is searcely too sanguine a hope to express, might almost be

met by the reduction of many inefficient and even useless, as well as expensive stablishments in more than one branch of the public service. In point of fact, however, a large addition to the military force of the lower provinces is already a gained point, and the valuable element of irregular cavalry is included in the estimate; it remains to be desired that their distribution should be directed according to the real dangers of the country.

But as regards the punishment of the Santhal disturbers of the peace, we likewise concur in the main with the views expressed by the editor of the Journal we have quoted.

"It is only by striking terror into these blood thirsly savages, who have respected neither age nor sex—that we can hope to quell this insurrection. It is necessary to avenge the outrages committed and to protect the cultivators of the plans from a repetition of them. The Santhals believe that they can enjoy the luxury of blood and plunder for a month without a certainty of retribution. It is absolutely necessary that this impression should be removed. or obliterated, if Government would not in these districts sit on bayonet points, To achieve this end the retribution must be complete, leaving no calculation of chances for future rioters ; striking that none may fail to know and understand ; and trimendous that people may know their lives and happiness are not held of light account. It is to pegu that we would convey the Santhals, not one or two of the ring leaders, but the entire population of the infected districts. India has not arrived at the point where armed rebellion can be treated with the centemptious forbearance, with which on English Ministry can pardom a knot of Chartists, or banish a gang of Iresh patriots. Let the Santhals punishment be entrusted to a special commission as was done in Canada in 1838. Or if even this expedient be too arbitrary. Let the villages be fined in an amount about equal to the plunder retained and the sum distributed among the sufferers. To secure the punishment of the race and restore the prestige of British authority, the mass of the Santhals should not remain unpunished.

"The leading principle of these passages is not perhaps one to be called in question. It was absolutely right, and a desirable thing that punishment of the severest kind, consistent and commensurate with its object, should be inflicted on as large a number as possible of those actively concerned in the movement. Under a system of Martial Law,

too late declared. and too easily withdrawn or else by special legislation, such results were attainable. Under the ordinary civil code in a civilized age and community their attainment was simply impracticable.

"The inefficiency of the law has been demonstrated beyond the possibility of argument : under its provisions we could neither put down, nor punish insurrection. Whenever an unusual crisis occurs, we abolish the Regulation system. We recur at once to the old principle of Government, as a refuge from the imbecile tyranny of legal institutions. Is it not probable that legar forms are not applicable to half civilized races. that for them absolute power under real responsibilities is the true Government?"

Such is the language of the Friend of India. A blind devotion writes Dr. Annold to the letter and forms of the constitution on all occasions, may really compromise those great interests, for the sake of which alone forms are valuable.

Hence did the Government general ordain that Santhal should be prevented from crossing the Grand Trunk Road, even though the measure might be an illegal one. It is for these and like reasons that we could have wished to find a sterner Justice dealt to the Santhal insurgents, than they have been permitted to feel. The safety and interest of the state the foundation of constitutional Government as well as the moral effect upon observant classes of society, and upon the Santhals timselves, required, one might be disposed. to think a severer course of the many prisoners captured by the military authorities as well when Martial Law was in force as when it was not extent. How many handed over to the civil power have been and will be from some vagueness of proof as to particular acts. acquitted and released as innocent subjects who without infringing any moral principle of truth. Justice and equity might have been at once and on the spot condemned as in a state of open defiance of the authority of their rulers. It is proposed to employ the Santhal convicts in opening out roads in the district of Bhaugulpore. But they are known to be adverse to service of any kind; high wages do not tempt them to any servile labour; before the outbreak those employed on the Railroad were few in number. A Santhal convict, then kept and guarded, may indeed be freed to work upon the roads; but unless in the condition of a close prisioner it is questionable whether any other of the race will not

either flee to the jungles rather them fulfil his sentence. And others them convicts cannot now be had because they cannot be visited with their merited punishment.

While we hasten to bring our thought upon this subject to a close, the question oft and again recurs, will the Santhals indeed be re-settled in the Damun-i-koh, or shall they give place to a new people from the plains of Bengal? And if the latter to a new people from the plains of Bengal? And if the latter be the event, where must the survivors among the insurgents betake themselves? We hear already of bodies of even thousands of Santhals having crossed without let remonstrance the Grand Trunk Road, though they were even intreated to return to the Damun, or occupy the banks of the Barakur river. It may be better that they should live in the south country, than starve idly among the Ghats of the Vindya chain. Yet it is much to be feared that this permission will be found to have been very premature; and a vigilant espionage, backed by a cordon of strong military posts both on the north and the south of the Damooda river, may possibly be not only an useful but a necessary measure. The feelings and temper of the race their doings and status through the next few months but particularly on the approach of the rains must be most strictly watched. A love of plunder if not of bloodshed has been excited both by the induced habit and by the comparative impunity which the Sonthals have enjoyed. They witnessed no Martial Law till a late hour, when it should have been declared in the first week of the revolt; when established it was but partially exercised. and soon with drawn. The punishment it brought though severe was not sufficient, and was but very temporary. The Santhals will surely not fear a second trial of independence when the first has been so successful and so leniently visited. As yet they have not only disregarded, but refused the invitations held out to them to return to the Damun-I-koh; and it seems exeedingly doubtful, that they ever will re-settle in the tract.

If they should persist in thus course, it will of course be a matter of not a moments difficulty to find other parties anxious to take up the vacated lands, and for less liable to be deceived or imposed upon by Muhajuns not more cunning than they. But the Santhals are not exterminated; there are thousands wandering about the Ghats; though they may have been participators in rebellion, individuals cannot now under the system which has been adopted be selected from their

numbers for punishment; they should therefore by every means be induced by the Government and the authorities employed in the new non-regulation district to re-settle quietly in the Damun; for the country is more like to be benefited and the Jungles cleared under their management than that of Bangalore cultivators; and as late learned professor of political and economical science was want to inclucate, the permanent gain and advantage of Governments and the proprietors of the soil are identical with the interests of the community. who cultivate the ground. The Santhals have rebelled indeed and rendered themselves the enemies not only of the opulent Bengalees who brought on the movement, and deserved their fury, but of the many ryots around who never offended them, but whom they attacked when the lust of bloodshed and plunder was fully aroused. yet that condign retrileution which once might have been visited upon them has been foregone; the proper time and occasion for its infliction has passed away; the submission of the now. obedient must be accepted. It has always seemed to us a great mistake that the military expeditions which were directed to sweep the valley of the Damun-I-Koh were not extended to all the pergannahs south-ward and westward of that tract, where it was know that large numbers of the insurgents had repaired, and that others would follow. Until these had completely submitted themselves, little was gained or to be expected by marching through an empty and deserted valley. But no military forces scoured these tracts; and if they did not follow the Santhals, it could not be supposed the Santhals would be attracted to their company. They should we think, have been hunted out by a competent military force wherever they had gone, and compelled to return and submit themselves; and expressly forbidden to wonder forth again without license. It is not improbable that this course would have prevented the second ourbreak on the Monghyr border in the month of January last. This policy, there is reason to think must ever now be adopted and Martial Law again be declared and maintained so long as it is found necessary to employ the military in active service in any of the disturbed tracts. If some such steps be not adopted and while the season is propitious it is not improbable that the absconded Santhals will again and for a long period harass the country where in they are concealed. We conceive that they should be surrounded, and hunted up everywhere, that none should be allowed to move to the south of the Damooda

river or of the Grand Trunk Road, that they should be compelled, by force, if need be to return to the Damun-I-koh, and to the wasted country in Bhaugulpore and Beerbhoom to rebuild the ruined villages restore the desolate fields to cultivation, open roads, and advance general public works; and do this under watch and guard for otherwise they will run away; and that this state of things should be continued until they are completely tranquillized and reconciled to their allegiance. The apparent illegality of such measures is as we have before expressed, no illegal, or unconstitutional, or improper exercise of the rights of civil government. The expense can hardly be greater than that which it is already contemplated to incur in the maintenance of military garrisons as well as of a new and augmented military police. We would not check any voluntary communications between the Santhals and the Bengalees, not even with the Muhajun class; for trade is humanizing; but the Santhals should be made fully to comprehend the meaning and use of police laws, and judicial courts, for this they have never yet underestood. We have seen many anecdotes of their extreme astonishment at witnessing, during recent operations the arrest and punishment of lordly Bengalee baboos who used to be their irresponsible tyrants. That all tyranny, therefore is illegal and that redress on that account is sure to be had, they should be led clearly to see and understand. The several new offices being created in the new official district should be under under the guidance of a single superior, sensible and experienced; one, as it has been expressed :—

"Who unites soldierly activity and nerve, great calmness of judgment, and immoveable tenacity of purpose. he may raise a race from barbarism to civilization, turn a countrry of jungle and ravine into a fortile province. And the man who makes rebellion impossible by the devation of the Santhals may claim a place in English opinion by the side of the fore most of Indian names.

We aspire yet to see the Santhal people, endowed with many good and estimable qualities thus devated and hereafter refined and totally restored in public opinion. There is too, another, and a material element of civilization which it is proposed to by.

Mr. Droese, a mussionary has long laboured in Bhugulpore, he is well acquainted with the Santhals; he has borne his testimony, that the Santhal villages which contained the few of that race that have learn

any of the principles of Christianity, were the last to join in the insurrection and then were urged probably by a pressure from without. This grand, this most essential. and by far the most effective element of progress and civilization the Church Missionary Sociely of old England are purposing to introduce. How large and effect must it produce. And amongst the Santhals their are no castes; there are no ancient prejudices on religious points; there are no deterring lies of a pledged faith; of adherence to treaty and expressed or implied promise to hinder the mightly Government of India from active and beneficent cooperation with these benovolent designs. How must the philanthropist, the earnest believer in Christianity, the warm friend and well-wisher of India, and her Governors. both imperial and local. desire that the name of the Government of India may yet the associated with so great and good a cause, that the great Government of Indian may accept the honor and the privilege of a leading participation in such a furtherance of the material welfare of a race, once their bitter and troublesome enemy, but converted in to the most faithful and examplory of her allies. Does she not hear the cry? The echo of a still small voice from those unhappy Jungles? It calls for that which after all, is the only ultimate real want of a nation, as of an individual, doomed to the dust like the countless generations and mighty empires before them, the light of real knowledge, the glory of real life.

Calcutta Review 1856

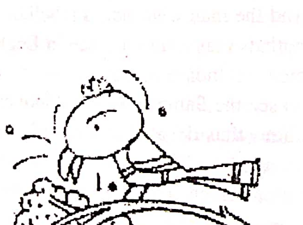

সংবাদপত্র
সাময়িক পত্র
প্রতিবেদন

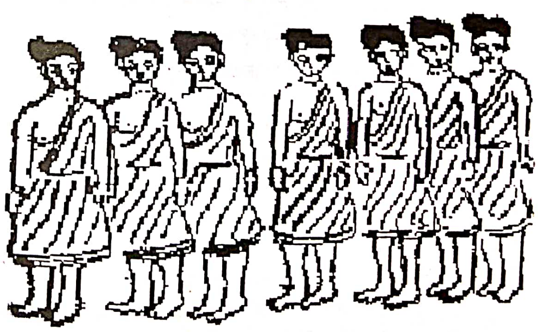

সংবাদ প্রভাকর

২ শ্রাবণ ১২৬২। ১৭ জুলাই ১৮৫৫

সাঁওতাল বিদ্রোহ

রাজমহল হইতে কোন সংবাদদাতা যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার স্থূলমর্ম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন, এই কাণ্ডকে প্রকৃত তিতুমিরের কাণ্ড বলিতে হইবেক। এবিষয়ে আমারদিগের যাহা বক্তব্য তাহা পরে প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব হইল।

অদ্য শ্রুত হইলাম যে জিলা ভাগলপুরের অধীন মোং রাজমহলের পশ্চিম অনুমান ৬। ৭ ক্রোশ অন্তর ভগ্না ডিহি নামক পাহাড়ে প্রায় দশ বারো হাজার পাহাড়িয়া লোক একত্র হইয়াছে, যাহারা ঐ অত্যাচারিদলের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছে তাহারা দুই সহোদর, এক দিবস নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থানপূর্বক এরূপ ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর স্বপ্নে আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া এরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই দেশ তোমারদিগকে প্রদান করিলাম, তোমরা পর্বতীয় লোকদিগের সাহায্যে ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরমসুখে রাজত্ব কর, এই বিষয় কোন ধনাঢ্য যবন শ্রবণ করিয়া উক্ত দেবতার স্থান দর্শনার্থ গমন করাতে তাহারা তাঁহাকে ধৃত করত বন্ধন করিয়া রাখে, এবং ঐ অধ্যক্ষদিগের দলবল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে, ঐ যবন বন্ধনাবস্থায় অতিশয় কাতর হইয়া মিনতি প্রকাশ করাতে ঐ রাজলোভী বুজুরুক ভ্রাতাদ্বয় তাহাকে ক্ষমা করিয়া আপনারদিগের দলভুক্ত করে ও তিনি তাহারদিগের অধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ঐ সম্ভ্রান্ত যবন এই প্রকার পদ প্রাপ্ত হইলে গোপনীয় পত্রদ্বারা দুইজন দারোগাকে তদ্বিশেষ বিজ্ঞাপন করিলেন।

৪ শ্রাবণ ১২৬২। ১৯ জুলাই ১৮৫৫

রাজমহলের পর্বতীয় লোকদিগের অত্যাচার ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়াছে, আমরা মুরশিদাবাদ ভাগলপুর ও আমড়ার রাজধানী হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহা নিম্নভাগে লিখিলাম।

"ভাগলপুর ১১ জুলাই।

সম্পাদক মহাশয়! ভাগলপুর, বীরভূম, রাজমহল, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জিলার পর্বতবাসী অসভ্যলোক সকল একত্র দলবদ্ধ হইয়া রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, মাজিস্ট্রেট সাহেবরা ভীত হইয়া একত্র বাস করিতেছেন, প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করা দূরে থাকুক তাহারা আপনাপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছেন, দুরাত্মারা যেখানে গমন করিতেছে সেইখানেই নির্দয়রূপে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকার প্রাণ বিনাশপূর্বক সর্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্যন্ত দেশ তাহারদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা অন্যূন ষোল হাজার হইবেক, ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে এরূপ ঘটনা কোন কালেই হয় নাই, বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতি ভয়ানক বলিতে হইবেক, সম্পাদক মহাশয় আমি হত-সর্বস্ব হইয়া ছিন্ন বসন পরিধান পূর্বক এক কর্মকারের গৃহে বসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।"

"আমড়া ১৩ জুলাই।

সম্পাদক প্রবর। পর্বতবাসিদিগের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য করিয়াছে বোধহয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করে না, অনল দ্বারা গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথাসর্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, আমি এই বিষয়ে ঐ পর্বতীয় লোকদিগকে বড় দোষি করিতে পারি না। বিবেচনা করিলে গবর্ণমেন্টের প্রতি সকল দোষ অর্পিত হইতে পারে, কারণ নিকটস্থ কোনস্থানে সৈন্য থাকিলে এরূপ হইত না।

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহার যদ্যপি পর্বতের উপর নাগরা ধ্বনি করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যেও ৪। ৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতির মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউক এই ঘটনায় গবর্ণমেন্টের কোন ক্ষতি নাই যে ক্ষতি সে কেবল প্রজার। এই অত্যাচার ব্যাপার আবার কি পর্যন্ত প্রবল হয় তাহাও নিরূপণ করা অসাধ্য, কি কারণে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই। কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় দুইজন যবন বুজরুক ব্রিটীস অধিকার অপরহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপুজা করিয়া তাহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই, কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল, যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।"

"বহরমপুর ১৪ জুলাই।

আমি পুর্বপত্রে লিখিয়াছি যে বিদ্রোহকারিদিগের দমনার্থ এখান হইতে ৫০০ সোয়ার ও ৪০টা হাতি ও দুইটা তোপ গিয়াছে নবাব নাজিম ২০০ সিপাহি দিয়াছেন, তাহারা কোন কালেই সংগ্রামের মুখ দেখে নাই, অতএব, এই অল্প সেনার দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের কোন সম্ভাবনা নাই, একারণ দানাপুরে পত্র গিয়াছে যে স্থান হইতে সেনারা জলপথ দিয়ে রাজমহলে উপস্থিত হইবেক, কলিকাতা হইতেও রেইলওয়ের গাড়িতে সৈন্য আসিবেক দুরাত্মারা দমন হইবেক বটে, কিন্তু তাহারদিগের কোন বিশেষ হানি হইবেক না, পর্বতের উপরে ভয়ানক শালবন আছে তাহারা তথায় গোপন হইলে রাজসেনারা তাহারদের কিছুই করিতে পারিবেন না, সাঁওতাল জাতি অতি ভয়ানক, তাহারা যাহা পায় তাহাই আহার করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, তিরের যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ নিপুণ, আমারদিগের ম্যাজিস্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব অরঙ্গাবাদে অনরবিল মেং ইডেন্স সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, ভাগলপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব তথায় আসিয়াছেন, সেনারা অরঙ্গাবাদ হইতে ঘটনাস্থানের নিকটবর্ত্তি হওয়াতেও দুরাত্মারা ভয় পায় নাই, দুই এক দিবসের মধ্যে সাংগ্রামিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

৫ শ্রাবণ ১২৬২। ২০ জুলাই ১৮৫৫

ইয়ংম্যান্স লিটেরার সোসাইটি নামক সভায় বাবু মধুসূদন মুখোপাধ্যায় "বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের বর্তমান অবস্থা" বিষয়ে যে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা পুস্তকাকারে সম্প্রতি

প্রকাশ হইয়াছে, আমরা তাহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে যে কথার উল্লেখ করিয়াছেন তত্তাবৎ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, দেশীয় প্রথা ও জাতিভেদের নিয়ম উত্তোলন না হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা অনান্য দেশীয় লোকদিগের ন্যায় হইবেক না, আমারদিগের সেই আশা দুরাশা বলিতে হইবেক, তাহা সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা অতি উত্তম হইয়াছে, তিনি যে সকল প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তত্তাবৎ উত্তম বলিতে হইবেক, তাঁহার লেখা কিঞ্চিৎ সরল ও পরিষ্কার হইলে আরো উত্তম হইত আমরা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ ঐ পুস্তকের কিয়দাংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

"বঙ্গদেশীয় নীচজাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা

বহুকালাবধি এই বঙ্গভূমিতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ জাতির বাস, ইহারা অন্যান্য দেশীয় লোকের ন্যায় পদমর্যাদা হেতুক আপনাদিককে উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ জাতিতে বিভক্ত করে নাই, কিন্তু জাতিসঙ্কর নামক ব্যবস্থা গ্রন্থদ্বারা ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব শ্রেণীস্থ লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহার বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপ সকলই সমাধা করিতে থাকে।

বিস্তারিতরূপে লিখিবার পূর্বে ঐ ত্রিবিধ জাতি কাহাকে কহা যায়, ইহা লেখা আবশ্যক বুঝিয়া সভ্য মহাশয়দিগের বিশেষ উপলব্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত আমি উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ জাতির বিষয় কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া বলি।

উত্তম, যথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ছত্রি, কায়স্থ ইত্যাদি যাহাদিগকে লোকসমাজ মধ্যে ভদ্রলোক বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

মধ্যম, যথা তন্তবায়, কর্মকার, কাঁসারি, গন্ধবণিক, সদ্গোপ, তেলি, নাপিত, শঙ্খবণিক, তামলি, মালী, ইত্যাদি। ইহারা লোক সমাজ মধ্যে নবশাখ বলিয়া গণ্য হয়।"

... ...

রাজমহল, ভাগলপুর মুর্‌সিদাবাদ, জঙ্গিপুর অরঙ্গাবাদ, আমড়া, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরাজী পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তদ্দারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে সাঁওতাল জাতিরা কোনকালে রাজ বিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহারা চিরকাল রাজানুগত ও পরিশ্রম তৎপর, তাহারদিগের পরিশ্রমে রাজমহলের পর্বোপরি বিচিত্র উদ্যান ও নগর নির্মিত হইয়াছে, তাহারা কৃষিকার্যের দ্বারা প্রচুর শষ্য উৎপন্ন করিতেছে, মেং পটেণ্ট সাহেব যে সময়ে ঐ পর্বতের রাজস্ব বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময়ে কেবল ৩০০ মাত্র সাঁওতাল জাতি তথায় বাস করিয়াছিল এইক্ষণে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইয়াছে এবং দক্ষিণ পর্বত হইতে সাঁওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে তাহারা বাঙালির ন্যায় ভীরুস্বভাব নহে বলবান এবং সাহসিক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি নানা বিধায়ে অত্যাচার করাতে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

রেইলওয়ে কর্মচারিগণ হুগলি ও বর্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে আগেকার ভীরু স্বভাব লোকেরা কোন আপত্তি না করাতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা সহ্য করিবেক? আমরা অবগত হইলাম যে

রেইলওয়ের কর্মচারিরা সাঁওতালজাতির যুবতি স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া বলৎকার করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাঁচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহাদিগের উদ্যান হইতে বল দ্বারা ফল কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই, সাঁওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবান জাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত তাহারা বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এ কথা কে বলিবেন?

আমাদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে প্রায় ৩০০০০ হাজার পর্বতী-য় লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহারা দুই দলভুক্ত হইয়াছে, একদল বীরভূমাভিমুখে গিয়াছে, অপর একদল সম্মুখস্থ সকল গ্রাম দগ্ধ করিয়া প্রজাদিগের প্রাণ বিনাশ ও দ্রব্যাদি লুঠ করিতে জঙ্গিপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে, তাহারদিগের এমত প্রত্যাশা আছে যে জিয়াগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদ লুঠ করিবেক, কিন্তু এতদিনে বোধহয় রাজসেনারা তাহারদিগের আগমনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, কয়েকজন বিবির প্রতি দুরাত্মারা যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছে তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, কয়েকজন সাহেব হত হইয়াছে।

কমিস্যনর সাহেব এক পলটন্‌ সিপাহি লইয়া বীরভূমাভিমুখে গিয়াছেন, বোধহয় বিদ্রোহকারিরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বে তিনি উত্তীর্ণ হইবেন।

গত দিবস সন্ধ্যার সময়ে সংবাদ আসিয়াছে যে ১৫ জুলাই সোমবার প্রাতে মহেশপুরে রাজসেনারা সাঁওতালদিগকে আক্রমণ করে, তাহাতে প্রথমতঃ তাহারা তির ও বন্দুক ধরিয়া যুদ্ধ করে, পরে রাজসেনারা গুলিবৃষ্টি করাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রস্থান করিয়াছে একশত সাঁওতাল হত ও একশত আঘাতি হইয়াছে, ২৮ জন ধরা পড়িয়াছে। ৫০০ নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া দিয়াছে। রেইলওয়ের কর্মচারি টেলর সাহেব ভালরূপে যুদ্ধ করিয়াছেন। বিস্তারিত সংবাদ আমরা আগামি পত্রে লিখিব।

৮ শ্রাবণ ১২৬২। ২৩ জুলাই ১৮৫৫

মুরশিদাবাদের মাজিস্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব লেপ্টেনান্ট গবরণর সাহেবের নিকট যে পত্র লেখেন তাহা ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যদিও ঐ সংবাদ আমরা অরঙ্গবাদের সংবাদদাতার পত্র দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বেই প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ মেং টুগুড সাহেবের পত্রের মর্ম কিঞ্চিৎ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। "তিনি ১৪ জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়া পলসায় উপস্থিত হয়েন, সেখানে রাজবিরোধীদিগকে দেখিতে পান নাই, তাঁহার গমন করিবার পূর্বেই সাঁওতালেরা ঐ গ্রাম লুঠ করিয়া মহেশপুরাভিমুখে যাত্রা করে, সেনারা ধান্য ক্ষেত্র দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায় কিন্তু পলসাতে তাহারা বিশ্রাম করে নাই, একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায় ৪। ৫০০ সাঁওতালকে আক্রমণ করে, ঐ দলের অধ্যক্ষ সিদু ও কিনু তাহারদিগের আদেশক্রমে সাঁওতালেরা তির ছুঁড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫ জন সেপাই অল্পাঘাতি হইয়াছে। বিপক্ষদিগের একশত হত ও একশত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি বেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেনারা তাঁহারদিগের পশ্চাদ্বর্তি হইতে পারে নাই, মহেশপুরে বিখ্যাত জানকী কুমারীর স্বামী গোপাল সিংহের বাটী ঐ অতি উচ্চ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, দুরাত্মারা তাহা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই।

রাজসেনারা কয়েকখানা পাল্কি, বগিগাড়িন পিত্তল ও কাংশ্য নির্মিত নানা প্রকার তৈজস, রেসম, বস্ত্র ও প্রায় ৪০০ টাকা মূল্যের যুদ্ধাস্ত্র ৭২৬০৪০ টাঃ ১২ আঃ নগদ পাইয়াছে, ২৮ জনকে কয়েদ করিয়াছে, ফলতঃ বিপক্ষেরাও অনেক দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, দুইটি হস্তির উপর বিস্তর নগদ টাকা ছিল তাহা রাজসেনারা লইতে পারে নাই।

ভগ্নাডিহী নামক স্থানে সাঁওতালদিগের ঠাকুর বাটী, টুগুড সাহেব সৈন্য লইয়া সেই স্থানে যাইবেন, যেহেতু ঐ ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে যুদ্ধ সময়ে ইংরাজদিগের বন্দুক হইতে কেবল জল নির্গত হইবেক, ইহাতেই মুর্খ লোকেরা রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এইক্ষণে কিছু দিবস অরঙ্গাবাদ অথবা পলসা কিম্বা মহেশপুরে সৈন্য রাখিতে হইবেক, শীত ঋতুর আগমন না হইলে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে না, কিন্তু যাহাতে উপস্থিত অত্যাচার নিবারণ হয়, এবং দুষ্টেরা প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারে এমন উপায় করিতে হইবেক।

আমরা জঙ্গীপুরের সংবাদদাতার পত্র নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

জঙ্গীপুর ৩ শ্রাবণ

"সম্পাদক মহাশয় সাঁওতাল জাতিরা বেলিয়া ও পলসা ও পুকর ও মহেশপুর ইত্যাদি কতিপয় গ্রাম দগ্ধ ও লুট করিয়া বহু প্রজার প্রাণ বিনাশ ও অর্থ এবং দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্বক জঙ্গীপুরাভিমুখে আগমন করিতেছে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকে ছেদন করিতেছে, লোকসকল নিজ নিজ গ্রামাদি হইতে পলাইয়া আসিতেছে, জঙ্গীপুর এবং নিকটস্থ গ্রামাদিতে দুই তিন হাজার লোক আসিয়াছে, এখানকার লোকেরাও সুস্থ নহেন কখন কি হয় কখন কি হয় এ চিন্তায় তাহারা এক প্রকার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, বহরমপুর হইতে ৫০০ সিপাহি মহেশপুরে গিয়া ২। ৩ শত সাঁওতালকে হত করিয়াছে, অধুনা তাহারদিগের দলে কতলোক আছে এ পর্যন্ত তাহা নিশ্চয় হয় নাই। এই প্রকার অত্যাচার ব্যাপার কোনকালে শ্রুত হই নাই, যে সকল লোক এখানে আসিয়াছে তাহারদিগের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়।"

বর্ধমানের সংবাদদাতার পত্র নিম্নভাগে প্রকটিত হইল—

"আমারদিগের এই বর্দ্ধমানবাসি ধনি ও দুঃখি সকলেই অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছেন, তদ্ধেতু এই, ধনি লোকেরা আগত রাজবিদ্রোহী পর্বতীয় সাঁওতালগণের দৌরাত্ম্য সংবাদ শ্রুত হইয়া ধন, মান, প্রাণ রক্ষার বিবিধ প্রকার উপায় চিন্তা করিতেছেন, যথা কেহ বা দ্বারদেশে নিয়মিত প্রহরির দশ গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন, কেহ বা মৃত্তিকা খনন পূর্বক অর্থ লুক্কায়িত করিয়া কেবল ত্রাহি মধুসূদন ত্রাহি মধুসূদন এই শব্দ করিতেছেন কেহ বা সংবাদ পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্থির রহিয়াছেন, কেহ বা কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্য কত গুলিন গেল তাহারি সংবাদ রেইলওয়ে স্টেসনে জানিতেছেন, ইত্যাদি প্রকারে মহা কোলাহল রব উঠিয়াছে, ধবল রাজপুরুষেরা অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বন্দুক ও বারুদ আদি আগ্নেয়াস্ত্র সুশোভন করিতেছেন, সাঁওতাল জাতীয়দের গুরুতর কোপ কেবল তাঁহারদের উপর, বীরভুম, রাজমহল আদি অনেক জিলায় রেইলওয়ে সংক্রান্ত কয়েকজন সাহেব ও বিবিকে

অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং বীরভূমের মাজিস্ট্রেট সাহেব অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছেন, শুনা গেল যে তিনি দশ সহস্র সাঁওতাল জাতির মধ্যে পতিত হইয়াছেন, এবং তাহার জীবনের আশাও বিপথগামী হইয়াছে, এই সকল কারণ বশতঃ অনেক সিপাহি ঐ অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এক নিদারুণ বিচার, আগত শমন সম দুরাত্মাগণের আগমন বার্তায় প্রজাগণের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া তাহাদিগকে ভরসা দেওয়া ও সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক অদ্য তিন দিবস হইল বেগার ধরার হেঙ্গামায় দুঃখিজন মাত্রেই দ্বারের বাহির হইতে পারে নাই, কি আশ্চর্য! তাহারা দুঃখিলোক দৈনিক শ্রমের প্রতি তাহাদের উপজীবিকার নির্ভর, সুতরাং তাহাদের দৌরাত্ম নিবারণ না হওয়ায় তাহারা সপরিবারে অন্নাভাবে সমূহ ক্লেশ পাইতেছে, শুনা যায় সাত শত কুলির আবশ্যক, ইহাতে কেবল নীচ জাতীয় ব্যক্তিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, এমত নহে, বর্ধমান বাসিন্দা ও কার্যোপলক্ষে স্থায়ি লোকেরদের প্রতিও দৌরাত্ম হইতেছে, কারণ ভদ্রলোকেরা স্বয়ং যাইয়া হাট বাজার করিয়া আনিতে পারেন না, চাকরদিগ্যে যাইতে হয়, কিন্তু ঐ হেঙ্গামায় তাহারও প্রাণভয়ে যাইতে অসম্মত, এজন্য তাহাদিগের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে অপিচ অনেক লোকের ভৃত্যকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, নীচ জাতিদিগের প্রতি অত্যাচারের কথা কি কহিব, কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাজারে গিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ধৃত করে, তাহাতে তাহারা মিনতিপূর্ব্বক কহেন যে হে বাপু আমরা ব্রাহ্মণ আমরা যাইয়া কি করিব, তাহাতে কোম্পানির লোকেরা উত্তর কিরল যে বেগারদিবার প্যাঁচ কি কেহ নাই, তোমাদিগকে তদুপলক্ষে যাইতে হইবেক বলিয়া লইয়া গেল, আর কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ঐ মতে ধৃত করিয়া ছিল, তাহারা অতিশয় বলবান এজন্য "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" ঔষধ অবলম্বন করিয়া অতিবেগে তাহাদের হস্ত ছাড়াইয়া প্রস্থান করিল। হায় ক্ষমতাবানের নিকট সকলেই নত, শ্রীলশ্রীযুত বর্ধমান অধীশ্বরের কয়েকজন বেহারাকে ধৃত করিয়াছিল, এই সংবাদ শ্রীযুতের কর্ণগোচর হইবামাত্র মাজিস্ট্রেট সাহেবকে তৎক্ষণাৎ এক চিটি লেখেন যে এ প্রকার দৌরাত্ম আমার চাকরদিগের প্রতি হইলে তোমাদের অতিশয় দুর্নাম হইবেক, অতএব যাহাদিগকে ধৃত করা হইয়াছে তাহারদিগ্যে অবিলম্বে প্রেরণ করিবে, উক্ত সাহেব ক্ষণকাল গৌণ না করিয়া তৎলিপি পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং এইমত হুকুম প্রচার করিলেন যে ভবিষ্যতে কেহ মহারাজার সম্পর্কীয় লোকদিগকে আক্রমণ না করে তদবধি অনেকেই অধীরাজ বাহাদুরের দোহাই দিয়া ইংলণ্ডীয় শমন হস্ত হইতে কিমতে পরিত্রাণ পাইবেক তাহার কোন রাহা দেখি না। বর্ধমান স্থানস্থ রাজপুরুষেরা আপনাদিগের রক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই, প্রজাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি কি হইবেন তবে এক উপায় দেখিতেছি যে বর্ধমানাধিপতির মনোভিনিবেশ হইলে বর্ধমান বাসিরা নিরাপদে থকিতে পারে, না করুন যদি এমত কোন বিপদ উপস্থিত হয় যে বর্ধমান বাসিয়া নিরাপদে থাকিতে পারে, না করুন যদি এমন কোন বিপদ উপস্থিত হয় যে বর্ধমান ছারখারে যাইবার সম্ভাবনা তাহা হইলে শ্রীযুতকে অবশ্যই বর্ধমানবাসিগণের রক্ষার উপায় করিতেই হইবেক, অতএব আমাদের অভিলাষ যে আমাদের কর্তা যেন গবর্ণমেণ্টের শান্তি রক্ষার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত না থাবেন। হে সম্পাদক মহাশয়! তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলে বর্ধমানবাসিগণকেও নিশ্চিন্ত

পুরবাসি হইতে হইবেক দাদার যে মত বন দিদির পাদপদ্মে প্রকাশ আছে, জিলাস্থ শান্তিরক্ষকদিগের যাদৃশ ক্ষমতা তাহা দেখা যাইতেছে, যে সকল গ্রাম বা দেশে ঐ সাঁওতাল জাতিদিগের আসিবার কল্পনা হইতেছে তত্রস্থ লোকেরা প্রাণভয়ে পুর্ব্বাহ্নেই পলায়ন পরায়ণ হয়, ইত্যবধানে তাহাদের ভরসা আমরা সামান্য করি, পরে যেমন হয় সংবাদক হইব নিবেদন

সোং বর্ধমান

৪ শ্রাবণ ১২৫২

কেষাঞ্চিৎ ভীত জনানাং।"

বীরভুম হইতে আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উক্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহার সমভিব্যাহারে হয়, হস্তি, পদাতিক, ডঙ্কা, শিবিকা, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং তাঁবু কানাত রেসালা লোক বিস্তর চলিয়াছে, ফলতঃ তাহার এই ভ্রমণদ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে তাহা আমরা কিছুই বিবেচনা করিতে পারি নাই, এ দিগে তাহার বিবেচনা দোষে সাঁওতালেরা পুনর্ব্বার সাহসিকরূপে অস্ত্রধারণ করত নির্দোষি প্রজাদিগের প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, বিজ্ঞলোকেরা একবার যে বিপদে পতিত হয়েন তাহাতে অবশ্য সাবধান হয়েন, সুতরাং সেই বিপদ পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার এক প্রকার বিপদগ্রস্ত হওয়াতে আমরা অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি, আহা কি আক্ষেপ! তাঁহারা অসভ্য সাঁওতালদিগের ভয়ানক অত্যাচার হইতে এ দেশের ভীরুস্বভাব, নির্দোষ লোকদিগকে রক্ষা করিবেন না, কি আশ্চর্য! এক দিবস হইল আমারদিগের গবরনর জেনেরল সাহেব কলিকাতা গেজেট পত্রে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাঁওতালীয় অত্যাচার সম্যক্‌রূপে নিবারণ হওয়াতে তিনি সেনাপতি লাইয়াড সাহেব ও তদধীন সেনানী ও সেনাদিগকে প্রণাম দিলেন, লার্ড সাহেব বিলাত গমন সময়ে স্বজাতি সমাজে মান্য হইবার নিমিত্তও ঐ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, কোথায় সাঁওতালীয় বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে? লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব দেশভ্রমণের আমোদ কেন এত টাকা মিথ্যা ব্যয় করিতেছেন? তিনি রাজ্যের অবস্থা দর্শন করণের ছলনার আমোদ প্রমোদ করা পরিত্যাগ করিয়া যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, যথানিয়মে তাহা নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ পরিষ্কার করুন, অত্যাচারিদিগের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় দেখুন।

—*সংবাদ প্রভাকর*, ৭.২.১৮৫৬

ইংলিসম্যান পত্রে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে একজন সাঁওতাল-পত্নী সাঁওতালদলের অধ্যক্ষ হইয়া তাহারদিগকে চালনা করিতেছে, দুরাত্মারা তাহাকে ঈশ্বরীর ন্যায় মান্য করে ও পূজা করিয়া থাকে, ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ, রণকৌশল বিলক্ষণ জ্ঞাত আছে, সে রাজসেনাদিগকে দেখিলে এমত সুকৌশলে আপন দলবল লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে ও গোপন হয়, যে সেনাপতির কোনক্রমেই তাহারদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে না।

সংবাদ প্রভাকর ১. ২. ১৮৫৬

২৯ পৌষ ১২৬২

এই রাজ্যের নতুন রাজা শিবসহায় ভকতের দ্বিতীয় আজ্ঞাপত্র

"রামজুলল এই দেশ জয় করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে জানাইতেছি যে জজ ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরেরা আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন কিনা তাহা তুমি আমাদের জানাইবা, তাঁহারা যদ্যপি আমাদিগের সুবা আক্রমণ করেন, তবে রাইয়তদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক, আর ইংরাজ সেনারা যদ্যপি আগমন করে তবে তাহাতেও রাইয়তদিগকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক, অতএব ইহা কর্তব্য হয় যে কেবল কিশোরী সুবা ও ইংরাজেরা পরস্পর যুদ্ধ করিবেক, তাহা হইলে রাইয়তদিগকে কোনপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইবেক না, অতএব এই পত্রের স্পষ্টানুমতি প্রেরণ করিবে, আর এই অনুমতি যাহারদিগের উদ্দেশে প্রেরণ করা গেল ডাকযোগে তাহারদিগকে ইহার স্থূল বিবরণ জ্ঞাত করিবে।

এই পত্র সিরিস্তাদারের নিকট প্রেরণ করা গেল।

সংবাদ প্রভাকর ২৩ পৌষ ১২৬২

৩০ পৌষ ১২৬২" পূর্ণিমা সোমবার"

গবরনর জেনরল সাহেব ঘোষণাপত্র দ্বারা ৰ্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ হইয়াছে, কিন্তু সাঁওতালেরা মনে মনে জানিয়াছে যে তাহারা দেশ জয় করিয়া বসিয়াছে, ইংরাজেরা তাহারদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়াছে। সাঁওতালদলের একজন অধ্যক্ষ শিবসহায় ভকত সংগ্রামপুরের নীলকুঠির অধিকারী মেং গ্রান্ট সাহেবকে যে অনুমতি পত্র প্রেরণ করে, আমরা নীলকরদিগের গত সভার বিবরণ হইতে তাহা অনুবাদপূর্ব্বক নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম, এতৎ পাঠে পাঠকগণ ঐ দুরাত্মাদলের সাহসের বিষয় বিলক্ষণ জানিতে পারিবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে যত শাসন করিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

"অনুমতি করিতেছি যে এই আজ্ঞা পত্র প্রাপ্তানন্তর তুমি দ্রব্যাদি লইয়া কুঠি ছাড়িয়া প্রস্থান করিবে। ইহাতে যদ্যপি সম্মত না হও অথবা কোন আপত্তি কর তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবেক না। এই আজ্ঞাপত্র দ্বারা তোমাকে জানাইতেছি যে আমারদিগের সেনারা বুধবার দিবসে তোমার কুঠি অধিকার করিবেক। তাহার প্রজাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিবেক না, বরং বাহুবলে তাহারদিগকে রক্ষা করিবেক।

সংগ্রামপুরের নীলকর সাহেব এই উভয়পত্র অনুবাদ সহিত কলিকাতাস্থ সভায় প্রেরণ করিলে ঐ সভার বিজ্ঞবর সম্পাদক মেং ডাবলিউ থিওবোল্ড সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেবের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করেন আমরা তাহা অনুবাদ পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সিসিল বিডন সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের
সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু
বংশাল ষ্ট্রীট ২ ফিব্রুআরি ১৮৫৬।

মহাশয়। আমি নীলকরদিগের সভার নিয়োজিত কমিটির আদেশমতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিদিতার্থ অদ্য তারিখের এক পত্র এবং সাঁওতালেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করাতে উক্ত কমিটি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহার নকল প্রেরণ করিতেছি। ঐ দুরাচারিদিগের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত এবং তাহারা অধিক দেশ আক্রমণ করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে কমিটি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে শীঘ্র সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আবশ্যক করেন এ কারণ এই প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করা গেল। অতএব যাহাতে গবরনর জেনরল সাহেব হজুর কৌন্সেলে এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আরো মনোযোগ করেন আপনি অবশ্য তাহার সদুপায় করিবেন।

আমি মহাশয়ের নিতান্ত বাধিত ও ভৃত্য
ডাবলিও থিওবোলড।
নীলকরদিগের সভার সেক্রেটারী।"

হে পাঠকগণ উপরিউক্ত পত্রত্রয়ের সহিত গবরনর জেনরল সাহেবের প্রকাশিত ঘোষণাপত্রের ঐক্য করিলেই তাহার অমূলকত্ব জানিতে পারিবেন। সাঁওতালি বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে বলিয়া গবরনর জেনরল সাহেব সেনানী ও সৈন্যগণের সাধুবাদপূর্ব্বক যে প্রণাম জানাইয়াছিলেন তাহারা তাহার যোগ্য হইলেন না, ফলতঃ ঐ বিষয়ে সেনাপতি ও সেনাদিগের কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, গবর্ণমেণ্টেরই সংপূর্ণ দোষানুভূত হইতেছে, যেহেতু ঐ সেনারা গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারেই কার্য করিয়াছে, ঐ বিদ্রোহানল নির্বাণ করিবার ভার যদ্যপি প্রধান সেনাপতি সাহেবের প্রতি অর্পিত হইত, তবে এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব যিনি কোনকালে সংগ্রামের মুখ দেখেন নাই; তাহার প্রতি ভারার্পিত হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞবর মেং হালিডে সাহেব জিলার মাজিস্ট্রেট ও কমিস্যনর সাহেবদিগের প্রতি পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করাতেই আরো অন্যায় হইয়াছে, তিনি সেনাদিগকে ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কেন আদেশ করিলেন! তাহার বিবেচনা দোষে ঐ অঞ্চলের প্রজারা পুনর্ব্বার গুরুতর বিপদগ্রস্ত হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

সংবাদ প্রভাকর ৭. ২. ১৮৫৬

মাঘ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ ১২. ২. ১৮৫৬

অসভ্য সাঁওতালেরা পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতি গুরুতর অত্যাচার আরম্ভ করে।...সাঁওতালেরা দলবদ্ধ হইয়া সংগ্রামপুরে মেং গ্রান্ট সাহেবের নীলকুটি লুটিয়া লয়।...একজন সাঁওতালপত্নী সাঁওতালদলের অধ্যক্ষের পদে অভিসিক্তা হইয়া তাহারদিগকে রণস্থলে চালনা করিতেছে।...সাঁওতালদলের অধ্যক্ষ শিবসহায় ভকত গবর্নমেণ্টকে এরূপ

সন্তালদলের গোল নিবারণের উপায় কি

আমরা ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না ইংরেজেরা কি উপায়ে সন্তালদলকে পরাভুত করিবেন জিলা পুরণীয়া অবধি মেদনীপুরের দক্ষিণ পর্যন্ত পর্বত শ্রেণী গিয়াছে, সন্তালেরা পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ঐ সকল পর্বত শ্রেণীতে সারিবদ্ধ রূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, পর্বত নিম্নস্থ উপত্যকা নিবাসি অনেক প্রজাকে হস্তগত করিয়াছে, যাহারা তাহারদিগের পরামর্শ গ্রহণ করে নাই তাহারদিগের বাড়ি ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং অনেক প্রাণিকে কাটিয়া ফেলিয়াছে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক তিন মাসের মধ্যেই সন্তালাবলী পাহাড়তলী সকল অধিকার করিয়া লইবে ইংরাজেরা তোপ গোলা গুলি সৈন্যাদি যতই প্রেরণ করুন ইহার মধ্যে কোন রূপেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিবেন না, তাহারা পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ায়, নিম্নভূমিতে সম্মুখ সমরে আইসে না, ইংরাজী সেনাগণকে জলাভূমি দিয়া চলিতে হয় তাহাতে অশ্ব গজ উষ্ট্রাদি যাইতে পারে না, তোপ গোলা গুলির গাড়িও চলে না, বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্যেরাও ধান্য ভুমি দিয়া গমন করিতে পারে না অসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে ইহাতে ইংরাজেরা কি করিতে পারিবেন, শীতকাল না আসিলে সন্তালকুল নির্মুলি হইবেক না, মান্দ্রাজীয় সৈন্য সকল আগমন করিতেছে এবং উত্তমাশা অন্তরীপে কাফ্রিদিগের দমনার্থ যে সকল সৈন্যেরা গমন করিয়াছিল তাহারাও আসিতেছে দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আমারদিগের ১৫ । ১৬ সহস্র সৈন্য সন্তালীর বিদ্রোহ স্থলে একত্র হইবে কিন্তু বর্ষাকালে সমর করিতে পারিবেক না অতএব দুঃখি প্রজা সকল সাবধান হউক, রাজার সাধ্য নাই কি করেন, এ দুঃসময়ে প্রজাসকলকে উপরিস্থ মহারাজ রক্ষা করিবেন।

১০. ৮. ১৮৫৫

রাণীগঞ্জ ৪ আগষ্ট। ৫০ সংখ্যক পদাতিক দলের কিয়দাংশ সেনা লইয়া লেপ্তেনন্ত ফুক্স সাহেব বাঁশকুলি হইতে সুরীতে যাত্রা করিয়াছেন এবং লেপ্তেনন্ত এণ্ডরসন সাহেব ৪টা তোপ সহিত বাষ্পীয় শকটে অদ্য এখানে উপনীত হইলেন তিনি কাপ্তান আলেকজাণ্ডার সাহেবের অধীন রামগড় অশ্বারোহী দলের দুই কোম্পানি সেনা সহিত সুরী গমন করিলেন, এই সকল সেনা গেলে সুরীতে ৮০০ পদাতিক ৬০ জন অশ্বারোহী ও ৪টা তোপ একত্র হইবে নদীর এপারে একটি সন্তালও দেখা যায় না কিন্তু বোধ হয় পরপারে তাহারা দলবদ্ধ হইতেছে।

আমরা পূর্বে ইংরাজি পত্র প্রমাণে লিখিয়াছিলাম সুরী লুঠ হইয়াছে, এক্ষণে তাহা মিথ্যাবোধ হইল।

ফতেপুর বীরভূম ৩১ জুলাই

সন্তালেরা নিতান্ত ভীত, তাহারা কেবল স্ত্রী বালক বৃদ্ধাতুর এই সকল লোকের উপর নির্দয়তা করে, জেলা বীরভূমে কিছু দিন ৪। ৫ রেজিমেন্টে সেনা স্থানে স্থানে না রাখিলে শাসন হইবেক না, এ স্থানের ৩। ৪ ক্রোশ ব্যবধানে তাহারা এক নূতন রাজা করিয়াছে সন্তালেরা জঙ্গল ছাড়িয়া অধিকদূরে যায় না, আর অধিকলোক একত্র থাকে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া কেবল দেশ লুণ্ঠন করে, কোন কর্মে তৎপরতা ও সাহস নাই, যাহারদিগের সাহস আছে তাহারাও শিক্ষিত নহে, উক্ত প্রদেশের দারগাদি পোলিস আমলা

ও জমিদার এবং গ্রামস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই পলায়ন করিয়াছে, রেইলওএ কার্য বন্ধ হইয়াছে, রাজমহলে প্রদেশে সন্তালীয় দৌরাত্ম্য আরো ভয়ানক, সুরীর নিকটে অনেক সন্তাল সকল সমবেত হইয়াছে।

১০. ৮. ১৮৫৫

রামপুর হাট হইতে ইংলিসম্যান পত্রের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে তিন স্থানে সাঁওতালদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছে! জিনিপুরে যে সংগ্রাম হয় তাহাতে লেপ্টেনান্ট লার্ড সাহেব ৫ জনকে হত করেন, মালহাটির যুদ্ধে কাপ্তেন জেরিস সাহেব ৫ জনকে হত করিয়াছে, কিন্তু তাহার অধীনস্থ চারিজন সেপাহি আহত হইয়াছে বামনী খালের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রামে অপর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে কতিপয় সাহেব ও চাপরাসি বন্দুক এবং শূকর শিকারের বরশা ধরিয়া যুদ্ধ করত দুই জনকে হত করিয়াছে, কিন্তু বিপক্ষেরা গ্রাম লুঠ করিয়া অনেক দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে।

এ অঞ্চলের কোন স্থানেই লোক নাই, সকলেই প্রাণ ভয়ে প্রস্থান করিয়াছে এবং যাহারা ছিল, তাহারা হত হইয়াছে। নারায়ণপুর নামক গ্রামে ১০০০০ প্রজা ছিল, তাহারদিগের অধিকাংশ ধনাঢ্য, তাহারা কেহ নাই। স্থানে স্থানে মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহাদি সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে। কমিস্যনর সাহেব ও ইঞ্জিনিয়র সংক্রান্ত কর্মচারি মেং বরবেল সাহেব এখানে ছিলেন, গত দিবস সিউড়িতে গমন করিয়াছেন, আমরা এইস্থান দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতেছি, কয়েকটা তোপ পাইয়াছি কিন্তু সেনা নাই, ২৫ জন সাহেব এবং ৬২ জন সেপাহি ও তাহারদিগের অধ্যক্ষ দুই জন সাহেব মাত্র আছেন। চাপরাসিদিগের সংখ্যা প্রায় ১০০ হইবেক, তাহার মধ্যে ১৫ জন বন্দুক ছুড়িতে পারে। অতএব আমরা পলায়ন না করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছি, আমারদিগের ভাগ্যে কি হয় বলা যায় না।

সাঁওতালেরা প্রায় প্রতি দিবস দুই এক গ্রাম লুঠ করিতেছে, আমরা অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতার পত্র স্থানাভাব জন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

১১. ৮. ১৮৫৫

গত প্রকাশিতের শেষ

তাহারা প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র লোক পর্বত হইতে অবরোহণ করিয়াছে এবং দলত্রয়ে বিভক্ত হওত একদল ভাগলপুরাভিমুখে একদল মুরশিদাবাদ অঞ্চলে ও অন্য দল বীরভূম প্রদেশে গমন করিয়া প্রজাবর্গের প্রতি গুরুতর দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে সম্পাদক মহাশয় তাহারদের অত্যাচারের বিষয় শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় কম্পিত ও শোক সলিল উপস্থিত না হয়। তাহারা করে করাল করবাল ধারণ পূর্বক নির্দোষ প্রজাপুঞ্জের কণ্ঠনিঃসৃত শ্রোণিত প্রবাহে পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতেছে সদ্যপ্রসূত শিশুকে জননীর ক্রোড় হইতে বল দ্বারা গ্রহণ করিয়া নির্দয়াচিত্তে তৎপ্রসূতার সম্মুখেই অসি দ্বারা বিনষ্ট করিতেছে পলায়ন অসমর্থ পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়স্ক জরা জীর্ণেন্দ্রিয় বৃদ্ধদিগকে নিষ্ঠুরচিত্তে শমন নিকেতনে প্রেরণ করিতেছে, গ্রামে গ্রামে প্রজাগণের সর্বস্ব হরণ করিয়া গৃহে অনল প্রদান করত ভস্মীভূত করিতেছে, এবং কত কত পথশ্রান্ত ক্লান্ত পান্থদিগেরও কেশাকর্ষণ করিয়া শিরচ্ছেদন করিতেছে। হায়! রাজমহল হইতে দক্ষিণভিমুখে ত্রিশ ক্রোশ পর্যন্ত কি মানব কি ইতর প্রামী কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, গ্রাম সকল কেবল মৃতদেহ পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধে কাহারো গমনাগমনে

সাধ্য হয় না যাহারা কোন প্রকারে পলায়ন পরায়ণ হইয়া স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন তাহারদেরও ক্লেশের পরিসীমা নাই, কেহ বা একবস্ত্র হইয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করত কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন, কেহ বা আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু বান্ধবগণের শোকে অভিভূত হইয়া দিবা বিভাবরী রোদন করিতেছেন, কেহ বা হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া উন্মাদ প্রায় হওত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এবং কেহ বা কি হইবে কোথায় যাইব এই চিন্তায় আকুল হইয়া ক্ষণে বিলাপ করিতেছেন। এখানকার শান্তিরক্ষক মহাশয়েরা প্রথমতঃ পাঁচশত সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া তাহারদের দমনার্থ গমন করেন এইক্ষণে বারাকপুর হইতে এক হাজার ও দানাপুর হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য উপরোক্ত সৈন্যের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এ স্থলে এ প্রদেশস্থ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত ঢুগুড সাহেবকে মুক্তকণ্ঠে শত শত ধন্যবাদ করিতে কদাপি বিমুখ হইব না তিনি শারীরিক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও এ প্রদেশকে...অবিনীত অসভ্য সাঁওতালদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। শ্রুত হইল উক্ত মহাত্মা এক দিবস অনাহারী থাকিয়া তাহারদের অন্বেষণে এবং স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে তাহারদের কতককে হত্যা করিয়াছেন ও কতককে ধৃত করিয়া বহরমপুরে প্রেরণ করিয়াছেন, শত্রুদলের আক্রমণ নিবারণার্থ অদ্যাপি উক্ত মহাশয় রাজমহলে অবস্থিতি করিতেছেন, বোধ করি অনতি বিলম্বেই সাঁওতালকুলকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে যাহা হউক পরে যাহা হইবে আপনারদিগকে অবগত করাইব।

২১. ৮. ১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার

২৯ দিবসীয় রাণীগঞ্জের পত্রে প্রচার হয় সন্তালেরা স্বীয় স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিতেছে, সমুদায় সন্তাল স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ও শস্যাদি খাদ্য দ্রব্য ও লুণ্ঠিত দ্রব্য এবং অন্যূন ৫০০০০ হাজার গোমহিষাদি সহিত পলায়নোম্মুখ হইয়াছে তাহার দিগের সংখ্যা দুই লক্ষের ন্যূন হইবেক না, প্রায় ৩০০০০ সহস্র বিপক্ষ আফজনপুরের দিগে গমন করিতেছে, গাড়ি গরু ইত্যাদি যথা সর্বস্ব সঙ্গে লইয়াছে এ জন্য শীঘ্র শীঘ্র যাইতে শক্ত নহে, বগুড়া অবধি গোবিন্দপুর পর্যন্ত স্থানের ট্রাঙ্ক রোডের সর্বত্র সিপাহি ও অশ্বারোহী পাহারা নিযুক্ত হইয়াছে, গত দিবস পোলিস প্রহরিরা চারটি সন্তাল রমণীকে ধরিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের প্রত্যেকের ক্রোড়ে দুই একটী শিশু আছে...

২৮. ৮. ১৮৫৫

রাজমহল হইতে সন্তালেরা সিংভূম মানভূম গমনের উদ্যোগ করিতেছে, এই কালে যদি সিপাহিরা তাহারদিগের উপর আক্রমণ করে তবে লুঠিত দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া অধিক সংখ্যক বিদ্রোহীকে হতাহত করিতে পারে এবং দুরাত্মারা বিলক্ষণ শিক্ষা পায়।

২৮. ৮. ১৮৫৫

ঘোষণা পত্র

যে সমস্ত সাঁওতাল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া বহু গ্রাম লুট ও নষ্ট করিয়াছে এবং সেনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসিক হইয়াছে তাহারদিগের মধ্যে অনেকে আপনাপন দোষ অনুধাবন করিয়া...ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে এবং পূর্ব মত আপনাপন দেশে গিয়া অবস্থান করণে সম্মত আছে গবর্ণমেণ্ট প্রজা বিনাশের

মানস করেন না, সকল অবস্থাতেই প্রজার কুশল চিন্তা করেন, ঐ সকল ব্যক্তি কূলোকদিগের কুহক চক্রে ও কুপরামর্শে এই অহিতাচারে প্রবিষ্ট হয়িাছিল অতএব গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন তাহারা এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইলে পর দশ দিবসের মধ্যে গবর্নমেণ্টের নিয়োজিত কোন বিশেষ কর্মচারির নিকটে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, তাহারদিগের মধ্যে যে সকল প্রধান লোক আছে অর্থাৎ যাহারা এই কুপরামর্শ দিয়াছে বা কোনরূপ হত্যা করিয়াছে বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ হইলে তাহারদিগের দণ্ড করা যাইবেক, যাহারা গবর্ণমেণ্টের পদানত হইবেক তাহারদিগের নিকট হইতে এক এক মুচলখা লিখিয়া লওয়া যাইবেক, এবং তাহারা আপনাপন দেশে গমন করণের অনুমতি পাইবেক, কিন্তু এই ঘোণাপত্রের পর দশ দিবসের মধ্যে যাহারা গবর্নমেণ্ট সংক্রান্ত, কোন কর্মচারির সমীপস্থ না হইবেক তাহারদিগের প্রতি উচিত দণ্ড বিধান করণে সেনারা ক্ষান্ত হইবেক না। এ সি বিডোএব।

৭.৯.১৮৫৫

প্রেরিত পত্র

"বিনয় পুরঃসর নিবেদন মিদং ইদানীং পর্ব্বতীয় সাঁওতাল সংজ্ঞক লোকদিগের দৌরাত্মের বিবরণ কি নিবেদন করিব। অশাসিত রাজ্যের ন্যায় বহুগ্রাম এবং সৎপল্লী রাজধানীত্যাদিতে স্বেচ্ছাচার পূর্বক স্থানে স্থানে চারি পাঁচ সহস্র সাঁওতাল একত্রীভূত হইয়া প্রায় ধনুর্বাণ ধারি সকলেই, ক্বচিৎ চক্র কুঠারাদি লইয়া বল পূর্বক প্রজা সকলের ধন ধান্যাদি হরণ এবং গ্রামাদিতে অগ্নি প্রদান এবং গোমহিষাদি হরণ বরং বহু প্রজাগণের প্রাণ হিংসা পর্যন্ত করিয়াছে এবং বহু গ্রাম হইতে বহু প্রজাগণ প্রাণ মানের ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া কেহ দূর স্থানে কেহ গ্রামান্তর ক্বচিৎ দেশান্তর পলায়ণ করিয়াছে যদিচ বীরভূম জিলার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব কতকগুলিন হিন্দু স্থানীয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধ সজ্জায় আছেন, কিন্তু তাহাতে বিপক্ষগণ পরাভূত হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় এতৎ প্রদেশে অকস্মাৎ এবম্ভূত দুর্নিবার দৌরাত্ম্য বর্তমান হওয়াতে প্রজাগণের বিনাশ ও ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যদি মহামহিমান্বিত শ্রীল শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর প্রজাগণের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া ইংলণ্ডীয় সৈন্য দুই তিন পল্টন প্রজা রক্ষার্থে এতৎ প্রদেশে প্রেরণ করিলে বোধ করি দেশ রক্ষা হইতে পারে নচেৎ স্বামিহীনের ন্যায় অশাসিত এবং দুর্দান্ত ভয়ে ভীত হইয়া সকলে আছেন, অধিক লিপিবাহুল্য অনুগ্রহ প্রকাশ পূরঃসর এই সংবাদ স্বীয় পত্রে বিকাশ করিবেন। শ্রীলাল মোহোন ঘোষ

১২. ৯. ১৮৫৫

আমরা অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতা মহাশয়ের পত্র নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"সম্পাদক মহাশয় মহেশপুর হইতে ৫। ৬ ক্রোশ অন্তর আমতা পা নামক স্থানের পাহাড়ে প্রায় ৫। ৬ সহস্র সাঁওতাল অস্ত্র ধরিয়া একত্র হইয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া চারিজন কাপ্তেন সাহেব ৩১ গণিত সেনাবলির ৪০০ সিপাহি লইয়া তাহার দিগকে দমনার্থ গমন করিয়াছেন। যেরূপ ঘটনা হয় মহাশয়কে পরে বিদিত করিব, সেনাদলের প্রধান

অধ্যক্ষ মেজর সাহেব এই অরঙ্গাবাদে সেনাদলের শিবির স্থাপন পূর্বক অবস্থান করিতেছেন, এ পর্যন্ত সাঁওতালীয় উপদ্রব নিবারণ হয় নাই, ৫। ৭ হাজার সিপাহি আসিয়াছে বটে, তাহাতে তাহারা ভীত হয় নাই সেনারা ১০০ সাঁওতাল এখানে ধরিয়া আনিয়াছে।

১৩. ৯. ১৮৫৫

কোর্টঅফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা গাবনর জেনরল সাহেবকে সংপ্রতি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি নীলগিরি পরিত্যাগ পূর্বক শীঘ্র কলিকাতা রাজধানীতে আগমন পূর্বক অসভ্য সাঁওতালদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশীয় নিরিহ প্রজা দিগের ধন প্রাণ রক্ষা করিবেন এবং যে পর্য্যন্ত নূতন জেনরল লার্ড কেনিংসাহেব কলিকাতায় উত্তীর্ণ না হয়েন না সে পর্যন্ত অন্যত্র গমন করিবেন না।

এই সংবাদ দ্বারা পাঠকবর্গ অবগত হইবেন যে সাঁওতাল জাতিরা বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে বিলাতের কর্তৃপক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন, এবং ঐ বিষয় লইয়া বিলাতের রাজনীতিজ্ঞ লোকেরা যখন বাহুল্যরূপে আন্দোলন করিতেছেন তখন তাহা হৌস অফ কমন্স নামক প্রজা প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের শীঘ্র রাজধানীতে আগমন করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক, তিনি যদ্যপি সাঁওতালীয় বিদ্রোহানল আশু নির্বাণ করিতে না পারেন তবে বিলাতে গিয়া কি বলিয়াই বা মুখ দেখাইবেন কোন মতেই প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না। লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব স্বদেশে গমন করিয়া সর্বত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের চারিদিগে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, কোন দিগে কোন বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা নাই কিন্তু লার্ড ডেলহৌসি সাহেব বিলাতে গিয়া বলিলেন যে তাহার গমনের কিছুদিন পরেই মূলতানে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার আগমন সময়েও অসভ্য সাঁওতালেরা অস্ত্র ধরিয়া বঙ্গদেশের হীনবল প্রজাদিগের ধনপ্রাণ সংহার করিতেছে, তাহারা রাজপরাক্রম কিছুই মান্য করে না এবং রাজসেনারা তাহারদিগের কিছুই করিতে পারে নাই, লার্ড সাহেব এই বলিলেই বিলাতের প্রধান পক্ষ রাজনীতিজ্ঞ নিরপেক্ষ লোকসকল তাহাকে বন শাসনকর্তা এবং প্রজাপালক গবরনর বলিয়া প্রশংসা করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

৮.১০.১৮৫৫

সাঁওতালীয় সংগ্রাম

ইংলিসম্যান পত্র দ্বারা অবগতি হইল যে সুড়ী হইতে ২ আকটোবর দিবসের যে এক তদ্দ্বারা ব্যক্ত করে যে সাঁওতালেরা তথাকার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহার পূর্বদিনে সন্ধি করণক চিহ্ন স্বরূপ একটি বৃক্ষের শাখা প্রেরণ করিয়াছে, এবং কহিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহারা ইংরাজ রাজ সমীপে সকলে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছে, এ বিষয়র সত্যাসত্য আমরা কিছুই বলিতে পারিলাম না।

রাণীগঞ্জের জনৈক কর্তৃক ২৭ সেপ্টেম্বরে লিখিত পত্র ২৯ সেপ্টেম্বর দিবসীয় হরকরা পত্রে প্রকাশ হয় তদ্দ্বারা বিদিত হইল যে ২৪ সেপ্টেম্বর দিবসে জামতাড়া নামক স্থান প্রায় ১০০০ এক হাজার বলবন্ত সাঁওতালগণের সহিত কাপ্তান ফিলিপ সাহেবের সৈন্যগণের যুদ্ধ হয়, তাহাতে অনেক ক্ষণকাল পর্যন্ত উক্ত অসভ্য দুরাত্মাগণ সম্মুখ রণে

দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে বন মধ্যে প্রবেশ করে, এবং জনরবে বিদিত হয় যে উক্ত ব্যাপারে সাঁওতালগণের মধ্যে ১৫ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছে, এবং নারায়ণপুরের জমিদার ও তদীয় পরিবারগণ সকলে নিহত হইয়াছে কি আশ্চর্য।

৯.১০.১৮৫৫

সন্তালীয় সংবাদ

সন্তালীয় সমাচার লিখিতে লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল তথাচ এ পাপ গোল নিবারণ হইল না, বরং দিন বৃদ্ধিই হইতেছে।

২০ অক্তোবর বাসরীয় রাণীগঞ্জের পত্রে প্রকাশ পায় সন্তালেরা চতুর্দিগে গ্রাম দাহ ও লুণ্ঠন করিতেছে, গবর্ণমেন্টের ঘোষণায় প্রজাদিগের আরো অনিষ্ট হইতেছে, সন্তালেরা স্থির করিয়াছে এইক্ষণে স্বচ্ছন্দে রাষ্ট্রবিপ্লব করিতে পারিবে যখন গবর্ণন্টের সেনা দ্বারা নিতান্ত তাড়িত হইবে তখন অস্ত্রত্যাগ পূর্বক বশীভূত হইয়া গবর্ণমেন্টের প্রসাদ লইবেক, ২ সংখ্যক ব্রিগেডিআর দলের এক কোম্পানি সেনা ডেপুটি কালেক্টর মেং টুইডি সাহেবের সহিত পালগঞ্জে গিয়াছে।

৩০ সেপ্টেম্বর পত্রান্তরে জানায় ২৮ দিবসে সন্তালেরা এক কালে পাঁচখান গ্রামে অগ্নি লাগাইয়া দিয়াছিল, তালডাঙ্গার ৫। ৬ ক্রোশ দূরে জামতরা নামক গণ্ডগ্রাম লুণ্ঠিত হইবে এই সংবাদ প্রাপ্তে কাপ্তান ফিলিপ্স সাহেব ১৯ দিবসে ২০০ সেনা সহিত ঐ গ্রামরক্ষার্থে গমন করেন, সেনারা একটা নালা পার হইতেছিল এমত কালে ৩০ জন সন্তাল আসিয়া তাহারদিগের উপর আক্রমণ করিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিপাহিরা গুলি দ্বারা ৮ জনকে হত ও কয়েক জনকে আহত করিলে অবশিষ্ট কয়েক জন পলায়ন করে, সন্তালেরা ক্রমে সাহসী হইতেছে, যদি সুশিক্ষিতি হইত তবে অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারিত, ২২ দিবসে অন্যূন এক সহস্র সন্তাল জামতরা গ্রামে আক্রমণ করে কিন্তু কাপ্তান ফিলিপ্স সাহেবের অধীন সেনারা ক্ষণ কাল মধ্যেই তাহারদিগকে তাড়াইয়া দিল এই যুদ্ধে তাহারদিগের ৩৫ জন হত ও তদধিক আহত হয় আমারদিগের পক্ষে একজনও হত হয় নাই, সহস্র সহস্র প্রজারা বারবার পার হইয়া পলাইয়া আসিতেছে, পালগঞ্জের চতুর্দিগে তাহার লুঠ করিতেছে, এমত জনশ্রুতি উঠীয়াছে বিদ্রোহি প্রদেশ মিলেটরী আইনের অধীন হইয়াছে।

কথিত আছে অজয় নদীর উত্তর তীরে সন্তালেরা মৃন্ময় দুর্গ নির্মাণ করিতেছে।

৩০.১০.১৮৫৫

সন্তালীয় সমাচার

সন্তালেরা পশুবৎ অসভ্য ও নির্বীর্জ বটে এবং তাহারদিগের যুদ্ধ দ্রব্যাদি কিছুই নাই ইহা সকলি সত্য, তথাচ এই সামান্য বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘসূত্রী হইয়া উঠিল, প্রাবৃট্ প্রারম্ভে এই বিদ্রোহ তার সূত্রপাত হইয়াছে, এইক্ষণে বর্ষাগত শীত সমাগত, এ পর্যন্ত সন্তালকুল নির্মুল হইল না, নির্মূল হইবেক দূরের কথা, ব্রিটিস পরাক্রমে ইহারা শঙ্কাও করে না, রুষীয় সমর সূত্রে এ দেশীয় সমাচার পত্র সকল সর্বদাই তত্তৎ সংবাদের আন্দোলন হইতেছে এবং সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রেও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা

বাদবিতণ্ডা চলিতেছে, কোন কোন পত্রে প্রকাশ হইয়াছে সন্তাল ভয়ে কলিকাতাস্থ লোক পর্যন্ত সশঙ্ক হইয়াছেন, কেহ কেহ লিখিয়াছেন জনেক রূষীয় এজেন্ট সন্তালদিগের পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন এবং টাইমস সম্পাদক সন্তালদিগের সাহস বার্তায় লেখেন সন্তালদিগকে রণশিক্ষা দিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আনিলে তাহার দিগের দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে, যাহা হউক, সামান্য বিবেচনা করিতে করিতে সন্তালীয় ব্যাপারে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।

ক্যাম্প মাকূরদি হইতে আগত ২৩ অক্তোবর বাসরীয় পত্রে জ্ঞাতা করে কানু সরদার কয়েক সহস্র সন্তালসহ মাকুরদির নিকটে সমাগত হইয়াছে, বোধ হয় যে সকল সন্তালেরা শান্তমূর্তি হইয়াছে তাহারদিগকে পুনরায় বিদ্রোহিতাচবণে প্রবৃত্ত করাইতে আসিয়াছে, ২২ তারিখে গ্রামস্থ কয়েক জন প্রজা আসিয়া শিবিরে সংবাদ দিল কানু সরদার অমরাপুর গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে, ঐ গ্রাম মাকুরদি হইতে ৩। ৪ ক্রোশ ব্যবধান, এতৎ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দুই কোম্পানি সিপাহি অমরাপুরাভিমুখে যাত্রা করিল এবং ২৩ তারিখ অতি প্রত্যুষে একদল সন্তালের সম্মুখে উপস্থিত হইল, সিপাহি দৃষ্টি মাত্র তাহার যূথ ভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় দিগ্‌বিদিগ পলায়ন করিতে লাগিল, গ্রাম মধ্যে অন্যূন ৮০০ শত সন্তাল প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা অরণ্য মধ্যে পলায়ন পথ না পাইয়া প্রান্তর দিয়া পলায়নপর হয়, তন্মধ্যে তিনজন লাল পরিচ্ছদে আবৃত ছিল, বোধ হয় তাহারই এক জনের নাম কানু হইবে। ব্রিটিশ সেনারা কিয়দ্দূর পর্যন্ত তাহারদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল কিন্তু কাহাকেও হতাহত করিতে পারে নাই।

৫. ১১. ১৮৫৫।

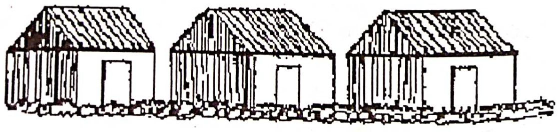

HINDOO PATRIOT

THE SOUNTHAL OUTBREAK

One of those sudden risings against established authority which mark the conduct of the various hill and jungle tribes on the frontiers of the Bangal provinces has just occurred in the districts of Bhaugulpore and Rajmehal. The Sounthals, a tribe of savages who inhabit the wilds from the north of Bancoorah round Beerbhoom Bhaugulpore and Maldah, to the banks of the Berhampooter, impelled by motives which cannot yet be determined with precision have risen in a body, of the number of which it is impossible to form an estimate, and marched in great force to Rajmehal, whence they are threatening the towns of Berhampore, Jungypore and Moorshedabad. They appear to be under something like regular organization, and are armed with swords and shields, besides their native weapon, the bow and arrow. The first outrage committed by them was the murder of the Darogah, Mohurrier and Burkundauzes of the Thannah of Pakour in Zillah Bhaugulpore. Meeting with little resistance, they then porceeded down and detached themselves in various bodies towards Rajmehal, which latter place was occupied and is still in their possession. Several of the Railway employees and three ladies in that vicinity are reported to have been killed. The local police have been completely paralyzed, and military aid has been sent for by the authorities. A detachment of the 7th N. I. from Berhampore, the 56th and 31st N. I. from Barrackpore, a few companies of the 3rd Europeans from Chinsurah, some mountain guns and a battery of ordinary field pieces from Dum Dum, have been or are in course of being depatched by railway and steamers towards the disturbed country.

It is strange fact in the history of these hill tribes that in spite of half a century's close contact with a new civillization they have progressed but little from their primitive habits. From the days of Cleveland to that of Pontet, they have been tended and rubed by a succession of able and truly philanthropic men. Yet they have benefited but little from this treatment. They are however described by all who know them to be a peaceable and honest race, and they must have been driven to the present insurrection by substantial injuries. It is evident that the employees of the Raiway company have to answer for much of the disposition which led to the rising. It is stated that compulsory labour has been exacted of the Sounthals, but

what seems to have exhausted their patience is the violation of their women. All who know the class of men who are chiefly employed in the railway works in this country will readily believe that this reports are not ill-founded. The exaction of oppressive rents also forms an item in the list of their grievances. It appears that the existence of these cause of complaint was known to the local authorites, but was treated with indifference by them untill the movement become general. As usual in such cases, the leaders of the insurrection have called religion to their aid, and the deluded Sounthals verily believe that Kaloo Thakoor and Suda Thakoor will make them independent of oppressive taxers extortionate landlords and licentious European neighbours.

The insurrection, no doubt, will be quelled in a few days, we may almost say, hours. It will then be the duty of Government to enquire fully into the motives and causes which led to the rising. We are glad that Mr. Bidwell, the commissioner of the Nuddeah Division, has proceeded to the spot. A perfectly impartial investigation and report cannot in such cases be hoped for from officials connected with the district. We hope Mr. Bidwell will boldly speak out all that be may learn and come to believe as true ; and that punishment may be awarded rather to those who drove by repeated and unforgiveable injuries a simple race to insurrection than those who can hardly be held moral agents, in these lamentable affairs. It is a misuse of terms to call the rising a rebellion. The Sounthals have no more idea of making their Thakoors the sovereigns of their hills and jungles than they have of installing them in the premiership of England. Their intellectuals like their physical vision does not extend beyond their woods and valleys. What they want is that they may enjoy them and their homes, their wives and the freedom of labouring as they choose, without let or hinderance from revenue officials, landlords and European black guards. We can liken this movement to nothing so much as the rising of the miners desribed in D'Israeli's splendid novel of "Sybil". Oppression is the cause, revenge the motive, and the object of the insurrection a vague undefined idea of freedom from sorely-felt annoyances.

19 July 1855

2

The insurrection of the Sounthals appears to be a much more serious affair than we at first supposed it to be. It is scarcely possible to give

credit to the statements sent from the disturbed districts of the number of the insurgents and the extent of their combinations, but it is very evident that almost the entire race of aborigines inhabiting the hills and jungles that skirt the northern and western districts of Bengal are more or less involved in the movement, and they have manifested a power of organization for which few were previously disposed to give them credit. The Sounthals of the Damon-i-koh in the Bhaugulpore district appear to have been first on the plains. Their number is given in various letters at between ten and twenty thousand which we suspect is about the entire population of the valley. Another body of them issuing from the Beerbhoom hills have come down upon the villages in the northern part of that Zillah. A third body have spread themselves along the left bank of the Pudina. In their respective courses these Sounthals have burnt down numberous villages massacred those who were unable to rescue themselves by flight, and destroyed the bungalows and property of the railway company especially. The troops despatched from Berhampore have yet met the insurgents in two or three places only, and although in one engagement the latter have suffered a servere loss in killed, wounded and prisoners, and a great portion of them been compelled to retire into their jungles, another body of them have repulsed a detachment of local troops, and the disturbances have nowhere subsided so as to leave wither person or property secure, whilst the tribes resident in the Mounbhoom and Ocryah districts have given signs of restlessness.

The military preparations for the suppression of the outbreak have been as prompt as the supineness of the local authorrities allowed them to be. On the first intimation of the revolt reaching Moorshedabad—which, however, was not given by the officers on the spot until the insurgents had made considerable progress–a small body of troops were sent forward from Berhampore. Soon after the government here made preparations to detach a greater force from Barrackpore, Dum Dum and Chinsurah. The number of insurgents may be reckoned at two thousand, and when all those under orders for the service move out the force will muster nearly five thousand. We are sorry to learn that the Sepoys have not conducted themselves well in the presence of so dispicable a for as the insurgents must be. A detachment of the 7th N. I. showed some signs of hesitation in attacking only some eight or ten times their own number ; and a portion of the Bhaugulpore Hill Rangers, who are mostly men of the same tribe with the rebels, actually turned their backs when brought

to the encounter leaving their quarter master sergeant, a European, to be killed by the rebels. For these unfortunate circumstances we hold the millitary authorities of the presidency seriously responsible. It is not that the sepoys are inferior in courage to the enemy they were brought of face, but their discipline is thoroughly inefficient, so that in combat even with unarmed rabble they cannot command the superiority of organized and armed troops. It is disgraceful to the officers commanding those soldiers that the men when ordered to fire should discharge their pieces over their heads, as the detachment of the 7th N. I. did, or that their guns should not go off, as was the case with those in the hands of the Bhaugulpore Rangers. The authorities entrusted with the distribution of the troops in the province appear also much to blame, for their culpable neglect of the military precautions essential to the security of what may, in many respects, be considered the frontiers of the country. The obvious utility of keeping up small batteries of mountain artillery close to these hills seems never to have occurred to the administrators of our military affairs, and to the discredit of thse functionaries it is to be told that a few thousands of savages, armed with primitive clubs, bows and arrows, kept the British power at bay, and that all the force which that power could bring forward after a weeks' exertion, with the aid of railway conveyance, were a few scanty, ill-appointed, ill-supplied and ill-disciplined deatchments, utterly unable even to hold their own ground before those savages.

The causes of the insurrection remain as obscure as before. A correspondent of one of the daily papers has been assured "that no language can depict the Zullum practiced by a certain form not exactly imported from not exactly the elite of British Society", and "that the most loathsome and dastardly crimes have frequently been committed in the way of pressing women and all other property belonging to the peaceable inhabitants of the surrounding country". Another correspondent of the same journal states that the removal of a sacred stone or image which has fallen on the line of the rails exasperated the Sounthals beyond measure. It would appear that the seeds of discontent have for months past been germinating in the minds of the savages, and that the people employed on the railway works, who were aware of this state of things, entertained as profound a contempt for the power of the Sounthals to revenge their wrongs as they had all along manifested for their feelings and rights. As to the public officers, besides being likely to participate in a similar

indifference towards the movements and acts of a body of unreclaimed barbarians, they were not in so good a position to know all that was brewing this fearful commotion in the jungles and hills.

26 July 1855.

THE SOUNTHAL INSURRECTION

The Sounthal insurrection has in its progress developed all the features of a predatory expedition. Barbarians are incapable of conceiving a political purpose, and the movement of the Sounthals is no exception to the general history of such irruptions. They might have been originally impelled by motives of revenge to issue out of their jungles and hills, but at present, so far as we can judge, the love of plunder and rapine chiefly sustains the energies of the marauding parties. In proportion however, as such a movement loses its political character, and with it, necessarily, much of the danger attendant upon such internal commotions, its suppression becomes more difficult. In the present instance, the length of frontier exposed to the attacks of the Sounthals, the meagreness of the military force available for its defence, the absence of an adequate amount of cavalry the season–unfavourable as it is to rapid locomotion, are all causes which will opeate to protract the duration of these disturbances.

Most absurd statements of the extent of the insurrection and of the power of the insurgents have been circulated through the community, and these are, in some measure, countenanced by the progress which the insurgents have made in one or two directions into the open districts, and the terrible ravages they commit when they enter the villages. The information from the disturbed districts is still very imperfect, and we would submit for the serious consideration of the Government of Bengal the propriety of its communicating to the public the reports which the Magistrate must be daily making to the Lieutenant Governor. This is the more necessary in as much as designing persons and professional robbers have taken advantage of the local panic to resume business on their own account in a very active style and with many chances in their favor. Nor are schemers of a more ambitious order absent to add varnish to the tales of the terrified letter-writers of Beerbhoom and Bhaugulpore Zillahs. One of these had heard that there was a flat nosed man to be seen in among a Sounthal mob. This piece of gossip, in its passage from Beerbhoom to Furreedpore, through, of course, the Calcutta papers, has assumed

the shape of a confirmed report that the Sounthals are acting under Nepaulese instigation and leadership.

In point of fact, as we have said, the Sounthals have made a rather disagreeable progress in some parts of the country. Rajmehal, by one account, has been plundered, Monghyr has been threatened, and volunteers and invalids are reported ready to be embodied for the defence of the town. Peer Pointee has been occupied by the insurgents after they had driven off a party of the Hill Rangres, they have possessed themselves of Nuggur, a place only about 6 miles distant from Soory, the sudder station of zillah Beerbhoom, after defeating a body of troops of the line with (as is reported) the loss of their commander, a European commissioned officer ; a number of villages on the estate of Rajas Pertapchunder Sing and Isser Chunder Sing have been sacked, and about fifty of the tenants who had been armed for the defence of the places have been killed. The Rajah's country residence and the splendid Takoor Baree which contains spoil enough to glut the whole Sounthal race are threatened. All the available troops have been moved up from Barrackpore, and the Allypore Militia and the Governor General's Body Guard have marched towards the disturbed districts. The military operations undertaken have yet produced but little effect,and the troops must wait for strong reinforcements from the upper provinces to enable them to circumvent– the only way of effectually reducing predatory hordes– the Sounthal insurgents.

2 August 1855

2

The Sounthal Insurrection has met with a partial check. The district of Moorshedabed, into which the insurgents had penetrated to a considerable distance, has nearly been cleared of them, and except in those parts of it which are conterminous with Zillah Beerbhoom the population have recovered their accustomed peace and security. The district of Bhaugulpore is still under marauders, but the preparations that have been made to chase them away to their native hills and wilds will, it is expected, soon relieve the inhabitants of their fears. Rajmehal is no longer threatened. Beerbhom is settled all that part of it which lies on the south of the river more, but bodies of the insurgents are still at large in the northern part. There have been no encounters of any note between the rebels and the troops during the past week. Martial Law has been proclaimed. Troops have been stationed at all the places where attacks were likely to be made, though not in sufficient number to justify offensive operations. Lieutenant Jourlmin's death is all but certain, no trace of him having been found since the affair at Naggur, although some of the Sepoys who had been missing have returned to their Regiment.

The Government of Bengal has communicated to the newspapers a report from Mr. Toogood, the Magistrate of Moorshedabad, detailing proceedings in the disturbed parts of the district. Mr. Toogood gives a lenghty account of insurgent bodies chased away, their villages their temples and images destroyed. He also gives a minute statement of what he as learnt to be the cause of insurrection. According to this statement, the insurrection took its rise from the ambition of two of the Sounth chiefs, who pretending to have received a mission from heaven, undertook to drive out the British from the country. They induced the Sounthals to join their standard by promising to procure them exemption in future from heavy rents, and payment of debts and various other benefits. One of these chiefs would appear to have died. Mr. Toogood's account of the origin of the insurrection is evidently incon plete. There is no doubt that the simple race have been led away from their peaceful habits by fanaticism infused into them by ambitious leaders ; but it is impossible to believe that the disposition to join the standard of revolt was created solely by the promise of the benefits enumerated by Mr. Toogood.

9 August 1855

3

The Sounthal Insurrection is in the last stage of a lingering existence. The rebels have been driven back to their jungle fastnesses from every place on the plains where they had made their appearance, offenisve operations against them are not undertaken partly for want of the requisite milltary means, partly in consideration of the state of the season which is a deadly one in the terrais of the hills, and partly from a hope that the vestiges of the outbreak will disappear of themselves without further measures of a very active descripion being taken against them. Nevertheless, whenever reliable information is brought to the troops posted in the different parts of the disturbed districts of the insurgents having collected in any numbers efforts are made to disperse or capture them. It is stated that a rocket troop of artillery, adopted to jungle warfare, is under orders to join the force commanded by Major General Lloyd. Some considerable bodies of prisoners have

been brought to Rajmehal, and the Commissioners appointed by Government to make the Civil arrangements for the suppression of the rebellion are busily engaged in ordering matters of the gradual re-settlement of tranquility in the districts recently freed from the presence of the insurgents. A statement that has been communicated from various different quarters at once would seem to show that the latter have found their cause hopeless. It is reported that the Sounthals, to the number of two hundred thousand, including men women and children, have quitted the valleys of north and north-western Bengal which they now inhabit and contemplate a general migration south-westward into the Ramghur and Maunbhom districts. In effecting this movement they must necessarily cross the Grand Trunk Road and will probably encounter the troops which have been posted to guard that line of communication. It can scarcely be necessary or expedient to intercept the retreat of the unfortunate race. The migration if it really takes place, will entail on them an amount of suffering greater than any the law could inflict, for as they must leave their crops and huts behind, the want of food and shelter for a whole season, if not a whole year, will alone consign a great portion of the emigrants to death.

We are not disposed to attach much belife to the report of the Sounthals contemplating a general emigration to the southwestern districts, but if the fact turns out to be so, we think an arrangement beneficial in many respects may made out of it. The Sounthals under their Thakoors in the Bhaugulpore and Beerbhom wilds were far less amenable to the influence and authority of the civil government than they would be if they places themselves under the Rajas of the south-western districts. The latter class of potentates have learnt in a great measure to respect and fear the administration, and their sense their sense of responsibility to public authority for acts affecting the public tranquility is much stronger than that of the Southal Thakoors. Living under them, the Sounthals cannot fail to imbibe correcter nations of the power of the government than they now seem to have. This alone would be a valuable guarantee of their peaceful behaviours, whilst the intelligent loyalty of the Rajahs will afford another. The Sounthals will not be again ready to believe on the word of their infatuated leaders that the musquets of the Bengal sepoys emit water instead of bullets. On the other hand, one considerable bar to the progressive improvement of the south-western districts is the want of population. The Sounthal emigration will in some measure remedy this evil. The Sounthals occupy, besides the valleys in the Bhaugulpore and

Beerbhoom hills, large quantities of land on the plains below, the cultivation of which they divide with their Bengallee neighbours. If they evacuate these lands means will be afforded to compensate the Bengallee tenantry of the adjacent estates for the terrible sufferings they have been exposed to. A Bengallee peasant farmer holding land on the terms which the Sounthals had in the Khas Mahals would grow rich in a very few years. This arrangement we believe, would be productive of scarcely less benefit than that suggested by a contemporary of deporting the Sounthals in a body to Pegue, and has the additional recommendation of being practicable, which we should think our contemporary's project is somewhat far from being.

Whilst upon this subject we gladly take occasion to press public attention to the speedy adoption of an excellent proposal made by a crrespondent of the Englishman for the opening of a Fund for the relief of those who have been driven away from their homes by the rebels or whose property was pillaged by them. Large numbers of helpless men, women and chidren are roaming in the districts of Beerbhoom and Berhampore in the most, destitute condition, whom it ought to be the object of the commissioners to re-settle in their former villages. The authorities however, can offer little inducement for this purpose, unless they can provide those willing to return to their deserted abodes with the means of making them habitable and of subsisting themselves until produce of the next year's industry comes to their hands. The government cannot be expected to provide this means, and it is no such occasions that the exercise of public charity is most urgently called for and proves the most beneficial.

30 August 1855

4

...The Sounthal outbreak is less a rebellion than a revolutionary movement. It was not the lost sovereignty of the Manjhees and the Thakoors to restore which the savages of the Damon-i-koh took up arms, but to obtain exempion from the high taxes of the British revenue officer, the rack-rents of the Bengallee zemindar and the snurious demands of the Hindoo Mahajun that they rose in a body. The proximate impulse might have been given to other causes, but the efficient causes were a sense of oppression suffered at the hands of a race dominant by tradition and still maintaining their domination by virtue of their superior civilization and a desire national inextent to

throw off that domination. The proximate causes have lost their force with the first burst of the rebellion, the ulterior and more enduring causes remain, and the outbreak has subsided into a chronic state of rebellion. Instead of challenging the troops to fight them, the Sounthals now wait till a Bengalee village is denuded of troops, and then pounce upon it and burn and plunder it. Their original leaders, whose ambition and influence afforded the means, as the atrocities of he railway officials afforded the immediate occasion, of the movement, have either been killed or taken prisoners, yet the movement continues, and the Sounthals are not loyal subjects of the empire. This is the most recent phase presented by the Sounthal insurrection.

Owing either to the numbers or the actvity of the troops or the nature of country, the Sounthals in the Rajmehal district have made no inroads upon the villages of the plains. It is also to be supposed that the main body of the Sounthals settlers of the Damon-i-koh have moved south wards and strengthened their insurgent compatriots in the Beerbhoom and Mannbhoom Districts. To have escaped into the wilds which cover a large surface of the latter district across the Grand Trunk Road is a movement which a portion of the Sounthals may be supposed to have effected without discredit.... the unsubdued spirit of the Sounthals in Beerbhoom shows that their numbers have received accession. The amnesty offered by the civil authorities appears to have been availed of by very few. A few miserable wretches who may be supposed to be litle under the influence of national feelings are all that have come in to claim Mr. Bidwell's proferred pardon, whilst the masses continue, as we have said, in hostility to those in whom they view only their implacable oppressors.

13 September 1855

THE PROCLAMATION OF MARTIAL LAW IN THE SOUNTHAL DISTRICTS

In another column will be found the proclamation which has at last been issued by the Government of Bengal placing the districts disturbed or threatened by the proceedings of the Sounthal insurgents under Martial Law. We have from the very first expressed ourselves incredulous as to the extent of benefit to be derived from this measure which was so ardently wished for by a majority in the press and of

the European inhabitants of the disturbed districts. The cry for Martial Law was evidently one of those cries in which people in fright or in danger, and unable to fix upon any really promising plan of riding themselves of either join nosooner they find some ingenious or deluded leader to put it into their mouths. Few of those who have been so violently indignant at the members of the supreme council for their not acceding at once to Mr. Halliday's proposal for the proclamation of Martial Law in the Sounthal districts, had distinct notions of how it would actually operate. They had some vauge idea that an insurrection ought to call forth the proclamation of Marial Law, and that it enables the military and the loyal to shoot down insurgents to the law than would otherwise be the case. The spirit in which our European friends in the Beerbhoom and Rajmehal Zillahs called for this measure is best seen embodied in a notable proposition made by one of them who, writing to a contemporary, offered to levy extempore soldiers and beat their insurrection, provided of course government paid him they pay of the improvised auxilliary force. If people in fright could reason coolly, they would have waited to ponder how the proclamation of Martial Law would conduce to the speedy suppression of the insurrection. Martial Law can not be beneficial in such cases in two ways only ; first, by inspiring the insurgents with a terror for dangers not ordinarily encountered in rebellious movements; secondly, by removing certain legal obstructions to the vigorous use of force in dealing with the rebels. If is difficult to understand how the proclamation will act with much effect upon the minds of the Sounthal rebels in the former respet. They now believe that the lives of all those have taken in arms against the authorities are already a forfeit to the state. The proclamation will only teach them, if they can learn even that, that whereas they could hitherto be tried by the session judge only, they will henceforth be tried by military officers. The difference is one which their unsophisticated intellects will not readily apprehend. Nor does the proclamation remove any real obstacles to the vigorous prosecution of the campaign against the rebels. It is true the measures heretofore taken to hut the rebels down have not been characterized by any great degree of vigou but the robstacles which have hitherto prevented a more energetic cause of action were mainly strategical not constitutional. Nor a fear or a qualm referable to the law of the land has yet disturbed the hearts of our military officers in shooting down any Sounthal that could be shot or burning down any Sounthal village that could be or needed to be fired.

So far as to the necessity of proclaiming what almost everybody has been pleased to call Martial Law in the Sounthal districts. Let us now see what it is that has been proclaimed. The proclamation states that the Lieutenant Governor of Bengal, in the exercise of the authority given to him by Regn X of 1804 and with the concurrence of the President in Council, establish Martial Law in certain districts therein named in suppression of the functions of the ordinary courts of penal justice as regards all persons taken in the actual commission of hostile, contumacious or rebellious acts, who are henceforth to be tried by Court Martial and are liabel to suffer death. We fear that on the connection of this proclamation no professional lawyer was consulted. To any one who has not derived his entire knowledge of what Martial Law is from the pages of Blackstone's commentaries, it is, unnecessary to say that Martial Law is not the creature of Regulations or any other written law, that trial by Curt Martial is no essential part if it, and that when a district is placed under it, its operation is not restricted to any particular class of persons resident therein distinguishable from other classes by their being guilty of certain offences. It is evident that the writer of the proclamation laboured under a confusion of ideas drawn from an imperfect knowlege of Bengal Regulation, English constitutional and Indian parliamentary law.

Had this proclamation been barely a piece of useless, harmless and meaningless bravodo, we would hardly have thought it worth serious condemnation but it is not so. All of us that recollect the abuses of rampart military power which a few years ago followed the proclamation of Martial Law in Kandy in Ceylon will admit that measures of this kind tolerated amongst an Indian population and executed by European officers are rife with dangers of the most serious description.

15 Noverber 1855

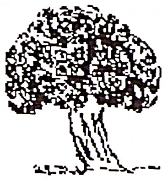

FRIEND OF INDIA

THE SONTHAL INSURRECTION

In a period of the most profound tranquility, an extensive and ferocious insurrection has broken out in the heart of Bengal, and express trains are busy in conveying troops in hot haste to a part of the counry where peace appeared to the most certain. The tribes in the Rajmahal hills have suddenly descended by tens of thousands into the plains, carrying desolation in every direction. The Santals are the chief leaders in this insurrectionary movement, and of all the tribes in those hills, the Santals have experienced the greatest blessings from the British Government, and appeared to be the most satisfied with their condition. They are not the original inhabitants of the region they now inhabit, and which is said to be the seat of the present outbreak. In the bosom of the Rajmahl hills, there is a tract of fertile land, called the Damin-i-koh, consisting of a succession of rich valleys, which the wild inhabitants reduced by Mr. Cleveland to the discipline of civilised life could not be induced to cultivate. Mr. Pontet, an uncovenanted Assistant, was appointed sixteen or seventeen years ago to the charge of his district in which he found about 3000 Santals established. By good management, and the offer of great inducements, combined with the exhibition of great justice and benevolence, he succeeded in encouraging other Santals to emigrate from the south, and join their fellow countrymen, and in the course of thirteen years, he had the happiness to increase their number to 83,000, distributed through nearly 1,500 villages. The anination and activity exhibited in the settlements in this tract, resembled rather the achievements of the Anglo-Saxon race in the backwoods of America than anything which had been seen in Bengal. The tract was covered with smiling villages and rich cultivation, and village was connected with village by roads which Mr. Pontet had induced the Santals themselves to construct. No part of Bengal presented a scene of greater comfort and prosperity, and the man who had created it was considered a being of a superior order by those who felt the benefit of his influence. Suddenly, the scene is changed. The hills have poured their population into the plains, armed with axes. and poisoned arrows, and muskets, breathing vengeance upon every European, destroying the fruits of industry, and marking their progress by the flames of houses and bungalows. The

men who have thus risen in insurrection against the authority of their benefactors are not predatory and lawless tribes, but a race of hardy, bold, industrious and successful cultivators. It is on this ground that the cause of this sudden change in their disposition and conduct appears so utterly inexplicable, some of the letters which have appeared in the papers insinuate that the men have been pressed into the service of the Railway without remuneration, and that their females have been subjected to insult. But the officers of the Railway staff indignantly repudiate the charge, and point to the period which it must have required to prepare and organize such a coalition, as the most satisfactory refutation of the charge. At present the most probable solution of the enigma is that the men are acting under the influence of religious and political fanaticism. They believe, it is said, that their god has become incarnate, and that they have a divine commission to expel the Europeans. and seat him on the throne of India. But we must hear Mr. Pontet's opinion before we bestow our belief on any such statement.

The insurrection has taken the public authorities by surprise. It is the most improbable event which could have happened, and no blame can therefore be attached to them for the want of due preparation. The accounts which have appeared in the public journals regarding this revolt, are written so much in haste, and so often under the influence of a panic which magnifies danger, and are altogether so desultory, besides being in some instances contradictory, that it is impossible as yet to frame a connected and consistent history of these events, and not very easy even to ascertain the actual position of affairs. The difficulty is increased by the flight of the Dawk Moonshees, and the suspension of the post. The number of the insurgents is variously stated at from 30 to 50,000 but the former number is likely to be nearer the mark, and they are divided into four or five parties under separate leaders. The first overt act of rebelion appears to have been the massacre of a Daroga and fifteen of his burkundazes, which developed the ferocity of their character, and spread terror through the country. It is said that one body of them drove in the Magistrate of Bhagulpore, but this is an isolated fact, and it would appear from all that has yet transpired that they have possession only of the country from the neighbourhood of Rajmahl to Jungypore. The natives, men, women and children have fled, as their ancestors did in 1755, when the Mahrattas came down, and laid waste the country between Cuttack and Rajmahl. It would appear that Mr. Eden, the Joint

Magistrate stationed at Aurungabad, in the heart of the insurrectionary movement, had contrived to collect a body of 200 natives, and though surrounded by thousands of the enemy, yet hoped to maintain his position till the troops came to his relief. The papers state that Mr. Mudge, employed in the Railway, wrote to Mr. Eden to say that having plenty of arms and ammunition, he intended to make a stand at Pakoa, and if overpowered, to fall back on a fortified godown of Mr. Maseyk, where he might hold his own till the arival of relief. But another account states that the insurgents threating Pakoa exceed 10,000. The insurgents had in every instance destroyed the Railway property, burnt down the bungalows and driven off the staff. There are numerous reports about the murder of Europeans, all vague and some contradictory, but until certain information is received, it appears advisable to aviod publishing the names of those who are reported to have been killed. Rajmahl is evidently in a state of siege. The Railway officers have taken refuge in it. On the 13th, the Magistrate of Bhagulpore and Mr. Pontet had been there a week, looking anxiously for the troops which were expected from Bhagulpore, and the non-arrival of whom requires official investigation. As the majority of the Hill Rangers are said to be Santals, there may have been some difficulty in moving them down against their brethren, and in that case the matter is explained. At Rajmahl there was a small knot of Englishmen, surrounded, that last letter says, by 20,000 of the insurgents, and determined to defend their lives to the last extremity. This spirit of determination appears to have startled the Santals, and hence it is inferred that they will not stand the fire of regular troops. Some of the letters published in the papers state that they had surrounded Jungypore, which being undefended, they might easily deliver up to plunder. They are, moreover, said to have vowed that they would sack Moorshedabad, which is scarcely defensible, as Berhampore has been denuded of its troops. Another body of them was marching down upon the civil station of Beerbhoom and according to the latest accounts were within eighteen miles of it. Mr. Elliot, the Commissioner, was marching up with three companies of sepoys, and it was hoped that they would reach the station before the insurgents.

The insurrection is much more formidable than it appeared at the beginning, and the Government has met it in a spirit of the most determined energy. So perfect and so permanent an image of tranquility did the province of Bengal present, so throughly contented were the tribes in the hills, who were subject to no fiscal exactions, that when

the insurrection so unexpectedly broke out, there were not 1200 troops within a distance of eighty miles of it, in either direction. But every exertion was made to send a larger force. A wing of a regiment immediately marched up from Berhampore to scene of danger. Two express trains have conveyed troops from Barrackpore to the point on the line nearest to the disturbed districts ; a Regiment has been sent up from the same station by water. Two guns of Major Sissmore's battery, under Lieut. Ashburner, and a train of mountain gunts under Lieut. Dowell have been despatched from Dum Dum, and it is said that the 3d Europeans at Chinsurah are to hold themselves in readiness to march at the shortest notice. The insurrection may therefore be put down with promptitude, but the sacrifice of property and life will be great. The brunt of this calamity has fallen on the Railway department, and their property, both public and private has been destroyed, and their houses delivered up to the flames ; and it is much to be feared that the progress to this great national undertaking will be considerably retarded by this revolt.

The accounts which have appeared since these remarks were, written, tend to throw doubt upon two of its statements ; first, that the men now in arms are the residents of the Damin-i-koh, and secondly, that the outbreak is not occasioned by persons connected with the Railway. It is asserted that the men now in arms are Santals from more distant districts and consist in a great measure of the men who have been employed on the Rail. Secondly, it is asserted in more than one letter, and in the most positive terms, that the Santals empolyed on the Rail have not been paid either for their daily labor, or for their fowls, eggs, goats and other articles they have sold to the Railway establishment, and that their women have been insulted. If both these crimes have been committed by the same Europeans, the blame falls on the contractors.–It would appear that Mr. Eden has been joined by Mr. Toogood, the Berhampore Magistrate, and the troops, and that they were prong to Cuddum Shah, as Pakoor was said to have been plundered. ...

19 August 1855

THE SONTAL INSURRCTION

...We are still without information in which any confidence can be placed as to the occasion of this outbreak. Many of the correspondents of the journals still continue to ascribe it to the violence of those engaged in Railway operations, and there can be no doubt, that there

have been occasional instances of oppression and insult; indeed, the determination to kill all the sahebs, and the destruction more particularly of all Railway property would give some color to this suspicion. On the other hand, the indiscriminate plunder and conflagration of villages, and the murder of natives who are not identified with the Rail, would lead to a different conclusion. One circumstance which has been mentioned to us appears to fix on the insurrection the character of a fanatical and political movement. A body of more than five hundred Santals are employed at one of the collieries at Raneegunge, and they are living in perfect ease and comfort with their wives and families in the villages erected for their residence. Several messengers from the insurgents have arrived among them, and they were asked whether they would join their countrymen. They said they had no reason for doing so, they were happy and contented where they were, but as soon as the written summons from their king was shewn to them, they would be under the necessity of quitting the place in a body. A large offer was made to one of their leading men to bring intelligence from the insurgents' camp, but he refused the offer with scron, and said that if he was ordered to go, he should obey, but he might or might not return, and if he did, he should communicate nothing. The insurgents are evidently linked together by the strongest bonds of clanship.

It would appear that one body of the rebels, approached Raneegunge some days ago, which induced the ladies at the station to rerurn to Calcutta. A body of troops was immediately sent up by the train, and they will at once remove all anxiety regarding the safety of the station. This is the first instance in which the Rail has been used for the conveyance of troops, and we are thus enabled to estimate the immense advantage which it confers on the country in a Military point of view. The troops could not have marched to Raneegunge in less than ten days, and before that time all the eatablishments at the collieries would have been completely destroyed by the insurgents. There is some fear lest the body advancing on the line to Raneegunge, should take possession of the Grand Trunk Road, and thus intercept our communication with the North West. Large bodies of Santals have spread themselves over the unfortunate district of Beerbhoom, and the country in every direction presents a scene of the most complete desolation. The villages have been plundered and burnt, and the inhabitants who could not make their escape, have been massacred. The Magistrate of Beerbhoom, with fifteen or twently Europeans of

the Railway and contractor's staff, are now besieged at Rampore Haut, about twenty miles north of Sooree, the Head Quarters of the district. The insurgents, to the number of – 5000, attacked and plundered the village of [–] inpore, and sacked Mulhatty. The Engineer and contractors, fearing to be surrounded, fer back on Rampore to protect the bungalow and property there. They were closely followed by the insurgents. Mr. Rose arrived at the same place with a small body of police, and the whole party was besieged by a large body of the enemy, but, according to the latest accounts, had been able to maintain their ground with the aid of their fire arms, and hoped to keep the insurgents at bay till the arrival of the troops sent to their rescue, which were most anxiously expected. Another body of the rebels threatned Sooree the "country town" of the Beerbhoom district, which was defended by three companies from Barrackpore, with the Commissioner, Mr. Elliott, as the Political Agent. he had despatched one company for the relief of the Magistrate at Rampore, but could not move on with a larger force, till the arrival of reinforcements.

Another body of the Santals, had marched down towards Pulsa and Kuddumshah. Kuddumshah is a factory of Mr. Maseyk, which he was unable to protect, and he therefore took refuge with two or three Europeans in his boat, but the boatmen had fled. The party, however, contrived to anchor the boat at a little distance in the stream, and fired several volleys with their rifles at the Santals, which brought down four or five of them, and induced the remainder to fly. Meanwhile, Mr. Toogood, with the troops from Berhmpore was advancing for the protection of Pulsa six miles farther on by forced marches. Several villages on the line of march were found to be plundered and burnt. The inhabitans had fled, those who could not succeed in doing so were killed, and among them, not a few women and children, their bodies presenting a frightful spectacle of the atrocities committed by these murderers. On reaching Pulsa, Mr. Toogood found that it had been plundered, and the bungalow built by the Railway engineers, entirely destroyed, together with the whole of their property. Information was received that the insurgents had gone to Muheshpore, and at midnight, twenty-nine elephants lent by the Nabob, were loaded with 200 sepoys, and moving all night reached it at day break. The enemy, though taken by surprize, were evidently prepared to resist our troops, and fired a large number of arrows and

some muskets. Mr. Toogood, when within thirty yards of their body, called on Captain Birch to fire. In about ten minutes the main portion of Santals was driven from the banks of the tank where they had made a stand. But other attacks were made on our troops from the village, which was not mastered under two hours, when the insurgents were driven across the river into the thick and impenetrable jungle. One hundred of their number are supposed to have fallen in the encounter, and an equal number was wounded. Five of our sepoys were injured by arrows not posioned. A large quantity of property which the Santals had plundered, fell into the hands of the victors, consisting of palankeens, a buggy, copper and brass utensils, silks, cloths, and 7260 Rupees in cash. 28 Santals were made prisoners. The Thakoor, or god of the insurgents was at a village, about forty miles from the scene of action, and it was Mr. Toogood's intention to lead the troops to that place as soon as possible, in the hope of at once quelling the riot. We trust he will not put his design into execution at this season of the year, when a larger number of troops are sure to perish from the deadliness of the climate than from the arrows of the enemy.

The intelligence from Rajmahl is unpleasant, but still uncertain. Mr. Vigors who was reported to have been killed, is alive and is said to be in a building at Rajmahal which he and the Railway people have fortified. Intelligence was received by a steamer which had come down to Jungypore that the Hill Rangers had attacked the Santals, but their guns would not fire, and they were all defeated and fled, except the European Quarter Master Sergeant, who stood his ground and killed and wounded a number of the enemy, but was at length overpowered and killed. The conduct of the Hill Rangers is attributed to treachery, as they are all, if not Santals, at least inhabitants of the same range of mountains. A letter of the 20th from Brehampore states that the sepoys of the 7th who were engaged were half inclined to retreat, when 500 men found themselves opposed to 8,000 and that they fired into the air, for which several were knocked down by their officers. But this statement is not likely to be true, for men who are seized with a panic, do not fire their pieces in the air. Nor is it likely that so large a body would quail before any number of an enemy armed only with bows and arrows. A letter of the 19th from the neighbourhood of Jungypore states that the whole of the 40th Regiment were at Rajmahal and would afford ample protection to that line of country.

The insurrection is evidently speading over a wider circle, and daily becoming more serious, and demands the most earnest and immediate attention from the Government of India, with whom it rests to sanction every movement. Independently of the loss of life, and of revenue which it must entail, it is exhbiting the British Government to its native subjects, in an attitude of weakness such as we have never exhibited since the battle of Plassey.

26 July 1855

THE SONTHAL INSURRCTION FROM THE BEGINNING

The details of this extraordinary movement are becoming confused. What with imperfect information, frightened newspaper correspondents, and the wide extent of territory occupied by the insurgents, it has become difficult even to trace the daily progress of the revolt. Europeans are killed one day, and fighting bravely the next ; the Hill Rangers are behaving gallantly according to one message, and returning to camp because the Sonthals would not attack them, according to the following one; while the position of the Regiments employed becomes wholly undistinguishable. The almost unknown names of Sonthal villages increase the abscurity, untill the public has gradually come to believe only one thing, viz. that revolt, and from this and some other sources we shall endeavour to draw up a succinct and intelligible narative.

Of the real cause of the first movement little is yet known. From that little, however, thus much may be gathered. The Sonthals have of late been exceedingly irritated by the presence among them of a number of shrewd Bengalee Muhajuns or moneylenders, who speedily emptied the hoards of a simpler people. With the want of forethought peculiar to savage races, they borrowed money without stint and speedily found themselves tied hand and foot by the most merciless of human creditors. To add to this source of irritation, they found themselves— by their own statements– compelled to submit to the extortions of the Amlah of the court. The investigations, they said, were made by these men, and they could not bear the expense. All these grievances, however, might have gone on for years, had not they been experienced by a family of some importance. This family, consisting of four brothers appears to have been either ruined by the Muhajuns or injured by the Amlahs. One at least of them has been a dacoit leader, and perhaps his experience in that capacity may have added at once to his influence and his contempt for Bengalee valour. This man Kanoo Manjee and his brother Sindhoo Manjee appear to have resolved on a great attempt at revenge. They issued proclamations, artfully appealing to the grievances we have mentioned, and declaring that their deity, or the deity—we are not certain which — had become incarnate in the person of a child. Of course the Avatar spoke through the mouth of Sindhoo, and so speaking commanded the Santhal people to chase the sahebs, the Muhajuns and the Amlas from the nither side of the river. He promised them, moreover, that he would protect them from their enemies, turn the sahebs' swords into sticks, and their cannon balls to water, and give to the Sonthals the entire command of Bengal and its wealth. The proclamations were obeyed apparently by some thousand, whose numbers rapidly increased with their first success.

The first intelligence of the outbreak was received at Bhaugulpore on the 4th July by the Magistrate, Mr. Richardson spread fast and far. Between five and ten thousand men were believed to be in arms in the districts lying between Rajmehal and Aurungabad, which they laid waste in every direction. Their only plan of operations appears to have been to march from village to village, destroying all houses, murdering all Europeans, Amlah and police and plundering all Bengalees. Generally all in the village attacked, men and women, young children, and old people were put to the sword, and their bodies brutally mangled. The flame gradually spread, till the Northern portion of Aurungabad, the line of territory between Sikree and Colgong, a considerable protion of Bhaugulpore, and the whole of Beerbhoom were swarming with marauding savages.

9 August 1855

THE SONTHAL INSURRECTION, AND ITS CAUSE

Little has transpired during the week of the progress of the insurrection. The Sonthals continue to ravage Beerbhoom, and with the exception of two pergunnahs are virtually masters of the district. The people are flying in thousands, with nothing saved except their wives and occasionally their cattle. Cholera and fever are doing their work among the people, and terror, suffering, and disease will probably

destroy more lives than the arrows of the savages. Martial Law has not been declared, and thus for four months the Government of India has been faced by savages without firearms or swords, without horses, without courage, and of late without a leader.

Meanwhile the cause of the rebellion is gradually becoming clear. We have seen the confession of Seedoo Manjee, the chief through whom the Deity was supposed to reveal his orders. It confirms in every respect the views we formerly expressed as to the origin of the outbreak. Seedoo tells his tale with the truthfulness which is the characteristic of a Sonthal. He confesses his own evil deeds, avows his determination to kill certain of the Europeans, and points out the hinding places of his kinsmen without a thought of treachery. Indeed, the idea that he has done wrong seems not to have entered his mind. With all, he adheres steadily to his belief that he has had a revelation. Whether he is a monomaniac, or the dupe of men wiser than himself, or simply a vulgar impostor appears uncertain. His frank courage and utter recklessness of consequences seem opposed to the last and most natural supposition.

The main grievance of the Sonthals was the oppression exercised by the money-lenders. The tribes were always in want of money for short periods, just before the harvest. Unlike most savage races they had fixed ideas on the subject of usury. They considered twenty five percent. as the natural interest of money, and as Seedoo says himself they would pay no more "and no less." Of course Bengalee money-lenders were not content with this. They, according to a valuation by which in he Damun-i-koh two measures of grain are considered equal to one rupee. For every rupee lent therefore they took ten meansures. so that they must have absorbed no inconsiderable portion of each year's harvest. The Sonthals brooded over this grievance for years. At first they petitioned Mr. Pontet, only who told them that they had eaten the Muhajun's advance, and then complained of their own bergain. We do not know that Mr. Pontet was much to blame. What could he do? If he had insisted on the Muhajuns taking less, he would have received a sharp rebuke from men saturated with English ideas, about interfering with free trade.

...Two Bengalees came into my verandah, they each had six finger. Half a piece of paper fell on my head before the Thakoor came (in the shape, he says in another place, of a cart-wheel) and half afterwards. I could not read, but Chand and Lehra and Dhome read

it. They said the Thakoor has written to you to fight the Muhajuns, and then you will have justice. Ever since chyte before the Thakor came, the Manjhees had been consulting together to kill the Muhajuns. When the Thakoor came I sent a sal branch to collect the Sonthals together.

The fall of the paper looks like trickery, but obviously some hazy, dreamy idea of divine intervention seems to have been in the mind of the poor savage. No cross examination shakes his faith in the Thakoor's message, or in the consequent righteousness of his own deeds. Even after the collection of the Sonthals, however, a spark seems to have been wanting to light the flame, and it was afforded by the Darogah Mohesh Dutt. Seedoo met this man, when returning after a last effort to interest some zemindars in behalf of his Sonthals. He told him he had demanded redress for five years, and had not obtained it and required a reason. Mohesh Dutt returned only abuse. Seedoo could hear no more, he killed the Darogah on the spot, and the rebellion commenced. This tyranny of the Muhajuns and vexation at the long continued refusal of redress were apparently the only causes. After all, there may be states of society in which usury laws are a valuable protection. It is to this he constantly returns. He talks of other grievances, of the Suzawuls and the Darogahs, of Mr. pontet and of the increased assessment but he always returns to this. "The Muhajuns took five Rupees for each Rupee. We were willing to pay four annas". His fellow prisoners deny the existence of any other grievance, and say the assessment is all fair, and that as for the payment to the Suzawuls it is a matter of good will.

Two other points in Seedoo's confession are remarkable. The first is his steady denial that he had any hostility to Government. he did not want to fight the sepoys. He did not want to hurt any body except the Muhajuns and Mr. Pontet. His resolution in the latter respect was repeatedly and unmistakeably evinced after his capture. He evidently thought the attack of the sepoys excessively unjust. The quarrel in his mind was between the Sonthals and the Muhajuns, and he did not see what Government had to do with it. There is something half pathetic, half ludicrous in his complaint, "I was going up to make my salaam to the sepoys, and tell hem I was not fighting with Goverment, but with the zemindars ; but meanwhile they shot me." The second point is the intense contempt in which the Sonthals were held by the Bengalees. The Sonthals were braver men, bigger men, richer men,

yet the Bengalees regarded and treated them as slaves. The Muhajuns used to pull their ears. The Zemindars jeered at Seedoo when he told them that if his wrongs were not redressed he should fight, and asked him if he hoped to contend with Bengalees. Of course these very men, supporters probably of the British Indian Association, fled like sheep when the revolt broke out. Seedoo had twenty followers round him when he spoke to the Darogah, yet the Bengalee abused him like a coolie.

Of course none of these facts can even palliate a revolt attended by horrors such as have accompanied this Sonthal outbreak. Neither can they palliate in any degree that weak lenity which has cost ten thousand lives, and may cost fifty thousand more. But they prove that the rebellion had a cause beyond a mere savage thirst for blood, plunder, and excitement.

11 October 1855

BENGAL HURKARU

The following is an extract of a letter from Mr. Toogood, dated camp Bhagnadihee, July 25, 1855 :

"I left Coochpara at about 6 A. M. yesterday, with the troops en route to Birheyte and Bhagnadihee. After we had marched about three miles we entered a pass through the Hills which led into a large valley in which is situated many Sauntal villages. We had not proceeded above a quarter of a mile when we observed a body of Sauntals about 200, strong, emerge from some distance and advance in an easterly direction towards us. Captain Middleton, Mr. Tylor, and myself rode forward, and three guns were fired... the rebels came on under Kanu with naked swords and bows and arrows. A company advanced under Lietunant Parlby to the attack; but though several shots were fired not one of the rebels appeared to be hit and they retreated in good order to the Hills and concealed themselves in the jungle.

I deemed it advisable to call upon Lietunant Parlby to burn the villages from which these rebels emerged, which being done we preceeded to Barheyte and arrived at about I P. M. We found the village totally deserted and plundered. Mr. Pontet's bungalow had not been fired, but there was not a vestige of anything remaining in it. Here on the banks of a tank, Captain Birch halted his men and Captain Middleton, Mr. Tylor, myself, and a few of the Nizamut troops rode on to the village of Bhugnadihee, about $1\frac{1}{2}$ miles distant in a south westerly direction. We found the village totally deserted, and in the compound of Kanu's house under a large cover made of wicker work the Thacoor, which consisted of a circle of mud about 2 feet in diameter raised some 2 inches, but connected with the adjacent earth, and having in the centre another small circle about three inches, in diametre and similarly raised about 2 inches, in fact the Thacoor was exactly like one of the solid wooden cart wheels used by these Hill people. It was cracked in two places, and report says, that when milk was poured on it from its f ssure sit spouted un and other phenomena were seen. Around the Thacorr were the heads of goats and two buffaloes, which animals were early that morning offered as an oblation to the deity, after which Kanu led forth the men to attack us in the valley. I have before mentioned, leaving Sedu, who was disabled by his wrist being broken at the fight at Moheshpore, to look after the Thacoor Baree and plunder. But on his hearing from some persons whom Kanu sent across the Hills, that we were

marching of Bhugnadihee he deemed it prudent to decamp with as much of the plunder as he could, and consequently little has fallen into our hands, except four elephants, the property of the persons noted below ; some howdahs, palkies, two guns and one rifle (English), some brass pots, European's clothes, and grain—all the gold and silver omaments and money has been carried off.

I am happy to say that in the Thacoor Baree I found a tin box, and in it several of the papers and documents of the ringleaders, the seal of the Darogah of thannah Digee, who was murdered, some orders of the Magistrate of Bhaugulpoor, Sedu's written orders, copies of some of which I send for your perusal. They are chiefly written in the Hindee language, those only written in Bengali are sent.

From enquiries made by me last night of the adjacent villages, I have learnt the following particulars. This rebellion has been instigated by four brothers, resident of the village of Bhugnadihee, by name Kanu, Sedu, Chand and Bhyrub, all manjhee, of whom, Sedu and Chand were at home, and the two others in the houses of their father-in-laws at Simulchap; pergunna not known, in the district of Bhaugulpore about 10 miles distant from this place. About two months ago Sedu and Chand went about and told the manjhees, or Mundles of the villages that a Thacoor had descended in their house, and therefore all should bring a cup full of milk and present it as an offering. The villagers asked in what form the Thacoor had appeared. They said in a flame of fire. The two brothers also said that on Friday next he would come again and on that day all should be assembled at their house which was placed before the Thacoor, and it was reported that the milk used to rise up and was thus a proof of the Thacoor's presence, Sometimes, when a man was doubted, his cup of milk was decleared to be of a bluish color, and he was there pronounced to be untrue to Thacoor and the offering was refused. When Firday came all the villagers went to see the Thacoor at Sedu and Kanu's house, and were told by the brothers that the Thacoor had not come that day, but would on the fifteenth day of he moon, which would be about fifteen days hence. Sedu shewed them two printed books and two pieces of papers and a small knife, and said these things were sent by the Thacoor, who had said they should be king, that only one anna should be paid for each oxen plugh and two annas for a buffalo plough, that their creditors should not be paid, and that in future only one pice per Rupee per annum should be paid as

interest; that the English were to be driven out of the country, and water only would come out of their guns etc. Before the fifeenth day of the moon came, Sedu began to collect all the Sauntals together in his house of Bhugnadihee. They came with bows and arrows, swords, axes and drums. Sedu's other two brothers who were at Simulchap also collected men and joined him at Bhugnadihee, and the force amounted to about 10,000 men, The Darogah of Dighee having received information of all this went with about 8 or 10 burkandauzes to Panchkattea, which is three miles distant from Bhugnadihee, and was met there by about 500 Sauntals, under Sedu. He sent for the Darogah and asked him why he had not presented himself before in accordance with the perwannah which he had issued to him. The Darogah replied that he was absent from his thannah. Sedu then ordered the Saunthals to surround the police, and with his own hands cut off the head of the Darogah, and the burkundauzes were killed by his followers. he then proceeded to murder all who would not follow him, and plunder and burn their villages. Chand Manjhee, it appears, remained at home whilst Sedu, Kanu and Bhyrub led the rebels. At Mohespore Sedu received a musket shot on the wrist of his right hand and Kanu and Bhyrub received a shot in the abdomen and back respectively, but none of these wounds are of a serious nature. Sedu was caried away from Moheshpore, on a charpoy after the fight at Moheshpore and the four brothers returned to Bhugnadihee with four elephants and a quantity of plunder, and have since remained at home. Yesterday, hearing of the arrival of the troops they sacrificed two buffaloes and ten goats, and Kanu with sixty or seventy men, went forth to Raghunathpor to fight the troops, about twelve o'clock in the day, some of the Sauntals came runing back to Bhugnadihee, and said that Kanu was shot and had died. Sedu and the other two borthers hearing of this fled to the Hills, taking with them as much as they could of the plundered property.

These villages are under the charge of Mr. Pontet ; they beling to the thannas of Tieree and Dighee, and Sedu and his brothers are common sort of men, much in debt and never paid their creditors.

I have burnt the village of Bhugandihee and with it the whole of the Thacoor Baree, and issued the enclosed proclamation. It is reported we are to be atacked with a large force to-morrow, but I don't believe we shall be.

The four books which it is reported fall from heaven and in which

the order of the Thacoor were written, and which books were read every day at the Thacoor Baree, are translations of the Gospels of Saint John into Bengallee and other languages. They were found on the verandah of Sedu's house, where he used to sit and dictated his orders, and close to the verandah was the Thacoor. The books were wrapped up in a white cloth and tied round with a piece of gold string."

7 August 1855

KOOMERABAD

The following is from Camp Koomerabad 18th August—

"Our detachment under the command of Lieutenant and Adjutant Fooks 50th N. I left Nunsoleesh on the 18th instant and marched to Shadeepoor, close to the foot of the hills, where we halted for the day : the next morning we marchaed for this passing through some ugly places, where if the Santhals had been wide awake, they would have attacked us. We had scarce arrived here, and were sitting down to have a little of something to eat when we were aroused by cries of Santhal log aya. We all get up and made ready to receive them ; as they were some distance off. Lieut. Fooks with a company advanced upon them, and after marching about two miles came upon about 150 of them, whom we soon dispersed, killing and wounding a few of their members; he then came back and we were quiet for the rest of the day. At day break the next morning we were alarmed by the same cries, of "Santhal log, Santhal log". We were jumped out of our beds, and saw much to our surprise a body of about 1,000 Santhals coming out of the jungle, about a quarter of a mile from camp, and entered the village immediately on our right. Lieutenant Dunbar marched his company down through the village and met them about half way, where his front section gave them such a dose of bullets, that after a few minutes they turned their backs and bolted leaving twelve or thirteen of their number ded in the street ; two of our sepoys being slightly wounded with their arrows. We were kept on the alart all day by false alarms, which disgusted us much At night we had most tremendous rain, and there was a report that the Santhals were going to attack us during the night, we kept awake for some time. However every precaution having been taken we felt pretty safe and one after another fell asleep. In the night we were awake by the tent falling from the heavy rain; we ran out and took refuge in a little

thatched place where our khidmatgars cook for us, getting heavy wet and feeling but comfortable. If the Santhals had come we should have been bothered a good deal. After a most wretched night, the rain cleared off, and the day promised fine, we soon heard the tom toms beating again and Garton of the 50th and myself, with a sub-division each, marched out in the direction from where the sound came; in the distance we saw a body of between 800 and 1,000 Santhals, but the jungle between us and them put a stop to our going on further. We sent back for orders, and were told to return; lucky for us we little thought they had laid such a trap for us. About midday we were surprised by thousands of Sonthals who had crept up through the jungle without beating their drums, and completely surrounded the camp, we turned out sharp, and placed a company each side of the camp. On our turning out the rebels beat their drums most furiously and advanced to within 200 or 300 yards, shrieking and yelling till the hills rang again. I never heard such hideous cries, as they did not come nearer some of us took long shots knocking over some of them, and making them retreat a little on one side, however where the village is the scoundrels had crept up quite close, and stood some sharp firing, when they also retreated to a distance, then staid round us, advancing, getting picked off, and then retiring, keeping us with all ourwits about us for three and half hours; some of the number had muskets, but very few, our position is a nasty one, we are completely surrounded by hills and thick jungle, and would you believe it, all these Bengalees are in league with the Santhals. We have caught several actually taking provision to them and of course giving them the news of us. We sit in a shed all day, expecting to be alarmed, and have not had a moment's peace since we came. The position of our sentries in the day time is generally on the top of some neighbouring trees. The Santhals we hear are determined to attack us again in greater force, as the village Koomerabad, (although a Bengalee one) is well known to contain a great deal of their plunder. Some of the Santhals with whom we fought yesterday, are we expect, from 'Nagore' as one of the rascal's had a sepoy's jacket on which he could only have got from one of the jacks who fell with poor Toulmin.

"To-day we have not seen any of the enemy, but hear their drums in the distance, the Sun, yesterday was awful, I wonder how we stand it so well, an August Sun is no joke.

"A wag amongst us observed during the engagement, that the showers of tears (TIERS) shed by the Santhals had little effect on our hard hearted jacks.

Another letter from Koomerabad, 17th August says,—

"You may have heard of the battle of Koomerabad before this, but here is a short account of it. Yesterday at noon an alarm was given that the Santhals were upon us, and in less than five minutes several thousands came flocking out of the surrounding jungles in bodies of several hundred each, all round the camp. The sepoys got ready in a wonderfully short time, and a company was placed on each side; we thought there might be a rush, but the Santhals had a dread of so many red coats, and kept their distance almost out of good musket range, about fifty of them were killed and knocked over at long distance; and although the arrows were flying thick over us no one was hit. On one side of the camp (the village side) the racals came withing sixty yards, and these were the men who had fought at Nuggur, as their chief was recognished by some natives and had a sepoy's jacket on. They yelled like fiends when any of their men fell, and made the jungles resound. This fun went on for about three and half hour in the most awful heat. I ever felt, and when they retreated, about four o'clock, I was not sorry to go and have a good drink, you may think it odd our not following the archers up, but if you had seen the situation we were in, I think you would have done likewise. Report says they are going to attack us again. I went after about 1,000 of them with the light company, caught them in a 'gully of the village' and after a few shots they all bolted, leaving twelve on the field. the 'Doogdoogee-wallah' amongst the number, as he was found beside his drum, and his drumstick on the ground, two or three sepoys were wounded. This is all the news at present."— *(Englishman)*

22 August 1855

A correspondent writing from Jungypore under date of the 28th ultimo sends us some minute and interesting details of the rise of the Sonthal insurrection and an account of the manner in which Mr. Henshaw and his two sons met their deaths at the hands of the rebels, both of which we publish below. From the same sourcee we learn that the Sonthals have not appeared in the neighbourhood of Jangypore since the 6th of the last month when they came to atack the party of the 31st N. I stationed at Mohespore, and after making three advances against the place fell back into the jungles with the loss of their

Doogdoogiewallah. Since this event they have neither been seen nor heard of in their quarter of the country. Doorgah and Runjeet Manjhees, a Darogah of Suddac and Rana and some eleven others were brought in prisoners on the 26th of August, and sent up to Bhaugulpore. Doorgah Manjhee is a man of substance, and is said to be worth some thousands of Rupees. One Manjhee, by name Sadhoo, was dug out of a den, in which he had been concealed :-

In the Harkaru of the 11th instant you transferred to your columns from the Friend of India, what you style a connected narrative of the Sonthal insurrection showing its rise and progress and the means adopted for its extension which you appear to accept as perfectly correct. The Friend's account, however is far from being accurate. His subjantaism does not appear this time to have aided him in his luebrations, I shall first point out his errors and then, endeavour to give you as correct an account of this insurrection as my position and the means I had of correctly informing myself will enable me to do. The Friend ascribes the rise of the Sonthals to the oppressions of the mahajuns or native money lenders and by their own statements to the extortions of the Amla of the Court. The later assertion has not the slightest foundation in truth. A reference to the records of the courts (I use the plural) will at once diclose the mind of the Friend of India. The visits of the Sonthals to our court Shave generally been far between and few. He calls the family of Seedoo (not Siadhoo as he has it) and Kanoo Manjees one of the importance. Far from it ; they are as low as perhaps any other beggarly Sonthal, or has one of the brothers ever been a dacoit, they are however described by their neighbours, who do not belong to their tribes, as consummate villains. They had issued a proclamation wherein they have stated that their deity had become incarnate in the person of a child. They have indiscriminately put to death Police or any body they have got hold of; but not a single Amla of any court, by way of selection, the Beerbhoom Nazir and a couple Mohurries of a Deputy Collector at Pulsa perhaps excepted. The 40th N. I. never came to this part of the country; the Regiment sent up is the 31st N. I. from Barrackpore under Major Legard. Mr. Toogood had nothing in the shape of a chase with the Sonthals so as to have been outstripped by them, nor did he ever go to Nulhat, but to Burhat, and Bhugnadighi the reported, strong hold of the Sonthals. He did however actually leave Sonthal villages untouched, the inhabitant whereof were (aimed?) to a man whom by the exercise of his ordinary civil powers he could have easily and without any blame being attached to him arrested and taken

into custody, for it is a fact known even to a child of five years that there is or was not a single Sonthal in Bhaugulpore, Moorshedabad and Beerbhoom who did not join or aid and abet the insurgents. Mr. Toogood, in order to impress on the minds of the Sonthals the peaceful and inoffensive character of his journey did in one of their villages, lay a fowl and so like Xerxes' messenger in days of yore had his earth and water, a pretty good token of submission and of their peaceful habits. The Railway officers employed in the country between Rajmahal and Pulsa have as a body, when the insurrection broke out behaved little better than the coward Bengalees. It is they who by indiscriminate and precipitay flight from their lines in all directions first spread terror and dismay all around. The only gentleman who has since redeemed his character is Mr. Taylor, of Sreecoend. I leave the Friend here, and begin my own narrative, supplying such facts as are perhaps—not generally—known.

The family of Seedoo and Kanoo Manjee (a Manjee among the Sonthals what a mundul or Ramanick is elsewhere) consists of four brothers, the two former Bhyrub and Chand. They cultivated lands but being extravagant borrowed money for a Sonthal to a large extent, so the rent and the mahajuny screw made their condition quite intolerable, At last in the beginning of June last Seedoo conceived in one to have observed in a dream their Thakoor, who appeared before and inspired him with hopes that their dook would be soon over. Seedoo communicated the next morning to his brother Kanoo, and both being accomplished knaves, immediately gave out the result of their dreams and reared a temple for the deity within the yard of their house, a description of which has already been given by Mr. Toogood. They regularly worshipped the Thakoor and offered milk and other sacrifices. The Sonthals and other people of the neigbouring villages flocked now to their houses, who were told by the brothers that Thakoor would remove all the grievances of the Sonthals, and required them to take up arms for the purpose, whereupon they wanted one day to see the visible appearance of the Thakoor, which was promised by the brothers on a certain day. When the Sonthals assembled in their house, they exhibited a paper to them in Nagree character, which the brothers knew how to read and write and stated it to have fallen from heaven and told them that it was inconsistent with the god's divine character to appear before a large number of people with whom, however, he would converse through the mouth of his chosen disciples

Seedoo and Kanoo, who now openly declared that the day of Sonthal glory was come, they would have no more to owe subjection to any one or pay the land holder or mahajun and be free from all kinds of oppressions, their body being proof against fire-arms, from which water alone would come out. A number of choota Nazirs, burra Nazirs, and Jemadars were then appointed, and the Manjees and Pirganaits of the distant pergannas were commanded on pain of death (aahi to toomara seer chata jaga were the terms of the perwannas) to arm the Sonthals under them and appear before the Thakoor, All the Sonthals Black smiths were ordered under the above penalty to visit the Thakoor, with sieyefulls of arrow-heads and a cetain number of battle axes. The brothers were addressed in the style of Soobha Maha Rajah dhi Raj, Sher Marr Accejung Bahadoor the killer of a tiger and repeller of an atack. For nearly a month the Sonthals, who resided at a distance from the Hills, and such of them as were employed in the factories and else where, constantly left their houses and places of business on leave to go and visit their Thakoor baree and the new soobha. On their return they openly told those who asked them that they were to have looracc. The appearance of a Thakoor among the Sonthals being however, an everyday occurrence, people laughed at them and their story. All this while one Heenga Ram Chowdhery, of Burhut, sooree or gorgseller by cast, and a moneylender supplying them with money, which he was forced to do. At last Surmoo Momein, a jola out of curiosity repaired to Bhugnadighi, and observing a gathering of more than 6,000 Sonthals asked Seedoo and Kanoo what convincing proof they had received of Divine inspiration, when they shewed him the Nagree writing, which he read and pronounced to be nonsense, whereupon his seer was ordered to be taken. The actful jola had presence of mind and wit enough to reply almost [ ] neously that as regards himself he was strongly convinced of the truth of Divine presence in their persons and houses, and had spoken apparently in an irreverent tone simply to test their veneration for the Thakoor, that he was in their hands a bird in the cage whom they would easily be able to put out of the way whenever they would think it necessary, and this is as they were now soobha of the moolook and he knew likka puccee he would act as their Moonshee, to which post he was immediatly appointed, his life being of course spared whilist so employed the jola privately wrote to Mohesh Datt and Kalipersad Darogah of Deeghee and Teerae, Zillah Bhaugulpore, informing them

of their mischievous intentions. He at the same time strictly cautioned them not to come if accompained by troops. The latter Darogah reported it to Bhaugulpore; the former came on the 6th ultimo to Panchkatiah, and lodged in the shep of one Manick Chand Shah, a modee, and sent thence Issur Singh burkundaz to bring over Seedoo and Kanoo, who sent word that they would come next day which they did accompanied by 200 armed Sonthals, leaving behind them about 7,000 at Bhugnadihi. On arriving them at Paunchkatiah, they observed one Loll Chand Pargunait, a Sonthal chowkedar, kept tied to a post, on which they became quiet enraged, and asked the darogah why he had done so, whether he was aware of the appearance of the Thakoor in their house and of their now being the soobha, of the moolook. The Darogah replied in the affirmative, and told he would immediately release the purganait, whom he had detained in order to check dacoity. Scarcely had he said when he was dragged from the modee's shop thrown on the ground, and his head was servered by strokes of battle axes. The burkundazes were then one by one dragged out, thrown on the corpse of the darogah and their heads cut with those of five others, among whom was the moodee Manickchand Shah. This was on the 7th July. On the 8th they plundered Burhaut, and this began their murderous and devastating expeditions. The Hon'ble Mr. Eden received the first intimation of this outbreak on the 9th from Mr. Mudge, Resident Engineer of the E. I Railway Company, who enclosed an original letter from Mr. Tylor, dated Sreecond 8th July. Mr Eden, on receipt of this, made some other eqnquiries, and after being satisfied that an emergency had arisen, he at once sent down an express to Berhampore for troops and for Mr. Toogood to come up, writing at the same time to Gopaul Singh of Mohespore, and to the Ranee of Pakur, and directing the Darogah of Thana Shumsheregunge to make enquiries and report. Towards the evening of the same day Sunnoo jola appeared before Mr. Eden and confirmed the information received by him. Mr. Eden, by his unremitting exertions had by this time assembled about 400 men, with whom were escaping from the villages situated close to the jungles in crossing the Nallah. The Friend has done an injustice to the Hon'ble Mr. Eden is not making the slightest allusion to his valuable services. The rebels have no doubt committed dreadful ravages in four thannahs of his jurisdiction, but had there been an officer of less energy, zeal and activity at Aurungabad, the whole country on the western bank of the Bhaugerriatty would have been done one heap of ruins. A week's delay in sending for the troops would have sufficed for this purpose. It is but just and fair to Mr. Toogood, however, that I should state that he too has acted with great energy and persence of mind.

The day before Mr. Henshaw set out against the Sonthals he received the following letter from Mr. Pontet.—

My dear Sir,—Can you oblige the Magistrate with the loan of your elephants; he wishes, to go out and attack the rebel Sonthals, and should you be disposed to join him with your guns, he will be very much obliged.

Excuse haste and pencil

Yours very sincerely
J. A. Pontet

Rajmahal, 13th

Mr. Henshaw, on receipt of the letter, declined to lend his elephants or join the Magistrate with his guns, intending himself to march against the Sonthals which he did no Saturday the 14th ultimo at about 10 A. M. on receiving information, from a Khotta Brahmin of Bhooeenpra, close to which he had a village of his own, Harroopara, that they, the villagers, had driven away ten or twelve of the Sonthals, who had come to their village. Mr. Henshaw left home against the most earnset entreaties of his servants and ryots accompanied by twenty-five men of the village of Mahatabpore, where he resided, and his two sons, James and George, the former being the eldst, the party arrived at about 1 P. M. At Bhooeenpara which is eight miles from Mahatabpore and three miles from Sreecond, the station of the Railway, where they were joined by about seventy-five villageers, so that their number exceeded one hundered. For a while they saw no traces of the Sonthals, and were therefore, thinking to return home when James sang out to his father that the Sonthals were coming out of the jungles. Hearing this Mr. Henshaw told his mahout and the followers to move towards an open place whence they could fire to an advantage ; whilst this was being done the people constructed it into a fight, and took to their heels, on which Mr. James Henshaw got down from his elephant, and riding on his horse moved towards the run-way villagers and the servants in order to bring them back; but scarcely had he done this when the scuondrels, to the number of from 600 to 1,000 drew near and began shooting their arrows. Seeing this James showed a disposition to cut away, but was observed by his younger brother George, who told his father what Jammy was about

when he returned. The rebels had by this time entirely surounded them. They first brought down by showers of arrows. Mr. James Henshaw from his horse and then struck his younger brother George, who was on the same hawdah with his father sitting behind him. He then made towards the elephant's neck. The mahout immediately leaving his seat, went and concealed himself in a thicket that was hard by. The elephant shot by arrows from all sides, ran forward a neighbouring marsh, where the Sonthals chased it and brought down young Henshaw. His father had by this time fired six volleys in different directions, but seeing his two sons hacked to pieces before him and deserted by his followers was panic struck lost his presence of mind, and sought shelter by sinking himself down in the howdah, whence he offered a large sum of money to the Sonthals which they agreed to accept on his seating down the elephant repeating the terms in their presence, which if he did not do, they would said they instantly got upon his elephant and kill him and the animal. Mr. Henshew acted as he was told to do, when they took him down, and said they would none give him the fackhutee (acquittance) a term applied by them by way of decision when they got hold of a patwarry or village gomastah, Mr. Henshaw earnestly begged them to spare his life, as he had come out on a seekar, which they had often seen him do. Their reply was toom saunturpor golee chalaya. Saying this they cut his body into pieces., beginning as has been usual with them from the legs. Mr. Henshaw had with him his two elephants, one horse, two rifles and five double-barrelled guns. If they had not been pain struck and lost their presence of mind, but had picked up courage and three of them had kept firing on the Sonthals, there is not the smallest doubt that they would have succeeded in saving their lives. With Mr. Henshaw they killed six others among whom was the chobey Brahmin who had brought news of the Sonthals to Mr. Henshaw, they next entered the village of Moharazpore, where they killed a Brahmin in his sister's presence, who had married a girl of nine years of age a fornight before.

Mr. Henshaw was about 60 years of age. His two sons, by two native females, were also grown up men. he was the son of an officer in the H. E. I Cols of H. M. service. He was formerly the proprietor of the Neemtollah Indigo concern, which he had sold about eight years ago and brought a small but profitable Zemindarry, on the profit of which he entirely lived. He had at one time been well to do in the world, but had latter been in a very distressed condition. He was a

gentleman of extremely good and concilinatory nature, and though a planter and Zemindar he knew not throughout his whole life what (feud) was. His own ryots and neighbours so much loved him that his loss is deeply and deservedly lamented by them.

The rebels had taken away Mr. Henshaw's elephants with the two howdahs, which have been recovered, the large howdahs having been unaccountably burnt by Mr. Toogood at Begnadighee.

4 September 1855

The Sonthal insurrection still drags its slow length along–Little appears to be doing or about to be done, to check the depredations of these savage hordes. Murder, pillage and incendiarism reign triumphant, and the Government calmly looks on, and almost doubts the existence of facts daily broadly represented by its own officers stationed in the disturbed districts. We pass over the oft asked question why Martial Law was not declared at the outset, to enquire why Government does not, now that campaign is inevitable, exert itself to cripple the resources of the Sonthals, while such a scheme is practicable. From numerous sources, we understand that the rebels have collected their plunder at stated places along the boundaries of the Bhaugulpore and Beerbhoom districts, and that they are now busily engaged in carrying off their supplies and plunder into the hills, in anticipation of a cold weather campaign. Nothing could be easier than to strike a series of blows by which the resources of the rebels might be contracted, but no time should be lost. There are troops enough in the Beerbhoom district to effect the purpose. One such blow has been struck, but in only one place. On or about the 9th instant. Colonel Burney, commanding at Sooree, having heard that the rebels, numbering many thousands, had assembled at and about the head quarters of their Soobah, and were busily employed in carrying off their grain and other kinds of the plunder, to the hills, resolved to make a dour, and see what he could effect in the way of punishing them recovering some of the plunder, and burning the reminder. He started on the evening of the 9th instant, with 500 men and 4 guns, and was at the Sonthal outpost, 18 miles north of Sooree, by 8 A. M. of the 10th. At the approach of the troops hundreds of the rebels were seen going across country, with their flocks &c, but apparently all towards one spot, Telaboonee. The residence of the Soobah, and village after village was burned, the wretched Bengallees of the neighbourhood being first allowed to recover all they could. At 2 P.M.

the force arrived within sight of Telaboonee, where it was supposed and earnestly hoped that the rebels would make a stand especially as the war drums were beating in all directions. No such luck, however was in store; the Soobah with about 1,500 men run away just before Lieut, Anderson could get a round shot amongst them.

The troops encamped at Telaboonee on the 10th and returned to Sooree on the 11th, having burned down 80 Sonthal villages, some of them containing as many as 130 huts. Immense stores of grain have been removed or destroyed and thus far the expedition has succeeded well, but if the march had been made straight upon Telaboonee, and no time lost, a severe example would have been made to the rebels. ....

16 October 1855

Makoondy—The following is from the 13th N. I Camp at Makoondy, October 9, 1855—

"The Sonthal Kowlia was brought in prisoner this morning. This man took a prominent part in the dacoitees which preceded the insurrection, and when the latter broke out was thought to be the originator of it. Ten thousand Rupees were offered by Government for his apprehension whereas Seedoo was only valued at five thousand. Latterly Kowlia has kept very much out of sight, but it was long thought by Mr. Pontet and many others that he secretly planned and directed the various enterprises of the insurgents, putting prominently forward his puppets, Sedoo and his brethren. In fact this man Kowlia has been looked upon in the light of one of these peculiar characters which writers of romances delight in a personage not without mystery, and with a great and secret power entirely disproportioned to his avowed circumstances. This morning an expedition was made with two companies under Lieutenant Turnbull to some Sonthal villages in the neighbourhood. The commandant and several amateurs accompanied the party and with it also was Mr. Champman the Magistrate. Two officers. Lieutenant Aitkon and Ens Loughnan, riding some distance in advance, when by a lucky accident the elicited from a village that Kowlia was in a village near at hand called Kutwun. They pushed on, and true enough, Kowlia was pointed out by the villagers and apprehended. He was quiet collected and steadily denied his identity, and affirmed that his name was Checrkah. Every man in the village swore the same thing. Fortunately, however, one man was at last persuaded to confess that his real name was Kowlia and he himself at length made the same admission.

"Kowlia is taller than Seedoo and appears much more intelligent. His countenance is even of an intellectual cast. During his examination, he was collected and shrewd. he admitted the dacoity, but denied all knowledge of Seedoo and the rebels, and gave a plausible account of himself durning the whole time since the beginning of the revolt. Indeed as yet not the slightest evidence exists that he was in any way implicated in it. He sems to possess great influence in his immediate neighbourhood. Upon his person was found a paper, borrowed from a friend, and in this paper, a Magistrate certified that the bearer, Brijnath Manghy, was rendering the Government a valuable service. Kowlia confessed that under his alias, he had paid a visit to this Magistrate, Mr. Money.

"Kowlia's capture is due to the activity of Lieut. Aitkon, and also to a clever Darogah, Kishen Singh, who was the first to suspect the prisoner's whereabouts. *(Englishman)*

19 October 1855

The following important intelligence has been sent us by a friend, and may be relied upon as correct :

"Ram Manjee, the man who, it is supposed, ordered the atrocious massacre of Mrs. Thomas and Miss Pell, if he did not actually lend in killing them himself, was caught on the morning of the 17th instant by Lieutenant Dunbar, 37th Regiment, That Officer had been for some time aware that Ram Manjee was in the neighbourhood of Gargori, but from different circumstances and attempt likely to be successful could not before be essayed. At $\frac{1}{2}$ past 3. A. M. on the above date Lietenant Dunbar accompanied by Lieutenant Lloyd. 56th Regiment, and Ensigns Cary and Clarke, 37th Regiment, with 150 men of the 37th, marched for the encampment of Ram Manjee, situated nine miles from Gargori. The guides took them by a circuitous road, by which means, they were enabled to approach the Sonthals quite unperceived. Some time before, they reached the encampment of the rebels, they heard the native drums sounding within a few yeards of them, a narrow belt of jungle only intervening; at about 7. A. M. they came suddenly on a small open plain in the middle of which were a great many houses or rather several small villages. In front of the village opposite which they entered was a strong body of the rebels all armed.

Owing to the sudden and unexpected appearance of the detachment they did not, however make any stand and with the exception of two

men they all immediately fled to the jungle. The two that remained behind were dressed in long white sheets, and on the detachment approaching within fifty yards of them they each raised a flute to their lips and began to play in a most inconcerned manner. They were ordered to be seized, and were immediately recognised by the guides and heads of one or two Bengalee villages to be the celebrated and notorious murderer and robber, Ram Manjee and his deputy. They seemed to be very proud of their situation, for they immediately confessed who they were, and Ram Manjee in a decided and loud voice exclaimed, 'I am Ram Manjee, made so by Ram Rajah, of Hazareebaugh.' Upon being asked why he didn't fly, he answered most scornfully 'Do you think I would fly from your people', ; afterwards he said that in a day or two, if he had not been taken prisoner, it was his intention to have gone to Calcutta for the purpose of explaining to the authorities the whole cause of, and the reasons for the insurrection. Ram Manjee himself is a fine-looking muscular man and very independent in his style of conversation. The house he was standing before when taken prisoner was built in neat comfortable manner with a raised mound in the centre which formed his throne; the ground surrounding it was covered with flowers. His force was stated to consist of 1,000 men, but is seemed to be larger. As they were the terror of the neighbourhood and were all armed they were fired into during their retreat, but the jungle was so thick that it was not advisable to follow them, and it is impossible to say how many of them were killed. There were no casualties on the side of the Military; the Bengalees plundered the villages, and after the departure of the detachment burnt the house to the ground. Great praise is due to the manner in which Lieutenant Dunbar conducted the suprise and captured this well known and much feared murderer and robber."

22 October 1855

The following is from a gentleman in the Beerbhoom district :

"The Englishman's correspondent who recently gave a short description of the affair which occurred near Sooree on the 10th instant was wrong in stating that Anderson's guns were fired, when the force came in sight of the Sonthal villages it halted and opened out so as to leave the centre clear for the guns, which were then taken off the elephants and mounted. While this was being done the Sonthals could be distinctly seen driving off great numbers of their cattle, and when all was ready after half an hour's delay the force moved on against the almost empty Sonthal villages, for the rebels had nearly all fled, and not a gun was fired. The Sonthals all skulked off as soon as they saw the sepoys, and only about a dozen musket shots were fired at a few of them as they ran out of some of the villages to the right, in the direction which Captain Halliday had taken ; the Sonthals returned the compliment with arrows, but no damage was done on either side. About 100 head of the cattle were collected by the camp-followers for themselves, but they nearly all vanished before morning, as their captors were too deeply engaged in feasting on goats and fowls to look after their plunder. Several Manghees are willing to come in with their followers as they have quite enough of this fun in which they are always the loosers, and particularly now Ram Manghee's camp is broken up, for it is said that nearer 100 than 30 villages were burnt on the 10th, and all the property and grain in them destroyed. Major Nembhard was withdrawn with his troops from Mahommed Bazar on the 18th instant, leaving only 40 sepoys under a Subadar there, and it is said that all the Sonthals in the direction of Sooree wish to settle down quietly. The 31st N. I. at Aurungabad, have received orders, it is said, from the General to march on the 10th Novemeber, they are to march first to Sreecoond and to pick up the detachment there and to make the best of their way in the Raneegunge direction via Pirour, Pulsa and Nulhutty. All the other corps are in like manner to make a simultaneous movement in the same direction and are not to touch the Sonthals unless they are attacked by them. Bancoorah is once more to be made a station, and a Regiment is to the cantoned there permanently."

24 October 1855

Our friend who recently wrote to us from Raneegunge, has picked up some more intelligence relative to the Sonthal insurrection and writes as follows under date of the 22nd instant.

"On the 10th Captain Pester came across a body of Sonthals, at a place called Sarlee Barra, and a usual gave a good account of them, killing twenty-five, and wounding a large number of them; the Sonthal came and all the supplies it contained were destroyed. Yesterday twenty prisoners arrived their submission, the repeated defeats they have of late sustained having shown them that the contest is a hopeless one for them. The Manghee who was captured by Lieutenant Dunbar, of the 37th N. I. turns out be be the veritable Ram Manghee the author of so many atrocious murders. I hope they will hang the villain, and if they will do so before the holidays are over I will go and see him swing.

On the 18th Captain Nicoll, of the 10th N. I. attacked the Head Quarters of one of the Sonthal division, situated at a place named Subunpore. he found the rebels in strong force, and they fought with much determination, wounding a duffadar, a sepoy and five horses, the first severely. Of course the rebels suffereed, for their daring ; sixty-five of them were left dead on the field and the wounded were in preportion ; five thousand head of cattle were taken and grain sufficient of supply a small army for months.

Captain Nicoll and Pester, and Lieutenant Dunbar have struck blows which will have a material effect in bringing the contest to a close, and if the advantages obtained be promptly followed up we feel little doubt that tranquillity will be restored before the three officers above named, and Captain Phillips, of the 63rd N. I there will be plenty of energy displayed, and we anticipate that their example will become infectious, and that we shall hear of a series of successes that will lead to the speedy submission of the Sonthals. The head-men having already evinced a desire to make their peace with the authorities, will hardly wait until the advance of fresh troops from the Rajmahal and Bhaugulpore districts shall have hemned the rebels in and rendered their destruction almost certain.

24 October 1855

The following particulars of the Sonthal Insurrection may be relied upon as correct :

"On the morning of the 22nd Soona Manjee, of Singaldhobie, Harun Manjee, of Hodellia, and Rognatti Manjee of Dumerhea, came in a very penitent manner to the camp of Lieut. Dunbar, 37the Regt, at Nala and stated that they had each as their names are set down 280, 96 and 95 followers whom they promised to bring in the day after to-morrow for the purpose of laying down their arms. Whether they really do so remain to be seen. One was allowed to go free to enable the rebels to be collected and brought in as they promised should be done, and two were kept as hostages. Captain Pester, with a detachment of the 63rd left Nala on the 22nd, having been ordered ot Jumtarra.

The Sonthals are collecting in the direction of Aurungabad and Berhampore with the affirmed intention of plundering and destroying the Raja's palace at Mohespore, which if they did at once, would fall an easy prey to them, as there are only 40 men protecting it at present. Some of the out posts of the 31 st Regt. could easily reinforce the small garrison if sufficient time were given. It is stated that there is only one company of the 7th on duty at Berhamporé, so that the Rajah could get no assistance from thence. The jungle will soon be in a fit. state for the shiker party to commence their proceedings.

Twenty Sounthal prisoners arrived at Raneegunge on the 20th whom Captain Pester managed to seize, and these with the sixteen rebels sent in on a fromer occasion by Captain Phillips, 63rd, make at present 36 prisoners ; they are a most miserable looking set of creatures and some of them mere children. On the 18th Dr. Walliah in the General Hospital there amputated the leg of one Sonthal sent in by Captain Phillips; the leg was in a dreadful state from a masket shot wound.

On the 20th instant Colonel Burney left Sooree on temporary leave till the 31st, and Major Nembhard again commands the 56th Regiment for a few days. 22 Manjees, followed by about 100 Sonthals gave themselves up on the 20th to the detachment at Mohammed Bazar ; these Sonthals reported when they had given themselves up that there were a great number of the disaffected rebels gathering about Nungeles. On the same day Lieut. Raikes, in command of the recrute from Barrackpore belonging to the 56th, arrived safely with them. On the 21st Lieut. Kempland, 56th Regt, commanding a detachement of 50 men at Nungolea sent an express for aid to the Head Quarters of the Regiment at Sooree as the rebels were crossing the river on a large body near a place called Nallee Bunnee and he required assistance. So sepoys under command of Lient. Battye were ordered to march immediately to his aid. After this detachment left, a great deal of friring was heard in the direction they went, but the result and the cause are not yet known. A letter arrived at Sooree from Nungolea at 9 p.m. of the same day, stating that at noon on that day the Sonthals commenced crossing the river in a large body. Lieut. Kempland took with him all the avaiable force to prevent them effecting their purpose. Before he could arrive, however, at the river about 200 Sonthals had crossed, but he was enabled to drive them back; a great many were killed but it is impossible to state the exact number ; none of the sepoys were wounded. At 12 o'clock the same night a detachement left Sooree for Mahommed Bazar as news had arrived that large bodies of Sonthals were crossing the river there for the alledged purpose of looting Mahommed Bazar."

22 October 1855

We received following further details of Captain Nicoll's action with the Sonthals at Suhunpore :

"Captain Nicoll, commanding detachement of the 50th, accompanied by Lieutenant Mathias And Ensign Gartou marched on the 17th from Jumtarrah at two o'clock A. M. for a place called Suhunpore reported to be only twenty miles on at eight o'clock in the morning they had ( ) reached Namenpore, where about ten days before the Sonthals had killed the Jemadar and a good many Bengalees. After the force had passed this village, they perceived the Sonthals collected about a mile in front of them in very large number. Upon approaching nearer, Lieutenant Mathias who ordered forwared with the light company in skirmishing order, when in distance they fired at the rebels, skirmishing all the time, and killed a geat number of them. The Sonthals stood well and answered by continued fights of arrows which fell thick arround the skirmishers, but only one sepoy was wounded ; they were at last driven into the jungle ; the Sonthals fought manfully, asking for no quarter; one man was observed in front of the others to fire at an officer at last a dozen times ; at last the Sonthal was wounded and fell flat on *hi fabe* dead to all appearances, when to the suprise of all he got up and made a profound salaam to the troops, and then turned round and walked calmly into the jungle whithout any further injury though fired at several times; when the Sonthals fell wounded only, they still fired amongst the troops; they fought for every yard of ground and gave back very slowly. Another Sonthal was lying wounded and one of the officers wished to spare his life, but while he was walking up to disarm him the Sonthal continued to fire as he sat on the ground, till the officer approached close to him, when one of the people shot him dead as he was about talking certain aim. This first affair lasted about one hour ; there was still two miles left through jungle before the force could reach the hill which the Sonthals had stockaded. Lieutenant Mathias again led the Light company in open order into the jungle and regularly beat it ; fights of arrows were continually coming which the sepoys answered with their muskets, but not a Sonthal was seen or heard, for they made no yelling and very seldom beat their war drums, which is unusual for them. About eighty were killed and wounded in the first affair, but through the jungle it was impossible to tell how many were hurt....

At last the troops arrived in the open, and the rebels were dirven up to their village. The Sonthals then retreating fired five or six stimes with matchlocks, the slugs coming just in front of the Light Company, but hurting no one, this is almost the first time they have been known to use firearms. The twenty five troopers that accompained the troops then charged amongst the enemy and cut down about eighteen of

them. The Duffadar cut down one man and then rode on; the wounded man sat up and fired an arrow at him, which went through the sword belt of the Duffadar and penetrated three inches into his back ; five horses were wounded and these were the only casulties. The Sonthals were driven off from their village which they had stockaded, and pursued a short distance. The troops then returned, and their camp and villages were plundered and burnt ; 5000 head of cattle were caught, which it is said, will be sold and the proceeds divided amongst the sepoys. About 5000 rupees worth of grain of different kinds was destroyed, and altogether it was a most successfully managed affair.

25 October 1855

We are happy to be able to state that His Honor the Lieutenant Governor of Bengal has proclaimed Martial Law in the Disturbed Districts. This is what ought to have been done some five months ago and would have been but for the opposition of the president of the Council of India

Since writing the above we have received a supplement of the Calcutta Gazette with the proclamation of Martial Law.

PROCLAMATION

Where as certain persons of the tribe of Sonthals and others,inhabitants of the Rajmahal Hills, of the Damun-i-koh, and of certain pergunnahs in the Districts of Bhaugulpore. Moorshedabad, and Beerbhoom and owing Allegiance to the British Government, are, and for some time past have been in open Rebellion against the authority of the Government ; and whereas soon after the first out-break of the said Rebellion, pardon to all who should come in and submit within a period of ten days, except ringleaders and person convicted of murder, not withstanding which act of clemency, the great body of the rebels have not availed themselves of the offer of the mercy thus held out, but continue in rebellion ;—wherefore, it has become necessary for the speedy and effectual suppression of the Rebellion that advantage should be taken of the season to commence systemic millitary operations against the Rebels, for which purpose it is expedint that Martial Law should be declared, and the the functions of the ordinary Criminal Court of Judicature should be partially suspended in the said Districts.

It is hereby proclaimed and noticed that the Lieutenant Governor of Bengal in the exercise of the authority given to him by Regulation X of 1804, and with the assent and concurrence of the President in Council, does hereby establish Martial Law in the following Districts, that is to say :–

So much of the District of Bhauguplore as lies on the right bank of the River Ganges.

So much of the District of Moorshedabad as lies on the right bank of the River Bhagirutee.

The District of Beerbhoom.

And that said Lieutenant Governor does also suspend the functions of the ordinary Criminal Courts of Judicature within the Districts above described with respect to all persons, Sonthals and others owing Allegiance to the British Government, in consequence of their either having been born or being-residents within its territories and under its protection, who after the date of this Proclamation and within the Districts above described shall be taken in Arms in open hostility to ; the said Government or shall be taken in the act of opposing by force of Arms the authority of the same, or shall be taken in the actual commission of any overt act of Rebellion against the state.

And that the said Lieutenant Governor does also hereby direct that all persons, Sonthals and otehr owing Allegiance to the British Government who after the date of this Proclamation shall be taken as afore said, shall be tried by Court Martial ; and is hereby notified that any person convicted of any of the said crimes by sentence of such Court will be liable, under section 3, Regulation x of 1804, to the immediate punishment of Death.

By order of the Lieutenant Governor Bengal

W. GREY

Secretary to the Govt. of Bengal.

Calcutta, November 10th 1855

12 Noverber 1855

নির্ঘণ্ট

অজয় নদ ২৪
অনুঢ়েশ্বরী দেবী
অম্বর ২৭, ৩৭
অরঙগাবাদ ৩২২

আইন ও শাসন ৩৭
আওরঙ্গজেব ২৫, ২৬
আগমহল ২৪
আড়াইকাটি ৩০৮
আমড়া ৩২৫
আলিবর্দি খাঁ ২৬

ইব্রাহিম খাঁ ২৪, ২৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৩২৪
ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ ৩২৭

উধুয়ানালা ২৬, ২৯

এরোপূজা ১২০

ওয়ার্ড ৩০০
ওয়ারেন হেস্টিংস ২৩, ২৯
ঔংগা ২৩, ২৯

কথর্প ২৬
কলিকাতা ৩১৫
কানু ৩১৬, ৩৬৪
কাপ্তেন ব্রুক ৩৭
কালিকাপুর ৩২২
কুল গোঁসাই ৯৫
কুমার মহম্মদ ২৫
কুশিদিয়া ৮৯
কোর্ফাপ্রজা ৫০
কোল ৯২
ক্লীভ ল্যাণ্ড ২৯, ৮০, ৫৪

খয়রাশোল ৩১৮
খাড়ওয়াড় ৯২

গামরিয়া ৩১১
গার্পামুড়ি ৩১৯
গুমানী ৮৯
গুমু গোঁসাই ৯৫
গোড্ডা ৯২.৩১৯
গোড়াইত ৯০
গোম্‌হা পরব ১০৭
গ্রাম্য সম্প্রদায় ৬২

ঘাটোয়ালী সম্পত্তি ৮০

চন্দ্রপুর ৩১৪
চান্দোবঙ্গা ৯৮
চামদা গোঁসাই ৯৫
চাল নদ ৯৪
চিতরীন ৯৪
চিলিমিলি সাহেব ৩০

ছাতা পূজা ১২২
ছাড়িওয়া ১৭৩
ছাড়িয়ার গান ১৭২

জগমাঝি ১৭০, ১৭১
জঙ্গলতরাই ২৩, ৩০, ৩৭
জঙ্গীপুর ৩২২, ৩২৮
জনপেটি ৩১
জর্জ লয়েড ৩৪, ৩১৪, ৩৩৯
জহর থান ৯৭
জামতাড়া ৩৪, ৩৭, ৫৫
জামাইতিরি ১৭৩
জাহাঙ্গীর ২৪
জে. পি. গ্রান্ট ৩১৮
জেমস ব্রাউন ২৯

ঝালদা ১১৪, ৩০৪
ঝিকরহাটি ৩২৪
ঝুটিয়া সাঁওতালী-৯৭

টাকশাল ২৫
টুকস ৩২০
টুলমেনন ৩১৭, ৩১৮

ঠাকুরবাবা ১৩০

ডাকেতা ৩১৩
ডিলুমেন ৩১৬

তপোবন ২৪
তিতুমিয়া ৩০৬
তেলিয়াগড়ি ২৪, ২৫, ২৬

দা-বাপলা মিরিং ১৭২
দামিন ইকো ৩১, ৩২, ৮৮, ৮৯, ৩০২
দামোদর ৩০২
দ্বারা গোঁসাই ৯৪
দিবিপূজা ২৪
দুমকা ৫৫, ৩২০
দুর্গাপূজা ১২৪
দুবরাজপুর ৩১৬
দেওয়ানি বিচার ৪৩
দেবঘর ৩৪, ৩০৬, ৩২৬
দেবঘর-বাজার ৩৫
দেশের অবস্থা ৯৯

ধামসাই ৩০৯

নওড়িয়া ৮৯
নওবাঁই ১২৪
নগর ৩১৪, ৩১৬
নবান্ন ১২২
নজর পয়মাস ৪৭
নর্ত উৎসব ৯৮
নাঙ্গুলিয়া ৩১৯
নায়কে ১৬৯
নারকেলবেড় ৩০৫
নিজমাত আদালত ৩১
নিন্দাচান্দোবঙ্গা ৯৬
নৃত্য ৯৭
নেহলি সিং ৩১
নৈয়া ৯০, ৯৫

পঞ্চাইত ৯১
পন্টেট ৩১, ৩০৪, ৩১০
পয়লাপুর ৩০৯
পরগণাই মাঝি ৯১
পরেশনাথ পাহাড় ৩৭
পলাসি ৩২৩
পাখরা ১০২
পাটওয়ারী ৮৮
পাতরুল ৩০৮, ৩০৯
পাথর গাঁওয়া ৩০৯, ৩১২
পাতকুম ৩০১
পাঁচ কেঠে ৩১১, ৩১২
পাঁচগাছি ৩০৯
পালারপুর ৩১২
পাহাড়িয়া ২৩
পিন-চু-বুধী ৯৫
পিন-চু-হারাম ৯৫
পিরপৈতিক ৩০৭
পুলিশ ৫৩
পূর্ণিয়া ৮৮
পোটেন্ট ৩১৫
পৌগোঁসাই ৯৪
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৩২৬
ফৌজদারি বিচার ৪২

ফ্রান্সি হ্যালিডে ৩১৭

বনবনি/হবি-অবি পরব ৯৫
বন্ধুয়া উৎসব ৯৫
বনসিংহ দেবতা ৯৬
বর্গীর হাঙ্গামা ২৬
বরাকর ৮৭
বর্ধমান ৩২২
বসন্তপূজা ১২১
বাঘনাডিহি ৩৩
বাদনাপূজা ১৬৭, ১৬৮
বাঁধাপূজা ১২২
বাঁধনাপরব ১০৭
বারকোপ ২৯, ৩০৮, ৩১২
বারা ৩০৮
বালাইতিড়ি ১৭১
বারে ইতেৎ ১৭১
বাশলয় ৮৭
বাসুকিনাথ ২৪
বাহাদুর শাহ ২৬
বাহাপূজা ১২১
বিচার-বিভাগ ৪২
বিবাহ ৯১, ১৯
বীরভূম ৪০, ৪১, ৩০৫, ৩১৩, ৩১৪
বুড়েশ্বরী ২৪
বেউড়া ৩১১
বেদিয়া সাঁওতাল ৯৫
বৈদ্যনাথধাম ২৩
ব্রাউন ৩৭
ব্রাহ্মণী ৮৭

ভগ্নাডিহি ৩০৫, ৩০৬, ৩১২
ভড় ৯০
ভবিষ্য-পুরাণ ২৩
ভাওলী ৪৮, ৪৯
ভাগবান্দ ৩১১
ভাগলপুর ৮৮, ৯০, ১১২, ৩০৩, ৩২২
ভাতেণ্ডা ৮৭

ভিলেজ কমিউনিটি ৬২

মণিকা ৯৬
মণিহারি পরগণা ২৭
মধুপুর ৫৫
মেবোকো টুরেকো ৯৫
মরাল ৮৬
ময়ূরভঞ্জ ১০২
ময়ূরাক্ষী ৮৭, ৩১৪
মরাল ৮৭
মরিস ৩১৬
মহম্মদবাজার ৩১১, ৩১৫
মহাগামা ৩১৩
মহাগামার রাজবাটি ৩০৮
মহাদেব বাথান ৩০৮, ৩১২
মহারাজপুর ৮৭
মহেশপুর ৩২০
মহেশপুরের যুদ্ধ ৩২৩
মাঘপূজা ১২২
মাঝিহারাম ৯৬
মানভূম ৮৮, ১০২, ১১২
মানসিংহ ২৪, ২৫
মারাংবুরু ৯৮, ৩০৫
মালদহ ৮৬
মালোয়ার ৯৩
মালেয়ার মাল ও কুমার ৯৩
মুরারই ৩২০
মুর্শিদাবাদ ৮২, ৩২১, ৩২৩, ৩২৬
মিউনিসিপ্যালিটি ৫২
মীরকাশিম ২৬
মীরজুমলা ২৫
মীরণ ২৬
মেজর নিমরড ৩১৬
মেজর ভিনসেন্ট জারডিকাস ৩১৪
মেদিনীপুর ২৫
মেদিমাই ৯৬
ম্যাকফারসন ৩০
যোগমাঝি ৯৪

রক্সী ৯৪
রাখাজঙ্গল ১০০
রাঙা মেটেয়া ৩০৮
রাজমহল ২৩, ২৪, ২৬, ৩০৬
রাজস্ব বিষয়ক আইন ৫৯
রাঠোর ২৬
রামপুরহাট ৩২৭
রিচার্ডসন ৩১৫
রুবেশ্বরী ২৪
রৈয়ত ওয়ারি ৪৭
রোটাস পর্বত ৯৩
রোডসেস ৫৫

লর্ড ডালহৌসি ৩১৪
লহড়িয়া বাজার ৩১২
লাহাটি ৩০৯
লীলাতেড় ৩১২
লোকসংখা ৮৯

শাসকের যুগ ২৮, ৩৫
শাসিতের যুগ ২৮,
শাহআলম ২৬
শাহসুজা ২৪, ২৫
শেরসাহ ২৪

সংগীদালান ৩৪
সরস্বতী পূজা ১২২
সরাই/সহরাই ৯৭
সহরাই পূজা ১২২
সংগ্রামপুর ৩০৯
সংবাদ প্রভাকর ৩২১
সাইথিয়া ৩৪
সাঁওতাল পরগণা ২৩, ২৭, ৩৮
সাঁওতাল পরগণা গঠন ৩১৮
সাজাহান ২৪, ২৫
সাদারল্যাণ্ড ৩১
সাপচালা ৩১১
সামাজিক রীতিনীতি ১০৬
সামরিক আইন ৩৪, ৩১৭
সারহুল উৎসব ৯৭
সার্জেন্ট গিলন ৩১৫
সাহাবাজপুর ৩২৪
সিউড়ি ৩১৩
সিঙ্গবাঙ্গা ৯৮, ১০৭, ১১১
সিধু ৩১৫
সিরাজদৌল্লা ২৬
সিরুমাঝি ৩১৩
সিংভূম ১১২
সিংপুর ৮৯
সুন্দরা নদী ৩০৮
সুবা সিং ২৫
সুরুই ৩২৪, ৩২৬
সুলতানাবাদ ২৯, ৩৭
সৈনিক শাসনের যুগ ২৮, ২৯
স্যর বার্ণস ৩১৭

হরলাজুড়ি ২৪
হরিয়াও পূজা ১২০
হরো চিখনা ১৭০
হাজারিবাগ ৮৮
হাড়িভাঙা খেলা ১৬৮
হুমায়ুন ২৪
হোমপূজা ১২১

কোন পথে ওরা এসে উপনিবেশ গড়ে তোলে পূর্ব ভারতের প্রান্তপ্রদেশে—সে ব্যাপারে বিশেষ তাদের মধ্যে রয়েছে মতভেদ। বেঁচে থাকার তাগিদে অনাবাদী জমির জঙ্গল হাসিল করে ওরা ফলিয়েছিল সোনার ফসল। আর সেই সোনার সন্ধানে যারা এসেছিল, তারাই বঞ্চিত-বিতাড়িত করে এইসব প্রকৃতির সন্তানকে। সুদূর অতীত থেকে বঞ্চনাই ছিল তাদের দুর্ভাগ্যের লিখন। বিদেশী লুণ্ঠনকারীরা যেদিন এসে উপস্থিত হয়েছিল, প্রাণের তাগিদে সেদিন থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে চাবাগান ও সমতলের কর্মক্ষেত্রে। শাসকদের নিপীড়নের ও মহাজনের শোষণের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে একদিন। সেই মরণপণ লড়াই—সমসাময়িক কালের সাঁওতাল জীবন এবং তাদের বিদ্রোহের কাহিনি নিয়েই বর্তমান গ্রন্থ।

9 788129 511768

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সিপাহি যুদ্ধ এবং নীলবিদ্রোহ যতখানি মর্যাদার সঙ্গে বিশ্লেষিত, সাঁওতাল বিদ্রোহ ততখানি মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত হয়নি। তখন বাংলা প্রেসিডেন্সির অঙ্গ ছিল সাঁওতাল পরগণা। আজ বহির্বাংলার অন্তর্গত স্বতন্ত্র রাজ্য। আর্যপূর্ব ভারতের অধিবাসী সাঁওতাল জাতি সুদীর্ঘকালের অবহেলা। নির্যাতনে এক মর্মান্তিক দুর্বিষহ জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। নির্মম পৃথিবী ওদের কোথাও সুখেশান্তিতে বসবাস করতে দেয়নি। এক কঠোর সংগ্রামের অধ্যায়। আর্য সংস্কৃতি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা আদি বাসভূমি ত্যাগ করে, জঙ্গল অধ্যুষিত বিপদসঙ্কুল স্থানে নতুন বাসস্থান গড়ে তোলে বারবার। কঠোর পরিশ্রমে অনাবাদী জমিকে চাষের উপযোগী করে নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করেছিল। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সংস্কৃৎতকে তখনও তারা পরিত্যাগ করেনি। স্বতন্ত্র স্বাভাবিক জীবন যাপনে তারা অভ্যস্ত থেকেছে। নিরীহ, কঠোর পরিশ্রমী সাঁওতাল জীবনধারায় লেগেছে পালা বদলের হাওয়া। ক্রমশ আধুনিক জীবনধারায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। সাঁওতালদের গ্রামভিত্তিক জীবন, সঙ্গীতপ্রিয়তা, প্রকৃতিপ্রেম, পূজাপদ্ধতি, ভাষা এবং বিদ্রোহের বিবরণ নিয়েই বর্তমান গ্রন্থ।

ISBN : 978-81-295-1176-8

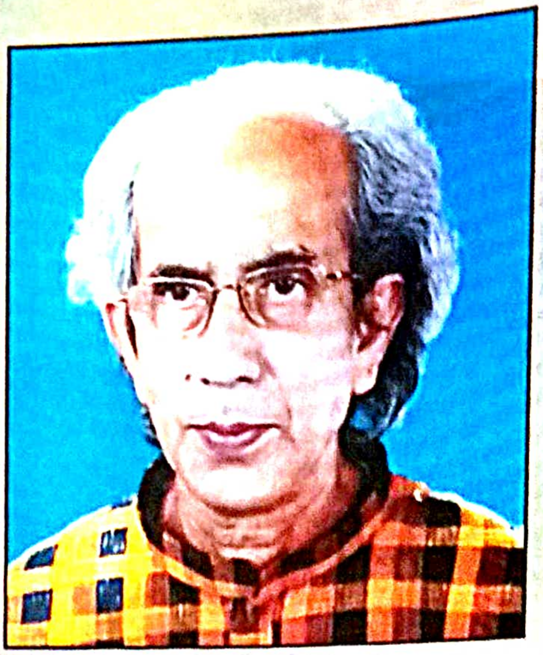

জন্ম ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। ১৯৪৭ সাল থেকেই কলকাতায় বড় হওয়া ও লেখাপড়া শেখা। ১৯৬১ সালে যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় যোগ দেন। তারপর থেকে যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা এবং সংবাদ প্রতিদিন-এ চাকরি জীবন কাটিয়ে ২০০২ সাল থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে ব্যস্ত। ১৯৮৭ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপর স্বতন্ত্র দুখানি বই লেখেন—যা ১৯৯৯ সালে একখণ্ডে 'চব্বিশ পরগনা-উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন' নামে প্রকাশিত। পরবর্তীকালে দে'জ ইতিহাস গ্রন্থমালায় সম্পাদনা করেছেন—যশোহর খুলনার ইতিহাস (২ খণ্ড), ঢাকার ইতিহাস (২ খণ্ড), বিক্রমপুর- রামপালের ইতিহাস, বৃহত্তর বাখরগঞ্জের ইতিহাস, সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস, দার্জিলিঙের ইতিহাস, কোচবিহারের ইতিহাস, ফরিদপুরের ইতিহাস, নোয়াখালি ও সন্দ্বীপের ইতিহাস, রাজসাহীর ইতিহাস, মেদিনীপুরের ইতিহাস (৩ খণ্ড), চট্টগ্রামের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (২ খণ্ড)। সিপাহি বিদ্রোহের ১৫০ বছর, বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ,বাঙ্গালার ইতিহাস (২ খণ্ড), সিলেটের ইতিহাস, নদীয়ার ইতিহাস, বীরভূমের ইতিহাস, সাঁওতাল বিদ্রোহ— সমাজ ও জীবন, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (নগেন্দ্রনাথ বসু) সিরাজদ্দৌলা (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়), বাঙ্গালার ইতিহাস— নবাবী আমল (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়), মধ্যযুগে বাঙ্গালা (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়), গৌড় রাজমালা (রমাপ্রসাদ চন্দ), উত্তরবঙ্গ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, গৌড় লেখমালা (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়), অগ্রন্থিত অক্ষয়কুমার, এবং অন্যান্য গ্রন্থ। 'গণ-আন্দোলনের ছয় দশক' নামে দুটি মূল্যবান গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার আরও কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায়।